New Pdf download: www.PoragEducation.com + webtalkbd.com

New Pdf download: www.PoragEducation.com + webtalkbd.com

নির্বাসন

সাদাত হোসাইন

অন্যধারা
৩৮/২-ক, বাংলাবাজার (৫ম তলা), ঢাকা-১১০০

New Pdf download: www.PoragEducation.com + webtalkbd.com

প্রকাশক
মোঃ মনির হোসেন পিন্টু
অন্যধারা
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা–১১০০
ফোন: ৭১২৩১৬৬, ০১৭১২৮০৭৯০১, ০১৯২০২১৬৯৬৮

নবম মুদ্রণ : মার্চ ২০১৯
অষ্টম মুদ্রণ : একুশে বইমেলা ২০১৯
সপ্তম মুদ্রণ : একুশে বইমেলা ২০১৯
ষষ্ঠ মুদ্রণ : একুশে বইমেলা ২০১৯
পঞ্চম মুদ্রণ : একুশে বইমেলা ২০১৯
চতুর্থ মুদ্রণ : একুশে বইমেলা ২০১৯
তৃতীয় মুদ্রণ : একুশে বইমেলা ২০১৯
দ্বিতীয় মুদ্রণ : একুশে বইমেলা ২০১৯
প্রথম প্রকাশ : একুশে বইমেলা ২০১৯

প্রচ্ছদ
হৃদয় চৌধুরী
(নাফিস আমিন এর তোলা আলোকচিত্র অবলম্বনে)

©
লেখক

কম্পোজ
অন্যধারা কম্পিউটার্স
৪৭/১ বাংলাবাজার, ঢাকা–১১০০
মুদ্রণ
একাত্তর প্রিন্টার্স
৪১/৪২, রূপচাঁন দাস লেন, ঢাকা-১১০০
মূল্য
৫৯০.০০ টাকা মাত্র

Nirbasan By Sadat Hossain
Published by Md. Monir Hossain Pintu, Anyadhara
38/2-Ka , Banglabazar, Dhaka 1100
Price : Tk. 590.00 Only US $ 25.00

ISBN 978–984–93661-1-9

ঘরে বসে বই পেতে ফোন করুন ১৬২৯৭
অথবা লগ অন করুন http://rokomari.com/anyadhara

New Pdf download: www.PoragEducation.com + webtalkbd.com

উৎসর্গ

দীর্ঘদিন আমার আফসোস ছিলো, আমার বড় কোন ভাই
বোন নেই বলে। নিজেকে মনে হতো খরতাপ দহনের
দিনে, ছায়াহীন পথে, একা হেঁটে যাওয়া মানুষ। সেখানে
হঠাৎই মায়াময় ছায়া হয়ে এলেন দুজন মানুষ–
এনামুল হক ও সাথি হাবিবা।
যেখানে আলোর রং আলোকিত আরো,
মমতা স্নেহের বোধ প্রগাঢ়, প্রগাঢ়!
এনাম ভাইয়া, আপনার এমন মমতার ছায়াবৃক্ষ বিস্তৃত হোক
আমার জীবনের বাকি পথজুড়েও। কথা দিচ্ছি, সেই পথ
ছুঁয়ে দেবে স্বপ্নের সীমানা।
সাথি আপু, এমন মায়াময় ভালোবাসায় আগলে রেখো।
কথা দিচ্ছি, আলো হয়ে ফিরে আসবোই, বারবার।

New Pdf download: www.PoragEducation.com + webtalkbd.com

ভূমিকা

আমার নানি কথায় কথায় শ্লোক আওড়াতেন।

সেই সব শ্লোকের বেশির ভাগই ছিল আমাদের কাছে দুর্বোধ্য। আমার সমবয়সী অন্য ভাই-বোনরা যখন তা এড়িয়ে যেত, আমি তখন অনেকটাই নাছোড়বান্দা, 'নানি, ওই যে বললেন, 'আহ্লাদের বউ তুমি, কাইন্দো না, কাইন্দো না, চাউল চাবাইয়া খাইমু আমি, রাইন্ধোনা, রাইন্ধোনা' এইটার অর্থ কী?'

নানি হেসে আমাকে পাশে বসাতেন। তাঁর গালের ভেতর পান গুঁজে দিতে দিতে ব্যাখ্যা করতেন। সেই ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বিশাল বিশাল গল্প ফেঁদে বসতেন তিনি। সেই সব গল্পের বেশির ভাগই আমার শৈশব-কৈশোরের কল্পনার জগৎকে রাঙিয়ে তুলত। ভাবনার জগৎকে আলোড়িত করত। গল্প শোনার এই তীব্র আগ্রহ আমি পুষে গেছি অহর্নিশ।

আমার চারপাশের জগৎ ও জীবনও যেন আমার সেই দুর্নিবার আগ্রহে সাড়া দিয়ে গেছে, আমার তেষ্টা মিটিয়ে গেছে। আমি চেতনে-অবচেতনে গল্প শুনে গেছি অবিরাম। সেই গল্প যে আমার ভেতরে গল্প বলবার একটা তীব্র তাড়নাও তৈরি করেছে, তা বুঝতে সময় লেগেছে বিস্তর। মজার ব্যাপার হচ্ছে, লিখতে শুরু করবার পর ক্রমশই আবিষ্কার করতে লাগলাম, আমার লেখার রসদ হিসেবে সেই গল্পগুলোই যেন কোথাও না কোথাও হয়ে উঠছে সরব কিংবা নীরব প্রণোদনা।

'নির্বাসন' তেমনই এক গল্প। যেই গল্পের প্রণোদনা শৈশবে লোকমুখে শোনা কোনো গল্পই। যেখানে জীবন এক অদ্ভুত খেয়ালি ঘুড়ির নাম। সে কখনো উড়ে যেতে যেতে সুতোর টানে থমকে দাঁড়ায়, ফিরে আসে নাটাইয়ের কাছে। আবার কখনো কখনো সুতো ছিঁড়ে উড়ে যায় অসীম আকাশে। সেই আকাশ কখনো মেঘ থমথমে বৃষ্টির, কখনো আলো ঝলমলে রোদ্দুরের। জীবনও।

'নির্বাসন' তাই জীবনের অন্য নাম।

—সাদাত হোসাইন

১৫ জানুয়ারি, ২০১৯

New Pdf download: www.PoragEducation.com + webtalkbd.com

'আসমানে উইঠাছে চাঁন, সেই চাঁন তোমারও লাহান,
চাঁনের ওই মুখ চৌক্ষে দেইখা, মন হইলো আনচান,
বাগানে ফুইটাছে ফুল, সেই ফুলে তোমারই ভুল,
আমার গাঙ্গে ঢেউ উঠাইয়া, ভাঙ্গিলো দুই কুল,
আকুল হইয়া সেই ঢেউয়েতে ঘর ভাইঙ্গাছি,
ও বন্ধু, তোমার লগে আমি আমার মন বাইন্ধাছি।
শুধু আমি জাইনাছি,
তোমার লাইগ্যা বন্ধু আমার মন বাইন্ধাছি।

জমিনে উইঠাছে বান, সেই বান তোমারো লাহান,
ঘর দুয়ার সব ভাসাই নিয়া, ভাসাইলো পরান,
নাও ভাসাইলো নয়া মাঝি, তারি তরে ধরলাম বাজি,
সেই বাজিতে সব হারাইয়া, মাঝ দইরাতে ভাসি,
সর্বনাশী আমিই আমার ঘর ভাইঙ্গাছি
ও বন্ধু, তোমার লগে আমি আমার মন বাইন্ধাছি।
শুধু আমি জাইনাছি,
তোমার লাইগ্যা বন্ধু আমার মন বাইন্ধাছি।

বুকেতে বাইন্ধাছে অসুখ, সেই অসুখের তুমি ওষুধ,
ফকির কবরেজ মিছাই আসুক, হইতে সাক্ষী সাবুদ।
নিশি রাইতে ডাকে কে যে, চৌক্ষের জলে বালিশ ভেজে,
সেই বালিশে নিত্য জানে, কী দুঃখ কার মাঝে!
সেই দুঃখেরই কান্দনে আমার ঘর ভাইঙ্গাছি
ও বন্ধু, তোমার লগে আমি আমার মন বাইন্ধাছি।
শুধু আমি জাইনাছি,
তোমার লাইগ্যা বন্ধু আমার মন বাইন্ধাছি।

—সাদাত হোসাইন

New Pdf download: www.PoragEducation.com + webtalkbd.com

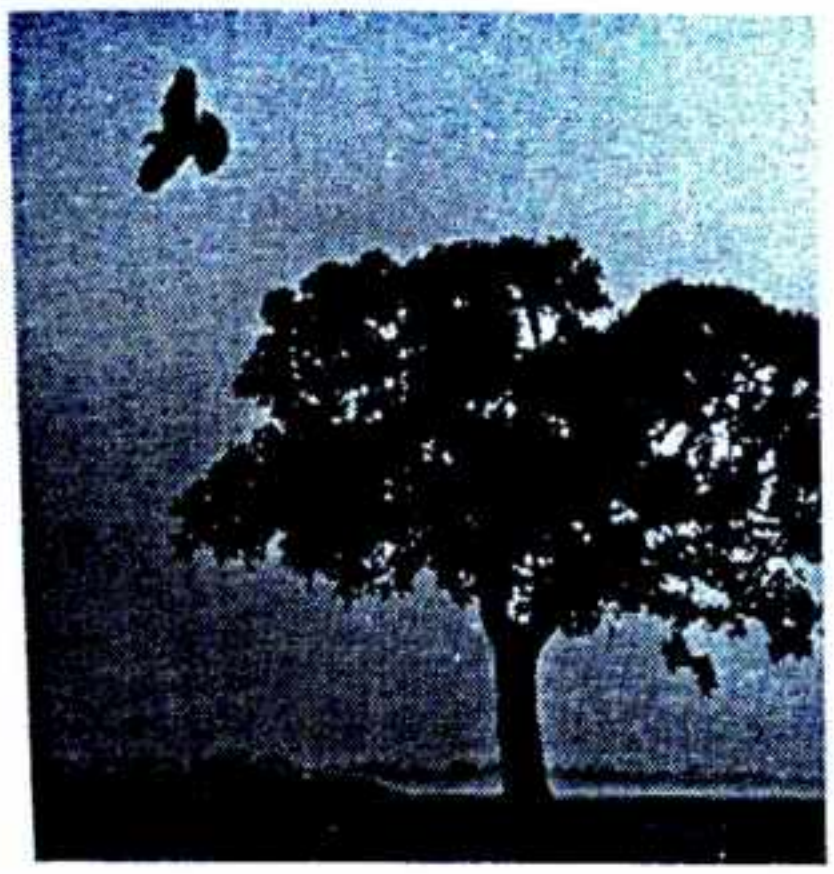

ভাদ্র মাসের আলো ঝলমলে সকাল। দিন তিনেকের গুমোট আকাশ ভেঙে গতরাতে তুমুল বৃষ্টি হয়েছে। তারপর ভোর এসেছে ঝাঁ চকচকে রোদ আর ফুরফুরে হাওয়া নিয়ে। তোরাব আলী লস্কর আমগাছের নিচে বসে আছেন। তার পরনে ধবধবে সাদা লুঙ্গি। পায়ে প্লাস্টিকের কালো জুতা। তবে তার শরীরের ঊর্ধ্বাংশ নগ্ন। নগ্ন শরীরে যত্ন করে তেল মেখে দিচ্ছে হানিফ। তোরাব আলী লস্কর মেঘের মতন গমগমে শব্দে বললেন, 'তোর বাতের ব্যতাডা বাড়ছেনি হানিফ?'

হানিফ থতমত খাওয়া গলায় বললো, 'আমারতো বাতই নাই। বাতের ব্যতা আইবো কোইথেইক্কা দাদাজান?'

'হেইডা আমি কেমনে বলবো! যেমনে ষোল বছরের মাইয়া মাইনষের মতন ঢ্যালঢ্যালা হাতে তেল মালিশ করতেছোস, তাতেতো মনে হয় তুই সত্তইর বছরের বাতের ব্যারামের রুগী। তোর এহন...।'

তোরাব আলী লস্করের কথা শেষ হলো না, তার আগেই জলের কলরোলের মতো হাসির শব্দ শোনা গেলো। হানিফ মুহূর্তেই সতর্ক হয়ে উঠলো। জোহরা এদিকে তাকিয়ে হাসছে। উঠানে ধান শুকাতে দেয়া হয়েছে। সেখানে রাজ্যের হাঁস-মুরগি। জোহরা সেই হাঁস-মুরগি তাড়াতে তাড়াতে হাসিতে ভেঙে পড়ছে। তোরাব আলী লস্কর জোহরার দিকে তাকিয়ে নরম গলায় ডাকলেন, 'এই দিকে আয়।'

জোহরা কোমরে শাড়ির আঁচল গুঁজতে গুঁজতে এলো। তার গলা ও নাকের ডগায় বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে আছে। গাছের পাতার ফাঁক-ফোকর দিয়ে আল্পনার মতো রোদ এসে পড়েছে তার মুখে। হানিফ সেদিকে মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে আছে।

New Pdf download: www.PoragEducation.com + webtalkbd.com

তোরাব আলী বললেন, 'তোর জ্বর কমছে?'

জোহরা বললো, 'পুরাপুরি কমে নাই।'

'তাইলে এই বেয়ান বেলা রোউদের মইধ্যে কামে নামছস ক্যা?'

'ঘরের মধ্যে সারাক্ষণ ভাল্লাগে না দাদাজান।'

'ঘরে ভালো না লাগলে এইহানে আইসা এই আম গাছতলায় বয়। বিলের পানি দেখছোস, কী সোন্দর! আর ফুরফুরা হাওয়া!'

জোহরা তাকালো। যতদূর চোখ যায় অসীম জলরাশি। জলের যেন কোনো শেষ নেই। মৃদু হাওয়ায় জলে ভাসা ধানের ডগা কাঁপছে। সে সেদিকে তাকিয়ে আনমনা ভঙ্গিতে বললো, 'আচ্ছা দাদাজান, যদি কোনোদিন দেখো বাপজান আবার ফিরা আসছে?'

তোরাব আলী লস্কর ঝট করে জোহরার দিকে ফিরে তাকালেন। কিছু একটা বলতে গিয়েও থমকে গেলেন। তারপর দমকা হাওয়ায় নিভে যাওয়া প্রদীপের মতো দপ করে নিভে গেলেন।

জোহরা বললো, 'আর কোনোদিন আইবো না দাদাজান?'

তোরাব আলী লস্কর দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, 'যে যায়, সে কি আর ফিরা আহে বু?'

'আহে না?'

'নাহ।'

'কিন্তু রুস্তম ভাই যে আইলো?'

'রুস্তম কি আসলেই আইছে?'

'আমি নিজ চোক্ষে দেখছি। তয় আগের মতো সেই জোয়ান তাগড়া, সাহসী মানুষটা আর নাই। কথা-বার্তাও খুব একটা কয় না। মুখভর্তি দাড়ি। আগে তারে দেখলে মাইনষে ভয় পাইতো, এহন সে মানুষ দেখলে ভয় পায়।'

তোরাব আলী লস্কর হাত বাড়িয়ে জোহরার হাতখানা ধরলেন। তারপর সামনের জলচৌকিতে মুখোমুখি বসিয়ে বললেন, 'রুস্তম আহে নাই, রুস্তমের মতো দেখতে অন্য মানুষ আইছে। একবার কেউ চইলা গেলে সে আর ফিরা আহে না। তার ছায়া আহে। বাইরে তার মতো দেখতে ভেতরের অন্য মানুষ আহে। চইলা যাওন যত সহজ, ফিরা আহন তত সহজ নারে বু।'

জোহরা কথা বললো না। সে তোরাব আলীর দিকে তাকিয়ে রইলো। এই মানুষটাকে তার কী যে অদ্ভুত লাগে! মানুষটা যেন ওই জলের মতোই শান্ত, সহজ, স্বচ্ছ অথচ গভীর। তার চোখে তাকালেই তখন তাকে পড়ে ফেলা যায়। আবার মুহূর্তেই কী ভীষণ প্রলয়ঙ্করী ঝড়!

জোহরা প্রসঙ্গ পাল্টালো, 'রাইতে যে বললা আমারে কিছু দিবা, এহন দেও।'

তোরাব আলী হাসলেন, 'এইটা এহনও ভুলোস নাই?'

'সব কিছু ভুইলা গেলে হইবো? হইবো না। দেও, দেও।'

তোরাব আলী তার লুঙ্গির কোঁচড় থেকে কাগজে মোড়ানো এক চিলতে সোনার চেইন বের করলেন। জোহরা ছোঁ মেরে তার হাত থেকে চেইনখানা নিয়ে নিলো।

New Pdf download: www.PoragEducation.com + webtalkbd.com

তোরাব আলী হাসলেন। জোহরা চেইনখানা গলায় পরতে পরতে বললো, 'এইখান কার গলায় আছিলো?'

'আন্ধারের মইধ্যে অতকিছু কি আর ঠাহর করন গেছে?'

পাশ থেকে হানিফ বলে উঠলো, 'এইখান আমি আনছি দাদাজান। তহন আন্ধার আছিলো না। গত সপ্তায় বড় লঞ্চ ডাকাতির সময় আনছি।' নতুন বউ, জামাইর লগে শহরেরতন ফিরতেছিলো। রামদাও দেইখ্যা নিজেই গলারতন খুইল্যা দিছে। জামাই বাধা দিতে গেছিলো, আমি কোপ দেওনের লাইগা রামদাও মাথার ওপর তুলতেই বউ আইসা আমার পাও জড়াই ধরলো। তারপর নিজের হাতেই সব খুইলা দিয়া দিলো।'

জোহরা অবশ্য হানিফের কথায় খুব একটা কান দিলো না। সে মনোযোগ দিয়ে গলার পেছন দিকে চেইনের আংটা লাগানোর চেষ্টা করছে। কিন্তু কিছুতেই কিছু হচ্ছে না। অবশেষে বিরক্ত ভঙ্গিতে হানিফের উদ্দেশ্যে বললো, 'হানিফ ভাই, একটু আংটাটা লাগাই দেও না'?

হানিফ যেন মুহূর্তেই প্রজাপতি হয়ে গেলো। সে ত্বড়িৎ উড়ে গিয়ে জোহরার পেছনে দাঁড়ালো। তারপর খানিক ইতস্তত ভঙ্গিতে আংটাটা লাগালো। জোহরা ঝলমলে গলায় বললো, 'আমারে কেমন লাগতেছে দাদাজান?'

তোরাব আলী বললেন, 'তোরে লাগতেছে রূপবানের লাহান।'

জোহরা ঠোঁট উল্টে বললো, 'জীবনে ওই এক রূপবান ছাড়াতো আর কিছু চিনলা না। আমি তোমার রূপবানের চাইতেও সোন্দর!'

তোরাব আলী হাসলেন। জোহরা উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বললো, 'যাই, ঘরে গিয়া আয়নায় দেহি।'

জোহরা চলে যেতেই তোরাব আলী গম্ভীর গলায় হানিফকে বললেন, 'তোরে আমি কইতে কইছি যে এই চেন কে, কই থেইকা, কেমনে আনছে?'

হানিফ ভীত গলায় বললো, 'আমি বুঝি নাই দাদাজান।'

তোরাব আলী আচমকা জোরালো চড় বসালেন হানিফের গালে। হানিফের মনে হলো সে চোখে জোনাকি পোকা দেখছে। তার বাঁ দিকের কান ঝা ঝা করছে। সে হতভম্ব চোখে তার সামনে স্থির বসে থাকা খানিক আগের শান্ত হাসিখুশি মানুষটার দিকে তাকিয়ে রইলো।

তোরাব আলী ঠাণ্ডা গলায় বললেন, 'তুই চেন আনতে গিয়া জামাইটারে খুন করছোস?'

হানিফ জবাব দিলো না। সে গালে হাত দিয়ে তার পায়ের নখের দিকে তাকিয়ে রইলো। তোরাব আলী বললেন, 'আর বউটারে কী করছোস?'

হানিফ হড়বড় করে কীসব বললো। তোরাব আলী অবশ্য সেসব আর শুনলেন না। তিনি হানিফকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, 'তোর বাপেরে এহনই ক এইখানে আইতে। জরুলী কথা আছে।'

হানিফ হাওয়ার বেগে উধাও হয়ে গেলো। তোরাব আলী উঠে দাঁড়ালেন। দাঁড়াতে গিয়ে কোমরে তীব্র ব্যথা অনুভব করলেন। অবশ্য বিষয়টিকে খুব একটা

New Pdf download: www.PoragEducation.com + webtalkbd.com

পাত্তা দিলেন না তিনি। এসব ছোটখাটো বিষয় তিনি কাউকে বুঝতে দিতে চান না।। বয়স বাড়লে এগুলো খুব স্বাভাবিক ঘটনা। স্বাভাবিক ঘটনাকে তিনি স্বাভাবিক হিসেবেই নিতে চান। বিচলিত হতে চান না। তিনি বিচলিত জোহরাকে নিয়ে। জোহরা এখনো মনে মনে তার বাবার ফিরে আসার অপেক্ষা করে, বিষয়টি তিনি নিতে পারেননি। জোহরার বাবা ফয়জুল তার মেজো ছেলে। সে আজ সাত বছর ধরে নিখোঁজ। তার মানে এই সাতটি বছর জোহরা মনে মনে তার বাবার ফিরে আসবার অপেক্ষা করছে! ষোল বছরের একটা মেয়ের প্রায় অর্ধেক জীবন কেটে গেছে অপেক্ষায়। কী ভয়ানক ব্যাপার!

তোরাব আলী লস্কর জানেন, জগতে অনিশ্চিত অপেক্ষার চেয়ে ভয়ংকর কিছু নেই। কিন্তু এই অনিশ্চিত অপেক্ষার যন্ত্রণা তিনি জোহরাকে পেতে দিতে চান না। আচ্ছা, মানুষ না চাইলেই কি তা হয় না? জীবনের কাছে তারও যে ঢের ঋণ জমা হয়ে আছে। সেই সব ঋণের হিসেব না নিয়ে জীবন তাকে ছাড়বে কেন? জীবনজুড়ে কত শত মানুষের এমন তীব্র যন্ত্রণাকাতর অপেক্ষার কারণ তিনি হয়েছেন, তা তোরাব আলী লস্করের চেয়ে ভালো আর কে জানে! তিনি এও জানেন, সেইসব ঋণের হিসেব কড়ায়-গণ্ডায় বুঝে নিতে জীবন একদিন না একদিন তার দুয়ার আগলে দাঁড়াতোই।

কিন্তু তার কৃতকর্মের হিসেব জোহরাকে কেন দিতে হবে? বিষয়টা তোরাব আলী লস্কর মেনে নিতে পারছেন না!

হানিফ তার বাবাকে নিয়ে এসেছে। তার বাবার নাম আয়নাল হক। আয়নাল হক তোরাব আলী লস্করের বড় ছেলে। লম্বা, রোগা চেহারার মানুষটার চোখ দুটো অদ্ভুত ফ্যাকাশে। খানিকটা মৃত মাছের চোখের মতো চোখ। ভাবলেশহীন। সে কথা বলে ফ্যাঁসফ্যাঁসে গলায়।

তোরাব আলী বললেন, 'খবর কী?'

'খবর ভালো না বাজান।'

'বাহাদুরের বউ কি টিকবো মনে হয়?'

আয়নাল ডানে-বাঁয়ে মাথা নাড়ালো, 'মনে হয় না।'

তোরাব আলী লস্কর সামান্য চুপ থেকে বললেন, 'এই এক কলেরায়তো বংশ নির্বংশ কইরা ছাড়বো। কোনো উপায় ভাবছোস?'

'এইহানে কি ডাক্তার কবিরাজ কিছু আছে? কি উপায় ভাববো?'

'আশেপাশের কোনো গঞ্জে নিয়া যাওন যায় না?'

'যায়, তয় আশেপাশের গঞ্জওতো কম দূরে না। তা ছাড়া রুগীতো এক দুইজন না, দশ বারো জন। এই বিলের পানি ভাইঙ্গা টলারে যাইতে আইতেও দুই দিন শ্যাষ। তার ওপর পুলিশের ডর আছে। কে কোনহানে ওত পাইত্যা থাহে কে জানে! আর হাতে ট্যাকা-পয়সাও তেমন নাই। শ্যাষ খ্যাপে নগদ ট্যাকা পয়সা বলতে তেমন কিছু পাই নাই। সোনা গয়না যা পাওন গেছে, হেইগুলা বেচা বিক্রি না করতে পারলে অবস্থা খারাপ।'

New Pdf download: www.PoragEducation.com + webtalkbd.com

'বেচা বিক্রির ব্যবস্থা কর।'

'কই বেচবো? আগের মাল কেনার পার্টির খোঁজ নাই। হুনছি ঢাকা শহরে সরকারের লগে ছাত্রগো কী গণ্ডগোল চলতেছে! হেই গণ্ডগোল এহন গ্রাম– গঞ্জেও ছড়াইয়া পড়তেছে। এইজন্য সবাই একটু সাবধানে। কোন দিক দিয়া কোন বিপদ আহে কেউ জানে না। এদিকে এইহানে এই কলেরার বিপদ। নগদ ট্যাকা-পয়সা ছাড়া আর কয়দিন? একজন-দুইজন হইলে না হয় একটা কথা আছিলো!'

'হুম।'

তোরাব আলী লস্কর গম্ভীর ভঙ্গীতে জবাব দিলেন। তারপর গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়ে রইলেন। তিনি ভালো করেই জানেন আগের সেই দোর্দণ্ড প্রতাপ আর তাদের নেই। লোকে এখনো তাদের ভয়-ডর করলেও দুর্বল মুহূর্তে সুযোগের অপেক্ষায়ও থাকে। লোকালয় থেকে বহু দূরের প্রত্যন্ত এই চরে বংশপরম্পরায় তাদের বাস। সময় সুযোগ বুঝে নদীপথের যানবাহনে তারা চুরি-ডাকাতি করে। এই কারণে মাঝেমধ্যে খুন-খারাবিও করতে হয়। কিন্তু আগের সেই নাম-ডাক আর তাদের নেই। বরং মানুষ এখন সুযোগ খোঁজে। দুর্বল মুহূর্তে আঘাত হানার চেষ্টা করে।

ঠিক সাত বছর আগের এক গভীর রাতে সোনাপুর বাজারে তার মেজো ছেলে ফয়জুলকে ঠিক এভাবেই লোকজন ধরে নিয়ে গিয়েছিলো। অন্ধকারে ওঁত পেতে থাকা গ্রামবাসী হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়লো। অবস্থা বেগতিক দেখে কোনমতে পালিয়ে এলো তারা। কিন্তু বিলের মাঝখানে আসার পর দেখা গেলো ফয়জুল নেই! ততক্ষণে ভোরের আলো ফুটেছে।

তোরাব আলী লস্কর এখনো জানেন না, ফয়জুল বেঁচে আছে না মরে গেছে! বহু চেষ্টা করেও ফয়জুলের কোনো খোঁজ তিনি বের করতে পারেননি। তবে ফয়জুলের মৃত্যুর কোনো খবরও তিনি পাননি। থানা-পুলিশ থেকে শুরু করে নদী-নালা, খাল-বিল সব চষে বেড়িয়েছে তার লোকজন, কিন্তু ফয়জুলের কোনো খোঁজ মেলেনি।

যেন ফয়জুল বলতে কখনোই কোথাও কেউ ছিলো না। সাতটা বছর! তোরাব আলী লস্করের বুক চিরে গভীর দীর্ঘশ্বাস নেমে এলো।

তিনি আচমকা উঠে দাঁড়ালেন। তারপর শক্ত গলায় বললেন, 'আগামী সাত দিনে তিন গঞ্জে ডাকাতি হইবো। গঞ্জের আড়তদারগো আগে থেইকাই চিঠি দে, যেন দোকানে নগদ ট্যাকা-পয়সা রাহে। নগদ ট্যাকা-পয়সা ছাড়া আর কোনো মালামালের দরকার নাই আমাগো।'

আয়নাল হক আর্তনাদের মতো গলায় বললো, 'তিন গঞ্জে একসাথে! তাও আবার চিঠি দিয়া? কেমনে বাজান?'

'কেমনে হেইডা আমি বুঝবো। লস্কররা আগে চিঠিপত্র পাঠাইয়া ঘোষণা দিয়াই ডাকাতি করতো। খুন-খারাবিও। বাঁচলে ব্যাডাগো মতন বাঁচতে হইবো। বিলাইর মতন মিউ মিউ কইরা না। এহন আবার হেইডাই শুরু করবো। তোরে যেইটা কইছি হেইডা কর।'

New Pdf download: www.PoragEducation.com + webtalkbd.com

'লোকজন বেশির ভাগই কলেরায় কাহিল বাজান। বাহাদুরের বউর এহন তহন অবস্থা। তার ওপরে রুস্তমরে পুলিশ ধইরা নিয়া যেমনে মারছে, ওর মাথায় মনে হয় গণ্ডগোলই দেহা দিছে। এই অবস্থায়...।'

তোরাব আলী লস্কর হাত তুলে আয়নালকে থামিয়ে দিলেন। তারপর হানিফকে পাঠালেন জোহরাকে ডেকে আনতে। সাথে কাগজ-কলম। জোহরা অল্পবিস্তর পড়াশোনা জানে। সে তোরাব আলী লস্করের সামনে জলচৌকির ওপর বসলো। তারপর রুলটানা কাগজে ভাঙা ভাঙা অক্ষরে চিঠি লিখতে লাগলো। তোরাব আলী লস্কর মুখে মুখে বলছেন। জোহরা লিখছে। তার জীবনে লেখা প্রথম চিঠি।

সে লিখলো, 'গোলাম আলী খাঁ সাব, সালাম নেবেন। বুধবার দিবাগত রাতে আমি আপনের পাঁটের আড়তে আসবো। আড়তে নগদ পয়সাপাতি রাখবেন। চরে নানান অসুখ-বিসুখ শুরু হইছে। মেলা টেকা পয়সা দরকার। আর খেয়াল রাইখেন, আমার লোকেগোর কারো যেন কোনো অসুবিধা না হয়। আমার আর আগের মতো খুন-খারাবি ভালো লাগে না। তয় আপনে জানেন, আমার অসুবিধা হইলে আমি যেকোনো কিছুই করতে পারি। অসুবিধা আমার পছন্দ না।

ইতি- তোরাব আলী লস্কর।'

চিঠি লেখা শেষে জোহরা তার দাদাজানকে পড়ে শোনালো। তোরাব আলী লস্করের মন ভালো হয়ে গেলো। বাপ-মা ছাড়া এই মেয়েটাকে তিনি অসম্ভব স্নেহ করেন। সে একা একা নিজের চেষ্টায় পড়া-লেখা শিখেছে। এই বিষয়টিতে তিনি ভীষণ চমকিত। গর্বিতও। তিনি হাত বাড়িয়ে জোহরাকে কাছে টানলেন। তারপর যেন আচমকা চোখে পড়েছে, এমন ভঙ্গীতে বললেন, 'তোর চেনখান কই? খুইলা রাখছোস? চেনখানতো তোর গলায় চান্দের হারের মতোন লাগতে আছিলো!'

জোহরা তোরাব আলী লস্করের মুখের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসলো। তারপর নির্বিকার ভঙ্গীতে বললো, 'চেনখান ভর্তি শুকনা রক্ত লাইগা আছিলো দাদাজান। হানিফ ভাই মাইয়াডারে খুন করনের সময় চেনখান মনে হয় মাইয়াডার গলায়ই আছিলো। হেই রক্ত চেনের ছোট ছোট আংটার মইধ্যে ঢুইক্যা শুকাইয়া শক্ত হইয়া রইছে। এইজন্য ধুইতে সাবানের পানিতে ভিজাইয়া রাখছি। ধোয়া হইলে গলায় পরবো।'

তোরাব আলী লস্কর বিস্মিত চোখে জোহরার দিকে তাকিয়ে আছেন। জোহরা হাসছে। কী সুন্দর নিষ্পাপ সেই হাসি! কিন্তু সেই নিষ্পাপ, সুন্দর হাসির দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে তোরাব আলী লস্করের বুকের ভেতরটা হঠাৎ কেঁপে উঠলো!

New Pdf download: www.PoragEducation.com + webtalkbd.com

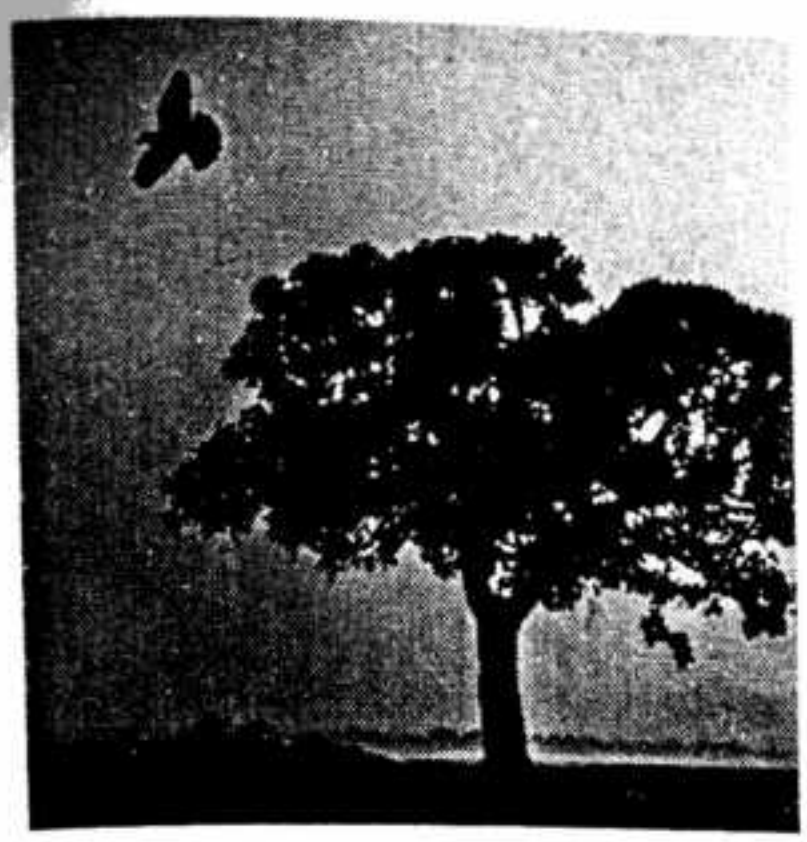

আজাহার খন্দকার যখন বাস থেকে ঢাকা নিউ মার্কেট এলাকায় নেমেছেন তখন সন্ধ্যা। কিন্তু অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে এখন গভীর রাত। রাস্তা-ঘাটে লোকজন তেমন নেই। দোকান-পাট বন্ধ। সড়ক দ্বীপের মাঝখানে যে ল্যাম্পপোস্ট তার আলোও যেন ম্রিয়মান। তিনি এদিক-সেদিক তাকিয়ে একখানা রিকশা দেখতে পেলেন। রিকশাওয়ালা কানের কাছে রেডিও নিয়ে সংবাদ শুনছে। ১৯৮৮ সালের মার্চ মাসের নির্বাচন সরকারি দল ছাড়া বাদবাকি সব দল বর্জন করেছে। এই নির্বাচনের কারণে দেশের রাজনৈতিক অবস্থা থমথমে। গতবছর নভেম্বরে সরকার বিরোধী আন্দোলনে নুর হোসেন পুলিশের গুলিতে নিহত হয়েছেন। এই নিয়ে দেশে-বিদেশে সরকারবিরোধী জনমত গড়ে উঠেছে। আন্দোলন বেগবান হয়েছে। তারপরও সরকার নির্বিকার। তারা নির্বাচন দিয়ে আবারও সরকার গঠন করেছে। কিন্তু ভেতরে ভেতরে কোথায় যেন একটা স্পষ্ট অস্বস্তি।

এর মাস কয়েক পরে আজাহার খন্দকার ঢাকায় এসেছেন তার বড় ছেলে মনসুরকে গ্রামে নিয়ে যেতে। মনসুর ঢাকা মেডিকেল কলেজের তৃতীয় বর্ষের ছাত্র। আজাহার খন্দকারের ধারণা সে পড়াশোনা বাদ দিয়ে সারাক্ষণ মিছিল-মিটিং আন্দোলন নিয়ে ব্যস্ত থাকে। এই কারণে এর আগেও বিভিন্ন সময়ে তিনি মনসুরকে গ্রামে নিয়ে যেতে চেয়েছেন। কিন্তু মনসুর নানা অজুহাতে তার কথা শোনেনি। তবে এবার আজাহার খন্দকার আটঘাট বেঁধেই এসেছেন। যে করেই হোক মনসুরকে এবার তিনি সাথে নিয়েই বাড়ি ফিরবেন। পরপর তিনদিন মনসুরকে নিয়ে ভয়াবহ দুঃস্বপ্ন দেখেছেন তিনি। দেশের পরিস্থিতি পুরোপুরি শান্ত না হওয়া পর্যন্ত মনসুরকে তিনি আর ঢাকায় ফিরতে দিবেন না।

New Pdf download: www.PoragEducation.com + webtalkbd.com

আজাহার খন্দকার রিকশাওয়ালার কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন, 'ঢাকা মেডিকেল যাবা?'

রিকশাওয়ালা তার কথা শুনেছে বলে মনে হলো না। সে গভীর মনোযোগে সংবাদ শুনছে। বিষয়টা নিয়ে আজাহার খন্দকার বিরক্ত। একজন রিকশাওয়ালার এত গুরুত্ব দিয়ে সংবাদ শোনার কি আছে! তিনি খানিক দাঁড়িয়ে থেকে আলতো হাতে রিকশাওয়ালার কাঁধ ছুঁয়ে বললেন, 'খবরে ভাত দিবো? খ্যাপ মারতে হইবো না?'

রিকশাওয়ালা বিরক্ত ভঙ্গিতে তার দিকে তাকালো। তারপর খক শব্দে মুখ ভর্তি করে থুথু ফেলতে ফেলতে বললো, 'খবর কে হুনতেছে!'

'তাইলে কী হুনতেছো?'

'কান ভর্তি খইস। খইসের জ্বালায় কিচ্ছু কানে হুনিনা, আবার খবর! সারাক্ষণ খালি ঘ্যাড়ঘ্যাড় করে। আইজ নগদ দুই ট্যাহা দিয়া কানের খইস পরিষ্কার করলাম। এহন কান টেস করতেছি।'

আজাহার খন্দকার কিছুটা থতমত খেয়ে গেছেন।। তিনি দ্বিধাগ্রস্ত গলায় বললেন, 'টেস্টের ফলাফল কি? কানের খইস কি পরিষ্কার হইছে?'

'বুঝতেছি না। তয় আপনের কথাতো মনে হয় পরিষ্কারই হুনতেছি। কিন্তু রেডিও হুনতে গেলেই ঘ্যাড়ঘ্যাড় শব্দ হয়।'

আজাহার খন্দকার হাসলেন, 'সমস্যা তোমার কানে না, সমস্যা রেডিওতে।'

রিকশাওয়ালা সম্ভবত আজাহার খন্দকারের কথায় মুগ্ধ হয়েছে। সে রেডিওখানা রিকশার সিটের তলায় রাখতে রাখতে বললো, 'আপনে ছার যাইবেন কই?'

'মেডিকেলে।'

'এই সময়ে মেডিকেলে ক্যান? কেউ অসুস্থ নাকি!'

আজাহার খন্দকার রিকশায় উঠতে উঠতে বললেন, 'নাহ, অসুস্থ না। আমার বড় ছেলে সেইখানে পড়ে। তার কাছে যাবো।'

'ওইদিকের অবস্থা কিন্তু ভালো না স্যার। দুপার বেলা পুলিশের লগে ইনভার্সিটির ছাত্রগো মারামারি হইছে। কয়জন যে হাসপাতালে, আল্লাহয়ই জানে! আর এহন পুলিশ যারে পাইতেছে তারেই ধরতেছে।'

আজাহার খন্দকারের বুক ধক করে উঠলো। তিনি নিশ্চিত হওয়ার জন্য জিজ্ঞেস করলেন, 'ইউনিভার্সিটির নাকি মেডিকেলের?'

'অত কি আর আমরা বুঝি ছার? ছাত্র আর পুলিশের মইধ্যে লাগলো। ইট-পাটকেল, টিয়ার গ্যাস, গুলি।'

আজাহার খন্দকারের আচমকা শরীর খারাপ লাগতে লাগলো। পরপর বেশ ক'দিন তিনি মনসুরকে নিয়ে দুঃস্বপ্ন দেখেছেন। বিষয়টি তিনি মাথা থেকে তাড়াতে পারেননি। ঢাকা শহরে নামার পর থেকেই তার মন আরো কু ডাক ডাকছিলো। এখনতো রীতিমতো হাত-পা কাঁপছে। তিনি নিচু গলায় বললেন, 'কারো বড় কোন ক্ষয়-ক্ষতি হয়নাইতো?'

New Pdf download: www.PoragEducation.com + webtalkbd.com

পুলিশের বড় একটা ভ্যান ফস করে তাদের গা ঘেঁষে বেরিয়ে গেলো। সেদিকে তাকিয়ে রিকশাওয়ালা প্রায় ফিসফিস করে বললো, 'লাশ পড়ছে কমপক্ষে এক গণ্ডা। কিন্তু হেই কতা কি আর কেউ কইবো? কইবো না। সবাই সরকাররে ডরায়। পুলিশের মাইরেরে ডরায়। এইজন্য সাম্বাদিক, রেডিও, টিভি আসল ঘটনা কয় না, ছাপায় না। কিন্তু জনগণ কি বলদ? জনগণ বলদ না, হেরা সব বোঝে। এই যে বড় বড় গাড়ি যায়, এইগুলানের মইধ্যে কি? খালি লাশ আর লাশ।'

'আস্তে কথা বলো। তুমি লাশ দেখছো?'

'দেখছি না আবার? মাথা ফাইট্টা মগজ বাইর হইয়া গেছে। সেই মগজ পইড়া আছে রাস্তায়। আর লাশ গাড়িতে।'

'তুমি নিজ চোখে দেখছো?'

রিকশাওয়ালা জবাব দিলো না। চুপচাপ রিকশা চালাতে থাকলো। আজাহার খন্দকারের মাথা কাজ করছে না। তার শরীর ঝিমঝিম করছে। তিনি আবারো জিজ্ঞেস করলেন, 'ঘটনা কোন জায়গায় ঘটছে?'

'কোন জায়গায় ঘটছে সেইটা আমি কেমনে বলবো? আমি কি ঘটনা ঘটাইছি? যে ঘটনা ঘটাইছে, ইট দিয়া বাড়ি মাইরা মাথা ফাটাইছে, সে বলতে পারবো।'

'তাইলে তুমি যে বললা, তুমি নিজ চোখে দেখছো?'

'আমি দেখবো কেন? আমি ঝয়-ঝামেলার মইধ্যে নাই। আমি হুনছি। আমাগো লগের আরেক রিকশাওয়ালা দেখছে। তয় হের নাম বলন যাইবো না। নাম বলন নিষেধ। নাম বললেই বিপদ!'

আজাহার খন্দকার যেন একটু হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। এর কথাবার্তার ঠিক নেই। কিন্তু তারপরও মাথা থেকে দুশ্চিন্তা পুরোপুরি দূর করতে পারলেন না। দুশ্চিন্তা দূর হলো পলাশি পার হওয়ার সময়। ছেলেদের ছোটখাটো একটা জটলা থেকে তাকে মনসুর ডাকলো, 'আব্বা!'

আজাহার খন্দকার প্রথমে বুঝতে পারলেন না। যতক্ষণে বুঝতে পারলেন ততক্ষণে তার চোখে পানি চলে এসেছে। এই রাস্তার মাঝখানে অত লোকের ভিড় থেকে মনসুর যেভাবে চিৎকার করে তাকে আব্বা বলে ডেকেছে বিষয়টা তাকে স্পর্শ করেছে। তিনি মানুষ হিসেবে কঠিন ধাঁচের। কঠিন ধাঁচের মানুষদের যে কোমল অনুভূতি নেই, তা না। বেশির ভাগ কঠিন মানুষের সমস্যা হচ্ছে, তারা সেই কোমল অনুভূতিগুলো ঠিকঠাক প্রকাশ করতে পারেন না। কারো প্রতি প্রবল মায়া, স্নেহ, ভালোবাসা থাকলে সেটি প্রকাশ করতে গিয়ে তারা সবকিছু এলোমেলো করে ফেলেন। ভালোবাসার বদলে শাসন দেখিয়ে ফেলেন। আনন্দের বদলে রাগ দেখিয়ে ফেলেন। ক্রমাগত এই বিব্রতকর অভিজ্ঞতা তাদের তখন আরো বেশি খোলসবন্দি করে ফেলে। তারা তখন তাদের জীবন কাটিয়ে দেন কঠিন মানুষের চেহারা নিয়ে।

তিনি রিকশা থেকে নেমে খুব স্বাভাবিক ভঙ্গিতে মনসুরকে জিজ্ঞেস করলেন, 'ঢাকায় নাকি খুব গণ্ডগোল হইছে?'

New Pdf download: www.PoragEducation.com + webtalkbd.com

'খুব বেশি কিছু না আব্বা। এই পুলিশের সাথে ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া। আজকাল এ আর তেমন কী!'

'হুনলাম ছাত্র মারা গেছে নাকি অনেক!'

'ধুর। কিচ্ছু না। এগুলো মানুষ ছড়াচ্ছে। আসলে কী হয়েছে, সরকার পেপার, রেডিও, টেলিভিশন সব সেন্সর করছে। যা ঘটছে, তার কিছুই দেখাচ্ছে না, প্রকাশ করতে দিচ্ছে না। এর ফলে যেটা হয়েছে, মানুষ যে যেভাবে পারছে, মনগড়া কথা রটাচ্ছে। আর একজনের কথা পাঁচজনের কাছে পাঁচভাবে ছড়াচ্ছে।'

'ওহ!' আজাহার খন্দকার তীক্ষ্ণ চোখে রিকশাওয়ালার দিকে তাকালেন। রিকশাওয়ালা অবশ্য তাকে পাত্তা দিলো না। সে চিন্তিত ভঙ্গিতে বললো, 'ছার, আপনের কথা ঠিক না। কানের মইধ্যে আবার ঘ্যাড়ঘ্যাড় করতেছে। এহনতো কানের ধারে রেডিও নাই, তাও ঘ্যাড়ঘ্যাড় করে! আবারো কানের খইস পরিষ্কার করন লাগবো। দুইডা ট্যাহা বাড়াই দিয়েন।'

আজাহার খন্দকার আর কথা বাড়ালেন না। তিনি দুটাকা বেশি দিয়ে রিকশাওয়ালাকে বিদায় করে দিলেন। মনসুর বললো, 'সরকার ভুল করছে। তারা এই রেডিও-টিভি কন্ট্রোল করে নিজেদের বরং আরো ক্ষতি করছে। যা ঘটেনি, মানুষ তাও ভেবে নিচ্ছে। নিজেদের মতো কল্পনা করে নিচ্ছে। ঠিকঠাক খবর প্রকাশ করলে, মানুষের কাছে মিডিয়ার গ্রহণযোগ্যতা থাকলে এটা হতো না।'

'এইসব দিয়া আমার দরকার নাই। তুই ব্যাগট্যাগ গুছগাছ কর। কাইল সকাল সকাল বাড়িতে রওয়ানা দিবো।'

মনসুর অবাক হলো না। সে খুব স্বাভাবিক গলায় বললো, 'কাল সকালেরটা সকালে দেখা যাবে আব্বা।'

আজাহার খন্দকার আচমকা চিৎকার করে উঠলেন, 'সকালে না। তুই এখন ব্যাগ গুছা। এক্ষণ। এক্ষণ আমি তোরে নিয়া বাড়ি যাবো। বাড়ি নিয়া গিয়া আমার পাটের আড়তের পাশে ওষুধের দোকান দিয়া দিবো। তুই ব্যাগ গুছা।

মনসুর অবাক চোখে তার বাবার দিকে তাকিয়ে রইলো। তার বাবা রাগী মানুষ সে জানে, কিন্তু তার এই বাবাকে সে চেনে না। আজাহার খন্দকারের চোয়াল কাঁপছে। তিনি ঘামছেন। লক্ষণ ভালো নয়। মনসুর আর কথা বাড়ালো না। সেই রাতে তারা রওয়ানা দিলো নবীগঞ্জের দিকে।

New Pdf download: www.PoragEducation.com + webtalkbd.com

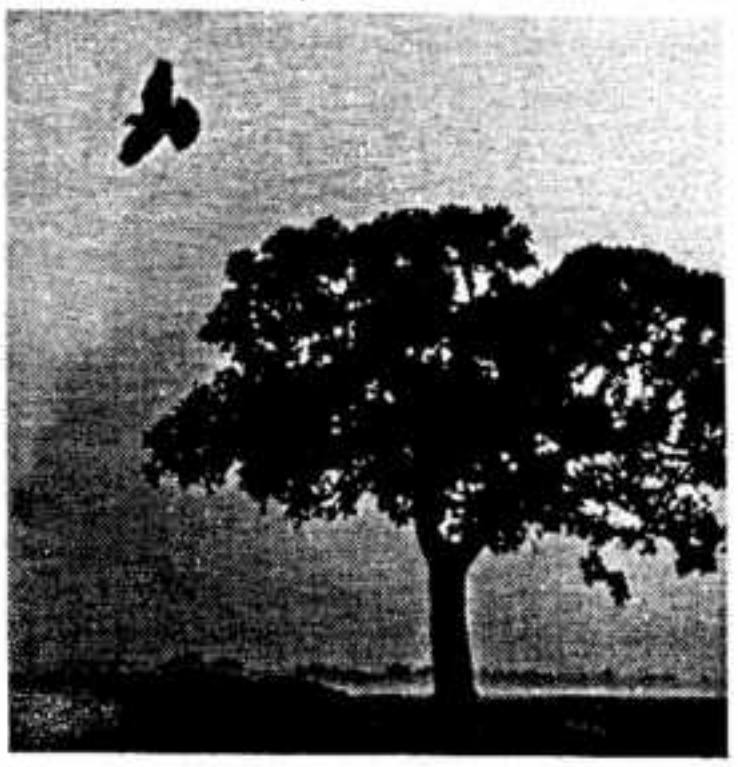

আজাহার খন্দকার চিঠিখানা পেলেন ঢাকা থেকে নবীগঞ্জ আসার দিন দশেক বাদে। মনসুর ততদিনে তার বন্ধুর বাড়ি গোবিন্দপুর বেড়াতে গেছে। তিনি আজ একটু বেলা করে নবীগঞ্জ ছোট বাজারে তার পাটের আড়তে এসেছেন। মূল গঞ্জ থেকে মাইল পাঁচেক দূরে এই ছোটবাজার। তার কর্মচারী মতি মিয়া ভোরবেলা আড়ত খুলতে এসে ঝাঁপের সাথে আটকানো চিঠিখানা পেয়েছে। আজাহার খন্দকার দোকানে আসতেই সে চিঠিখানা বাড়িয়ে দিলো। চিঠি খুলে আজাহার খন্দকারের মেরুদণ্ড বেয়ে ভয়ের একটা শীতল স্রোত বয়ে গেলো। তোরাব আলী লস্করের চিঠি। আগামী বুধবার দিবাগত রাতে সে দলবল নিয়ে ডাকাতি করতে আসবে। দোকানে পর্যাপ্ত নগদ টাকা-পয়সা রাখতে বলেছে। কোনো ধরনের বাধা-বিপত্তি যেন না ঘটে, সেই বিষয়েও সতর্ক করে দিয়েছে। প্রয়োজনে খুন-খারাবি করতেও সে দ্বিধা করবে না।

আজাহার খন্দকার চিঠিটা বার কয়েক পড়লেন। তারপর চাপা গলায় বললেন, 'এই চিঠি কী আসল নাকি মতি?'

মতি মিয়া ঘাড় চুলকে বললো, 'দেইখ্যাতো আসলই মনে হয় খোনকার সাব।'

'কী দেইখ্যা আসল মনে হইলো?'

মতি মিয়া আরো খানিক্ষণ ঘাড় চুলকে বিজ্ঞের ভঙ্গিতে বললো, 'গত দুই সপ্তায় দুই জায়গায় ডাকাতি হইছে। গত সপ্তায় হইলো ভেদরগঞ্জে। আপনে যেই দিন ঢাকায় গেলেন, হেইদিন রাইতে হইলো গোলাম আলী খাঁ সাবের বাড়িতে।'

'এহন কি করবো? পুলিশে খবর দিবো?'

New Pdf download: www.PoragEducation.com + webtalkbd.com

'পাগল নাকি আপনে! এই কাম কেউ করে? টেকা-পয়সা যা আছে, সব আড়তে আইন্যা থুইয়া দ্যান। তারা আইলে আমি গিয়া তাগো ট্রলারে পৌছাই দিয়াসবো। শুধু শুধু পানির কুমির ডাঙ্গায় আননের কী দরকার!'

মতি মিয়াকে কিছু বলতে গিয়েও আজাহার খন্দকার নিজেকে সামলে নিলেন। তার মাথার ওপর টিনের চাল। ভাদ্রমাসের গরমে সেই চাল তেঁতে আছে। প্রচণ্ড গরমে আজহার খন্দকারের কানের পাশ দিয়ে ঘামের চিকন স্রোত নামছে। কপালের বাঁ পাশের শিরাটা দপদপ করে কাঁপছে। তবুও তিনি নিজেকে শান্ত রাখার চেষ্টা করছেন। বহু ব্যবহারে কালো তেলতেলে হয়ে যাওয়া মেহগনি কাঠের ক্যাশবাক্সের ওপর থেকে তিনি চিঠিখানা আবারো হাতে নিলেন।

দুই লাইনের চিঠি, *'খোনকার সাব, সালাম নিবেন। বুধবার দিবাগত রাতে আমি আপনের পাটের আড়তে আসবো। আড়তে নগদ পয়সাপাতি রাখবেন। চরে নানান অসুখ বিসুখ শুরু হইছে। মেলা টেকা পয়সা দরকার। আর খেয়াল রাইখেন, আমার লোকগোর কারো কোনো অসুবিধা জানি না হয়। আপনে জানেন, আগের মতো এহন আর আমার খুন খারাবি ভালো লাগে না। আবার অসুবিধাও পছন্দ হয় না। ইতি– তোরাব আলী লস্কর।'*

আজাহার খন্দকার গদি ছেড়ে উঠে চিঠি হাতে আড়তের দরজার কাছে এসে দাঁড়ালেন। সামনে যতদূর চোখ যায় বিস্তৃত বিল। বিলের দিকে বেশিক্ষণ চোখ রাখা যাচ্ছে না। প্রচণ্ড রোদে বিলের পানি থেকে যেন আগুনের হলকা উঠছে। তিনি চোখ সরিয়ে নিতে নিতে বললেন, 'মনসুরের কোনো খবর আছে নি মতি?'

'আছে। সে তার বন্ধুর বাড়ি গোবিন্দপুরে গেছে। কবে ফিরবো কিছু বইলা যায় নাই।'

'এই খবর জানি। এই খবর ছাড়া নতুন আর কোন খবর আছে?'

'নতুন কোন খবর নাই খোনকার সাব।'

'খবর না থাকলে খবরের ব্যবস্থা কর।'

'নবীগঞ্জ থেইকা গোবিন্দপুর লঞ্চে যাইতেও এক রাইতের পথ। আইজকাল যাত্রীও তেমন জোটে না, তার ওপর হয় লোকসান। এইজন্য লঞ্চের ট্রিপও গেছে কইমা। ট্রিপ মারে পনের দিন পরপর এক দিন। এর মধ্যে তারে খবর দিবো কেমনে?'

'তাইলে তোরাব আলী ডাকাইতের এই চিঠি আমার দোকানে আসলো কেমনে?'

' সেইটা আমি জানবো কেমনে! দোকান খুলতে আইসা দেহি ঝাঁপের লগে আটকাই আছে!'

আজাহার খন্দকার চিন্তিত। এই চিঠি যদি সত্যি হয়ে থাকে, তবে তা বিপদের কথা। তোরাব আলী লস্কর অবজ্ঞা করার মতো লোক না। সে ভয়ংকর মানুষ। তিনি বললেন, 'মঞ্জু কই?'

New Pdf download: www.PoragEducation.com + webtalkbd.com

'সেতো স্কুলে।'

'তারে জরুরি খবর দে। আর মনসুরের খোঁজে লোক পাঠা।'

আজাহার খন্দকারের দুই ছেলে। মনসুর আর মনজুর। ছোট ছেলে মনজুরকে সবাই মঞ্জু বলে ডাকে। সে পড়ে ক্লাস টেনে। সামনে ম্যাট্রিক পরীক্ষা। আজহার খন্দকারের ইচ্ছা, ছোট ছেলেকে ম্যাট্রিক পাশের পর আর পড়া-লেখা করাবেন না। পাটের আড়তে বসিয়ে দেবেন। বড় ছেলে মনসুরকে পড়াশোনা করাতে গিয়েই তার যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে। মা-মরা ছেলে দুটিকে নিয়ে এই বয়সেও তার রাজ্যের দুশ্চিন্তা।

আড়তে আসতে আসতে মঞ্জুর বিকেল হয়ে গেলো। আজাহার খন্দকার ছেলেকে পাশে বসিয়ে বললেন, 'মনসুর কবে আসবে কিছু বইলা গেছে?'

মঞ্জু শান্ত স্বভাবের ছেলে। মুখের কথার চেয়ে ইশারা ইঙ্গিতে কথা বলতে সে বেশি পছন্দ করে। সে ডানে-বাঁয়ে মাথা নাড়লো। আজাহার খন্দকার বললেন, 'যেই বাড়ি গেছে, সেই বাড়ির কোনো ঠিকানা আছে?'

মঞ্জু এবারো না সূচক মাথা নাড়লো। আজাহার খন্দকারের হঠাৎ কী হলো! তিনি সপাটে চড় বসালেন ছেলের গালে, 'মুখে কথা বলন যায় না? মুখ কী কেউ সেলাই কইরা দিছে নাকি, অ্যা?'

মঞ্জু বাঁ হাতে গাল চেপে ধরে অবাক চোখে বাবার দিকে তাকিয়ে রইলো। তার এই ষোল-সতেরো বছরের জীবনে এমন ঘটনা এর আগে কখনো ঘটেনি। আজাহার খন্দকার চিৎকার দিয়ে বললেন, 'ঠিকানা বল? ঠিকানা বল হারাম...।' তিনি তার বাক্যটা শেষ করলেন না। বহু কষ্টে গালি দেয়া থেকে নিজেকে বিরত রাখলেন। মঞ্জু অবশ্য ধীর-স্থির ভঙ্গিতে তার স্কুলের খাতা বের করলো। তারপর খাতার একটা পৃষ্ঠা ছিঁড়ে সেখানে ঠিকানা লিখে দিলো। আজাহার খন্দকার ঠিকানা দেখে মতিকে ডেকে বললেন, 'এই ঠিকানায় লোক পাঠা। কাইল বিকালে ভেদরগঞ্জ থেইকা যে লঞ্চ যাবে গোবিন্দপুর, সেই লঞ্চে একখান চিঠি দিয়া লোক পাঠাবি। সে যেন ঘাড় ধরে তারে বাড়িতে নিয়া আসে।'

মনসুর বাড়ি এলো দিন পনেরো পর। এর মধ্যে দুই বুধবার চলে গেছে। এই দুই বুধবারেই আজাহার খন্দকার সর্বোচ্চ সতর্ক অবস্থায় ছিলেন। দোকান থেকে যথাসম্ভব টাকা পয়সা, দামি জিনিসপত্র সরিয়ে রেখেছিলেন। শুধু যে সরিয়েই রেখেছিলেন, তাও না। অতি কষ্টে থানা শহর থেকে কিছু পুলিশ পাহারারও ব্যবস্থা করেছিলেন। কিন্তু তাতে লাভ কিছু হলো না। তোরাব আলী লস্করের লোকজনকে কোথাও দেখা গেলো না। তবে এতে নিশ্চিন্ত হওয়ারও কিছু নেই। আজাহার খন্দকার ভালো করেই জানেন, তোরাব আলী লস্কর যেহেতু চিঠি পাঠিয়েছে, সেহেতু আজ হোক, কাল হোক সে আসবেই। এবং কোনো এক বুধবার দিবাগত রাতেই আসবে। চিঠি পাঠিয়ে এভাবে ডাকাতি করাটা তার স্বভাব। এক ধরনের খেলাও বলা যায়। এমনও হয়েছে চিঠি পাঠানোর দশ বছর পরে চিঠিতে উল্লেখিত নির্দিষ্ট দিনে এসে সে হাজির হয়েছে। এ কারণেই পুলিশকে জানিয়েও কোনো লাভ

New Pdf download: www.PoragEducation.com + webtalkbd.com

হয় না। আজাহার খন্দকারও ঠিক জানেন না, কোন বুধবার তোরাব আলী আসবে! আর এই অনিশ্চিত অবস্থায় পুলিশ পাহারাও বেশিদিন পাওয়া যাবে না। তার ওপর পুলিশদের চাহিদারও শেষ নেই। শেষ অবধি তিনি পুলিশ পাহারা সরিয়ে নেয়ারই সিদ্ধান্ত নিলেন। কিন্তু সার্বক্ষণিক দুশ্চিন্তায় আজহার খন্দকারের ঘুম হারাম হয়ে গেলো। তবে তার এই দুশ্চিন্তা থেকে তাকে মুক্তি দিলো মনসুর।

সে চিঠিখানা উল্টেপাল্টে দেখে বললো, 'আপনি পুলিশ প্রটেকশন এখনই সরিয়ে ফেলবেন না আব্বা।'

'কেন?'

'আমার ধারণা সপ্তাহ দুয়েকের মধ্যেই তারা আসবে।'

'তোমার কী দেখে এই ধারণা হইলো?'

'চিঠি দেখে।'

'চিঠিতে এমন কী লেখা আছে?'

'চিঠিতে লেখা আছে, তারা যে চরে থাকে, সেখানে নানান অসুখ বিসুখ শুরু হয়েছে। এ জন্য তার টাকা-পয়সা দরকার। এখন অসুখ-বিসুখে টাকা-পয়সা দরকার মানে ইমাজেন্সি। তারতো দেরি করার উপায় নেই। এরমধ্যেই দেরি হয়ে গেছে। এখন যত দ্রুত সম্ভব টাকা-পয়সা দরকার তার।'

আজাহার খন্দকার মনসুরের কথা তেমন গুরুত্ব দিলেন না। ছেলের প্রতি তার কোন ভরসা নেই। কিন্তু তারপরও পরের বুধবারও তিনি পুলিশ পাহারার ব্যবস্থা করলেন। অদ্ভুত ব্যাপার হলো সেই রাতেই তোরাব আলী ডাকাতের দল নবীগঞ্জ ছোট বাজার আক্রমণ করলো। তারা এসেছে দ্রুত গতির দু খানা ট্রলারে। নয়-দশ জনের একটা দল। সেই দল কিছু বুঝে ওঠার আগেই ঘাটে ওঁত পেতে থাকা পুলিশ আর দোকানিরা হৈ হৈ করে ঝাঁপিয়ে পড়লো তাদের ওপর। সবাইকে অবশ্য ধরা গেলো না। তোরাব আলী লস্করের দুজন লোক ধরা পড়লো। অসুস্থ স্ত্রীকে বাড়িতে একা রেখে আসা বাহাদুর তাদের একজন। বাহাদুরের স্ত্রী শেফালি কলেরায় আক্রান্ত। গত দুদিন শেফালির শরীরটা খানিক ভালোর দিকে থাকায় বাহাদুর নিজ থেকেই ডাকাতিতে এসেছিলো। কিন্তু তার ভাগ্য খারাপ। অন্ধকারে মোকাররমের সাথে সেও ধরা পড়ে গেলো। তবে সবচেয়ে খারাপ যেটি হলো, তাহলো লোকমান নামের এক ডাকাত পুলিশের গুলিতে নিহত হলো। বাকিরা ট্রলার ঘুরিয়ে অন্ধকারে মিলিয়ে গেলো।

এই ঘটনা ছড়িয়ে পড়লো চারপাশে। দশগ্রামে আজাহার খন্দকারের নাম ছড়িয়ে পড়লো। তার সাহসের প্রসংশায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠলো চারপাশ। কিন্তু খুশি হতে পারলেন না আজহার খন্দকার নিজে। পরের কয়েকটা দিন তিনি থম মেরে বসে রইলেন। আজহার খন্দকার ভেবেছিলেন, তোরাব আলী লস্কর নিজে দলবল নিয়ে আসবে ডাকাতিতে। কিন্তু সে আসেনি। বিষয়টি চিন্তার।

New Pdf download: www.PoragEducation.com + webtalkbd.com

যদিও আগের সেই দোর্দণ্ড প্রতাপ আর তোরাব আলী লস্করদের নেই। সুবর্ণপুর বিল ছাড়িয়ে জলের বুকে জঙ্গল। তার ওপারে লস্করদের চর। বেশ কিছুদিন তাদের খুব একটা দেখা যায়নি। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে দেশের অস্থির রাজনৈতিক অবস্থার সুযোগটা তারা আবার নিতে শুরু করেছে। সরকারের অবস্থা টালমাটাল। ফলে স্থানীয় সরকার প্রশাসনও অনেকটাই শিথিল। আর এই সুযোগেই প্রত্যন্ত চরাঞ্চলে তারা আবার তাদের প্রভাব বিস্তার করা শুরু করেছে।

আজাহার খন্দকার ভেবেছিলেন, এই সুযোগে যদি তোরাব আলীকে ধরে ফেলা যায়, তবে আর তারা মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে না। কিন্তু ঘটনা যা ঘটেছে, তাতে পুরো বিষয়টি নিয়ে আজাহার খন্দকার যথেষ্ট চিন্তিত ও ভীত। যদিও তিনি তখনো ঘুণাক্ষরেও জানেন না, কী ভয়াবহ দুর্যোগ তিনি নিয়ে এসেছেন তার জীবনে!

মনসুর বসে আছে মতি মিয়ার সাথে। তার হাতে একটা সাদাকালো ছবি। ছবিতে ঘন কালো লম্বা চুল ছাড়িয়ে এক মেয়ে বসে আছে। তার পেছনে ফুল, লতাপাতাওয়ালা বাগানের দৃশ্য। এই দৃশ্য সত্যি না। স্টুডিওতে ছবি তোলার জন্য এমন ব্যাকগ্রাউন্ড ব্যবহার করা হয়। মতি মিয়ার চোখে অবশ্য ব্যাকগ্রাউন্ড ধরা পড়ছে না। সে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে মেয়েটির চোখের দিকে। মেয়েটির চোখ-মুখ জুড়ে অসম্ভব মায়া। ছবিতে সে চেষ্টা করছে না হাসতে, কিন্তু পুরোপুরি পারছে না। কোনো এক রহস্যময় কারণে তার সারা শরীর হাসিতে ভেঙে পড়ছে। মেয়েটা ঠোঁট চেপে সেই হাসি আটকে রাখার চেষ্টা করছে। হাসি চেপে রাখা ঠোঁটে তাকে দেখতে লাগছে পরীর মতো। মতি মিয়া বললো, 'তুমি তোমার আব্বার লগে কথা কও।'

'আমার ভয় করে মতি চাচা।'

'ভয়ের কী আছে? তুমি কইয়া দেহো তোমার আব্বা কী খুশি হয়!'

'আমি বলতে পারবো না।'

মতি মিয়া ছবিখানা হাতে নিলো। তারপর উল্টেপাল্টে কিছুক্ষণ দেখে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো, 'তোমার আব্বারে তোমরা দুই ভাই চেনো না। সে হইলো নাইকোলের মতন মানুষ। ওপরে শক্ত, ভেতরে নরম। তোমাগো দুই ভাইরে সে এইটুক বয়স থেইকা মানুষ করছে। বিয়া-শাদিও আর করে নাই। তোমরা দুই ভাই সেইটা না দেইখ্যা দেহো কখন তোমাগো সে গালমন্দ করলো, সেইটা।'

মতি খানিক থেমে আবার বললো, 'তুমি না পারলে আমিই বলবো। সমস্যা নাই। তয় তুমি বললে সে বেশি খুশি হইতো।'

মনসুর কথা বললো না। মতি মিয়া ছবি হাতে উঠে দাঁড়ালো। মনসুর ছবিটার জন্য হাত বাড়াতেই সে বললো, 'ছবিখানতো লাগবো। ছবি না হইলে সে বুঝবো কেমনে যে তার পোলা কারে বিয়া করবো?'

New Pdf download: www.PoragEducation.com + webtalkbd.com

আজহার খন্দকার রাতে মনসুরকে ডাকলেন, 'মেয়ের নাম কী?'

'কণা।'

'আগে পিছে কিছু নাই?'

মনসুর খানিক ভেবে বললো, 'তাতো জানি না।'

'বিয়ে করলে সে তোমার স্ত্রী হবে। তার সাথে সারাজিবন থাকতে হবে। আর তুমি তার নামটাও ভালোভাবে জানো না?'

'জানতাম, আপনি জিজ্ঞেস করার সাথে সাথে ভুলে গেছি আব্বা।'

'হুম। মেয়েরা কয় ভাই বোন?'

'সে একাই।'

'মেয়ের বাপ কী করে?'

'স্কুল শিক্ষক।'

'হুম।'

আজাহার খন্দকার কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, 'বিয়ের সময় পাত্রীর ভাই বোন দেখে বিয়ে করা উচিত। বিপদ আপদে যাতে তারা সাহায্য-সহযোগিতা করতে পারে...।'

মতি মিয়া পাশ থেকে বললো, 'এক মাইয়া হইলেও সুবিধা আছে খোনকার সাব। মাইয়ার বাপের সয়-সম্পত্তি সব পোলায় পাইবো।'

আজহার খন্দকার মতির কথা গ্রাহ্য করলেন না। তিনি চেয়ার থেকে উঠে জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। জানালার বাইরে গাঢ় অন্ধকার। সেখান থেকে একটানা ঝিঁঝিঁ পোকার ডাক ভেসে আসছে। দূরে বিলের মধ্যে জেলে নৌকার টিমটিমে আলো দেখা যাচ্ছে। জলের মৃদু ঢেউয়ে আলোগুলো কাঁপছে। দৃশ্যটা প্রাত্যহিক, সাধারণ। কিন্তু সেই সাধারণ দৃশ্যের দিকে তাকিয়েই আজহার খন্দকারের বুকের ভেতর কোথায় যেন একটা শিরশিরে অনুভূতি কাঁপিয়ে দিয়ে গেলো। এই অনুভূতির কারণ তিনি জানেন না। আজহার খন্দকার ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন, 'এই মেয়ের সাথে তোমার পরিচয় কীভাবে?'

মনসুর মিনমিনে গলায় বললো, 'গোবিন্দপুরে।'

'তাতো বুঝতেই পারছি। কীভাবে পরিচয় সেইটা জানতে চাইছি।'

মনসুরের পরিবর্তে কথা বললো মতি মিয়া। সে বললো, 'গোবিন্দপুরে সে যে বন্ধুর বাড়ি গেছিলো, সেই বন্ধুর চাচাতো বইন। মাইয়া ভালো। ওইখানের কলেজ থেইক্যা এইবার আইএ পরীক্ষা দেবে। ছাত্রীও ভালো। বংশও ভালো।'

'তুমি যে তারে পছন্দ করো, এইটা সে জানে?'

মনসুর মৃদু গলায় বললো, 'জি, জানে।'

'তার মত কী?'

'বাবা মা রাজি থাকলে তার আপত্তি নেই।'

New Pdf download: www.PoragEducation.com + webtalkbd.com

'বাবা মা রাজি?'

'এত দূরে দেখে তার বাবা-মায়ের মত নেই। তা ছাড়া একমাত্র মেয়ে বলেও তারা কাছাকাছি কোথাও বিয়ে দিতে চায়।'

আজাহার খন্দকার সামান্য চুপ করে থেকে বললেন, 'মেয়ে মানুষের আবার কাছে-দূরে কী? স্বামীর বাড়িই তাদের আসল বাড়ি। আসবো লাল বেনারসি শাড়ি পইরা, বাইর হইবো সাদা কাফনের কাপুড় পইরা। এইটাই নিয়ম। বিয়া মানে বাপের বাড়ি শেষ।'

মতি মিয়া কিছু বলতে যাচ্ছিলো। তার আগেই আজাহার খন্দকার বললেন, 'ছবি দেইখাতো আর মেয়ের চেহারা ছবি, বংশ বোঝা যায় না। তারপরও মেয়ে আমার পছন্দ হইছে। মতি, তুই মেয়ের বাপ-মায়ের সাথে কথাবার্তার ব্যবস্থা কর। বিয়ার আয়োজন কর।'

সেই রাতে সারারাত আজাহার খন্দকার ঘুমাতে পারলেন না। কী এক অবর্ণনীয় অস্থিরতায় কেটে যেতে লাগলো তার সারারাত। তার কেবলই মনে হতে লাগলো ছবির ওই মায়াময় মুখটা তিনি বহু বহু বছর ধরে চেনেন। তৃতীয় সন্তানের জন্ম দিতে গিয়ে মারা গিয়েছিলেন তার স্ত্রী। একটা কন্যাসন্তানের জন্য আকুল হয়েছিলেন তারা দুজনই। কিন্তু সেই কন্যাসন্তানের মুখ আর তাদের দেখা হলো না। মাঝখান থেকে এই ঘরখানা, এই সংসারটা পুরোপুরি হয়ে গেলো মায়াহীন। যে ঘরে নারী নেই, সেই ঘরের চেয়ে মায়াহীন গৃহ আর জগতে নেই। একজন মা, একজন স্ত্রী, একজন কন্যা একটা ইট-কাঠ-পাথরের কাঠামোকে মুহূর্তেই ঘর বানিয়ে ফেলতে পারে। জীবনের রোজকার ক্লান্তির দিন, যুদ্ধের পথ, অবিরাম ছুটে চলা শেষে সেই ঘরখানায় তাই ফিরে আসতে ইচ্ছে হয়। একটু আশ্রয়ের জন্য, একটু প্রশান্তির জন্য, একটু মায়াময় স্পর্শের জন্য। কিন্তু এই এতটা কাল তিনি কাটিয়ে গেছেন আশ্রয়হীন এক জীবন। ছবির ওই মায়াবতী মেয়েটি যেন এক লহমে তার বুকের ভেতরের শুকিয়ে রুক্ষ হয়ে যাওয়া মরুভূমিতে প্রশান্তির বৃষ্টি ঝরিয়েছে।

মেয়েটির মুখখানা তার বুকের কোথায় যেন গেঁথে রইলো পরম প্রশান্তির সুতীব্র তেষ্টা হয়ে। মেয়েটিকে তিনি তার ছেলের বউ করে এই ঘরে চানই চান।

New Pdf download: www.PoragEducation.com + webtalkbd.com

তোরাব আলী লস্করের সামনে টাকা-পয়সা স্তূপ করে রাখা। তবে সেই টাকা পয়সার দিকে কারো খেয়াল নেই। সবাই তাকিয়ে আছে উঠানের মাঝখানে রাখা লাশের দিকে। বাহাদুরের বউ শেফালি শেষরাতে মারা গেছে। মারা গেছে অশীতিপর বৃদ্ধা হাজেরা বানুও। দুজনই মারা গেছে কলেরায়। তবে সকলেই ব্যস্ত শেফালির দেড় বছরের মেয়ে মায়াকে নিয়ে। মায়া তার মায়ের লাশের খাট ধরে দাঁড়িয়ে আছে। তার বাঁ হাতে একখানা আধখাওয়া নরম পেয়ারা। সে সেই পেয়ারায় খানিক পরপর তার সদ্য গজানো দাঁতে কামড় বসানোর চেষ্টা করছে। আর ডান হাত মায়ের মুখের ওপর রেখে আধো বোলে মাকে ডাকার চেষ্টা করছে, 'ম্মাহ, ম্মাহ!'

মায়াকে লাশের পাশ থেকে সরিয়ে নিতে বলেছেন তোরাব আলী লস্কর। কিন্তু সরিয়ে নিতে দেয়নি জোহরা। সে একদৃষ্টিতে মায়ার দিকে তাকিয়ে আছে। মায়া আচমকা তার হাতের পেয়ারাটা মায়ের মুখের কাছে ধরলো। তারপর মৃত মায়ের ঠোঁটের ফাঁকে পেয়ারাটা জোর করে গুঁজে দিতে দিতে বললো, 'ম্মাহ, খা। খা। খা। মিষ্টি।

মা খাচ্ছেনা দেখে সে হঠাৎ কেঁদে ফেললো। তারপর হাতের পেয়ারাটা ছুড়ে ফেলে দিলো দূরে। সেখানে বসে আছে জোহরা। জোহরা পেয়ারাটা হাতে তুলে নিয়ে উঠে দাঁড়ালো। তারপর তোরাব আলী লস্করের সামনে এসে বললো, 'বাহাদুর ভাই আর মোকাররম ভাইর কোনো খবর আছে দাদাজান? তারে ছাড়ানোর কোনো ব্যবস্থা করা গেছে?

তোরাব আলী লস্কর ধীরে চোখ তুলে তাকালেন। তারপর ঠাণ্ডা গলায় বললেন, 'নাহ।'

'লোকমান ভাইর লাশ? লাশ কই আছে?'

তোরাব আলী লস্কর কোনো কথা বললেন না। তবে তার দুই চোয়াল শক্ত হয়ে থরথর করে কাঁপতে লাগলো।

পাশ থেকে হানিফ বললো, 'হুনছি নবীগঞ্জ পুলিশ পরশু বাহাদুর ভাই আর মোকাররম ভাইরে আলীপুর থানায় চালান করবো।'

এই কথা শুনেও কেউ কোনো সাড়া-শব্দ করলো না। জোহরা কিংবা তোরাব আলি লস্করও না। দুপুর নাগাদ শেফালির দাফন হয়ে গেলো। সেই রাতে মায়া খুব যন্ত্রণা করলো। সে দুগ্ধপোষ্য শিশু। মায়ের দুধ ছাড়া তার ঘুম হয় না। সারা রাত বাহাদুরের মাকে সে এক ফোটা ঘুমাতে দিলো না। গভীর রাতে সুনসান চরের বিষণ্ন হাওয়ার সাথে তার কান্নার শব্দ ভেসে আসতে থাকলো। সেই শব্দে অন্য কারো ঘুম ভেঙেছে কি না জোহরা জানে না। স্বজন হত্যা ও হারানোর এই চরে তার সেই কান্না জোহরার বুক বিদীর্ণ করে দিয়ে তাকে এক নিশাচর যন্ত্রণাকাতর পাখি করে রাখলো।

শেষ রাতের দিকে মায়ার কান্নার শব্দ যখন ক্রমশই স্তিমিত হয়ে এলো, জোহরা তখন চুপিচুপি তার ঘর থেকে নেমে এলো উঠানে। একটা শীতল হাওয়া অকস্মাৎ তার সারা শরীর কাঁপিয়ে দিলো। হানিফ দাঁড়িয়ে ছিলো ঘরের বাইরেই। তার শরীর কালো চাদরে ঢাকা। তারা দুজন দ্রুত পায়ে গিয়ে দাঁড়ালো দখিন দিকের ঘাটে। সেখানে ছোটখাট একখানা দ্রুতগতির ট্রলার বাঁধা। নিঃশব্দে সেই ট্রলারে উঠে পড়লো জোহরা আর হানিফ। তারা উঠতেই অসুস্থ রুস্তমের বারো বছরের ছেলে হামিদুল ট্রলারে স্টার্ট দিয়ে দিলো। শেষ রাতের এই গভীর অন্ধকার বুকে পুষে রাখা গাঢ় নিস্তব্ধতা ভেঙে খানখান হয়ে গেলো ইঞ্জিনের শব্দে। তোরাব আলী লস্কর সেই শব্দ শুনে যতক্ষণে ঘরের বাইরে এসে বিলের ধারে দাঁড়ালেন, ততক্ষণে জোহরাদের ছোট্ট ট্রলারখানা দৃষ্টির সীমানা ছাড়িয়েছে।

নবীগঞ্জ ছোট বাজার থেকে মূল গঞ্জের দূরত্ব মাইল পাঁচেক। সেখানে পুলিশের অস্থায়ী থানা। থানার পেছনে করাতকল। গভীর রাতে সেই করাতকলের গা ঘেঁষে জোহরাদের ট্রলারখানা এসে থামলো। ট্রলার থেকে নেমে এলো হামিদুল। সে একটানা আঠারো ঘণ্টারও বেশি ট্রলার চালিয়েছে। তার চোখ টকটকে লাল। জামা কাপড়ে কালি-ঝুলি লেগে আছে। করাতকলের সামনে হলদেটে ম্লান আলো জ্বলছে। হামিদুল সেই আলোর সামনে এসে দাঁড়ালো। তার কোমরে গামছা। সে গামছা খুলে বারকয়েক হাত মুখ মুছলো। তারপর ডান দিকের অন্ধকার কোণটাতে সরে গেলো। করাতকলের মূল দরজাটা খুললো তার খানিক পরে। থুত্থুরে বুড়ো এক লোক কুঁজো ভঙ্গিতে হেঁটে এসে অন্ধকার কোণটাতে দাঁড়ালো। হামিদুল নিচু গলায় বললো, 'আপনে হারাধন দাদু?'

New Pdf download: www.PoragEducation.com + webtalkbd.com

লোকটা খুকখুক শব্দে বার দুই কাশলো। তারপর ফ্যাসফ্যাসে গলায় বললো, 'হানিফ আইছে?'

'হ। টলারে। আপনে টলারে যাইবেন?'

লোকটা কথার জবাব দিলো না। তবে অন্ধকারে বেড়ালের মতো পা টিপেটিপে নিঃশব্দে ট্রলারের দিকে এগুলো। কিন্তু ট্রলারে জোহরাকে দেখে সে থমকে গেলো। হানিফ অবশ্য তাকে আশ্বস্ত করলো, 'হারাধন দাদু, ও আমার চাচাতো বইন জোহরা। ওর বাপের নামই ফয়জুল লস্কর।'

হারাধন অন্ধকারেই যেন জ্বলজ্বলে চোখ মেলে জোহরার দিকে তাকালো। তারপর গম্ভীর গলায় শব্দ করলো, 'হুম।'

হানিফ বললো, 'জোহরা আপনের লগে দেখা করতে চাইছিলো। মোকাররম আর বাহাদুর ভাইতো এহনো এইহানের থানাতেই আছে, না?'

হারাধন একইভাবে বললো, 'হুম।'

হানিফ জোহরার দিকে ফিরে বললো, 'এই হইলো হারাধন দাদু।'

জোহরা মাথা নুইয়ে হারাধনকে সালাম দিলো। তারপর বললো, 'আপনের কথা দাদাজানের কাছে অনেক হুনছি। দাদাজানের লগে আপনে একবার জেল খাটছিলেন। দাদাজান ছয় মাস পর ছাড়া পাইলেও আপনে বিনাদোষে জেল খাটছিলেন দশ বছর।'

হারাধন সামান্য হাসলো, 'হুম। দশ বছর।'

জোহরা বললো, 'এই স'মিলের সামনের খালে চেরাই কাঠের মইধ্যে একটা লাশ ভাসছিলো। পুলিশ আপনেরে ইচ্ছা কইরা ফাঁসাই দিলো। আসলে ঘটনার কিছুই আপনে জানতেন না, কিন্তু বিনা দোষে দশ বছরের জেল খাটতে হইলো। দাদাজানে জেলেরতন বাইর হওনের পরও রেগুলার আপনের খোঁজ খবর নিছে।'

জোহরা থামলেও হারাধন এবার আর কোন কথা বললো না। হানিফ মাঝে মধ্যে তার কাছে আসে। তোরাব আলী লস্কর তার ছেলে ফয়জুলের খোঁজে নানা সময়ে গোপনে লোক পাঠিয়ে হারাধনের সাহায্য সহযোগিতা নিয়েছেন। হারাধন চেষ্টাও করেছে, কিন্তু কাজের কাজ কিচ্ছু হয়নি। এতদিন পর সেই ফয়জুলের মেয়েকে এভাবে দেখে হারাধন খানিক অবাক হয়েছে।

জোহরা বললো, 'বছর তিনেক আগে আমি একবার ছোট কাকার লগে এইহানে আসছিলাম। আপনের মনে থাকনের কথা। তহন বাইস্যাকাল। দিন রাইত বৃষ্টি। সেই বৃষ্টিতে সুবর্ণপুরের নদী হইতে দীঘিনালার খাল ধইরা নবীগঞ্জ ঢোকনের মুখে বিরাট এক কড়ই গাছ পানির মধ্যে উল্টাই পড়ছিলো। সেই কড়ই গাছের তলায় চাপা পইরা একখান বড় ট্রলার ডুইবা গেছিলো। মানুষও মারা গেছিলো কয়েকজন। মনে আছে?'

হারাধন বললো, 'হুম।'

জোহরা এবার আর সাথে সাথে কথা বললো না। অন্ধকারে যেন নিজেকে খানিক গুছিয়ে নিলো। তারপর বললো, 'ঠিক ওই জায়গাটা দিয়া, মানে আলীপুর যাইতে হইলে দীঘিনালার খাল ধইরা যাইতে হয় না?'

'হুম।'

'আসনের সময় আমরা দীঘিনালা হইয়া আসছি। অন্ধকারে ঠিকঠাক বুঝতে পারি নাই। কিন্তু আমার যদ্দুর মনে হয়, ওই জায়গার খালটা এহনো আগের মতো চিকনই আছে। আর দুই ধারে খাড়া পার।'

হারাধন এবার ভারি অবাক হলো। সে বললো, 'হুম, আছে। কিন্তু এইগুলা দিয়া তোমার কি কাম?'

জোহরা হারাধনের প্রশ্নের উত্তর দিলো না। সে বললো, 'আপনের আমার একটা উপকার করন লাগবো।'

'কি উপকার?'

'আপনের স'মিলেরতন লোকজন দিয়া পাঁচ-ছয়খান বড় গাছের গুঁড়ি ওইখানে নেওনের ব্যবস্থা কইরা দেওন লাগবো।'

হারাধন এবার আর নিজের কৌতূহল আটকে রাখতে পারলো না। সে বললো, 'কেন! গাছের গুঁড়ি দিয়া তুমি কি করবা?'

জোহরা এবারও জবাব দিলো না। অন্ধকারেই মৃদু হাসলো। তার সেই হাসি কেউ দেখলো না। তবে তার পরদিন ঘটে গেলো অবিশ্বাস্য এক ঘটনা। সকাল দশটার দিকে পুলিশের ছোটখাটো একখানা ট্রলার বাহাদুর আর মোকাররমকে নিয়ে রওয়ানা দিলো আলীপুরের উদ্দেশ্যে। সেই ট্রলার নবীগঞ্জের খাল থেকে দীঘিনালা ঢোকার মুখে আচমকা থমকে গেলো। খালের দুই পাশের খাড়া ঢাল বেয়ে হঠাৎ বড় বড় গাছের গুঁড়ি গড়িয়ে পড়তে লাগলো তাদের দিকে। ডান পাশের প্রথম গুঁড়িটা কোন মতে কাটিয়ে দেয়া গেলেও বাঁ পাশ থেকে আসা বড় গুঁড়িখানা সরাসরি আঘাত হানলো ট্রলারের মাঝ বরাবর। ডান দিকে হেলে যাওয়া ট্রলারটা আর সোজা হতে পারলো না। পরের গুঁড়িখানা ট্রলারের মাঝ থেকে সামনের গলুই বরাবর ভেঙে দিলো। কলকল করে জল ঢুকে যেতে থাকলো ট্রলারে। অপ্রস্তুত হতভম্ব পুলিশ চারজন কী করবে ভেবে পেলো না। দ্বিতীয় গুঁড়ির তীব্র আঘাতে দুজন পুলিশ ছিটকে পড়লো পানিতে। বাকি দুজন আটকা পড়ে গেলে ডুবন্ত ট্রলারের তলায়।

বাহাদুর আর মোকাররম অবশ্য আগে থেকেই প্রস্তুত ছিলো। ভোরবেলা থানার ভেতরে তাদের খবর পাঠানোর ব্যবস্থা করেছিলো হারাধন। ফলে প্রথম গুঁড়িটা নেমে আসার সাথে সাথেই তারা দুজন লাফিয়ে পড়েছিলো পানিতে। হতভম্ব পুলিশের দলটি হঠাৎ আসা এই দুর্যোগ থেকে যতক্ষণে নিজেদের মুক্ত করতে পারলো, ততক্ষণে হামিদুলের দ্রুতগতির ট্রলারখানা বহুদূর নিরাপদ দূরত্বে চলে এসেছে।

New Pdf download: www.PoragEducation.com + webtalkbd.com

সুবর্ণপুর নদীতে এসে প্রথম কথা বললো হানিফ, 'দাদাজানরে কী কইবি জোহরা? এতক্ষণে তোর চিন্তায়তো দাদাজানের অবস্থা খারাপ হইয়া যাওনের কথা!'

জোহরা ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালো কেবল। কোনো কথা বললো না। হানিফ বললো, 'আমার এহনো বিশ্বাস হইতেছে না!'

জোহরা ঠাণ্ডা গলায় বললো, 'বিশ্বাস না হওনের কী আছে!'

হানিফ কিছু একটা বলতে গিয়েও নিজেকে সামলে নিলো। তার হঠাৎ মনে হলো এই জোহরাকে সে এতদিন দেখেনি। এই জোহরা অন্য অচেনা এক মানুষ। তার সামনে নিজেকে কেমন জড়সড় লাগতে লাগলো হানিফের। হানিফ জানে, জোহরা যা করেছে, তা রীতিমতো অবিশ্বাস্য!

জোহরা প্রথম যখন এই পরিকল্পনার কথা তাকে বলেছিলো, তখনো বিশ্বাস হয়নি হানিফের। তবুও কেবল জোহরার কাছে খানিক গুরুত্ব পাওয়ার লোভেই সে রাজি হয়ে গিয়েছিলো। এমনকি এই যে এখন, বাহাদুর আর মোকাররম তার পাশে হাতকড়া হাতে বসে আছে তা দেখেও হনিফের বিশ্বাস হচ্ছে না। সে জোহরার দিকে তাকিয়ে উদাস গলায় বললো, 'চেষ্টা আর বুদ্ধি থাকলে সবই সম্ভব।'

জোহরা অবশ্য এবার আর তার কথার জবাব দিলো না। সে তাকিয়ে রইলো সামনের বিস্তৃত জলরাশির দিকে। সূর্যের আলোয় সুবর্ণপুর নদীর মৃদু ঢেউগুলো মুক্তোর মতো জ্বলজ্বল করছে। সেই জ্বলজ্বলে ঢেউয়ের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে জোহরার চোখ হঠাৎ জ্বালা করে উঠলো। খানিক ঝাপসাও হয়ে এলো যেন। আচমকা তার খুব বাবার কথা মনে পড়তে লাগলো।

বাইরে একটানা ঝিঁঝি পোকা ডাকছে। হারিকেনের মৃদু আলোয় কণা বসে আছে পড়ার টেবিলে। অদ্ভুত ব্যাপার হচ্ছে সন্ধ্যা থেকে তার একটা শব্দও পড়া হয়নি। কিন্তু সে অতি মনোযোগী ছাত্রীর ভান ধরে টেবিলে বসে আছে। মাঝখানে তার মা এসে তাকে বার কয়েক লেবুর শরবত খাইয়ে গেছেন। বিষয়টা কণার পছন্দ না। কিন্তু তার মা শাহিনা বেগমের ধারণা এই গরমে লেবুর শরবত ছাড়া পড়াশোনা সম্ভব না। শুধু যে লেবুর শরবত তা-ই না, তিনি মেয়ের মাথায় খানিক পরপর নিদ্রাকুসুম তেল মেখে দিচ্ছেন। কণা বিরক্ত গলায় বলেছেন, 'এই তেল দেয়ার মানে কী?'

'এই তেল দিলে মাথা ঠাণ্ডা থাকে।'

'আমার মাথা এমনিতেই ঠাণ্ডা আছে মা।'

শাহিনা বেগম মেয়ের মাথার তালুতে হাত রেখেই আঁতকে ওঠা গলায় বলেছেন, 'মাথার তালু দিয়া আগুনের হলকা বাইর হইতেছে, আর সে কয় মাথা ঠাণ্ডা! এই মাথায় এখন পিঁয়াজ মরিচ দিয়া ডিম গুলাইয়া রাখলে ফস কইরা ডিম ভাজা হইয়া যাইবো। তাওয়া বসাইলে রুটি ভাজা দুই মিনিটের মামলা।'

'তুমি এই বিচ্ছিরি ভাষায় কথা বলো নাতো মা!'

'এখনতো আমার ভাষা বিচ্ছিরিই লাগবো। এখন বড় হইছো, আইএ-বিএ পাশ দিবা। বড় কলেজে পড়বা। বাপের মতো তুমিও শিক্ষিত হইবা। এখন আর অশিক্ষিত মায়ের কথা পছন্দ হইবো ক্যান?'

কণার এই কথা শুনতে খুব বিরক্ত লাগে। সে নাহয় খানিক বাপ ন্যাওটা মেয়েই, তা এমনতো কতজনই আছে! কিন্তু তাই বলে এই নিয়ে মা সারাক্ষণ তাকে কথা শোনাবে। তাকে নিয়ে তার বাবা দেলোয়ার হোসেনের স্বপ্নও অনেক। তিনি

New Pdf download: www.PoragEducation.com + webtalkbd.com

তাই ছোটবেলা থেকেই মেয়েকে একটু আলাদা করে মানুষ করার চেষ্টা করেছেন। আচরণে, চলনে, বলনে কণা তাই কোথায় যেন তার চারপাশের আট-দশজনের চেয়ে খানিক আলাদাই।

সমস্যা হচ্ছে, এতকিছুর পরও তার পড়াশোনা হচ্ছে না। আইএ পরীক্ষার আর বেশিদিন বাকিও নেই। এই সময়টা তার তুমুল পড়াশোনার সময়। তার বাবা-মা, সহপাঠী থেকে শুরু করে কলেজের শিক্ষক, প্রতিবেশী সকলেই তাকে নিয়ে চূড়ান্ত আশাবাদী। সে নিজেও খুব আত্মবিশ্বাসী ছিলো। কিন্তু তারপর হঠাৎ করেই যেন সবকিছু কেমন এলোমেলো হয়ে গেলো।

সেদিন সে মাকে বললো, 'তুমি যে এই কিছুক্ষণ পরপর আমার মাথায় নিদ্রাকুসুম তেল দিচ্ছো, এতে কি হয় জানো?'

'জানি, ভালো পড়াশোনা হয়। মাথা ঠাণ্ডা থাকলে পড়াশোনা ভালো হয়।'

'জি না। মাথা ঠাণ্ডা থাকলে ঘুম ভালো হয়। নিদ্রাকুসুমের নিদ্রা শব্দের অর্থতো জানো মা? নিদ্রা শব্দের অর্থ ঘুম। আমি এখন নিদ্রাকুসুম তেল মাথায় মেখে ঘুমাবো?'

কণা ভেবেছিলো তার এই কথা শুনে শাহিনা বেগম আঁতকে উঠবেন। কিন্তু তিনি আঁতকে উঠলেন না। বরং উচ্ছ্বসিত গলায় বললেন, 'তাই যা। সারাটা দিন এত পড়াশোনা কইরা কী হইবো? এত খাটাখাটনি আর রাত জাইগা তোর চেহারাটাইতো নষ্ট কইরা ফেলতেছোস। চোখের নিচে কালি পইরা গেছে। এ বয়সের মাইয়ারা নিজেগো চেহার স্বাস্থ্যের কত যত্ন নেয়, আর তোর হইলো এই অবস্থা! তোরে আমার বিয়া দিতে হইবো না?'

মায়ের এই ধরনের কথা শুনলে কণার রাগে পিত্তি জ্বলে যায়। তবুও সে মাথা ঠাণ্ডা রেখে বললো, 'তোমার কি ধারণা, আমার বিয়ে হবে না?'

'দিনে দিনে গায়ের রং যেমনে কালা বানাইতেছোস, আর চেহারা বানাইতেছোস শুঁটকি। তোর কেমনে বিয়া হইবো?'

কণা হঠাৎ ফিক করে হেসে ফেললো, 'তুমি চিন্তা করো না মা। আমার ভালো বিয়ে হবে।'

তার বলার ধরনে কিছু একটা ছিলো। শাহিনা বেগম যেন সেটা ধরতে পারলেন। তিনি কণার গা ঘেঁষে এসে দাঁড়িয়ে বললেন, 'ঘটনা কি? আমারে খুইলা বল।'

কণা রহস্যময় গলায় বললো, 'ঘটনা কিছু না।'

শাহিনা বেগম কণার সামনে থেকে তার বইখানা নিয়ে নিলেন। তারপর শক্ত গলায় বললেন, 'ঘটনা কি খুইলা বল।'

কণা মাকে ভয় পায় না। বাবার সাথে তার যতই ঘনিষ্ঠতা থাকুক। জগতের সকল কথা সে অকপটে বলতে পারে একমাত্র এই মাকেই। সে লজ্জাবনত গলায় বললো, 'ডাক্তার জামাই তোমাদের পছন্দ?'

শাহিনা বেগম কণার হাত ধরে টানতে টানতে খাটের কাছে নিয়ে গেলেন। তারপর এদিক-সেদিক তাকিয়ে প্রায় ফিসফিস করে বললেন, 'ঘটনা খুইলা বল। ছেলের বাড়ি কই? নাম কি? থাকে কই? সংসারে কে কে আছে?'

কণা বলবে না বলবে না করেও সেদিন সে মাকে মনসুরের কথা বলে ফেললো। আসলে তার বলতে ভালো লাগছিলো। একটা অদ্ভুত লজ্জামিশ্রিত ভালো লাগা। শাহিনা বেগম প্রথমে উচ্ছ্বসিত হলেও দূরত্বের কথা ভেবে তার উচ্ছ্বাস নিভে গেলো। তিনি বিড়বিড় করে বললেন, 'প্রয়োজনে মাইয়া ঘরের খুঁটি বানাই রাখবো, তাও অতদূরে মাইয়া বিয়া দিবো না।'

মায়ের এই দুঃখটা কণা বোঝে। তার নানিবাড়ি গোবিন্দপুর থেকে বহু দূরের পথ। এইজন্য বছরের পর বছর শাহিনা বেগমের আর বাপের বাড়ি যাওয়া হয় না। প্রথম প্রথম তাও যা যাওয়া হতো, কিন্তু দিন যতো পুরনো হয়েছে, বাবার বাড়ি যাওয়ার সুযোগও তত কমেছে। যোগাযোগও কমেছে। আর সবকিছু বদলেও গেছে খুব দ্রুত। এই কষ্টটা তিনি মেয়েকে পেতে দিতে চান না। মা হিসেবেও পেতে চান না।

কণা অবশ্য সেদিন মায়ের মুখের ওপর আর কথা বলার সাহস করেনি। তা ছাড়া মানুষটাকেতো সে সেভাবে চেনেও না। মাত্র দিন কয়েকের পরিচয়। কিন্তু কী জানি কী একটা ছিলো মানুষটার মধ্যে। তার এইটুকু জীবনে এমন গভীর করে আর কেউ কখনো দাগ কেটে যেতে পারেনি। একটা সময়তো কণার মনে হতো, তার বুঝি ভালো লাগার অনুভূতিই নেই। কলেজের বন্ধুরা সেই স্কুল থেকেই কত কত সম্পর্কে জড়িয়েছে, কিন্তু কণার কেবল মনে হতো তার চারপাশের জগতটা কাঠখোট্টা এক ধু-ধু মরুভূমি। সেখানে ভালোবাসার মতো কেউ নেই। আর কখনো আসবেও না।

কিন্তু মনসুরের সাথে তার দেখা হওয়াটা হুট করেই যেন সবকিছু বদলে দিলো। সেদিন বিকেলে বড় চাচি তাকে খবর দিয়ে বাড়িতে নিয়েছিলো। তার চাচাতো ভাই জসিমের কলেজ জীবনের বন্ধু মনসুর এসেছে বেড়াতে। তারজন্য এটা– সেটা রান্না করতে হবে। পিঠা বানাতে হবে। বড় চাচি একা বৃদ্ধ মানুষ। তাকে খানিক সাহায্য করতেই কণা গিয়েছিলো।

মনসুর শুয়েছিলো পুকুর ঘাটে। খানিক লম্বা চুলগুলো বাতাসে উড়ছিলো। চালুনিভর্তি তরকারি ধুতে পুকুর ঘাটে গিয়েছিলো কণা। কিন্তু সিঁড়ির মাঝখানে একটা মানুষকে ওভাবে আড়াআড়ি শুয়ে থাকতে দেখে তার ভীষণ রাগ লেগে গেলো। এমনতো নয় যে এ বাড়িতে কেউ পুকুর ঘাটে আসে না, কারো কোনো কাজকর্ম থাকে না! সে এখন মনসুরকে ডিঙিয়ে পুকুরে নামবে কী করে?

ফিরে গিয়ে একবার বড় চাচিকে বললোও সে। কিন্তু ব্যস্ত বড় চাচি বিষয়টাকে তেমন পাত্তাই দিলেন না। আশেপাশে জসিমকেও কোথাও দেখতে পেলো না কণা। শেষে রাজ্যের বিরক্তি নিয়ে সে-ই গিয়ে ডাকলো, 'এই যে শুনছেন?'

New Pdf download: www.PorageEducation.com + webtalkbd.com
[illegible] ঘাটের দুপাশে বসার ব্যবস্থা রয়েছে। কিন্তু সেখানে আরাম করে পা ছড়িয়ে শোয়া যায় না। সে তাই চওড়া মসৃণ সিঁড়ির ওপরই পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়েছিলো। বিকেলের ফুরফুরে হাওয়ায় এত ভালো লাগছিলো যে কখন চোখ বুজে এসেছে তা সে টেরই পায়নি। হতচকিত মনসুর উঠে বসতে বসতে বললো, 'আপনার কাছে পানি হবে? খুব তেষ্টা পেয়েছে।'

কণা ভারি অবাক হলো। সে শক্ত গলায় বললো, 'আমার কাছে নাই, তবে পুকুরভর্তি পানি আছে, একটু কষ্ট করে নেমে চুমুক দিলেই খেতে পারবেন।'

মনসুর কিছুই বুঝলো না। সে অবাক চোখে তাকিয়ে রইলো। কণা আবারো কঠিন গলায় বললো, 'বাড়িতে মেয়ে ছেলে আছে, তারা পুকুর ঘাটে এসে বসে। গোসল করে, ওজু করে। আর আপনি একটা পুরুষ মানুষ এইখানে এইভাবে শুয়ে আছেন কেন?'

মনসুর এতক্ষণে খানিক ধাতস্ত হয়েছে। কণার কথা বলার ভঙ্গির মধ্যে এমন কিছু একটা ছিলো যে মনসুর রাগ করতে পারলো না। সে হঠাৎ ফিক করে হেসে ফেললো। এতে কণার রাগ আরো বেড়ে গেলো। সে ঝাঁঝালো গলায় বললো, 'আপনি হাসছেন কেন? আমি হাসার মতো কি বলেছি?'

মনসুর বললো, 'আপনি হাসার মতো কিছু বলেননি। আপনি যা বলেছেন তা হলো...।'

'তা কী?'

মনসুর কণাকে রীতিমতো চমকে দিয়ে বললো, 'তা হলো ভালোবাসার মতো!'

কণা পুরোপুরি হতভম্ব হয়ে গেছে। এটা সে আশা করেনি। কিছু বলতে গিয়েও আর কথা খুঁজে পেলো না কণা। বরং ভেজা তুলোর মতোন মিইয়ে গেলো সে। মনসুর উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বললো, 'সবাইকে সব কিছু মানায়?'

কণা সলজ্জ ভঙ্গিতে চোখ তুলে তাকালো, 'মানে?'

'মানে এমন মায়াময় শান্ত দীঘির মতো চোখ যার, তার অমন আগুন চোখে তাকালে হয়?'

কণা কী বলবে জানে না। সে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলো। মনসুর দুধাপ সিঁড়ি ডিঙিয়ে কণার আরো কাছে চলে এলো। তারপর খুব স্বাভাবিক ভঙ্গিতে কণার হাত থেকে তরকারিসুদ্ধ চালুনিটা নিতে নিতে বললো, 'সত্যি সত্যি আমার খুব তেষ্টা পেয়েছে। একটু পানি খাওয়াবেন?'

কণা বজ্রাহতের মতো দাঁড়িয়েই রইলো। নির্বাক, স্থির, নিঃশব্দ। মনসুর বললো, 'বিনিময়ে আমি আপনার তরকারি ধোয়ার কাজটা করে দিচ্ছি।'

কথা শেষ করেই সে তরকারিসুদ্ধ চালুনিটা নিয়ে তড়তড় করে সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেলো পুকুরে। কণা অবশ্য সেখানে আর দাঁড়ালো না। পানি নিয়ে ফিরেও এলো না। এমনকি বড় চাচির কাছেও আর গেলো না সে। রাজ্যের অপমান, লজ্জা,

ক্ষোভ কিংবা নানান মিশ্র অসংজ্ঞায়িত অনুভূতি নিয়ে সে বাড়ি ফিরে গেলো। জসিমদের বাড়ি থেকে তাদের বাড়ি হাঁটা পাথে দশ মিনিটের পথ। এই মিনিট দশেক সময়ে কত শত এলোমেলো ভাবনা যে সে ভেবেছে! ভেবেছিলো বাড়ি এসে মাকে বলবে। বাবার কাছে নালিশ করবে। কিন্তু তার কিছুই করলো না সে। বরং রাত যত গভীর হয়েছে, ততই একটা অদ্ভুত অব্যাখ্যেয় অনুভূতি ক্রমশই তার বুকের ভেতর কোথায় যেন ধোয়ার মতো কুণ্ডলী পাকিয়ে ধীরে ধীরে তাকে গ্রাস করে নিতে লাগলো। এই অনুভূতির নাম সে জানে না। ভোর রাতের দিকে তার খানিক আফসোসও হতে লাগলো। মনে হতে লাগলো, মানুষটার জন্য একগ্লাস পানি নিয়ে গেলে কী এমন ক্ষতি হতো! এমনওতো হতে পারে যেকোনো কারণে খুব ক্লান্ত, শ্রান্ত হয়েই মানুষটা ওখানে ওভাবে ঘুমিয়ে পড়েছিলো। সে চাইলে তাকে ওভাবে না জাগিয়ে পাশ কাটিয়েও পুকুরে নেমে যেতে পারতো।

শেষরাতের দিকে একটা তীব্র অপরাধবোধ নিয়েই কণা ঘুমিয়ে পড়লো। তার ঘুম ভাঙলো পরদিন বেলা করে। কলেজের দেরি হয়ে যাবে ভেবে কোনোমতে মুখে একটু জলের ঝাপটা দিয়েই বারান্দায় এসে দাঁড়ালো সে। কিন্তু উঠানের মাঝখানে জসিমের সাথে মনসুরকে দেখে এত অবাক হলো কণা! জসিম তাকে দেখেই হেঁড়ে গলায় ডাকলো, 'কীরে, এত বেলা অব্দি কেউ ঘুমায়? বিয়ের পর শ্বশুরবাড়ি গেলেতো এর মধ্যে তিন বেলার কাজ সেরে ফেলতে হতো!'

কণা কোনো কথা বললো না। তার ভারী লজ্জা হচ্ছে। সে আশেপাশে কোথাও মাকে দেখতে পেলো না। বাবা এই সময়ে স্কুলে থাকে কণা জানে। জসিম বললো, 'সেই কখন থেকে এসে ডাকছি, কিন্তু পুরো বাড়ি যেন শ্মশান। কোথাও কারো কোনো সাড়া-শব্দ নেই।'

কণা অনুচ্চ গলায় বললো, 'ঘরে এসে বসো দাদা। মা যে কই গেলো?'

মনসুর প্রথমবারের মতো কথা বললো। সে কণাকে উদ্দেশ্য করে বললো, 'আমি আপনার কাছেই এসেছি।'

কণা উঠোনের পাশের কাঁঠাল গাছটার তলায় দু খানা চেয়ার বের করে দিলো। ঘরে ভ্যাপসা গরম। তার চেয়ে বাইরেই ভালো। খানিক হাওয়া-বাতাস রয়েছে। মনসুর বললো, 'আপনি আমাকে খুব বেহায়া ভাবছেন, তাইনা?'

'তা কেন?'

'ভাবছেন না? কাল যা করলাম, তাতে ওটা না ভাবলে খুব অবাক হবো।'

কণা এবার আর কোনো জবাব দিলো না। মনসুর বললো, 'দেখলেন তো? ঠিক ঠিক তা-ই ভাবছেন!'

'মোটেই না।' কণার গলা এবার খানিক উষ্ণ শোনালো।

মনসুর বললো, 'তাহলে প্রমাণ হয়ে যাক?'

কণা এই প্রথম মনসুরের চোখে চোখ রাখলো, 'কীভাবে?'

New Pdf download: www.PoragEducation.com + webtalkbd.com

'কীভাবে আবার? কালতো পানি খাওয়ালেন না, আজ না হয় খাওয়ালেন। তেষ্টাটা এখনো একদম তেমনই আছে। কে জানে, হয়তো বেড়েছেও। কাল থেকে এত পানি খেলাম, কিন্তু বিশ্বাস করুন একটুও কমে নি।'

লোকটা কী একটু হ্যাংলা? গায়ে পড়া স্বভাবের? কথাটা ভাবতে গিয়েও নিজেকে মানাতে পারলো না কণা। তার মনে হলো এই মানুষটিই এমন। নিজের ভেতরটা হয়তো লুকাতে পারে না। এমন মানুষই ভালো, কোনো ভান নেই। মনসুর তাকে চমকে দিয়ে বললো, 'আমাকে খুব হ্যাংলা ভাবছেন তাই না? কী করবো বলুন? আমি মানুষটাই এমন। কিছু লুকাতে পারি না। আপনি কী আমাকে এক গ্লাস পানি খাওয়াবেন?'

কণা পানি নিয়ে এলো। ধোয়া কাঁচের গ্লাসটা সে আবারো খুব যত্ন করে ধুলো। তারপর খুব সতর্কভঙ্গিতে মনসুরকে পানির গ্লাসটা দিলো। যেন কোনভাবেই মনসুরের হাতে তার হাত লেগে না যায়।

মনসুর সময় নিয়ে পানিটা খেলো। তারপর আচমকা খুব গম্ভীর ভঙ্গিতে বললো, 'কালকের ঘটনার জন্য আমি খুবই দুঃখিত কণা।'

'কেন?'

'আমার ওরকম করাটা একদমই ঠিক হয়নি।'

কণা কী বলবে খুঁজে পাচ্ছিলো না। তার কী বলা উচিত হবে যে মনসুর কাল যা করেছিলো ঠিকই ছিলো, সে কিছু মনে করেনি! কিন্তু সেটি কী ঠিক হবে? সে এসব ভাবতে ভাবতেই মনসুর আবার বললো, 'আসলে হঠাৎ আমার কী যে হলো! কীসব আবোল-তাবোল বলে ফেললাম। আপনাকে ওরকম রাগী রাগী কথা বলতে দেখে মাথায় হঠাৎ দুষ্ট বুদ্ধি চেপে গিয়েছিলো। কিন্তু পরে বুঝলাম কাজটা একদমই ঠিক হয়নি। আর আপনি অত সিরিয়াস হয়ে যাবেন, তাও বুঝতে পারিনি। পরে জসিমের মার কাছে রাতে শুনলাম, আপনি রাগ করে কাউকে কিছু না বলেই চলে এসেছিলেন। শুনে খুব খারাপ লাগছিলো। আমি সত্যিই সরি কণা।'

কণার কতকিছু বলতে ইচ্ছে করছিলো। কিন্তু সে কিছুই বলতে পারছিলো না। শেষ বাক্যটা বলার সময় মনসুরের গলাটা যেন খানিক ভার হয়েছিলো, খানিক গাঢ়। একটা স্পষ্ট অপরাধবোধ। বিষয়টা কণার কান এড়ালো না। সে ভাবছিলো মনসুর আরো কিছুক্ষণ বসবে। আরো কিছু কথা বলবে। কিন্তু সে বসলো না, আচমকা উঠে দাঁড়ালো। তারপর শান্ত গলায় বললো, 'যাই কণা। ভালো থাকবেন। আর আমি কিন্তু সত্যি সত্যিই সরি।'

মনসুর আর দাঁড়ালো না। উঠে ধীর পায়ে চলে গেলো। কিন্তু ঠায় দাঁড়িয়ে রইলো কণা। মনসুর চোখের আড়াল হতেও সে উঠানের মাঝখানে খালি গ্লাস হাতে দাঁড়িয়ে রইলো। গ্লাসটার গায়ে এখনো ফোটা ফোটা জল জমে আছে। সে আঙুলের ডগায় আলতো করে একটা জলের ফোটা ছুঁয়ে দিলো। আর ঠিক সেই মুহূর্তে তার খুব আফসোস হতে লাগলো। আচ্ছা, অসতর্কতাবশত হলেওতো মনসুর গ্লাসটা নেয়ার সময় তার আঙুলটা একটু ছুঁয়ে দিতে পারতো। পারতো না?

কণার খুব অভিমান হতে লাগলো। মনসুরের ওপর যেমন, তেমন নিজের ওপরও। সেদিন আর সে কলেজে গেলো না। মা জিজ্ঞেস করতেই বললো, তার শরীর খারাপ লাগছে। শাহিনা বেগমও তাকে আর ঘাটালেন না। মেয়েটা দিনরাত পড়াশোনা করে শরীর খারাপ করে ফেলছে। তার চেয়ে একটা দিন অন্তত অসুখের কারণে হলেও ঘুমাক। সেই সারাটা দিন ঘরের দরজা বন্ধ করে শুয়ে রইলো কণা।

পরের দু দিন মনসুরের সাথে আর দেখা হলো না কণার। কণা জানে না কেন, এই দুটো দিন সারাক্ষণ তার মনে হয়েছে, এই বুঝি মনসুর তার সাথে দেখা করতে, কথা বলতে এসেছে। পড়ার টেবিলে সারাক্ষণ উৎকর্ণ হয়ে থাকতো সে। বাড়ির উঠানে কারো পায়ের শব্দ শুনলেই ছুটে এসে বারান্দার জানালা দিয়ে তাকাতো। তারপর নিজের কাছেই কেমন লজ্জা লাগতো নিজের। এমন করছে কেন সে? এ কোন ছেলেমানুষি তাকে পেয়ে বসছে! বারকয়েক বিষয়টা মাথা ও মন থেকে তাড়িয়ে দেয়ার চেষ্টাও করেছে সে। কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার হলো, যত বেশি তাড়িয়ে দেয়ার চেষ্টা করেছে, তত বেশি বিষয়টা যেন আরো গেড়ে বসেছে মন ও মগজে।

আপাতদৃষ্টিতে খুবই যুক্তিহীন এই ছটফটানির কাছে শেষ অবধি নিজেকে ছেড়ে দিয়েছিলো কণা। বিষয়টি তার মায়ের চোখও এড়ায়নি। একদিন মা জিজ্ঞেসও করলেন, কণা কৌশলে এড়িয়ে গেলো। তবে তৃতীয় দিন বাবার সাথে কলেজে যাওয়ার সময় সে বাবাকে বললো, 'বাবা, আমরা কী একটু বড় চাচার বাড়ি হয়ে যাবো?'

দেলোয়ার হোসেন সাইকেল চালাচ্ছিলেন। পেছনের সিটে কণা বসা। তিনি সামান্য ঘাড় কাত করে বললেন, 'এখন এই সময়ে আবার বড় চাচার বাড়ি কেন?'

'কাল শুনেছি বড় চাচির বাঁতের ব্যথাটা আবার বেড়েছে। আমাকে একবার যেতে বলেছিলেন।'

কণা আংশিক মিথ্যে বলেছে। বড় চাচির বাঁতের ব্যথা নতুন কোনো অসুখ নয়। তিনি বারো মাস বাঁতের ব্যথায় ভোগেন। কখনো কম আর বেশি, পার্থক্য এটুকুই। কণা ও বাড়িতে গেলে তিনি খুশিই হন। তা কলেজ থেকে ফেরার পথে দেলোয়ার হোসেন তাকে বড় চাচার বাড়ির সামনে নামিয়ে দিয়ে গেলেন। কিন্তু অদ্ভুত বিষয় হচ্ছে বড় চাচার চিরচেনা বাড়ি ঢুকতে তার কেমন লজ্জা লাগছিলো। পুরো বাড়ি অবশ্য ফাঁকা। কোথাও কেউ নেই। বড় চাচি রান্নাঘরে মাছ কুটছিলেন। তবে রান্নার ঝিটাকে কোথাও দেখা গেলো না। রান্নার আয়োজনও তেমন কিছু নেই। কণার বুকটা হঠাৎ ছ্যাঁৎ করে উঠলো, মনসুর চলে যায় নিতো! কিন্তু এ কথা সে বড় চাচিকে কী করে জিজ্ঞেস করবে?

বড় চাচিকে জিজ্ঞেস করতে হলো না। তিনি নিজ থেকেই বললেন, 'দেখলিরে কণা, দুই পাগলের কাণ্ড!'

'কী কাণ্ড?'

New Pdf download: www.PoragEducation.com + webtalkbd.com

'কেন? তোর জসিম ভাই তোরে খবর দিতে যায় নাই?'

কণা ভারি অবাক হলো, 'কই, নাতো!'

'তা যাবে ক্যান? মাথায় পাগলামি উঠলে আর কিছু মনে থাকে? তারা দুই বন্ধু ঠিক করছে, আইজ রাইতে তারা দুইজন রান্না-বান্না করবে। মনসুর নাকি ঢাকা মেসে-হোস্টোলে থাইকা থাইকা বহু বড় রাঁধুনী হয়ে গেছে!'

কণার বুক থেকে যেন একটা পাথর ভার নেমে গেলো। সে বললো, 'কী রান্না করবে চাচি?'

'তা কী জানি কী রান্না করবে? তারা বাজার করতে গেছে। আসার পর বোঝা যাবে। আমার বাঁতের ব্যথা যা বাড়ছে। সন্ধ্যা নামলে আরো বাড়বে। এর মধ্যে এই দুইজনের পাগলামি আর ভালো লাগছে না রে কণা।'

কণা নরম গলায় বললো, 'তুমি চিন্তা করো না, আমি দেখছি।'

জসিম আর মনসুর এলো তার কিছুক্ষণ পরেই। কণা ভেবেছিলো মনসুর তার সাথে নানান ছুঁতোয় কথা বলতে চাইবে। এজন্য নিজেকে সে মনে মনে একভাবে প্রস্তুত করেই রেখেছিলো। প্রথম দিনের মতো অমন কাঠখোট্টা আচরণ সে আর ভুলেও করবে না। কিন্তু তাকে অবাক করে দিয়ে পুরোটা সময় মনসুর আশ্চর্য রকমের নিষ্প্রভ হয়ে রইলো। কণাকে দেখেও সে কথা বলতে এগিয়ে এলো না। বরং পুকুরের পেছন দিকটায় উঁচু ঢিবির মতো যে জায়গাটা রয়েছে, সেখানে গিয়ে পুরোটা বিকেল বসে রইলো। কণা ছোটখাটো নানান কাজ করতে করতে কতবার যে আড়চোখে মনসুরকে খুঁজলো তার ইয়ত্তা নেই। বার কয়েক ইচ্ছে করে পুকুর ঘাটেও জল আনতে গেলো সে। কিন্তু মনসুর ফিরেও তাকালো না। সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে আসতে আসতে কণার মনটাও কেমন ভার হতে লাগলো। আচ্ছা, মানুষটা এমন কেন?

রাতে কণাকে বাড়ি পৌঁছে দিতে গেলো জসিম। ঘুটঘুটে অন্ধকার রাত। কাছেই কোথাও থেকে থেকে শেয়াল ডাকছে। উঠোন থেকে রাস্তা অবধি উঠতেও কণা যে কতবার নানা ছুঁতোয় আবার ঘরে ফিরে এলো! একবার ইচ্ছে করেই সে তার চুলের ক্লিপ রেখে এলো। একবার নিজের জুতোর বদলে বড় চাচির জুতো পরে এলো। সেগুলো আনতে বার কয়ের আবার ঘরে ফিরে গেলো সে। কিন্তু মনসুর চুপচাপ বসে আছে অন্ধকারে। একবারের জন্যও ফিরে তাকালো না সে। কণার হঠাৎ খুব কান্না পেয়ে গেলো। মানুষটা এমন কেন? সে কী কিছুই বুঝতে পারছে না?

মনসুর বুঝলো। কণাকে নিয়ে জসিম রাস্তায় উঠতেই মনসুর ডাকলো, 'তুই একটু চাচির কাছে থাক। ওনার ব্যথাটা বোধহয় বেড়েছে। একটু গরম ভাঁপ দিতে পারিস। ভালো লাগবে।'

'তাহলে ও?'

'ওকে আমি দিয়ে আসছি।'

জসিম কী বুঝলো কে জানে! সে আর কথা বললো না। কথা বললো না মনসুর কিংবা কণাও। দুজন অচেনা মানুষ পরস্পরকে জানবার সুতীব্র ইচ্ছে বুকে পুষে রেখে নীরবে হেঁটে যেতে থাকলো পাশাপাশি। তাদের মাঝে দুর্ভেদ্য গাঢ় অন্ধকার। অন্ধকার তাদের চারপাশেও। সেই অন্ধকার যেন আড়াল করে রাখছে অব্যক্ত অসংখ্য অনুভূতিও। মনসুরের হাতে টর্চলাইট। তবে খুব প্রয়োজন না হলে সে আলো জ্বালছে না। কণা খুব করে চাইছে মনসুর কিছু একটা বলুক। কিছু একটা করুক। তারপর সে হয়তো কথার পিঠে কথা ছুড়ে দিতে পারবে। কিন্তু মনসুর কিছুই বললো না। বাড়ির সামনে এসে মনসুর দাঁড়ালো। কণা একবার ভাবছিলো মনসুরকে ভেতরে খানিক বসে যেতে বলবে। হয়তো সৌজন্যতাবশত তার সেটা বলাও উচিত। কিন্তু কোন এক গোপন রাগ বা তীব্র অভিমানে সে কিছুই বললো না। পেছনে ফিরেও তাকালো না। পা বাড়িয়ে রাস্তা থেকে বাড়ির উঠানের দিকে নেমে যেতে থাকলো। মনসুর আচমকা ডাকলো, 'কণা?'

কণার বুঝতে কিছু সময় লাগলো। সে ডাক শুনে থমকে দাঁড়ালেও ঘাড় ঘুরিয়ে পেছনে ফিরে তাকালো খানিক পর। মনসুর গাঢ় কণ্ঠে বললো, 'একটু শুনবেন?'

কণা সামান্য সামনে এগুলো, 'জি, বলুন?'

'আপনার হাতটা একটু দেখি?'

কণা ভারি অবাক হলো। সে রাজ্যের দ্বিধা ও কৌতূহল নিয়ে তার ডান হাতখানা বাড়ালো। মনসুর তার হাতের তালুতে কিছু একটা রাখলো। কোনো চিরকুট কি? কণা তখনো জানে না। সে শুধু জানে, এই ভ্যাপসা গরম আর অদ্ভুত নৈঃশব্দ্য ভেদ করেও তার বুকের ভেতর শিরশির করে ঢুকে যাচ্ছে উত্তুরে হাওয়া, পাখির কোলাহল, অজস্র শব্দ, কম্পন ও কান্না। মনসুর তার হাতের আঙুলগুলোকে আলতো করে ধরে মুঠো করে দিলো। সেই মুঠোর ভেতর কি? চিঠি?

কণা জানে না। সে কেবল জানে, তার সারা শরীর থরথর করে কাঁপছে। বুকের ভেতর বয়ে যাচ্ছে শ্রাবণের উথাল-পাথাল নদী। সেই নদী ভাসিয়ে নিতে জানে মন ও মানুষ।

সেই রাতে, যখন বাড়ির সবাই গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন, ঠিক তখন কণা তার ঘরের হারিকেনের মৃদু আলোটাকে আরো মৃদু করে দিয়ে খুব গোপনে চিরকুটখানা খুললো। সে শুনেছে ডাক্তারদের হাতের লেখা জঘন্য হয়। কিন্তু মনসুরের হাতের লেখা মুক্তোর মতো ঝকঝকে। একটা ধবধবে সাদা কাগজে সে লিখেছে,—

New Pdf download: www.PoragEducation.com + webtalkbd.com

'কণা,

সেদিন পুকুর ঘাটে আমার ঘুম ভেঙে যেতেই একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটলো। আমি একটা ভয়াবহ বিভ্রান্তিতে পড়ে গেলাম। হুট করে ঘুম ভেঙে আমি আলাদা করতে পারছিলাম না, আমি কী আপনাকে স্বপ্নে দেখছি, নাকি বাস্তবে! কেন আলাদা করতে পারছিলাম না, সেটি আমি এখন বলবো। কিন্তু আমি জানি, আমার কথা শুনে আপনি হাসবেন কিংবা মিথ্যুক ভাববেন। শুধু আপনি না, যে কেউই ভাববে। কিন্তু ঘটনা সত্যি। সেদিন ভয়াবহ গরম পড়ছিলো। পুকুর ঘাটের ফুরফুরে হাওয়ায় আমার হঠাৎ ঘুম পেয়ে গেলো। আমি কিছুতেই জেগে থাকতে পারছিলাম না। কখন ঘুমিয়ে পড়েছি আমার খেয়ালও নেই। কিন্তু ঘুমের ঘোরে আমি স্বপ্নে দেখলাম মরুভূমির মতো একটা জায়গায় একদল ডাকাত আমাকে তাড়া করছে। আশেপাশে কোথাও কোন গাছ-পালা, ঘর-বাড়ি, মানুষ কিচ্ছু নেই। মাথার ওপরে অগ্নিকুণ্ডের মতো সূর্যটা জ্বলছে। প্রচণ্ড তেষ্টায় আমার বুক ফেটে যাচ্ছে। মনে হচ্ছিলো, এই মুহূর্তে এক ফোটা পানি না পেলে আমি মরেই যাবো। আর ঠিক সেই মুহূর্তে মরুভূমির মধ্যে খুব সুন্দর স্বচ্ছ পানির ছোট্ট একটা পুকুর দেখতে পেলাম আমি। ডাকাতদের কথা ভুলে আমি সেই পুকুরের দিকে ছুটে গেলাম। কিন্তু গিয়ে দেখি কেউ একজন একটা স্বচ্ছ কাচের কলসে পুকুরের সবটুকু পানি তুলে নিয়েছে। এক ফোটা পানিও আর পুকুরে অবশিষ্ট নেই। আমি অসহায় চোখে মানুষটার দিকে তাকালাম। তিনি আমার দিকে পেছন ফিরে আছেন। তার মাথায় লম্বা চুল। পরনে শাড়ি। কাঁখের স্বচ্ছ কলসটা ভর্তি স্ফটিকের মতো টলটলা স্বচ্ছ জল। আমি বার দুই তাকে চিৎকার করে ডাকার চেষ্টা করলাম। কিন্তু প্রচণ্ড পানির পিপাসায় আমার গলা তখন শুকিয়ে কাঠ। কোনো শব্দ বের হচ্ছিলো না। হঠাৎ আমি অচেতন হয়ে পড়ে গেলাম। সেই অচেতন অবস্থায়ই আচমকা যেন আমি টের পেলাম, মেয়েটা আমার কাছে ফিরে এসেছে। এবং সে আমাকে ডাকছে, 'এই যে শুনছেন'! আমি বহু কষ্টে চোখ মেলে তাকালাম। আর ঠিক সেই মুহূর্তে আমার ঘুম ভেঙে গেলো। ঘুম ভেঙে তাকিয়ে দেখি আমার সামনে আপনি দাঁড়িয়ে আছেন। স্বপ্নে আমি আপনার মুখ দেখিনি। কিন্তু বাস্তবে যখন আমি আপনার মুখ দেখলাম, তখন মুহূর্তের জন্য আমার মনে হলো, আপনি স্বপ্নের ওই মেয়েটিই! কিছুক্ষণের জন্য আমি স্বপ্ন আর বাস্তবকে আলাদা করতে পারলাম না। গুলিয়ে ফেললাম। তারপর আমার কী হলো আমি জানি না। পরের কয়েকটা দিনেও না। আমার মনে হলো, আমি আমার নিজের ওপর সকল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছি। এই কথাগুলো আমার আপনাকে বলার দরকার ছিলো। না হলে আমি স্বস্তি পাচ্ছিলাম না।

আচ্ছা, এই যে কিছুক্ষণ আগে চিঠিটা দেয়ার সময় আমি ইচ্ছে করেই আপনার হাত স্পর্শ করেছি, আপনি কী তা বুঝতে পেরেছেন? কেন করেছি জানেন? করেছি এটি বোঝার জন্য যে আপনি আমার মনের কোনো কল্পনা ননতো? আপনি যদি সত্যি না হয়ে মিথ্যে হন, আমার কল্পনা বা স্বপ্ন হন, তাহলে বিষয়টা খুব বিচ্ছিরি হবে। খুব। আপনিবিহীন এই পৃথিবীটা কী ভীষণ জঘন্য!'

শেষের লাইনটা কণা আরো বার কয়েক পড়লো। তারপর আরো বার করেক। তারপর আবারও। পড়তেই থাকলো। পড়তেই থাকলো। তারপর তার আচমকা মনে হলো, আচ্ছা মানুষটা এত সুন্দর করে কীভাবে বললো, আপনিবিহীন এই পৃথিবীটা কী ভীষণ জঘন্য!

কণা তাকালো, বাইরে অন্ধকার। একনাগাড়ে ঝিঁঝি পোকা ডেকে যাচ্ছে। চাঁদ কী উঠেছে? সে জানে না, কিন্তু সে এটা জানে, ওই মানুষটাকে ছাড়া, তার জগতটাও কী যে জঘন্য, কী ভীষণ জঘন্য!

চিঠিটা কণা কতবার পড়েছে সে জানে না। সে কেবল জানে সেই সারাটা রাত সে চিঠিটা অসংখ্যবার ভাঁজ করে রেখেছে, খুলেছে, পড়েছে। আবার ভাঁজ করে রেখেছে। তার মনে হয়েছে এই চিঠিটা সে সারাটা জীবন ধরে পড়তে পারবে। এবং সারা জীবনই চিঠিটা তার কাছে নতুন মনে হবে। এমন করে প্রতিটা শব্দ পড়ার সময় তার বুকের ভেতর। টিং করে কংক্রিটের মেঝেতে মার্বেল পতনের শব্দ হবে। এমনই থরথর করে কাঁপবে। এবং সেই প্রতিবারই তার মনে হতে লাগলো 'আপনি যদি সত্যি না হয়ে মিথ্যে হন, আমার কল্পনা বা স্বপ্ন হন, তাহলে বিষয়টা খুব বিচ্ছিরি হবে। খুব। আপনিবিহীন এই পৃথিবীটা কী ভীষণ জঘন্য', এই লাইনটা এত সুন্দর কেনো? এত সুন্দর কেন!

আজ ঠিক এই মুহূর্তে, এই যে সে হারিকেনের মৃদু আলোতে জানালার পাশে বসে আছে, এখনো সেই অনুভূতির সবটুকু সে অনুভব করতে পারছে। সেই অদ্ভুত রাতের পর মনসুর আর যে কটা দিন ছিলো, কণা যেন বুঁদ হয়ে রইলো অদ্ভুত ঘোরের এক জগতে। পরদিন কলেজ থেকে বের হয়ে দেখে মনসুর দাঁড়িয়ে। কণার কেন যেন ভারী লজ্জা লাগছিলো। আজ বাবা তাকে নিতে আসেনি, কিন্তু মনসুর কী তা আগে থেকেই জানতো?'

মনসুর এগিয়ে গিয়ে বললো, 'একটা অপরাধ করে ফেলেছি।'

'কী অপরাধ?'

'জসিমকে দিয়ে মিথ্যে কথা বলিয়ে আপনার বাবাকে বাড়ি ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছি।'

কণা চমকে ওঠা গলায় বললো, 'কী মিথ্যে কথা?'

'আপনার নানাবাড়ি থেকে লোক এসেছে। এই বয়সে বহু বছর বাদে শ্বশুরবাড়ির লোকজন এলে আলাদা যত্ন করতে হয়!'

'কী বলছেন আপনি?'

'হুম। উনি আপনাকে নিতে প্রায় কলেজের কাছে চলেও এসেছিলেন, তখন জসিম উনাকে বললো, আপনার শ্বশুর আসছে। বৃদ্ধ মানুষ। আপনার তার কাছে থাকা দরকার। আমি একটা কাজে এদিকে আসছি। কণাকে আমিই বাড়ি পৌঁছে দিবো।'

New Pdf download: www.PoragEducation.com + webtalkbd.com

আল্লাহ! কিন্তু বাবাতো বাড়িতে গিয়ে দেখবে নানা আসে নাই, তখন? আর নানার যা শরীরের অবস্থা, তার আসার কথাও না।'

'সেই ব্যবস্থাও আছে।'

'কী?'

'বলবে যে ভুল হয়ে গিয়েছিলো। অবিকল আপনার নানার মতো এক লোককেই আপনাদের বাড়ি ঢুকতে দেখে সে ভেবেছিলো উনিই আপনার নানা। এমন ভুলতো হতেই পারে, পারে না?'

'বাবা ঠিক বুঝে ফেলবেন। খুবই ছেলেমানুষি হয়েছে।'

'প্রেমে পড়লে মানুষ এরচেয়েও কত বড় বড় ছেলেমানুষি করে। সে তুলনায় এত কিছুই না, তাই না?'

কথাটা কণার বুকে লাগলো। প্রেমে পড়লে! কত সহজে কথাটা বলে গেলো সে। কোথাও একটু বাঁধলো না, কাঁপলো না। ভাবলো কী? নাকি তাও ভাবলো না? আচ্ছা, প্রেম যদি এত সহজ হয়, তবে কী তা গভীর হয়? এই যে সে নিজেও একটু ভাবার সময় নিলো না! টুপ করে একটা কিছু যেন বুকে এসে বিঁধলো। তারপর বিঁধতেই থাকলো। আরো গভীরে। গভীর থেকে গভীরে। কিন্তু সেতো খুলে ফেলতে চেষ্টাও করেনি, বরং ইচ্ছে করেই আরো বিঁধতে দিয়েছে। এমন কেন করলো সে? প্রেমের অনুভূতি কী এমনই? এমন বেহিসেবী, যুক্তিহীন, সর্বপ্লাবী? এই প্রশ্নটা কণার মনে গেঁথে গেলো। কিন্তু সেই দুপুর থেকে বিকেল। কলেজ থেকে পায়ে হাঁটা প্রায় ঘণ্টাখানেকের পথ তারা দুজন হেঁটেই এলো। কত শত কথা, কত গল্প।

মনসুর বললো, 'তুমি কী একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা জানো, কণা?'

'কী?'

'এই যে এই মুহূর্ত থেকে আমি তোমাকে তুমি করে বলতে শুরু করলাম!'

কণা হাসলো, 'হুম, জানলাম।'

'তুমি কী আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ কথা জানো?'

'কী?'

'তুমি কখন থেকে আমাকে তুমি করে বলতে শুরু করবে?'

কণা জবাব দিলো না। চুপচাপ হাঁটতে থাকলো। মনসুর বললো, 'জীবনে কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় থাকে, সেই বিষয়গুলো ঠিকঠাক জানাটা খুব জরুরি। এখন বলো, তুমি আমাকে কখন থেকে তুমি করে ডাকবে?'

কণা অস্ফুট স্বরে বললো, 'আপনাকে আমি তুমি করে কেন ডাকবো?'

'ভালোবাসো বলে!'

'আমি কী বলেছি যে আমি আপনাকে ভালোবাসি?'

'ভালোবাসি বলতে হয় না, ওটা এমনি এমনি হয়ে যায়।'

কথাটা কী যে ভালো লেগেছিলো কণার! মানুষটা কী সুন্দর করেই না কথা বলে। এবং কথাগুলো সত্যিও। সে নিজে তার প্রমাণ। মনসুর আবার বললো,

'অজস্রবার ভালোবাসি বলার পরও ভালোবাসা হয় না। আবার একবার না বলেও পৃথিবীর সবচেয়ে গভীরতম অনুভূতি নিয়ে ভালোবেসে ফেলা যায়। যায় না?'

এই কথাটা এই মুহূর্তে কণার চেয়ে বেশি আর কে জানে! কণা খুব গাঢ় গলায় বললো, 'হুম।'

ওইটুকু হুম শব্দে কিছু একটা ছিলো। নির্জন রাস্তায় মনসুর হঠাৎ তার হাত বাড়িয়ে দিলো কণার চোখের সামনে। তারপর বললো, 'তুমি কী আমার হাতটা একটু ধরবে? আমার খুব ইচ্ছে হচ্ছে তোমার হাত ধরতে। কিন্তু সাহস হচ্ছে না। চাইলে তুমিও ধরতে পারো। আর না হলে আমাকে অভয় দাও।'

মনসুর যা করছে, তার সবই বিপুল মুগ্ধতায় ডুবিয়ে ফেলছে কণাকে। এই যে হাত ধরার কথাটাও কী সুন্দর করেই না বললো সে! সুন্দর অথচ সহজ। সহজ অথচ গভীর। কণা তারপরও হাত বাড়ালো না। তবে সে চাইছিলো মনসুর নিজ থেকেই তার হাতটা ধরুক। কিন্তু মুখে কিছু বলতেও তার লজ্জা লাগছিলো। মনসুর অবশ্য তার হাত ধরলো না। সেই পুরোটা পথ আর কণার হাত ধরার কথা বললোও না সে। সে যে রাগ বা অভিমান করেছে, তা নয়। তবে সে অনুমোদনবিহীন সীমা লঙ্ঘন করতে চায়নি। একটা মানুষ কী চটপটে, কখনো সখনো একটু বেশিই হ্যাংলা, গায়ে পড়া স্বভাবের, অথচ সেই মানুষটিই যেন আবার জানে, কোথায় কতটুকু পরিমিতিবোধ তার থাকা উচিত। কণার মুগ্ধতা ক্রমশই সীমা ছাড়াতে লাগলো।

পরদিন তুমুল বৃষ্টি। বৃষ্টিতে কলেজে যেতে পারলো না কণা। কিন্তু দেলোয়ার হোসেনকে সকাল সকালই স্কুলে যেতে হলো। দুপুর গড়িয়ে বিকেল হলেও দেলোয়ার হোসেন স্কুল থেকে ফিরলেন না। কণা আর তার মা দুশ্চিন্তায় পড়ে গেলো। দিনভর বৃষ্টিতে রাস্তায় কাদায় জল জমে গেছে। বিকেলের দিকে কণাকে তার মা বড়চাচার বাড়িতে পাঠালেন। জসিম যদি কোনো খোঁজ নিতে পারে। তা জসিম গেলোও। বাবার জন্য প্রচণ্ড দুশ্চিন্তা নিয়ে কণা বসেছিলো খোলা বারান্দায়। টিনের চালে ঝমঝম বৃষ্টি। মাটির কাঁচা উঠানে জলের তীব্র স্রোতে কতকিছু ভেসে চলে যাচ্ছে পুকুরে! দৃশ্যটা দেখতে কণার খুব ভালো লাগছিলো। মনে হচ্ছিলো উঠোন জুড়েই ছোট ছোট অনেকগুলো খরস্রোতা নদী। একটা ফুল, দুটো কাঁঠাল পাতা, একটা পাটখড়ির ভাঙা টুকরো, একপাটি স্যান্ডেল ভেসে চলে যাচ্ছে। কখনো কখনো জলের প্রস্রবণ সরু কিংবা অগভীর হওয়ায় ভেসে যাওয়া জিনিসগুলো এখানে সেখানে বেঁধে যাচ্ছে।

মনসুর কখন পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে, সে জানে না। পেছন থেকে মনসুর বললো, 'খুব দুশ্চিন্তা হচ্ছে না?'

কণা ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালো, 'হুম।'

New Pdf download: www.PoragEducation.com + webtalkbd.com

'কেন?'

'কেন আবার!' কণার খানিক বিরক্ত লাগলো। বাবার জন্য দুশ্চিন্তা হচ্ছে, তাতো মনসুর জানেই। তাহলে? মনসুর বললো, 'এই বৃষ্টির মধ্যে উনি আসবেন কী করে? উনার তো বৃষ্টি থামা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে, তাই না?'

'বৃষ্টিতো মাঝখানে ঘন্টাখানেকের জন্য থেমেওছিলো! বাবার তখনই চলে আসার কথা ছিলো।'

'উহু, ছিলো না। উনাকে দীর্ঘপথ সাইকেল চালিয়ে আসতে হতো। প্রথমতম রাস্তা জল কাদায় মাখামাখি, এখন যদি উনি এই জল কাদায় সাইকেল নিয়ে বের হন, তাহলে সাইকেলে চড়ে না, সাইকেলকে উনার মাথায় চড়িয়ে আনতে হবে।'

কণা কথা বললো না। সে নিমগ্ন দৃষ্টিতে বৃষ্টি দেখছে। মনসুর বললো, 'তা ছাড়া, বৃষ্টি নেই দেখে উনি পথে নামলেন, আর তখনই যদি আবার বৃষ্টি শুরু হতো! এই চিন্তা করেই হয়তো তিনি অপেক্ষা করছেন।'

মনসুরের কথায় যুক্তি আছে। কিন্তু কণার তা পছন্দ হচ্ছে না। সে থম মেরে বসেই রইলো। ভাদ্র মাসের বিকেল দীর্ঘ। সেই দীর্ঘ বিকেল ক্রমশই সন্ধ্যা হয়ে আসছে। বৃষ্টি থামার কোনো লক্ষণও দেখা যাচ্ছে না। এমনকি তার বাবা কিংবা জসিম কারো কোনো খোঁজও নেই। মনসুর চুপচাপ কণার পাশে বসে রইলো। সন্ধ্যার আগে আগে বৃষ্টি কমে এলো। আর কণাও হঠাৎ অস্থির হয়ে উঠলো, 'বাবার সত্যি সত্যি কিছু হলো নাতো!'

এই দুশ্চিন্তাটা এখন মনসুরেরও হচ্ছে। এতক্ষণ ধরে কোনো না কোনো খবর নিয়ে জসিমের অন্তত চলে আসা উচিত ছিলো। বিষয়টা মনসুরকেও কিছুটা বিচলতি করে তুললো। সে জসিমের মায়ের অনুমতি নিয়ে নিজেই রওয়ানা দিলো বাজারের উদ্দেশ্যে। কিন্তু বাধ সাধলো কণা। সেও যাবে। অনেক বুঝিয়েও কোনো লাভ হলো না। শেষ অবধি তাকে নিয়েই কর্দমাক্ত রাস্তায় অন্ধকারের ভেতর রওনা দিলো তারা। পুরো পথে কেউ কোনো কথা বললো না। তবে একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটলো। রাস্তায় নেমেই কণা আবিষ্কার করলো, এই জলে ভেজা পিচ্ছিল রাস্তায় সে কোনোভাবেই একা একা হেঁটে যেতে পারবে না। কিন্তু এই কথা বললেই মনসুর তাকে রেখে যাবার একটা অজুহাত পেয়ে যাবে। ফলে কিছুক্ষণ সে সর্বোচ্চ চেষ্টা করলো একা একাই হেঁটে যেতে। খানিকটা সফলও হলো। কিন্তু তার মধ্যেও বার কয়েক পড়ে যেতে যেতেও কোনো মতে নিজেকে সামলে নিলো কণা। বিষয়টা মনসুরের চোখ এড়ালো না। সে তার ডান হাতের টর্চখানা বাঁ হাতে নিয়ে খুব স্বাভাবিক ভঙ্গিতে কণার বাঁ হাতটা ধরলো। কণা প্রথমে বুঝতে পারলো না ঘটনা। বরং আরো একবার পিছলে যেতে যেতে নিজেকে সামলালো সে। কিন্তু নিজেকে সামলাতে গিয়েই সে আবিষ্কার করলো, মনসুরের হাতের মুঠোয় তার হাতখানা শক্ত করে ধরা। এত শক্ত যে কণার মনে হলো এই হাত সে আর এই জীবনে ছাড়াতে পারবে না!

বাবার জন্য ভীষণ দুশ্চিন্তা হচ্ছে কণার। কিন্তু বিস্ময়করভাবে সে আবিষ্কার করলো, ওই ভাবনাটুকু তার শরীরে রহস্যময়, অব্যখ্যেয় এক তীব্র অনুভূতি ছড়িয়ে দিচ্ছে। তার মনে হলো, মনসুর আর কখনো তার এই হাতখানা না ছাড়ুক। সারা জীবনেও না। এক মুহূর্তের জন্যও না।

মনসুর অবশ্য ছাড়লোও না। সেই অন্ধকারে বিপজ্জনক পুরো রাস্তাটা সে কণাকে একভাবে তুলে নিয়ে বাজারে পৌছালো। গভীর অন্ধকারের এই সময়টুকু, বিপদসঙ্কুল এই পথটুকু, ভয়ানক দুশ্চিন্তার এই মুহূর্তটুকু নির্বাক দুটি মানুষের বুকের ভেতর বুনে দিতে থাকলো বাঙময় অনুভূতির অজস্র বীজ।

দেলোয়ার হোসেন অবশ্য বিপদেই পড়েছিলেন। বড়সড় না হলেও ছোটখাটো বিপদ। দুপুরে যে ঘন্টাখানেকের জন্য বৃষ্টি থেমেছিলো, তিনি তখনই সাইকেল নিয়ে বের হয়ে গিয়েছিলেন বাড়ির পথে। কিন্তু ভেজা, কর্দমাক্ত পিচ্ছিল রাস্তায় সাইকেলের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পড়ে গিয়েছিলেন পাশের খালে। খুব গুরুতর না হলেও শরীরের বিভিন্ন জায়গায় আঘাত পেয়েছেন তিনি। ছিলেও গেছে কয়েক জায়গায়। জসিম তাকে থানা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে ভর্তি করিয়েছে। ডাক্তাররা অবশ্য প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে রাতেই ছেড়ে দিলেন। শরীরের বিভিন্ন জায়গায় ব্যান্ডেজও করে দিলেন। বাবার এই অবস্থা দেখে কণার তখন দিশেহারা অবস্থা। একটা তিন চাকার ভ্যান গাড়ির ব্যবস্থা করে তাতে করে দেলোয়ার হোসেনকে বাড়ি নিয়ে আসা হলো। আর এই পুরোটা পথ ধরেই ফুপিয়ে ফুপিয়ে কাঁদলো কণা।

মনসুর মেডিকেলের ছাত্র। ফলে এর পরের কয়েকটা দিন তার অবাধ যাতায়াত হয়ে উঠলো কণাদের বাড়ি। কণার যে কী ভীষণ লজ্জা লাগতো! মনে হতো, বাবা-মা ঠিকঠিক বুঝতে পারছে মনসুর আর তার কথা। মনসুরও অবশ্য কম দুষ্টু নয়। কেউ চোখের আড়াল হলেই সে বলতো, 'জামাই শ্বশুরবাড়িতে এলে একটু আদর যত্ন করতে হয় বুঝলে?'

'ইশ, জামাই হবার শখ কতো!'

'কেন, তোমার বউ হবার শখ নেই?'

'আমি কখনো বিয়েই করবো না!'

'কখনোই না?'

'উহু। বাবা বলেছেন, আইএ পরীক্ষার পর আমাকে ঢাকায় নিয়ে গিয়ে ভর্তি করিয়ে দেবেন।'

মনসুর চোখ টিপলো, 'হুম, আইএ পরীক্ষার পরই কিন্তু বিয়ে পরীক্ষা।'

কণা প্রথমে বিষয়টা ধরতে পারলো না। পরে যখন ধরতে পারলো, তখন সে মনসুরকে ভয় দেখানোর ভঙ্গিতে দু হাত বাড়িয়ে তেড়ে এলো । মনসুর অবশ্য ভয় পেলো না। সেও বরং হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললো, 'আসো আসো। যদি এই সুযোগে একবার জড়িয়ে ধরা যায়!'

New Pdf download: www.PoragEducation.com + webtalkbd.com

কী অসভ্য! লোকটার মুখে যেন কিচ্ছু আটকায় না। কণার ভীষণ ভয় হয়, কেউ যদি শুনে ফেলে! সাথে লজ্জাও। আর একটা অদ্ভুত ভালো লাগাও। এটা কেন হয়? মনসুর যা-ই করুক না কেন, সবকিছুতেই শেষে গিয়ে একটা তীব্র ভালো লাগা কাজ করে তার! এটাই কী ভালোবাসা? কণা বুঝতে পারে না। তবে সে এটা বুঝতে পারে, এই মানুষটা ক্রমশই তাকে তীব্র এক ঘোরে ডুবিয়ে ফেলছে।

তারপর রোজ কথা হতো তাদের। কত কত গল্প। একটা মানুষ এত মুগ্ধকর কী করে হয় কণা জানে না! সারাটাক্ষণ বুকের ভেতরটা কেমন ছটফট করতো তার, কখন দেখা হবে মনসুরের সাথে? কখন একটু কথা হবে?

কিন্তু তারপর একদিন জরুরি খবর পেয়ে হুট করেই চলে গেলো মনসুর। যেন উধাও হয়ে গেলো। যেন কোথাও কখনোওই ছিলো না সে। কোনো খোঁজ নেই, খবর নেই। সেই কটা দিন, কী তীব্র অপেক্ষায় যে দিন কেটেছে কণার, তা শুধু সে-ই জানে।

আজ সন্ধ্যায় যখন জসিম তাকে জানিয়েছে, মনসুর এসেছে। রাতে তার সাথে দেখা করতে আসবে। জরুরি কথা আছে। কণার মনে হয়েছিলো বহুকাল জলের তলায় দমবন্ধ হয়ে আটকা পড়েছিলো সে। আজ হঠাৎ জলের তলা থেকে উঠে বিশুদ্ধ হাওয়ায় বুক ভরে নিঃশ্বাস নিতে পারছে।

সেই থেকে মনসুরের অপেক্ষায় বসে আছে। কী এমন জরুরি কথা? কোনো বিপদ নয়তো? কণার সামনে টেবিলে খোলা বই-খাতা। কিন্তু একটা শব্দও সে পড়তে পারছে না। এক অসহ্য অপেক্ষায় সে তাকিয়ে আছে জানালার বাইরে। সেখানে ঘুটঘুটে অন্ধকার। কয়েকটা জোনাকি পোকা যেন সেই ঘুটঘুটে অন্ধকারের কপালে কোনো এক মায়াময় আলোর টিপ পরিয়ে দিচ্ছে। কিন্তু টিপগুলো স্থির থাকতে পারছে না। তারা ছটফট করে ঘুরে বেড়াচ্ছে চারদিকে। ছটফট করছে কণাও। মনসুর আসছে না কেন? কখন আসবে সে? কখন?

রাত গভীর। কিন্তু লস্কর চরের কারো চোখে ঘুম নেই। তোরাব আলী লস্করের ঘরের উঠানে হ্যাজাক লাইট জ্বলছে। হ্যাজাক লাইটকে কেন্দ্র করে কৌতূহলী পোকামাকড়ের ভিড় জমেছে। ভিড় জমেছে কৌতুহলী মানুষেরও। দেখে মনে হচ্ছে, চরের সব মানুষ চলে এসেছে! তারা গোল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে তোরাব আলী লস্করের উঠানে। তাদের মাঝখানে হোগলা পাতার মাদুরের ওপরে বাহাদুর আর মোকাররম বসে আছে। আর সবার মতো তোরাব আলী লস্কর নিজেও যুগপৎ বিস্ময় ও অবিশ্বাস নিয়ে তাদের দিকে তাকিয়ে আছেন। বাহাদুর আর মোকাররমের হাতের হাতকড়া ভাঙা হয়েছে। দীর্ঘসময় হাতকড়া পরে থাকায় তাদের হাতের রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে গিয়েছিলো। তারা এখন নানা কসরত করে হাতের রক্ত চলাচল স্বাভাবিক করার চেষ্টা করছে।

তোরাব আলী লস্কর বাহাদুরকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'ঘটনাতো শুনছোস বাহাদুর?'

'কোন ঘটনা?'

তোর বউর ঘটনা?'

বাহাদুর কোনো কথা বললো না। সে চুপচাপ তার হাত ডলতে লাগলো। তোরাব আলী লস্কর নরম গলায় বললেন, 'হায়াত-মউত আল্লাহর হাতে। রাখলেও সে, মারলেও সে। আমাগো আর ক্ষমতা কী?'

চরের প্রবীণ অধিবাসীদের একজন জালালুদ্দিন। তার বয়স প্রায় আশির কাছাকাছি। মুখভর্তি শুভ্র দাড়ি। ভঙ্গুর, অসুস্থ শরীরের কারণে আজকাল আর ডাকাতিতে যেতে পারে না সে। তবে চরের অন্যান্য শিশু ও বৃদ্ধদের মতো তারও

New Pdf download: www.PoragEducation.com + webtalkbd.com

এখন সময় কাটে বিলে-নদীতে মাছ ধরে। তিনি খুব ধীরে সুস্থে, শান্ত ভঙ্গিতে বললেন, 'কথাখান কিন্তু ঠিক কইলি না তোরাব।'

তোরাব আলী খানিক অবাক গলায় বললেন, 'কোন কথা কাকু?'

'সবই যদি আল্লাহর হাতে হয়, তাইলে মানুষের আর কাম করনের দরকার কি? সব আল্লাহর হাতে ছাইড়া দিলেইতো হয়!'

'সেই কথাতো কই নাই জালাল কাকু?' তোরাব আলী লস্কর তার কথার পক্ষে যুক্তি দেয়ার চেষ্টা করলেন, 'কইছি, জন্ম-মৃত্যুর মতোন ব্যাপারতো আল্লাহর হাতেই, তার ওপর কারো হাত নাই।'

'ধরা পড়ন আর ছাড়া পাওনও? এই যে কাম করতে গিয়া ধরা পড়তেছে আমাগো পোলাপান, তারপর বেশির ভাগই নিরুদ্দেশ। আর কোনো খোঁজখবর নাই। কোনো ব্যবস্থাও নাই খোঁজ খবরের। এইগুলানও কী আল্লাহর হাতেই? আমাগো কিছু করনের নাই?' জালালুদ্দিন যেন খানিক ফোঁড়ন কাটে তোরাব আলীকে, 'তোর পোলাডা আইজ সাত বছর নাই। এইজইন্য আল্লাহর হাতে তারে ছাইড়া দিয়া নিশ্চিন্ত আছোস?'

তোরাব আলী লস্কর এতক্ষণে যেন আড়ালের ঘটনা বুঝতে পারেন। চরে জালালুদ্দিনের মতো বয়স্ক দুয়েকজন আছেন। বেশির ভাগই ডাকাতি করতে গিয়ে কোনো দুর্ঘটনায় অচল। এরা বয়সে বড় হলেও তোরাব আলীর কথার ওপরে কোন কথা বলেন না। আজ জালালুদ্দিনের সাহস দেখে তোরাব আলী যেন কিছুটা অবাকই হলেন। তবুও তিনি নিজেকে সংযত করেই বললেন, 'চেষ্টাতো আমি কম করি নাই! আমার নিজের পোলা, আমার চাইতে আর দরদ বেশি কার?'

'তোর নিজের পোলার উপরে না হয় তোর দরদ বেশি। কিন্তু অন্য মাইনষের পোলার ওপরেতো তাগো বাপ-মায়ের দরদই বেশি? এই যে লোকমানডা মরলো, কই, তার উপরতো তোর দরদ দেখলাম না?'

তোরাব আলী লস্কর এবার কিছুটা বিরক্তই হলেন, 'অনেক হিসাব-নিকাশ কইরা কাজ করতে হয় কাকু। ইচ্ছা থাকলেই অনেক কিছু করন যায় না!'

'ইচ্ছা থাকলে করন যায় কি না, হেই প্রমাণতো তোর সামনেই।'

'মানে?'

'মানে আর কী! ওইটুকু দুধের বাচ্চা এক মাইয়া জোহরা, সে কী কামডাই না করলো! আর আমরা এতবছর কিছু করতে পারলাম না! চাইয়া চাইয়া খালি দেখলাম। অমুক জায়গায় গিয়া একজন ধরা পড়ছে, খোঁজ নাই। তমুক জায়গায় গিয়া আরেকজন ধরা পড়ছে, কোনো খোঁজ নাই। চেষ্টা করলে একটু খোঁজ কিন্তু নেওন যাইতো। যাইতো না? খালি ডর, ডর আর ডর। এই কামে ডরাইলেই সর্বনাশ।'

পেছন থেকে মাঝবয়সি হোসেন আলী কথা বলে উঠলো, 'কথা ঠিকই কইছেন দাদা। এই ডরের লইগাই আইজ আমাগো এই অবস্থা। একটু খালি সাহস কইরা দুইটা ঘটনা ঘটাইলেই দেখন যাইতো সব ঠাণ্ডা।'

জালালুদ্দিন বললেন, 'দশ কথার এক কথা। হক কথা। নাইলে খোনকারগো এত সাহস হইলো কেমনে যে তোরাব আলী লস্করের চিডি পাওনের পরও তারা আন্ধারে আক্রমণ করে? মানুষ খুন কইরা ফালাইলো? এইডা কোনো স্বাভাবিক ঘটনা? আমি বুড়া মানুষ, চিন্তা কইরা আমার রক্তইতো টগবগ করতেছে!'

বিষয়টাতে তোরাব আলী লস্করের যে লাগেনি তা নয়। কিন্তু চরের এই অবস্থায়, এই ক্ষয়িষ্ণু শক্তি নিয়ে তিনি কী করবেন তা ভেবে পাচ্ছিলেন না। আজাহার খন্দকার যা করেছেন তা মেনে নেয়া এই চরের কারো পক্ষেই সম্ভব না। কিন্তু চরের প্রধান হিসেবে তোরাব আলী লস্কর চাইলেই অন্যদের মতো হুটহাট কোনো সিদ্ধান্ত নিয়ে নিতে পারেন না। সিদ্ধান্ত নেয়ার আগে তাকে অনেক বিষয় ভাবতে হয়। তা ছাড়া কলেরার মতো ভয়ানক এক রোগ এসে মহামারি আকার ধারণ করেছে। চরে প্রত্যেক ঘরেই কেউ না কেউ কলেরায় আক্রান্ত। এই অবস্থায় তিনি ইচ্ছে করলেই কোথাও গিয়ে শক্তি প্রয়োগ করার ঝুঁকি নিতে পারেন না। এই বাস্তবতাটুকু তিনি ছাড়া আর কেউই বুঝতে চাইছে না।

তবে আসল সমস্যা অন্য। যা তোরাব আলী লস্কর ছাড়া আর কেউই ঘুণাক্ষরেও ভাবতে পারছে না। আজ যে কারণে এই চরের সবাই এত আনন্দিত, উল্লসিত, ঠিক সেই একই কারণে তোরাব আলী লস্কর চিন্তিত। জোহরার এই অবিশ্বাস্য ঘটনায় তিনি আনন্দিত হতে পারছেন না। বিষয়টি এমন নয় যে জোহরার এই অভূতপূর্ব সাহসিকতায়, বুদ্ধিমত্তায় তিনি অখুশি হয়েছেন। কিন্তু তিনি ভবিষ্যৎ দেখতে পাচ্ছেন। তিনি জানেন, এই ঘটনা দীর্ঘমেয়াদে নানা জটিলতা তৈরি করবে। তার প্রতি অন্যদের আস্থার সংকট তৈরি করবে।

এতদিন চরের সবাই যেমন বিনা বাক্যব্যয়ে তোরাব আলী লস্করের সিদ্ধান্ত, নেতৃত্ব মেনে নিয়েছে, এই ঘটনার পর তা স্পষ্টতই একটি বড়সড় ধাক্কা খেয়েছে। কারণ সবাই জানে, জোহরা তার দাদাজানের অনুমতি না নিয়েই রাতের অন্ধকারে নিজের একক সিদ্ধান্তে এই অবিশ্বাস্য ঘটনা ঘটিয়েছে। শুধু তা-ই না, সে তার অসাধারণ সাহস ও বুদ্ধিমত্তা দিয়ে বিজয়ীর বেশে ফিরেও এসেছে। যে সাহস এর আগে কেউ দেখায়নি। এমনকি তোরাব আলী লস্কর নিজেও না।

তোরাব আলী লস্করের অনুমতি ছাড়া এই ধরনের ঘটনা ভয়াবহ শাস্তিযোগ্য অপরাধ। কিন্তু আজকের এই ঘটনায় সেই নিয়মের আর কানাকড়ি মূল্যও যেন কারো কাছে নেই। সকলেই এখন জোহরার বীরত্ব বন্দনায় মুগ্ধ। মোকাররম এবং বাহাদুরকে মুক্ত দেখে তোরাব আলী লস্করও আনন্দিত। জোহরার জন্য এক ধরনের প্রবল আনন্দমিশ্রিত গর্বও তার হচ্ছে। কিন্তু তিনি জানেন, এর ফলে এই চরে প্রচলিত বহু বছরের নিয়ম-কানুনের শৃঙ্খলটা হঠাৎ করেই ভেঙে যেতে পারে। এবং সেটি হলে তার ফল হবে ভয়াবহ। কিন্তু এই মুহূর্তে সবার আস্থা ধরে রাখতে তাকে কিছু না কিছু করতেই হবে। কিন্তু কী করবেন তিনি?

তোরাব আলী লস্কর হাত তুলে সবাইকে থামতে ইশারা করলেন। তারপর শান্ত, স্থির ভঙ্গিতে বললেন, 'জোহরা, হানিফ আর হামিদুল যেইটা করছে, সেইটা আমাদের সবার জন্য একটা বিরাট ঘটনা।'

New Pdf download: www.PoragEducation.com + webtalkbd.com

তার কথা শেষ হবার আগেই উপস্থিত চরবাসী তুমুল উল্লাসে শেষ রাতের নিস্তব্ধতা ভেঙে দিলো। তোরাব আলী লস্কর বললেন, 'চরে বহুদিন কোনো উৎসব হয় না। আইজ রাইতে উৎসব হইবো। মোকাররম আর বাহাদুর ফিরা আসছে এই জইন্য উৎসব হইবো। হানিফ, জোহরার জইন্যও উৎসব হইবো। ভালো খানাপিনা হইবো। কী সবাই খুশিতো?'

উপস্থিত জনতা আবারো তুমুল উল্লাসে মেতে উঠলো। তাদের উল্লাস ধ্বনির মধ্যেই তিনি তার বড় ছেলে আয়নাল হককে ডেকে বললেন খাসির ব্যবস্থা করতে। কিন্তু জালালুদ্দিন তাকে ছাড়লেন না। জনতার কোলাহল স্তিমিত হয়ে আসতেই তিনি কম্পমান শরীরে উঠে দাঁড়ালেন। তারপর শক্ত গলায় বললেন, 'আজাহার খন্দকারের কোনো ব্যবস্থা হইবো না?'

তোরাব আলী লস্কর দীর্ঘসময় কোন কথা বললেন না। তিনি নিস্পলক চোখে তাকিয়ে রইলেন তার পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলির দিকে। তিনি জানেন পুরো উঠোনভর্তি মানুষ তার দিকে তাকিয়ে আছে। তার একটা কথার ওপর নির্ভর করছে অনেক কিছুই। তোরাব আলী লস্কর হঠাৎ আবিষ্কার করলেন একটা ভয়াবহ বুনো ক্রোধ ক্রমশই তার শরীর-মন গ্রাস করে নিচ্ছে। প্রচণ্ড রাগ, ক্ষোভ আর প্রতিশোধের নেশায় রক্ত টগবগ করে উঠছে। আজাহার খন্দকারের প্রতি হিংস্র এক আক্রোশে তিনি থরথর করে কাঁপছেন। তিনি ধীরে উঠে দাঁড়ালেন। তারপর চোয়ালবদ্ধ প্রতিজ্ঞায় ঘোষণা করলেন, 'আজাহার খোনকারের জীবন যদি আমি জাহান্নাম না করছি, তয় আমি তোরাব আলী এক বাপের জন্ম না।'

সেই রাতে জোহরার সাথে আর তোরাব আলী লস্করের কথা হলো না। প্রচণ্ড মানসিক ও শারীরিক পরিশ্রমে ক্লান্ত জোহরা পরদিনও মরার মতো ঘুমালো। তার ঘুম ভাঙলো সন্ধ্যায়। বাইরে তখন উৎসব আয়োজনের তুমুল হৈ-হট্টগোল। কিন্তু চোখ মেলে তাকাতেই জোহরা দেখলো সন্ধ্যার আধো আলোতে তোরাব আলী লস্কর চুপচাপ তার বিছানার পাশে বসে আছেন। তার হাতে একখানা তালপাখা। তিনি সেই পাখা দিয়ে জোহরাকে বাতাস করছেন। জোহরা আড়মোড়া ভাঙতে ভাঙতে ঘুম জড়ানো গলায় বললো, 'তুমি আমার ওপর রাগ করেছো দাদাজান?'

তোরাব আলী লস্কার ডানে-বাঁয়ে মাথা নাড়লেন। জোহরা উঠে বসতে বসতে বললো, 'তাইলে কি খুশি?'

তোরাব আলী লস্কর এবারো কথা বললেন না। তবে হাত বাড়িয়ে আলতো করে জোহরার মুখের ওপর এলোমেলো পড়ে থাকা চুলগুলো সরিয়ে দিলেন। জোহরা বললো, 'খুশিও না, বেজারও না। তাইলে কী?'

তোরাব আলী লস্কর এবার কথা বললেন, 'আমি যে কত রাইত ঠিক মতোন ঘুমাই না জানোস?'

'হুম, জানি।'

'ক্যান ঘুমাই না?'

'বাপজানের জইন্য।'

'আমার খালি সারাক্ষণ মনে হয়, ওই বুঝি ফয়জুল আইলো। আইসা আমারে ডাক দিলো। আর তহন যদি আমারে না পায়? এই জইন্য রাইতের পর রাইত আমি ঘুমাইতে পারি না। কোনো একটা শব্দ হুনলেই বুকটা ছ্যাঁৎ কইরা ওঠে, মনে হয় আমার বাজানে নি আইছে!'

জোহরা তার দাদাজানের হাতখানা হাতের মুঠোয় নিয়ে নিলো। তারপর বললো, 'তোমারে মাঝে-মইধ্যে দেখলে কি মনে হয় জানো দাদাজান?'

'কী?'

'মনে হয় এইহানে তোমার ভুল কইরা জন্ম হইছিলো। তোমার জন্ম হওনের কাম আছিলো টাউনে, কোনো শিক্ষিত, ভালো ঘরে।'

তোরাব আলী লস্কর মৃদু হাসলেন, 'বাপ ডাকাইত হোউক, খুনি হোউক, দুইন্যার সবচাইতে খারাপ মানুষ হোউক, নিজের পোলা-মাইয়ার কাছে সেতো বাপই। পোলা মাইয়ার কাছে বাপ-মা কেমন, এইডা দিয়া সে মানুষটা কেমন, সেই বিবেচনা করন যায় নাগো বু।'

তোরাব আলী লস্কর থামলেও জোহরা কথা বললো না। সে তার দাদাজানের স্থির চোখের দিকে তাকিয়ে রইলো। তোরাব আলী উঠে গিয়ে হারিকেনের আলোটা বাড়িয়ে দিলেন। তারপর জোহরার কাছে এসে বসতে বসতে বললেন, 'তোরে আমি একখান কথা বলবো, কথাটা তোর রাখতে হইবো।'

'কী কথা দাদাজান?'

'আগে বল, কথাখান রাখবি?'

'তুমি না বললে কেমনে বুঝবো যে রাখতে পারবো কিনা? এখন তুমি যদি কও যে আসমানের চাঁদ বা তোমার রূপবানরে আইনা তোমারে দিতে হইবো, তাইলে কী রাখতে পারবো?'

জোহরা ভেবেছিলো তোরাব আলী লস্কর হাসবেন। কিন্তু তিনি হাসলেন না। গম্ভীর গলায় বললেন, 'তুই আর এইসব জিনিসের মইধ্যে জড়াবি না।'

'কোন সব জিনিস?'

'এই আমাগো কাম কাইজের মইধ্যে। তুই মাইয়া মানুষ। মাইয়া মানুষের মতোন ঘরে থাকবি।'

'ঘরেইতো থাহি। এই যে দ্যাহো, এহনও ঘরেই আছি। মাথার ওপরে চাইয়া দ্যাহো টিনের চাল।'

'না থাহস না। তোর বাইল চাইলও ভালো না।'

'কী করলাম আমি? কারো লগে প্রেম পিরিতিতো করি নাই।'

'শোন, তোরে আমি এইহানে রাখবো না। ভালো ঘরে বিয়া দেবো। এই চরে বিয়া দেবো না। আমার এক দোস্ত আছে, ফরিদপুর থাহে। তারে আমি বইলা রাখছি, ভালো একখান পোলা পাইলেই সেইহানে আমি তোর বিয়া দেবো। একটু পড়ালেহা জানা পোলা হইলে ভালো। না জানলেও ক্ষতি নাই। তয় পাত্রপক্ষের কেউ জানবো না যে তোর জন্ম এইইহানে।'

'কী কও তুমি এইগুলা?'

New Pdf download: www.PoragEducation.com + webtalkbd.com

'ঠিকই কই। আমার সব ব্যবস্থা করা আছে। এহন একটা ভালো পোলার ব্যাপার। তারা জানবো তুই আমার দোস্তের নাতিন। ছোটবেলায় বাপ-মা মারা গেছিলো।'

'ক্যামনে মারা গেছিলো? লস্কর চরের ডাকাইতগো হাতে খুন হইছিলো?' জোহরা হঠাৎ হা হা হা করে হেসে উঠলো।

তোরাব আলী লস্কর বললেন, 'তোর ভাব ভঙ্গি আমার সুবিধার লাগতেছে না জোহরা। তুই এমন করিস না। তুই জানি কেমন কইরা চাস, কেমন কইরা হাসোস। এই বিষয়টা আমার ভাল্লাগে না।'

'তাইলে কি মিষ্টি কইরা হাসবো? কোনো মিষ্টির মতোন হাসবো কও দাদাজান? চমচম, না রসগোল্লা? আমি কিন্তু সবই পারি।'

তোরাব আলী লস্কর জোহরার কথায় কান দিলেন না। তিনি গম্ভীর গলায় বললেন, 'আমি চাই না, তোর পোলা মাইয়াও এইহানে বড় হোউক। তাগোও এই জীবন হোউক। তোর বাপ নাই, মা নাই। আমিও দুই দিন বাদে থাকবো না। তারপর যারা থাকবো, তাগো দিনও যাইবো হয় অন্যরে মারো, না হয় নিজে মরো এই চিন্তা করতে করতে, এইটা আমি চাই না।'

জোহরার হাসি থামছে না। সে হাসতে হাসতেই বললো, 'তুমি কী আগে কহনো যাত্রাপালায় অভিনয় করতা নাকি দাদাজান? তোমার কথা শুইনা মনে হইতেছে তুমি যাত্রাপালার ডায়লগ দিতাছো। একবার আয়নাল কাকুর লগে আলীপুর বাজারে গিয়া যাত্রাপালা দেখছিলাম। এক্কেবারে তোমার মতো ডায়লগ দেয়। হাঃ হাঃ হাঃ।'

হাসতে হাসতে জোহরার দম আটকে যাওয়ার অবস্থা হলো। তোরাব আলী তাও বেপরোয়া ভঙ্গিতে বললো, 'এইহানে তোর জন্ম হইছে ভুলে। আয়নায় নিজের চেহারাটা চাইয়া দেখছোস? এইহানে তোর জন্ম হওনের কথা আছিলো না!'

'তোমারও না। তোমার জন্ম হওনের কথা আছিলো কলেজের ছারেগো ঘরে। হা হা হা।' জোহরার হাসি থামছেই না।

তোরাব আলী লস্কর বললেন, 'এইহানে তোরে আমি কার কাছে বিয়া দেবো?'

'ক্যান, হানিফ ভাইর লগে। দেহো না কেমনে চাইয়া থাহে। আর দামড়া গরুর মতোন সারাক্ষণ পিছে পিছে শিং উঁচাইয়া ঘোরে।'

তোরাব আলী আর কথা বাড়ালেন না। তিনি বুঝতে পেরেছেন, এই মুহূর্তে জোহরাকে আর কিছু বলেই লাভ নেই। সে চলে তার নিজের খেয়াল খুশি মতো। বরং অন্য কোনো সময়ে আবার তাকে বোঝানোর চেষ্টা করা যাবে। জোহরা তখনো হাসছে। তোরাব আলী লস্কর আর তার সেই হাসির দিকে তাকালেন না। তার কেন যেন মনে হচ্ছে, এই মেয়েটিকে তিনি ভেতরে ভেতরে ভয় পান।

ভাদ্র মাসের শেষের দিকে এসে শরৎকাল যুবতী হয়ে উঠেছে। নদীর দুই ধারে শুভ্র কাশফুলের মেলা। ফুরফুরে হাওয়ায় সেই কাশফুলের বনে উথাল-পাথাল ঢেউ লেগেছে। ভরভরন্ত নদীর বুকে ছলাৎ ছলাৎ শব্দ। কণার বুকেও। তার সামনে বসে আছে মনসুর। কিন্তু সে মনসুরের দিকে তাকাতে পারছে না। তার লজ্জা যেমন করছে। ভয়ও। কেউ যদি এখানে তাকে মনসুরের সাথে দেখে ফেলে তবে কেলেঙ্কারি হয়ে যাবে। বিকেলের চুরি যাওয়া আলোয় মনসুর তার সামনে বসে আছে। গতকাল রাতে মনসুর আর তার সাথে দেখা করতে আসতে পারেনি। কণা সারারাত জেগে ছিলো। গভীর নিস্তব্ধ রাতে একটা পাতা পড়ার শব্দ, একটা ঝিঁঝি পোকার ডাক, ছুটে যাওয়া একটা ইঁদুরের পায়ের শব্দেও সে উৎকর্ণ হয়ে ছিলো। এই বুঝি মনসুর এলো! কিন্তু মনসুর আসে নি। সম্ভবত তার জীবনের দীর্ঘতম রাতটা কাল কাটিয়েছে কণা। খুব অভিমান হয়েছিলো তার। তবে অভিমান বেশিক্ষণ থাকেনি। তার জায়াগায় দ্রুতই গেড়ে বসেছিলো দুশ্চিন্তা। আচ্ছা, মনসুরের কিছু হয়নিতো! তারপর সারাটা দিন কেটেছে রুদ্ধশ্বাস অপেক্ষায়। অপেক্ষা ফুরিয়েছে বিকেলে। জসিম গিয়ে তাকে বাড়ি থেকে নিয়ে এসেছে।

মনসুর কোনো ভনিতা না করে সরাসরি বললো, 'তোমার কাছে আমার একটা শব্দ পাওনা আছে।'

কণার খুব অভিমান হচ্ছিলো। সে ভেবেছিলো প্রথমে কিছুতেই সে মনসুরের সাথে কথা বলবে না। যতক্ষণ না মনসুর তার রাগ ভাঙানোর জন্য বিশেষ কিছু করে! কিন্তু মনসুরের কথা শুনে সে আর তার কৌতূহল আটকে রাখতে পারলো না। একরকম মুখ ফসকেই সে বলে ফেললো, 'শব্দ!'

New Pdf download: www.PoragEducation.com + webtalkbd.com

'হুম।'

'কী শব্দ?'

'তুমি।'

'তুমি?'

'হুম, তুমি আমাকে এখনো তুমি করে ডাকো নি।'

'আপনাকে আমি তুমি করে কেন ডাকবো?'

'কারণ এই যুগে কোন স্ত্রী তার স্বামীকে আপনি করে ডাকে না।'

কণা রীতিমতো হতভম্ব হয়ে গেলো। সে কী বলবে ভেবে পেলো না। মনসুরই আবার বললো, 'এটাকে বলে শব্দঋণ। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে আর যেকোনো ঋণ থাকতে পারে, কিন্তু শব্দ ঋণ থাকতে পারে না।'

'মানে?'

'মানে তারা দুজন দুজনকে জগতের সকল কথা বলতে পারে। ভালোবেসে পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দরতম কথা। আবার ঝগড়া করে পৃথিবীর সবচেয়ে অসুন্দরতম কথা। এর কারণ কী জানো?'

কণা চোখ তুলে তাকায়। কিন্তু কথা বলে না। মনসুর বলে, 'এর কারণ জগতে এই দুজন মানুষের মধ্যে কোনো আড়াল থাকে না। আর সবার মধ্যে আড়াল থাকে।'

মনসুরের যুক্তি কণার পছন্দ হচ্ছে না। খুবই জঘন্য যুক্তি বলে মনে হচ্ছে। স্বামী-স্ত্রী কেন পরস্পরের সাথে ঝগড়া করলে পৃথিবীর সবচেয়ে অসুন্দর কথা বলবে? কথাটা ভাবতে গিয়েও কণার আচমকা মনে পড়লো, আপাতদৃষ্টিতে নিরীহ, শিক্ষিত, ভদ্র, স্কুল শিক্ষক তার বাবা আর সহজ-সরল মাকেও পরস্পরের সাথে ঝগড়া করতে গিয়ে ভয়াবহ সব কথা বলতে সে শুনেছে। তবে এটিও সত্য যে সেই ভয়ংকর ঝগড়ার সময়ে প্রতিবারই সে ভেবেছে, নিজের জীবনে এমন ঘটনা সে কখনোই ঘটাবে না। মরে গেলেও না।

মনসুর আবারো বললো, 'এখন আর স্ত্রীরা স্বামীদেরকে আপনি করে ডাকে না। তুমি করে ডাকে। তুমি কী আমাকে তুমি করে ডাকবে?'

কণা এবারেও জবাব দিলো না। মনসুরের কথার মাথামুণ্ডু সে কিছুই বুঝতে পারছে না। কিন্তু এখন তার কেন যেন খুব লজ্জা লাগছে। সে অনর্থক একটা ঘাসের ডগা তার বা হাতের আঙুলে পেঁচিয়ে টেনে টেনে উপড়ে ফেলেলো। তারপর সেই উপড়ে ফেলা ঘাসের ডগাটা তার সামনের দাঁতে টুকরো টুকরো করে কাটতে লাগলো। মনসুর খানিকটা কাছে সরে আসতেই কণা বললো, 'আমাকে যেতে হবে। সন্ধ্যা হয়ে আসছে।'

'তাহলে তুমিটা হয়ে যাক?'

কণা এবার খানিক দৃঢ় গলায় বললো, 'কী হয়েছে আমাকে বলবেন?'

মনসুর বিয়েসংক্রান্ত ঘটনা খুলে বললো। তার বাবা আজাহার খন্দকার যত দ্রুত সম্ভব কণার সাথে তার বিয়েটা সেরে ফেলতে চাইছেন। তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে

কথা বলতে লোকও পাঠাতে চান। তবে সবার আগে কণার বাবা-মায়ের ভাবনাটা জানতে চান তিনি। সরাসরি বিয়ের প্রস্তাব পাঠিয়ে প্রত্যাখ্যাত হওয়ার মতো লোক নন আজাহার খন্দকার। সব শুনে কণা কী বলবে ভেবে পেলো না। সে দীর্ঘ সময়ে অকারণ তাকিয়ে রইলো নদীর উল্টোদিকের বিস্তৃত ধান ক্ষেতের দিকে। সেখানে সারি সারি বক উড়ে যাচ্ছে। মনসুর বললো, 'কিছু বলবে না? বাবা বলেছেন যত দ্রুতসম্ভব তোমার বাবা-মাকে জানাতে। তোমাকে দেখার জন্য অস্থির হয়ে আছেন বাবা। তুমি কী জানো, আমার বাবা হলেন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম বাবা?'

কী বলবে কণা? তার আচমকা মনে হলো কোথাও একটা বকুল ফুলের গাছ সুবাস ছড়াচ্ছে। সেই সুবাস হাওয়ায় ভেসে ভেসে তাকে জড়িয়ে নিচ্ছে। সে ক্রমশই ডুবে যাচ্ছে এক অদ্ভুত সুবাসিত ঘোরে। কিন্তু সেই ঘোর কেটে যাওয়ার ভয়ে সুবাসটুকু সে ইচ্ছে মতো বুক ভরে নিতে পারছে না। তার ভয় হচ্ছে, মা-বাবা যদি রাজি না হন? তা ছাড়া সামনে তার পরীক্ষা। বাবা কিছুতেই এই বিয়েতে রাজি হবে না। আর অত দূরে বলে, মা-তো সরাসরি না করেই দিয়েছেন। তাহলে?

কণা সেই সারাটা রাত ভাবলো। তার পরদিনও। কতকিছু যে ভাবলো সে। কিন্তু একটা বিষয়ে সে স্পষ্ট, মনসুরকে ছাড়া সে থাকতে পারবে না। কোনোভাবেই না। এই মানুষটা কখনো কখনো খুব উদ্ভট, কেমন বিরক্তিকর, কখনো কখনো খুব হ্যাংলা, বাচাল, গায়ে পড়া স্বভাবের। কিন্তু তারপরও এই মানুষটিকেই তার চাই। যেভাবেই হোক। কিন্তু সে বাবা-মাকে কী করে বলবে? ওদিকে মনসুর অপেক্ষায় আছে। কণার সবুজ সংকেত পেলেই সে বাবাকে বলবে আনুষ্ঠানিকভাবে লোক পাঠাতে। কিন্তু কণার সাহস হলো না মাকে এই কথা বলার। সে বললো বাবাকে, 'বাবা।'

'হুম?' দেলোয়ার হোসেন স্কুলের পরীক্ষার খাতা দেখছিলেন। কণা মাঝে মাঝে তাকে খাতা দেখতে সাহায্য করে। সে বললো, 'আমি তোমার খাতা দেখে দেই বাবা?'

দেলোয়ার হোসেন অবাক চোখে কণার দিকে তাকালেন। তারপর বললেন, 'তুই! তুই দিবি আমার পরীক্ষার খাতা দেখে?'

'হু।'

তিনি তার চোখ থেকে চশমাটা খুলতে খুলতে বললেন, 'আজ হঠাৎ নিজ থেকে খাতা দেখে দিতে চাইছিস, ঘটনা কী?'

'ঘটনা কিছুনা বাবা। তুমি এই যে সারা দিন-রাত এত এত খাতা দেখো, আমার ভালো লাগে না।'

'কিন্তু তোরতো সামনে পরীক্ষা।'

'হোক পরীক্ষা। সারাদিন এত পরীক্ষা পরীক্ষা করে কী হবে?'

'কী হবে মানে? তোর আইএ পরীক্ষার রেজাল্ট কিন্তু খুব জরুরি। এরপর তোকে আমি ঢাকায় নিয়ে যাবো। তুই পড়াশোনা করবি ঢাকায়।'

New Pdf download: www.PoragEducation.com + webtalkbd.com

'আচ্ছা বাবা, আমাকে যদি তুমি ঢাকায় নিয়ে ভর্তি করাও, তখন তোমার খারাপ লাগবে না?'

'খারাপ লাগবে কেন?'

'লাগবে না? আমি তোমার একটামাত্র মেয়ে! আমি তোমার কাছ থেকে এত দূরে চলে যাবো। দু-চার মাসে একবারও বাড়ি আসতে পারবো না। তখন আমাকে না দেখে থাকতে তোমার খারাপ লাগবে না?'

'লাগবে। তবে ছেলে-মেয়ে বড় হলে দূরে চলে যাবে, এটাইতো নিয়ম। তোকে বিয়ে দিলে তুই শ্বশুরবাড়ি যাবি না? তখন কি তোকে আমি আটকে রাখতে পারবো?'

কণা সাথে সাথেই জবাব দিলো না। চুপ করে রইলো। দেলোয়ার হোসেন বললেন, 'তোর ঘটনা কী বলতো? তুই কী ঢাকায় পড়তে যেতে চাস না?'

'মা কি যেতে দেবে বাবা?'

'এইটা একটা চিন্তার বিষয়। তোর মাকে নিয়ে খুব ঝামেলা হয়ে যাবে। সেতো তোকে ছাড়া এক মুহূর্তও থাকতে পারবে না।'

'তাহলে বাবা? তখন কী করবে?'

'তোর মাকে বোঝাতে হবে। তুইও বোঝাবি।'

'আমি বোঝালে হবে না বাবা। তোমাকে বোঝাতে হবে।'

'হুম।' দেলোয়ার হোসেন সামান্য গম্ভীর হয়ে গেলেন। তারপর আবার সাথে সাথেই বললেন, 'সে দেখা যাবে। এখনো অনেক দেরি। ওসব নিয়ে এখন না ভেবে ক্লাস পরীক্ষার দিকে মন দে'

'কীভাবে দেবো বাবা?'

'কেন?'

'প্রতিদিন একটা না একটা অনুষ্ঠানতো লেগেই আছে।'

'কীসের অনুষ্ঠান?'

কণা তার গলায় আরোপিত বিরক্তি ঢেলে বললো, 'আমাদের ক্লাসের সব মেয়েদেরতো বিয়ে হয়ে যাচ্ছে বাবা। আজ এর বিয়েতো, কাল ওর বিয়ে। আর ক্লাসমেটদের বিয়ে হলে না গিয়েওতো উপায় নেই।'

'হুম, শুনলাম।' দেলোয়ার হোসেন গম্ভীর হয়ে গেলেন, 'তোদের কলেজের ছাইদুল স্যারের মেয়েরও নাকি বিয়ে হয়ে গেছে? বাচ্চা বাচ্চা মেয়েগুলোকে দুমদাম বিয়ে দিয়ে দিচ্ছে। কী একটা অবস্থা!' দেলোয়ার হোসেনের কণ্ঠে স্পষ্ট হতাশা। কিন্তু তার কথা শেষ হবার সাথে সাথেই শাহিনা বেগমের গলা শোনা গেলো, 'বাচ্চা, না বাচ্চা? কয় বছর বয়সে আমি তোমার ঘরে আসছি, সেই খেয়াল তোমার আছে? আর এই বয়সে মাইয়াগুলার বিয়া না দিলে কোন বয়সে দিবো? বুড়ি হইলে? তহন বিয়াই হইবো না। এইটাই হইলো মাইয়া মাইনসের বিয়ার আসল বয়স। আর সবার বাপরা তাদের মাইয়া নিয়া চিন্তা করে, তারাতো আর তোমার মতো না!'

শাহিনা বেগম কখন ঘরে ঢুকেছেন তা বাবা-মেয়ে কেউই খেয়াল করেনি। তিনি শাড়ির আঁচলে ভেজা হাত মুছতে মুছতে আবার বললেন, 'তোমার কপালে খারাবি আছে, এইটা আমি বইলা রাখলাম। মাইয়া পড়াইয়া জজ ব্যারিস্টার বানাইবা, কিন্তু তহন দেখবা বিয়ার বয়স নাই। পোলা পাইতেছো না। মাইয়া মাইনষের বয়স হইলো কচু পাতার পানি। এই টলটলা, দেখতে ভালো, পরক্ষণেই নাই। এইটা বোঝনের ক্ষমতা তোমার আছে?'

দেলোয়ার হোসেন হাসলেন, 'তাহলে কী, মেয়ে পড়াশোনা করাবে না?'

'পড়াশুনা কইরা কী হইবো? সেইতো চুলা ঠেলা লাগবো। বাচ্চাকাচ্চা মানুষ করন লাগবো। তা সে তুমি জজ ব্যারিস্টার বানাও আর আমার মতো পোড়া কপালিই বানাও।'

'তোমার কপাল পোড়া নকি? কই দেখি?'

শাহিনা বেগম এবার তেলে- বেগুনে জ্বলে উঠলেন, 'আমি তামাশার বিষয়, না? তোমাগো বাপ-ঝি'র কাছে আমি তামশার বিষয়? হ, তামশার বিষয়ইতো!'

কণা তার মায়ের হাত ধরে পাশে বসালো। তারপর বললো, 'তুমি শুধু শুধু রাগ করছো মা। বাবাতো তোমার সাথে মজা করছিলো!'

'হুম। মজাইতো করবো। মানুষ মজা করে তুচ্ছ মানুষের লগে। আমিতো তুচ্ছই। তো তুচ্ছ হইলেও, কথায় আছে না, গরিবের কথা বাসী হইলে ফলে। এইটা তোমরা দুজন মনে রাইখো। আমার কথা বাসী হইলে ফলবো।'

সামান্য থেমে স্বামীকে উদ্দেশ্য করে তিনি আবার সাথে সাথেই বললেন, 'এই যে তার ক্লাসের সবগুলা মাইয়ার বিয়া হইয়া যাইতেছে, এই খেয়াল আছে? দুইদিন পর তাদের ঘর-সংসার হইবো, বাচ্চা কাচ্চা হইবো। তহন সবাই বলবো, এই মাইয়ার বয়স কত? তার সাথের সবাইর এত বড় বাচ্চা, আর এর এহনো বিয়াই হয় নাই? তহন বাপ-ঝি আইএ, বিএ পাশ আর সার্টিফিকেট ধুইয়া পানি খাইও।'

বাবা-মায়ের সামনে এই আলোচনায় থাকতে অস্বস্তি হচ্ছে কণার। কিন্তু সে উঠতেও পারছে না। তা ছাড়া, তার এইটুকু জীবনের সবচেয়ে দুঃসাহসী কাজটা আজ তাকে করতেই হবে। দেলোয়ার হোসেন বললেন, 'এই যে এত বিয়ে বিয়ে করছো, তো মেয়ে বিয়ে দিলে তাকে ছাড়া থাকতে পারবে তুমি?'

'পারবো না ক্যান? দুনিয়ার সব মা পারলে আমিও পারবো। আর মাইয়াতো আমি দূরে কোথাও বিয়া দিবো না, বিয়া দিবো কাছে। আর দরকার পড়লে ঘর জামাই রাখবো। এমনতো না যে আমাগো দশটা-পাঁচটা পোলাপান!'

দেলোয়ার হোসেন হাসলেন। শাহিনা বেগম রাগে গজগজ করতে করতে আবার রান্নাঘরের দিকে উঠে গেলেন। দেলোয়ার হোসেন বললেন, 'কী বুঝলি? তোর ঢাকায় ভর্তি নিয়ে মনে হচ্ছে মহা ঝামেলা হবে!'

কণা কথা বললো না। দেলোয়ার হোসেনই আবার বললেন, 'কী যে করি! সবচেয়ে ভালো হতো যদি ভালো একটা ছেলে পাওয়া যেতো। যে বিয়ের পরও তোকে পড়াবে।'

New Pdf download: www.PoragEducation.com + webtalkbd.com

কণার এবার সত্যি সত্যিই খুব লজ্জা লাগতে লাগলো। সে বাবার সাথে যতই সপ্রতিভ হোক, নিজের বিয়ে নিয়ে কথা শুনতে কেমন আড়ষ্ট লাগছে।

দেলোয়ার হোসেন বললেন, 'তুই তাহলে খাতাগুলো দেখ। আমি একটু বাজার থেকে ঘুরে আসি।'

কণা হঠাৎ মৃদু গলায় বাবাকে ডাকলো, 'বাবা!'

'হুম, বল?'

'আমি যদি কখনো বড় কোনো অন্যায় করে ফেলি, তুমি তাহলে খুব কষ্ট পাবে তাইনা বাবা?'

'কী অন্যায়?'

'বড় কোনো অন্যায়।'

'আমার মেয়ে যে বড় কোন অন্যায় করবে না, সে ব্যাপারে আমি নিশ্চিত।'

'তারপরও হতে পারে না বাবা? সবসময় কী মানুষের নিজের ওপরে নিয়ন্ত্রণ থাকে?'

'তা থাকে না। তবে যে বোঝে যে সে যেটা করছে সেটা অন্যায়, সে যদি ভালো মানুষ হয়, তাহলে তখন আর তার সেটা করার কথা না। আমার মেয়ে যে ভালো মানুষ তাতো আমি জানিই।'

'কিন্তু বাবা...।' কণা কিছু বলতে গিয়েও আচমকা থেমে গেলো। দেলোয়ার হোসেন আলনা থেকে তার বাইরে বের হবার জামাটা গায়ে পরছিলেন। কিন্তু কণার কথা বলার ধরনে তিনিও থমকে গেলেন। দু হাতে পরা জামার হাতাগুলো আবার খুলতে খুলতে কণার দিকে এগিয়ে গেলেন। তারপর তার মাথায় আলতো হাত রেখে বললেন, 'কী হয়েছে?'

কণা কথা বললো না। সে পাথরের মতো শক্ত, নিস্পন্দন, স্থির হয়ে পরীক্ষার খাতাগুলোর দিকে তাকিয়ে আছে। যেন জগতের দর্শনীয় সকল বস্তু ওই খাতার বুকে সেঁটে আছে। ফলে সে খাতা থেকে চোখ ফেরাতে পারছে না। কিন্তু কণা আসলে কিছুই দেখছে না। তার বুকের ভেতরটা হঠাৎ তোলপাড় করতে লাগলো। মনে হতে লাগলো, অজানা কোনো এক নদীতে মুহূর্তেই যেন তুমুল বান ডেকেছে। সেই বানের ঢেউ ওলটপালট করে দিচ্ছে বুকের একূল-ওকূল। দেলোয়ার হোসেন মেয়ের চিবুকে হাত রেখে তার মুখ সামান্য উঁচু করলেন। কণার চোখের কোনায় জল। দেলোয়ার হোসেন রীতিমতো ধাক্কা খেলেন। তিনি জামাটা একপাশে রেখে দু হাতে কণার মুখ তুলে ধরলেন, 'কী হয়েছে মা?'

কণা আচমকা সমূলে উপড়ে পড়া গাছের মতো বাবার কোলে লুটিয়ে পড়লো। সে তার বাবাকে দু হাতে জড়িয়ে ধরে হাউমাউ করে কাঁদতে লাগলো। সেই কান্না কত কত না বলা কথা বলে দিলো। কত কত পাথর কঠিন বাধা গলিয়ে দিলো। কত কত জটিল হিসেব সহজ করে দিলো। তা কেবল জানলো কণা একা।

কণা কিছু বলতে গিয়েও আচমকা থেমে গেলো। তারপর চুপচাপ আবার খাতা দেখতে লাগলো। তার বাবা বসে রইলো পাশে। দুজন মানুষ অনেকটা সময় নির্বাক বসে রইলো। একটা কেমন অনির্বচনীয় নীরবতা নেমে এলো দুজনের মাঝে।

নীরবতা ভাঙলেন দেলোয়ার হোসেনই, 'তুই কী কিছু বলতে চাস?'

কণা যেন চমকালো, 'নাতো বাবা! কী বলবো?'

দেলোয়ার হোসেন আলতো করে মেয়ের মাথায় হাত রাখলেন। তারপর বললেন, 'কিছু একটাতো বলতে চাসই। বলে ফেল।'

'বাবা!' কণা নিজেকে সামলে নেয়ার চেষ্টায় ঈষৎ আরক্ত হলো, 'কী বলবো?'

'মনসুরের কথা।'

কণার মনে হলো এই এতটা দিন প্রগাঢ় যত্নে আড়াল করে রাখা তার সকল গোপন যে এমন প্রকাশ্য হয়েছিলো তার কিছুই সে কখনো ঘুণাক্ষরেও টের পায়নি। ঠিক এই মুহূর্তে একটা গভীর-নিগুঢ় লুকানোর জায়গা তার খুব দরকার। বাবা কী করে এমন সহজে তাকে পড়ে ফেলতে পারলো!

দেলোয়ার হোসেন বললেন, 'ছেলেটাকে আমার পছন্দ। কিন্তু তোর মা? তাকেতো কোনভাবেই বোঝানো যাবে না, ওই অতটা দূর...!'

কণার মনে হচ্ছে সে যদি এই মুহূর্তে অদৃশ্য হয়ে যেতে পারতো, তাহলে সবচেয়ে ভালো হতো। লজ্জায়, জড়তায় সে আড়ষ্ট হয়ে রইলো। এই এত দ্বিধার, এত সঙ্কোচ ও শঙ্কার বিষয়টিকে বাবা এত সহজ করে বুঝে ফেলবে তা সে ভাবতেই পারেনি। দেলোয়ার হোসের শান্ত কণ্ঠে বললেন, 'মেয়ে বড় হলে তাকে বিয়ে দিতে হবে, এটুকু কী বুঝি না! বুঝি। বাবা হিসেবে আমারো দুশ্চিন্তা হয়। কিন্তু আমি চাইছিলাম আমার মেয়ে পড়াশোনাটা করুক।'

একটু থেমে, কণাকে সামলে নেবার খানিক সময় দিয়ে তিনি আবার বললেন, 'মনসুর ছেলে হিসেবে ভালো। আমি জসিমের কাছে খোঁজখবর নিয়েছি। তা ছাড়া শিক্ষিত ছেলে, ঢাকায় থাকে। তোর পড়াশোনাটা যদি কেউ চালিয়ে নিতে চায়, তবে তার চেয়ে ভালো পাত্র আর হয় না। আর দুজন একই সাথে থাকলে আমাদের দুশ্চিন্তাটাও একটু কমবে।'

কণার কান দিয়ে যেন গরম ভাপ বের হচ্ছে। সে আরো ঝুঁকে প্রায় খাতার সাথে মুখ লুকিয়ে ফেললো। আর কোথায় লুকাবে সে! দেলোয়ার হোসেন বললেন, 'তোর মা'র সব কথা যে ভুল, তা কিন্তু না। আমাদের দেশে এখনো মেয়ে বড় হলে নিজেদের চেয়ে চারপাশের মানুষের কথা বেশি চিন্তা করতে হয়। মেয়ের ভবিষ্যৎ ভাবতে হয়। আমি যে এসব বুঝি না তাতো নয়। কিন্তু তোর পড়াশোনার ক্ষতি হোক, এটা আমি মেনে নিতে পারছিলাম না। আমি খুব করে চাইছিলাম, এমন একটা ছেলে যদি পাওয়া যেতো, যে বিয়ের পরও তোর পড়াশোনাটা চালিয়ে নেবে। আমার বিশ্বাস মনসুরের এতে আপত্তি থাকবে না! এখন সমস্যা হচ্ছে তোর মা। তাকে কে বোঝাবে!'

New Pdf download: www.PoragEducation.com + webtalkbd.com

শাহিনা বেগমকে বোঝালেন কণার বড় চাচি। মনসুরের চেয়ে ভালো পাত্র পাওয়াটা যে প্রায় অসম্ভব, এ কথা শেষ পর্যন্ত তিনি মেনে নিতে একপ্রকার বাধ্যই হলেন। কণার কাছে পুরো বিষয়টা মনে হচ্ছে স্বপ্নে মতো। কিংবা স্বপ্নেও সে এমন করে সবকিছু ভাবতে পারতো না। কিন্তু সমস্যা হলো যখন মতি মিয়া বিয়ের কথাবার্তা পাকা করতে এলো তখন। তার সাথে এসেছে মনসুরের বড় খালা আর খালু। মনসুরের বড় খালা কর্তৃত্বপরায়ণা নারী। তিনি বললেন, 'মাইয়ার গায়ের রংতো ময়লা।'

তার কথায় উপস্থিত সকলেই খানিক অপ্রস্তুত বোধ করলো। কণা দেখতে মোটেই ময়লা রঙের নয়। তার চেয়েও বড় কথা বিয়ের সব কথাইতো পাকা। এখন এসে এসব বলার অর্থ কী! তিনি অবশ্য এতেও থেমে থাকলেন না। পরের কথাটা আরো ভয়ংকর। তিনি বললেন, 'গায়েতো গোস্ত বলতে কিছু নাই। দুই বাচ্চা হওনের লগে লগে আর এই মাইয়া খুঁইজা পাওন যাইবো না। খোনকার বংশ নবীগঞ্জের যেই সেই বংশ না। এই বংশের নামে বাঘে-ছাগলে এক ঘাটে পানি খায়। আমার দুলাভাই আজাহার খন্দকার দিন কয় আগেই লস্কর ডাকাইতের এক লোক খুন করছে। দুইজন ধইরা পুলিশে দিছে। এই বংশে পোলাপান লাগবো বেশি। আমার বইনে মইরা গেলো দেইখ্যা দুলাভাই আর বিয়া-শাদি করতে পারলো না। নাইলে এতদিনে খোনকারগো বংশে পোলাপান গিজগিজ করতো। যত বড় বংশ, তত বেশি পোলাপান দরকার। কিন্তু এই মাইয়াতো দুই পোলা জন্ম দিতে গিয়াই শ্যাষ।'

উপস্থিত সকলেই লজ্জা, ক্ষোভ, অপমানে মুহ্যমান প্রায়। কিন্তু কথার তখনো বাকি। মনসুরের বড় খালা তার সামনের টেবিল থেকে একগ্লাস পানি নিয়ে ঢকঢক করে খেয়ে ফেললেন। তারপর বললেন, 'আর পানিও তো দেহি ভালো না। পানিতে এত আয়রন কেন? এই পানি খাইয়াই মাইয়ার গায়ের রং আয়রনের লাহান ময়লা হইছে। এই বয়স মাইয়াগো রূপ-যৌবনের বয়স। কালা কুচকুচা মাইয়ায়ো এই বয়সে দেখতে লাগে হইলদা পক্ষীর লাহান। আর এর এই অবস্থা কেন!' তিনি ঢোক গিলে আবার বললেন, 'আরেকখান কথা। আমার দুলাভাই ভালো মানুষ দেইখ্যা বউ মরার পরও আর বিয়া করে নাই। কিন্তু এহনকার যুগ ভালো না। পোলাপান ঢাকার শহরে থাহে। রঙ বিরঙের, রং ঢং ওয়ালা মাইয়া মানুষ দেহে। এর মইধ্যে বাচ্চাকাচ্চা হওয়াইতে গিয়া যদি দেহা যায় তার চেহারা শরীল হইছে...। তহন শিক্ষিত, ঢাকায় থাহা পোলাপান কিনা কী কইরা বহে, বলন যায় না!'

মতি মিয়া বার কয়েক চোখের ইশারায়া তাকে থামতে বললেন। কিন্তু বড় খালা তা পাত্তাই দিলেন না। তিনি বললেন, 'এহন পোলায় যেহেতু পছন্দ করছে। ঘর-সংসার করবো তারা। আমাগো আর কী! তারা নিজেরা যদি ভালো থাহে, তাইলে আমরাও ভালো। ও মতি। বিয়ার ডেট ঠিক কর। বাদবাকি কী আশয়-বিষয় আছে, সেইগুলান ঠিক কর।'

মতি মিয়া কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলো। তার আগেই দেলোয়ার হোসেন খুব শান্ত, নরম গলায় বললেন, 'আপনারা কী পাকা কথাবার্তার আগে খাওয়া দাওয়া করবেন? না পরে?'

মতি মিয়া বললো, 'আগে কথাবার্তা শেষ হোউক। তারপর খাওন-দাওন। ঘ্রাণেতো মনে হয়, রান্না ভালোই হইছে।'

বড় খালা মাঝখান থেকে বললেন, 'নারে মতি, আইছিতো সময় কম হয় নাই। আগে খাই-দাই, তারপর কথাবার্তা কই। তাড়াহুড়ারতো কিছু নাই। আর বিয়াতো পাকাই। এত কথা বলনের কী আছে! শোনেন বেয়াই সাব, আমার বড় মাইয়া, দুধে আলতা গায়ের রং। এই কথা কইতে হয় না, ধর্মে গুনাহর কাম, তাও কই, দেবী দুর্গার লাহান মুখখান। সেই মাইয়ার লগে মনসুরের সব ঠিকঠাক। এহন আইসা সে আপনের এই মাইয়া বিয়ার করনের জইন্য পাগল হইয়া গেছে। কী কমু কন। যাউক, আমার আর কী! যার যার কপাল, তার তার।'

দেলোয়ার হোসেন মিষ্টি করে হাসলেন। তারপর বললেন, 'আপনাদের খাবারটা যদি আমরা টিফিন ক্যারিয়ারের বাটিতে করে দিয়ে দিই, আপনাদের কী খুব বেশি অসুবিধা হবে?'

মতি মিয়া ঝট করে দেলোয়ার হোসেনের দিকে তাকালো। দেলোয়ার হোসেন বললেন, 'এখন সন্ধ্যা সাতটা। একটা ভ্যান গাড়িতে করে জসিম আপনাদের সোনাপুর গঞ্জে পৌছে দেবে। ওইখানে একটা হোটেল আছে। খুব একটা ভালো না হলেও আপনাদের থাকার অসুবিধা হবে না। পরদিন ভোরে ছোট লঞ্চে করে গোবিন্দপুর চলে যাবেন। বিকেলে নবীগঞ্জ যাওয়ার লঞ্চ।'

বড় খালা আঁতকে ওঠা গলায় বললেন, 'কী বলতেছেন আপনে!'

'আমি বলছি আপনি যদি মেয়ে মানুষ না হতেন, তাহলে থাপ্পড় মেরে আপনার সবগুলো দাঁত আমি এখন ফেলে দিতাম। শুধু যে ফেলেই দিতাম তা না, দাঁতগুলো যত্ন করে একটা কাগজে মুড়িয়ে আপনার সাথে দিয়ে দিতাম। এরপর থেকে আপনি যেখানেই যেতেন, কথা বলার সময় আপনার দাঁতগুলোর কথা মনে পড়তো।'

বড় খালা তার কানকে বিশ্বাস করতে পারলেন না। তিনি প্রথমে হড়বড় কর কিছু একটা বলতে চাইছিলেন। কিন্তু পারলেন না। তারপর আচমকা উঠে দাঁড়ালেন। তার থামের মতো মোটা উরুর ধাক্কায় সামনের টেবিলে রাখা জগ, গ্লাস, খাবার উল্টে পড়ে কাদা জলে মাখামাখি হলো। তিনি চিৎকার করে বললেন, 'ওই মতি, বইসা বইসা কী দেহস! কী দেহস! কত বড় সাহস, এদের কত বড় সাহস। কত বড় সাহস!

এর বাইরে তিনি আর কোনো কথা বলতে পারলেন না। পরের সপ্তাহখানেক দিন-রাত তিনি এই একই কথা অনবরত বলে যেতে লাগলেন। এই কথার বাইরে আর কোন কথা তার মাথায় এলো না।

মনসুরের বিয়ে ভেঙে গেলো।

New Pdf download: www.PoragEducation.com + webtalkbd.com

নবীগঞ্জ থানার এসআই একরামুল হক এসেছেন জেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে। সেখানে পুলিশের তিন কনস্টেবল ভর্তি। দুজনের পাঁজরের হাড় ভেঙেছে মারাত্মকভাবে। একজন সামান্য আহত। তবে নুরুন্নবী নামে একজন অক্ষত অবস্থায়ই ফিরে এসেছে। গুরুতর আহত দুজনকে জরুরি ভিত্তিতে ঢাকায় পাঠানো উচিত। কিন্তু ঢাকা থেকে সংশ্লিষ্ট কারো কোনো সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। দেশের অবস্থা ভালো না। সরকার আছে টালমাটাল অবস্থায়। এই মুহূর্তে কোথাকার কোন চরে ডাকাত ধরতে গিয়ে পুলিশের শক্তি খর্ব করতে কেউই আগ্রহী নয়। বরং বিষয়টি নিয়ে তারা বিরক্ত। সরকার চাইছে প্রশাসনের সকল স্তর থেকে এখন সরকারবিরোধী যেকোনো আন্দোলন, মিছিল, মিটিং, সভা সমাবেশ প্রতিহত করা হোক। এর বাইরে যা কিছুই ঘটুক, তা নিয়ে তাদের তেমন কোনো মাথাব্যথা নেই। কিন্তু একরামুল হক বিষয়টি নিয়ে চিন্তিত। থানায় পুলিশের নতুন ওসি এসেছেন। নাম মইনুল হোসেন। মইনুল হোসেন তাকে ডেকেছেন। তিনি ঘটনা জানতে চান। তোরাব আলী লস্কর ভয়াবহ ডাকাত তা সকলেই জানে। তারপরও তার দলের দুজন লোকের জন্য কেন চারজন মাত্র কনস্টেবল পাঠানো হলো!

একরামুল হক স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স থেকে বের হয়ে গেলেন তার অফিসে। সেখানে নুরুন্নবী বসে আছে। একরামুল হক বললেন, 'ঘটনা কী ঘটেছিলো খুইলা কও।'

'কী আর ঘটবো ছার? দীঘিনালা খালে ঢোকতেই খালটা ওইহানে হুতানাইল্যা সাপের লাহান চিকন। দুই ধারে খাড়া উঁচা পাহাড়ের মতোন। আচমকা সেই চুড়া থাইক্যা বড় বড় আজদাহা গাছের গুঁড়ি গড়াইয়া নামতে লাগলো। প্রথমে আমরা বুঝি নাই। যতক্ষণে বুঝছি, ততক্ষণেতো জান পরাণ লইয়া বাইচ্যা আহনই কঠিন।'

'কয়জন ছিলো তারা?'

'তাতো জানি না! ওই উঁচা জায়গায় কারা আছিলো, তহন দেখনের উপায় আছিলো না।'

'দিনে দুপুরে ঘটনা ঘটলো, কাউরেই দ্যাহো নাই?'

'না ছার।'

একরামুল হক গম্ভীর হয়ে গেলেন। বিষয়টা তার আত্মসম্মানে লেগেছে। তার এই এতবছরের চাকরির জীবনে এমন ঘটনা এর আগে কখনো ঘটেনি। হ্যাঁ, তিনি হয়তো আরেকটু সাবধান হতে পারতেন, কিন্তু আসামীর সাথে চারজনের বেশি কনস্টেবল দেয়ার অবস্থাও নবীগঞ্জ থানার নেই। এই বাস্তবতা তিনি যেমন জানেন, জানেন মইনুল হোসেনও। কিন্তু বিপদে পড়লে সবাই না জানার ভান করে।

একরামুল হক চিন্তিত গলায় বললেন, 'ট্রলারের মাঝি মনু মিয়ারে ডাকো। তার সাথে কথা আছে।'

মনু মিয়ার বয়স চল্লিশের কাছাকাছি। তার নিজের ছোটখাটো একটা ট্রলার আছে। সে মূলত তার ট্রলারে পুলিশের নানান কাজকর্মই করে। মাঝেমধ্যে পুলিশের সোর্স হিসেবেও তার কথা শোনা যায়। একরামুল হক বললেন, 'ঘটনাডা কেমন হইলো মনু মিয়া?'

'জে ছার?'

'তুমি ট্রলারে থাকতে এমন একটা ঘটনা ঘটলো। আর তুমি কিছু জানলা না?'

'আমি জানলে কী আর আমার ট্রলারখানের ওই অবস্থা হয় ছার? কত কষ্ট কইরা ওই ট্রলারখান বানাইছিলাম। এইডা ছাড়া আমার আর কী আছে?'

মনুর কথায় যুক্তি আছে। কিন্তু একরামুল হক তার কাছ থেকে কথা আদায় করতে চান। তিনি বললেন, 'তুমিতো ট্রলারের পেছনে আছিলা, তোমারতো দ্যাহার কথা, ওইদিন ওইখানে কে কে আছিলো?'

'ছার, গাছের গুঁড়িগুলা ওপর থেইকা পড়তে দুই সেকেন্ডও লাগে নাই। আচুক্কা দেহি মাথার ওপরেরতন নামতেছে। তহন কী আর কইলজায় পানি আছিলো?'

'ওপরেরতন খালি গাছের গুঁড়ি নামতেই দেখছো? আর কিছু দ্যাহো নাই? গাছের গুঁড়িতো আর বৃষ্টি না যে আসমান হইতে নাজিল হইছে! কেউ না কেউতো ওইটা ওপরেরতন ঠেইলা নামাইছে। নামায় নাই?'

'জে ছার, কথা সত্য। তয় একটা মাইয়া মানুষ ছাড়া আমি আর কাউরে দেহি নাই।'

'মাইয়া মানুষ!' একরামুল হক ভারি অবাক হলেন। তিনি বললেন, 'কী কস? কেমন মাইয়া মানুষ?'

'অত কিছুতো দেহি নাই। চৌক্ষের পলকে দেখছি, একটা মাইয়া, বয়স পনারো-ষোলোও হইতে পারে, আঠারো-কুড়িও হইতে পারে। সে চিক্কুর দিয়া দিয়া ঢালের ওইপাশের লোকগুলারে কী কী জানি কইতেছে! তারপরতো আর কিছু খেয়াল নাই।'

New Pdf download: www.PoragEducation.com + webtalkbd.com

'কী কইতেছিলো?'

'স্পষ্ট মনে নাই। তয় মনে হয় কহন গুঁড়ি ফালাইতে হইবো, সেইটাই কইতেছিলো।' মনু মিয়া কী যেন চিন্তা করে হঠাৎ বললো, 'হয় হয় ছার, হেইডাই কইতেছিলো। পানিতে লাফাইয়া পড়নের আগে আমি হুনছি সে চিক্কুর দিয়া কইতেছে এহন ডাইন পাশেরটা ফালা। ডাইন পাশেরটা।'

একরামুল হক এবার সত্যি সত্যিই চিন্তায় পড়ে গেলেন। আঠারো কুড়ি বছরের একটা মেয়ে! তা কী করে সম্ভব? মনু মিয়া ভুল দেখেনিতো!

পরদিন সে ডেকে পাঠালো করাতকলের মালিক হারাধনকে। হারাধনের ঠাণ্ডা-কাশির ব্যারাম। সে কাশতে কাশতে বললো, 'ওসি সাব। জীবনের দশটা বছর এই পুলিশ আমার খাইলো। আমার ধন সম্পদ, জমি-জমা সব এই মিথ্যা মামলার পেছনে গেলো। এহন আমি পথের ফকির। কোনোমতে ওই স'মিলডা দিয়াই দুই বেলা খাইয়া পইরা পোলাপান লইয়া বাঁইচা আছি। এর মইধ্যে আবার আমারে টাইনেন না।'

'কী যে কন না মশাই। আপনেরে টানবো ক্যান? জাস্ট জানার জইন্য, ওই গাছের গুঁড়ি গুলানতো আপনের সমিলেরই?'

'তাও আমি বলতে পারবো না ওসি সাব। বিভিন্ন জায়গা থেইকা কাঠ ব্যবসায়ীরা গাছ কাইটা আনে, অনেকে নিজেগো গাছও আনে। করাতিরা আনে। আনতে গিয়া কিছু কিছু নৌকা, টলারে আহে। কিছু কিছু পানিতে ভাসাইয়া দড়িতে বাইন্ধা টাইনা আনতে হয়। সব খবরতো আমি জানি না ওসি ছাব!'

হারাধনের কথা সত্য। তার করাতকলে কাঠ চেরাই হয়, কিন্তু আস্ত গাছ, গাছের গুঁড়ি, কোনগুলো কখন কোথা থেকে কে এনেছে, কোথায় রেখেছে তার হিসেব রাখা তার পক্ষে সম্ভব নয়। কর্মচারীরা হয়তো জানতে পারে। তা ছাড়া, ওই গাছের গুঁড়িগুলো যাদের, তারা উল্টো নদীতে ভেসে যাওয়া তাদের গুঁড়ির খোঁজ না পেয়ে হারাধনের কাছে অভিযোগ করেছে। জানিয়েছে পুলিশকেও।

বিকেলে নতুন ওসি মইনুল হোসেনের সাথে দেখা করতে গেলেন এসআই একরামুল হক। তিনি সব শুনে বললেন, 'এত বছর ধরে একটা চর দখল করে রেখে তারা আশেপাশের এলাকাগুলোতে এই যে তাণ্ডব চালাচ্ছে, এর বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেয়া হয়নি কেন?'

'কে নিবো ব্যবস্থা স্যার? খুবই দুর্গম সেই চর। যাইতে আসতেই তিন দিন লেগে যায়। তারপর শীতের মৌসুমেতো যাওনের অবস্থাই নাই। একমাত্র পথ নদী, বিল। কিন্তু ভাদ্র আশ্বিন মাসে, বর্ষার সিজনে নদী থাহে উত্তাল। বিলও বিপজ্জনক।'

'তাই বলে এগুলো চলতেই থাকবে?'

'এহনতো কমই ছার। আগেতো আরো খারাপ অবস্থা আছিলো। শুনছি এককালে নাকি থানা থাইকাও তারা মাসোহারা নিতো!'

'কী বলেন আপনি?'

'কথা সত্য স্যার। এহন বরং তারা ঠাণ্ডা। বহুবছর বাদে পরপর বেশ কয়েকটা বড়সড় ডাকাতি করলো তারা।'

'হু।' মইনুল হোসেন চিন্তায় পড়ে গেলেন। দেশের অস্থিতিশীল অবস্থার সুযোগটা নিচ্ছে ডাকাতরা। তারও খুব ভালোভাবে জানে, পুলিশ-প্রশাসন এই মুহূর্তে জনগণের নিরাপত্তার চেয়ে সরকারের নিরাপত্তা নিয়ে বেশি ব্যস্ত। পুলিশের আসলে একমাত্র দায়িত্বই এখন এটা। ফলে ডাকাতরা চাইলেই এখন যা খুশি করতে পারে। আর তার ফলাফলই সাম্প্রতিক ঘটে যাওয়া ঘটনা। পরপর কয়েকটি বড়সড় ডাকাতি। সবচেয়ে বড় ব্যাপার আসামি ছিনিয়ে নেয়ার বিষয়টা। এটা সরাসরি পুলিশের প্রতি তুচ্ছতাচ্ছিল্য প্রদর্শন। কিন্তু এখানে খুব বেশি জনবল খাটানোর উপায় পুলিশের নেই। মইনুল হোসেন কী করবেন ভেবে পাচ্ছেন না। একরামুল হক তার পরিস্থিতি আঁচ করতে পেরে বললেন, 'আমার ওপর বিশ্বাস রাহেন স্যার। একটু সময় দ্যান। দেখা যাক কী করতে পারি!'

'কী করবেন আপনে? এতবছরেই যখন কেউ কিছু করতে পারেনি!'

'সরাসরি তাদের চরে গিয়াতো আর যুদ্ধ করন যাইবো না। তয় স্যার, একটা কথা আছে না, যা কাটে না ধারে, তা কাটে ভারে। বুদ্ধি বইলাওতো একখান জিনিস আছে। আছে না?'

'তো আপনার কী ধারণা, আপনার বুদ্ধি বেশি?'

একরামুল হক এই প্রশ্নের সরাসরি উত্তর দিতে লজ্জাবোধ করলেও ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিলেন, তার বুদ্ধি ভালো। তিনি এর একটা হ্যস্তন্যস্ত করেই ছাড়বেন। পুলিশের কাছ থেকে আসামি ছিনিয়ে নেয়া ছোটখাটো কোনো অপরাধ নয়। গুরুতর অপরাধ। এর একটা বিহিত তিনি করবেনই।

একরামুল হক তবুও কিছুই করতে পারলেন না। তার পারার কথাও না। অসুস্থ পুলিশ কনস্টেবলদের সেরে উঠতে দীর্ঘ সময় লাগলো। সেরে উঠেও তারা যেন ইচ্ছে করেই পূর্ণ কর্মক্ষম হতে চাইলো না। বরং নানা অজুহাতে তাদের দায়িত্ব এড়িয়ে যেতে চাইলো। পিতৃপ্রদত্ত জীবনটাকে তোরাব আলী লস্করের কারণে আর ঝুঁকির মুখে ফেলতে চায় না তারা। তার চেয়ে বরং এই প্রত্যন্ত চরাঞ্চলে ছিঁচকে চুরি, মারামারি, ঝড়গাঝাটিসহ ছোটখাটো নানান অপরাধের বিহিত করে, বেতনের বাইরেও পাঁচ, দশ টাকা উপরি কামাই করে, সহাস্য আলস্যে, সুগভীর আরামে তাদের দিন গুজরান হয়ে যায়।

একরামুল হক অবশ্য হাল ছাড়লেন না। তিনি আহত পুলিশ কনস্টেবলদের মধ্যে অপমানবোধ জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করলেন। তাদের বোঝানোর চেষ্টা করলেন, এর একটা প্রতিশোধ নেয়া চাই-ই। না হলে সারাজিবন আর কারো কাছে উঁচু গলায় কথা বলা যাবে না। তার ক্রমাগত চেষ্টা যে বিফলে গেলো তাও নয়।

New Pdf download: www.PoragEducation.com + webtalkbd.com

ধীরে ধীরে যেন তাদের মধ্যে একটা পুলিশ সুলভ অহমও জেগে উঠতে থাকলো। তবে একরামুল হক তাদের এও বোঝালেন, ইচ্ছে করলেই তারা বড়সড় কোনো অপারেশনের যেতে পারবে না। তাদের বরং সঠিক সময় ও সুযোগের অপেক্ষা করতে হবে। আর এইজন্য সবচেয়ে বেশি যা জরুরি, তা হলো চোখ কান খোলা রাখা।

সুযোগ অবশ্য মিলেও গেলো। এক দুপুরে ট্রলারের মাঝি মনু মিয়া হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলো, 'ছার, খবর আছে, গরম খবর।'

'কী খবর?'

'কালীগঞ্জ বন্দরে হানিফরে দ্যাহা গেছে। লগে বুড়া কইরা দুই লোক। আর এক কম বয়সী মাইয়া।'

'মাইয়া!'

'জে ছার। আমি নিজ চৌক্ষে দেহি নাই। কালীগঞ্জ থেইকা আইজ বেয়ান বেলা একখান মাছের টলার আইলো, সেই টলারের মাঝি আমারে কইলো। আমার ক্যান জানি মনে হয়, এই মাইয়াই সেই মাইয়া!'

'তুই ঠিক শুনছোস তো?'

'ভুল শোনার তো কোনো কারণ নাই ছার।'

'কী উদ্দেশ্যে আইছে?'

'শুনছি মাছ বেচতে আইছে।'

'মাছ পাইলো কই?'

'মাছতো সব তাগো ওইদিকেই।'

'মানে?'

'মানে হইলো গিয়া, আমাগো এই দিকের নদীতে প্রত্যেকদিন কত কত টলার চলে। বড় লঞ্চ চলে, গাঙ্গে হই-হট্টগোল, গ্যাঞ্জাম লাইগাই আছে। তার ওপরে পোড়া মবিল-ডিজেল পড়তেছে পানিতে। ক্ষ্যাতের কীটনাশকতো আছেই। এইসব কারণে আগের মতনতো আর মাছ পাওন যায় না এইদিকে। তারওপর হাজার হাজার জাল, জাইল্যারা মাছ ধরতেছে, মাছ পাইবো কই? সব মাছ এহন লস্করগো বিলে, গাঙ্গে।'

'তাইলেতো ভালোই। তারা এহন ডাকাতি বাদ দিয়া মাছ বেচা শুরু করবো।'

'এইটাই চিন্তার বিষয়। এই ঘটনা বাপের জন্মেও কোনোদিন হুনি নাই। লস্কর ডাকাইতরা আসছে মাছ বেচতে!'

ঘটনা শুনে ওসি একরামুল হক দ্বিধান্বিত হয়ে গেলেন। ঘটনা আসলে কী। এই কত কত বছরের ডাকাতির পেশা ছেড়ে হঠাৎ মাছের ব্যবসা কেন? নতুন কোনো ফন্দি নয়তো! তিনি সেই রাতেই দুজন পুলিশ কনস্টেবল নিয়ে সাদা পোশাকে মনু মিয়ার ট্রলারে কালীগঞ্জ রওয়ানা হলেন। কালীগঞ্জ বন্দরে যখন পৌছালেন, তখন ভোর। কিন্তু বড় নদীবন্দর হওয়ায় সাত সকালেই বাজার জমে

উঠেছে। বিভিন্ন জায়গা থেকে তাজা শাকসবজি, ফল-মূল থেকে শুরু করে মাছ মুরগিও নিয়ে এসেছে বিক্রেতারা। তবে মাছের বাজারটা সবচেয়ে বেশি জমজমাট। ছোট বড় নৌকায় দূর-দূরান্ত থেকে জেলেরা মাছ নিয়ে এসেছে। সেই সারাটা দিন তারা বাজারে ঘুরলেন। ঘুরে যা বুঝলেন, এই এত বড় বিশাল বন্দরে হানিফ বা তার দলের কাউকে কারো পক্ষে আলাদা করে চেনা সম্ভব নয়। তা ছাড়া এখানে নিত্য নতুন লোকের আনাগোনা। সবাই আসে নিজের ধান্ধায়। সুতরাং প্রয়োজন না হলে অন্য কারো খবর কেউ রাখে না।

তবে একটা বিষয় একরামুল হক নিশ্চিত। আশেপাশে আর কোথাও না গিয়ে কালীগঞ্জ বন্দরে আসার কারণে লস্করদের জন্য বিষয়টা নানাভাবেই নিরাপদ হয়েছে। প্রথমত, এখানে ভিড় বেশি। দ্বিতীয়ত, স্থায়ী ও স্থানীয় লোকজন কম। তৃতীয়ত, নবীগঞ্জ বা আলীপুর থানার পুলিশদের এখানে নিয়ন্ত্রণ তেমন নেই, নেই যাতায়াতও।

সিদ্ধান্তটা যে-ই নিক, সে যে খুব হিসেব কষে নিয়েছে, এ বিষয়ে একরামুল হকের আর কোনো সন্দেহ রইলো না। ঘাটের কুলিদের সাথে কথা বলেও তেমন কোনো তথ্য পাওয়া গেলো না। তবে একটা মাছের ট্রলারে যে কম বয়সি একজন মেয়েছেলে ছিলো, সেটি অনেকেই বলতে পারলো। ট্রলারটি অবশ্য সকালে এসে দুপুর নাগাদ চলে গেছে। দুজন বৃদ্ধ মানুষও ছিলো। প্রচুর মাছ নিয়ে এসেছিলো তারা। কিছু কেনাকাটাও করেছে। এর মধ্যে বেশির ভাগই ছিলো মাছ ধরার সামগ্রী। জাল, জাল সেলাইয়ের সুই- সুতো, আলকাতরা ইত্যাদি।

একরামুল হক ঘটনা কিছুই বুঝতে পারলেন না। তিনি নানাবিধ দুশ্চিন্তা নিয়ে নবীগঞ্জ ফিরে গেলেন।

New Pdf download: www.PoragEducation.com + webtalkbd.com

তোরাব আলী লস্করের মুখ ভার। তার সামনে অপরাধীর ভঙ্গিতে বসে আছে জোহরা। তিনি তৃতীয়বারের মতো বললেন, 'তুই কী চাস আমি সবকিছু ছাইড়া ছুইড়া চইলা যাই?'

জোহরা এবার কথা বললো, 'আমার ভুল হইয়া গ্যাছে দাদাজান। এই ঘটনা আর ঘটবো না।'

'আগেরবারও এই একই কথা কইছিলি!'

'না দাদাজান, তহন এই কথা বলি নাই!'

তোরাব আলী লস্কর বললেন, 'তুই কী চাস, আমারে খুইলা ক।'

'আবার ক্ষেইপা যাবা নাতো আমার ওপর?'

তোরাব আলী জবাব দিলেন না। শক্ত চোখে জোহরার দিকে তাকিয়ে রইলেন। জোহরা বললো, 'তুমিই না সেইদিন কইলা, তুমি চাওনা এই চরে আমি থাহি!'

'হুম।'

'ক্যান কইছিলা? এই চরের মানুষ খারাপ, ডাকাতি করে, মানুষ মারে, মানুষের জিনিসপত্র সোনা গয়না ছিনাই আনে, সেইজন্যইতো, নাকি?'

তোরাব আলী লস্কর জবাব দিলেন না। জোহরা বললো, 'এইডা নিয়া লজ্জা পাওনেরতো কিছু নাই। যে মাস্টার, তার কাম মানুষরে পড়া লেখা শিখাইয়া আয় রোজগার করন। যে মসজিদের ইমাম, তার কাম লোকজনরে নামাজ পড়াইয়া আয় রোজগার করন। যে জল্লাদ, তার কাম মানুষরে ফাঁসি দিয়া আয় রোজগার করন। আর যে ডাকাইত, তার কাম মানুষের জিনিসপত্র ছিনাই আইনা নিজের আয়-রোজগারের ব্যবস্থা করন। ঠিক কী না?'

তোরাব আলী লস্কর জোহরার উদ্দেশ্য বুঝতে পারছেন না। তিনি তাই এবারও তার কথার জবাব দিলেন না। জোহরা বললো, 'শোনো দাদাজান, এইহানে আমার জন্ম না?'

'হুম।'

'এইহানে আমি বড় হইছি না?'

'হুম।'

'এইহান থেইকা আমি কোনখানে যাবো না। আমার জন্ম এইহানে, আমি মরবোও এইহানে। এইহানে যারা আছে, তারা সবাই আমার মা-বাপ, ভাই-বইন। এগোরে থুইয়া আমি কোনো শিক্ষিত সমাজের রাজপ্রসাদে যাইয়া শান-শওকতে থাকবো? তাতে আমার শান্তি হইবো? হইবো না। বাঁচি মরি, যা করি, এইহানে থাইকাই করবো।'

জোহরা থামলেও তোরাব আলী লস্কর কোনো কথা বললেন না। তিনি বিস্মিত চোখে জোহরার দিকে তাকিয়ে আছেন। জোহরা বললো, 'এহন কথা হইলো, এই যে মানুষ খুন করন, এইডা ঠিক কিনা? এইডা ঠিক না। আমার বাজানের কোনো খোঁজ আমি পাই নাই, তুমিও তোমার পোলার কোনো খোঁজ পাও নাই, তাতে আমার যেমন কষ্ট লাগে, তোমারও লাগে। আমরাও যহন ডাকাতি করতে গিয়া কাউরে খুন করি, তহন তার আত্মীয়-স্বজন, বাপ-মা, পোলা-মাইয়ারও এমনে খারাপ লাগে। কষ্টতো সমানই, সমান না? এহন আমরা খুন করি ক্যান? বিপদে পড়লেইতো করি তাই না? মাইনসের জিনিসপত্র, ট্যাকা-পয়সা আনতে গেলে তারাতো আর এমনে এমনেই দিয়া দিবো না। বাধা দিবো, ধরার চেষ্টা করবো, এইটাইতো স্বাভাবিক। আবার আমরা বাঁচার চেষ্টা করবো, সেইটাও স্বাভাবিক। সেইটা করতে গিয়া খুন- খারাবিতো হইতেই পারে। আমি এইডারে এমন কোন দোষ মনে করি না। দুনিয়ার নিয়মই এই। সিংহ যদি অন্যরে না মারে, না খায়, তাইলে সে বাঁচবো কেমনে? দুনিয়ার নিয়মই এইডা, একজন আরেকজনরে খাইয়া বাঁচবে, তারে আবার অন্য আরেকজন খাইয়া বাঁচবে।'

'তোর কী হইছে খুইলা ক।'

'আমার কিছু হয় নাই দাদাজান। আমি সেইদিন তোমার কথাবার্তা শুইনা অনেক চিন্তাভাবনা করছি। চিন্তাভাবনা কইরা মনে হইছে, তুমি লোক ভালো না। তুমি মানুষ হিসাবে স্বার্থপর।'

'স্বার্থপর!'

'হু, তোমার খারাপ লাগবো জাইনাও কইলাম। তুমি খালি তোমার কথা নিজের কথা ভাবো। নিজের ভালো-মন্দ ভাবো। অন্যের কথা ভাবো না।'

'আমি খালি আমার কথা ভাবি? আমার ভালো মন্দ ভাবি? অন্যের কথা ভাবি না?' তোরাব আলী লস্কর জোহরার কথায় ভীষণ আহত হলেন। তিনি ভারি গলায় বললেন, 'তোর কথা, তোগোর কথা আমি কিচ্ছু ভাবি না?'

New Pdf download: www.PoragEducation.com + webtalkbd.com

জোহরা হাসলো, 'আমিতো আর অন্য না দাদাজান। আমিতো তুমিই। তোমার অংশ। কিন্তু দাদাজান তুমি আমারে নিয়া যা ভাবো, তা কী আর সবাইর জন্য ভাবো? আমার মতো তাগোও কিন্তু তোমার অংশ হওনের কথা আছিলো। তারা কিন্তু তোমারে তাই ভাবে। ভাবে তাগো সবাইর গার্জিয়ান তুমি।'

জোহরা সামান্য থেমে আবার বললো, 'কিন্তু তুমিতো সবাইর কথা একরকম ভাবো না। বাহাদুর ভাইর ওইটুক মা-মরা মাইয়াটারে লইয়া তুমি কিছু ভাবো? লোকমান ভাই, মোকাররম ভাই, রুস্তম ভাইরে লইয়া ভাবো? ভাবো না। কিন্তু এই চরের সবাই তোমারে তাগো বাপের মতোন বইলা জানে। সর্দার বইলা মানে। কিন্তু তুমি তাগো কথা না ভাইবা ভাবো খালি নিজের পোলা আর নাতিরে লইয়া। এইটা কী ঠিক দাদাজান? তুমিতো এই চরের সবাইর। সবাইর না?'

তোরাব আলী লস্কর কিছু বলতে গিয়েও থেমে গেলেন। জোহরা বললো, 'আমি একখান বুদ্ধি বাইর করছি।'

'কী বুদ্ধি?'

'এমনেতেইতো চাইরপাশের পরিস্থিতি ভালো না। সামনে আরো খারাপ হইবো। ডাকাতিওতো বন্ধ হওনের জোগাড় হইছিলো। কী দুরবস্থাডাই না তহন গেছিলো সবাইর। এইরম পরিস্থিতিতো সামনে আরো আইতে পারে। পারে না?'

তোরাব আলী লস্কর গম্ভীর ভঙ্গিতে বললেন, 'হুম, পারে। বল।'

'এইজইন্য আমাগো উচিত অন্য আরো কোনকিছুর ব্যবস্থা কইরা রাখা। যাতে বড়সড় কোনো বিপদ-আপদ আইলে আমরা সেইটার ওপরও নির্ভর কইরা অন্তত কিছুদিন চলতে পারি।'

'কী ব্যবস্থা?'

'চরে ছোট পোলাপান, মহিলা, বয়স্ক লোক যারা আছে, তাগোতো খুব বেশি কোনো কাজ-কাম নাই করনের মতো। তারা খালি খায় আর হাগে। হা হা হা। আর কোন কাম তাগো আছে?'

'কী কাম করবো তারা? করার মতো কী আছে এইহানে?'

'আছে। আমাগো এইহানের নদীতে বারো মাসই মাছ থাহে।'

'মাছ দিয়া কি হইবো? মাছ আর কত খাইবো?'

'খাইবো কেন?'

'তাইলে?'

'আগে দূরের গঞ্জ, বন্দর বা অঞ্চলগুলার নদীতে মাছের কোনো অভাব আছিলো না। কেউ মাছ কিন্যাও খাইতো না। এত মাছ কে খাইবো! কিন্তু দিন পাল্টাইছে। অনেক এলাকার নদীতেই এহন আর মাছ নাই। আস্তে আস্তে আরো কমতেছে। এইজন্য মাছের চাহিদাও বাড়তেছে। আমরা যদি এদিক থেইকা মাছ ধইরা নিয়া বেচি, তাইলে কিন্তু আমাগো আয় রোজগারের আরো একটা উপায় হইলো।'

তোরাব আলী লস্কর বসা থেকে ঝট করে উঠে দাঁড়ালেন, 'লস্কররা শ্যায় পর্যন্ত মাউচ্ছা হইবো? মাছ বেচবো? ওই জাইল্যাগো মতন মাছ ধরবো আর মাছ বেচবো! তোর মাথা ঠিক আছে? এইজন্যই কয়, অল্প বয়সে বেশি বুদ্ধি ভালো না।'

জোহরা তার দাদাজানকে নানাভাবে বোঝানোর চেষ্টা করলো। কিন্তু লাভ হলো না। এ কদিনে সে যা যা ভেবেছে, তার সকল চিন্তা-ভাবনা, পরিকল্পনা সবকিছুই। কিন্তু কোনো কিছুতেই কিছু হলো না। তোরাব আলী লস্কর বরং ভয়ংকরভাবে রেগে গেলেন। তিনি কোনোভাবেই এই বিষয়টি মেনে নিতে পারছেন না।

তিনি চিৎকার করে বললেন, 'তুই প্রথম বার চর ছাইড়া রাইতের অন্ধারে নবীগঞ্জ গেছোস, আমি কিছু কই নাই। বুঝাইছি। কিন্তু তুই আমার কথা শুনোছ নাই, একই কাজ আবারো করছস। তুই জালালুদ্দিন আর হানিফরে লইয়া এইবার গেছোস কালীগঞ্জ মাছ বেচতে। তোর কী মনে হয় না সব কিছুই বেশি বেশি হইয়া যাইতেছে!'

জোহরা তার দাদাজানকে শান্ত করার চেষ্টা করলো, 'দাদাজান!'

তোরাব আলী লস্কর থামলেন না। তিনি উত্তেজির কণ্ঠে বললেন, 'যদি কোনো বিপদ হইতো? একবার ভালোয় ভালোয় সব হইছে দেইখ্যা প্রত্যেকবারই যে ঠিকঠাক সব হইবো, তেমন তো না? তহন? তহন কী হইতো? চাইরদিকে পুলিশ নজর রাখতেছে। তুই পোলা মানুষ না, তুই মাইয়া মানুষ। এই কথাটা মাথায় রাখতে হইবো। অন্যগো বিপদ আর তোর বিপদ এক না। তোর যদি কোনো ক্ষতি হয়...।'

তিনি আর কথা বলতে পারলেন না। তার রাগান্বিত গলার স্বর আচমকাই যেন ভিজে এলো।

জোহরা উঠে গিয়ে তার দাদাজানের কাঁধে হাত রাখলো, 'দাদাজান!'

তোরাব আলী লস্কর জোহরার হাতখানা তার কাঁধ থেকে আস্তে করে সরিয়ে দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। তারপর ভারি কণ্ঠে বললেন, 'আরেকখান কথা। সবাই কিন্তু ভাবতেছে, আমার দিন শেষ। লস্কর চরের ভবিষ্যৎ হইতেছে জোহরা!'

তোরাব আলী লস্করের শেষ কথাটা তীরের মতন কানে বিঁধলো জোহরার। সে উঠে গিয়ে তার বাহু ধরে নিজের দিকে ফেরালো, 'কী বলতেছো দাদাজান? এই কথা তোমারে কে বলছে? তুমিও সত্যই এইডা ভাবতেছো?'

তোরাব আলী লস্কর দীর্ঘ সময় জোহরার কথার জবাব দিলেন না। যেন তিনি বোঝার চেষ্টা করলেন, কীভাবে উত্তরটা দিবেন। তারপর বললেন, 'আমার ভাবায় কিছু যায় আহে না। মানুষ হাতেনাতে ফল চায়। কিন্তু তারপরের পরিণতি লইয়া ভাবে না। তারা দেখতেছে, তুই এইটুক একটা মাইয়া, যা-ই করতেছোস, হাতে নাতে ফল। আর আমার বয়স হইয়া গ্যাছে, আগের শক্তি সাহসও নাই। তাগো আর দোষ কী!'

New Pdf download: www.PoragEducation.com + webtalkbd.com

জোহরা হাসলো, 'আমিতো আর অন্য না দাদাজান। আমিতো তুমিই। তোমার অংশ। কিন্তু দাদাজান তুমি আমারে নিয়া যা ভাবো, তা কী আর সবাইর জন্য ভাবো? আমার মতো তাগোও কিন্তু তোমার অংশ হওনের কথা আছিলো। তারা কিন্তু তোমারে তাই ভাবে। ভাবে তাগো সবাইর গার্জিয়ান তুমি।'

জোহরা সামান্য থেমে আবার বললো, 'কিন্তু তুমিতো সবাইর কথা একরকম ভাবো না। বাহাদুর ভাইর ওইটুক মা-মরা মাইয়াটারে লইয়া তুমি কিছু ভাবো? লোকমান ভাই, মোকাররম ভাই, রুস্তম ভাইরে লইয়া ভাবো? ভাবো না। কিন্তু এই চরের সবাই তোমারে তাগো বাপের মতোন বইলা জানে। সর্দার বইলা মানে। কিন্তু তুমি তাগো কথা না ভাইবা ভাবো খালি নিজের পোলা আর নাতিরে লইয়া। এইটা কী ঠিক দাদাজান? তুমিতো এই চরের সবাইর। সবাইর না?'

তোরাব আলী লস্কর কিছু বলতে গিয়েও থেমে গেলেন। জোহরা বললো, 'আমি একখান বুদ্ধি বাইর করছি।'

'কী বুদ্ধি?'

'এমনেতেইতো চাইরপাশের পরিস্থিতি ভালো না। সামনে আরো খারাপ হইবো। ডাকাতিওতো বন্ধ হওনের জোগাড় হইছিলো। কী দুরবস্থাডাই না তহন গেছিলো সবাইর। এইরম পরিস্থিতিতো সামনে আরো আইতে পারে। পারে না?'

তোরাব আলী লস্কর গম্ভীর ভঙ্গিতে বললেন, 'হুম, পারে। বল।'

'এইজইন্য আমাগো উচিত অন্য আরো কোনকিছুর ব্যবস্থা কইরা রাখা। যাতে বড়সড় কোনো বিপদ-আপদ আইলে আমরা সেইটার ওপরও নির্ভর কইরা অন্তত কিছুদিন চলতে পারি।'

'কী ব্যবস্থা?'

'চরে ছোট পোলাপান, মহিলা, বয়স্ক লোক যারা আছে, তাগোতো খুব বেশি কোনো কাজ-কাম নাই করনের মতো। তারা খালি খায় আর হাগে। হা হা হা। আর কোন কাম তাগো আছে?'

'কী কাম করবো তারা? করার মতো কী আছে এইহানে?'

'আছে। আমাগো এইহানের নদীতে বারো মাসই মাছ থাহে।'

'মাছ দিয়া কি হইবো? মাছ আর কত খাইবো?'

'খাইবো কেন?'

'তাইলে?'

'আগে দূরের গঞ্জ, বন্দর বা অঞ্চলগুলার নদীতে মাছের কোনো অভাব আছিলো না। কেউ মাছ কিন্যাও খাইতো না। এত মাছ কে খাইবো! কিন্তু দিন পাল্টাইছে। অনেক এলাকার নদীতেই এহন আর মাছ নাই। আস্তে আস্তে আরো কমতেছে। এইজন্য মাছের চাহিদাও বাড়তেছে। আমরা যদি এদিক থেইকা মাছ ধইরা নিয়া বেচি, তাইলে কিন্তু আমাগো আয় রোজগারের আরো একটা উপায় হইলো।'

তোরাব আলী লস্কর বসা থেকে ঝট করে উঠে দাঁড়ালেন, 'লস্করেরা শ্যাষ পর্যন্ত মাউচ্ছা হইবো? মাছ বেচবো? মাছ বেচবো? ওই জাইল্যাগো মতন মাছ ধরবো আর মাছ বেচবো! তোর মাথা ঠিক আছে? এইজন্যই কয়, অল্প বয়সে বেশি বুদ্ধি ভালো না।'

জোহরা তার দাদাজানকে নানাভাবে বোঝানোর চেষ্টা করলো। কিন্তু লাভ হলো না। এ কদিনে সে যা যা ভেবেছে, তার সকল চিন্তা-ভাবনা, পরিকল্পনা সবকিছুই। কিন্তু কোনো কিছুতেই কিছু হলো না। তোরাব আলী লস্কর বরং ভয়ংকরভাবে রেগে গেলেন। তিনি কোনোভাবেই এই বিষয়টি মেনে নিতে পারছেন না।

তিনি চিৎকার করে বললেন, 'তুই প্রথম বার চর ছাইড়া রাইতের অন্ধারে নবীগঞ্জ গেছোস, আমি কিছু কই নাই। বুঝাইছি। কিন্তু তুই আমার কথা শুনোছ নাই, একই কাজ আবারো করছস। তুই জালালুদ্দিন আর হানিফরে লইয়া এইবার গেছোস কালীগঞ্জ মাছ বেচতে। তোর কী মনে হয় না সব কিছুই বেশি বেশি হইয়া যাইতেছে!'

জোহরা তার দাদাজানকে শান্ত করার চেষ্টা করলো, 'দাদাজান!'

তোরাব আলী লস্কর থামলেন না। তিনি উত্তেজির কণ্ঠে বললেন, 'যদি কোনো বিপদ হইতো? একবার ভালোয় ভালোয় সব হইছে দেইখ্যা প্রত্যেকবারই যে ঠিকঠাক সব হইবো, তেমন তো না? তহন? তহন কী হইতো? চাইরদিকে পুলিশ নজর রাখতেছে। তুই পোলা মানুষ না, তুই মাইয়া মানুষ। এই কথাটা মাথায় রাখতে হইবো। অন্যগো বিপদ আর তোর বিপদ এক না। তোর যদি কোনো ক্ষতি হয়...।'

তিনি আর কথা বলতে পারলেন না। তার রাগান্বিত গলার স্বর আচমকাই যেন ভিজে এলো।

জোহরা উঠে গিয়ে তার দাদাজানের কাঁধে হাত রাখলো, 'দাদাজান!'

তোরাব আলী লস্কর জোহরার হাতখানা তার কাঁধ থেকে আস্তে করে সরিয়ে দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। তারপর ভারি কণ্ঠে বললেন, 'আরেকখান কথা। সবাই কিন্তু ভাবতেছে, আমার দিন শেষ। লস্কর চরের ভবিষ্যৎ হইতেছে জোহরা!'

তোরাব আলী লস্করের শেষ কথাটা তীরের মতন কানে বিঁধলো জোহরার। সে উঠে গিয়ে তার বাহু ধরে নিজের দিকে ফেরালো, 'কী বলতেছো দাদাজান? এই কথা তোমারে কে বলছে? তুমিও সত্যই এইডা ভাবতেছো?'

তোরাব আলী লস্কর দীর্ঘ সময় জোহরার কথার জবাব দিলেন না। যেন তিনি বোঝার চেষ্টা করলেন, কীভাবে উত্তরটা দিবেন। তারপর বললেন, 'আমার ভাবায় কিছু যায় আহে না। মানুষ হাতেনাতে ফল চায়। কিন্তু তারপরের পরিণতি লইয়া ভাবে না। তারা দেখতেছে, তুই এইটুক একটা মাইয়া, যা-ই করতেছোস, হাতে নাতে ফল। আর আমার বয়স হইয়া গ্যাছে, আগের শক্তি সাহসও নাই। তাগো আর দোষ কী!'

New Pdf download: www.PoragEducation.com + webtalkbd.com

তোরাব আলী লস্করের মাথায় যেন আগুন ধরে গেলো। তবে তিনি কিছু বললেন না। মনে মনে নিজেকে শান্ত করার চেষ্টা করলেন। জালালুদ্দিন বললেন, 'এই মাইয়া যেই– সেই মাইয়া না। এর ভাও-ই আলাদা। এরে তুমি চাইলেও সামলাই রাখতে পারবা না। চোউখ দেখলেই কওন যায়।'

কথা জালালুদ্দিন মিথ্যা বলেননি। বিষয়টা তোরাব আলী লস্করও খেয়াল করেছেন। জোহরা যখন কথা বলে, যখন হাসে, তাকায়, তার চোখ যেন কথা বলে। তবে সেই কথা পুরোপুরি পড়া যায় না। কিছু একটা টের পাওয়া যায় কেবল। এবং সেটি তোরাব আলী লস্করকে এক ধরনের ভয়ের অনুভূতি দেয়।

জোহরা ঘর থেকে বের হলো পরদিন সকালে। বাহাদুরের মেয়ে মায়ার জ্বর। ওইটুক এক মা-মরা মেয়ে। জ্বর, ক্ষিধে, তেষ্টায় যেন আরো ছোট হয়ে গেছে। তার দাদি তাকে শান্ত করার সবরকম চেষ্টাই করেছেন, কিন্তু লাভ হয়নি। দুগ্ধপোষ্য শিশু মায়ের দুধ না পেয়ে ধীরে ধীরে দুর্বল হয়ে পড়েছে। অনেক চেষ্টা করেও অন্য কোনো খাবার তাকে খুব একটা খাওয়ানো যায়নি। ঠোঁটের মাঝে মায়ের স্তন না পেয়ে সারারাত চিৎকার করে কাঁদে সে। প্রথম কয়েকদিন দাদি তাকে কোনোমতে সমলে রাখতে পারলেও শেষের দিকে এসে আর কোনোকিছুতেই কিছু হচ্ছে না। গতরাতে অতদূর থেকে মায়ার কান্নার শব্দে জোহরাও একফোঁটা ঘুমাতে পারেনি।

মায়াকে দেখে জোহরা প্রায় চমকে উঠলো। হাড্ডিসার কঙ্কাল একটা শরীর পড়ে আছে চৌকির ওপর। তার পাশে শুয়ে আছেন বাহাদুরের বৃদ্ধ মা। তিনিও যে সুস্থ নেই, তা তার মুখ দেখেই বুঝে ফেললো জোহরা। এই বয়সে নাতনি সামলাতে গিয়ে রাতের পর রাত ঘুমাতে পারেননি তিনি। জোহরাকে দেখে বাহাদুরের মা উঠে বসলেন। তারপর বললেন, 'আল্লায় বেজার হইবো দেইখ্যা কথাডা কই না, তয় আল্লাহর উচিত আছিলো, মার লগে মাইয়াডারেও লইয়া যাওন। যে কষ্ট সে পাইতেছে, এরতন মরন ভালো। চৌক্ষের সামনে ওইটুক মাইয়ার এই তইজ্যা আমি আর সহ্য করতে পারি না। মনে হয়...।'

শেষের দিকে এসে বাহাদুরের মায়ের গলা বুজে এলো। জোহরা ধীর পায়ে গিয়ে তার পাশে বসলো। তারপর বললো, 'বিপদ-আপদ মানুষেরই হয় চাচি। আপনে এত ভাইঙ্গা পড়লে কেমনে হইবো? সাহস রাখতে হইবো।'

'শইলে এহন আর তাগত পাইনারে মা। শইলে বল না থাকলে সাহস দিয়া কিছু হয় না।'

বাহাদুরের মা মিথ্যে বলেনি। তার অবস্থা দেখে জোহরার নিজেরই ভয় লাগছে। এই মা-মরা মেয়েকে তিনি কী করে দেখে রাখবেন! জোহরা বললো, 'এর গায়তো জ্বর? কিছু করছেন?'

'কী করবো ক দেহি মা? জ্বর কমানোর লাইগ্যা এইটুক বাচ্চার মাথায় পানিও ঢালন যায় না। আরো ঠাণ্ডা লাইগ্যা যায়। তার ওপর কিচ্ছু খায় না।'

'কিছুই না?'

'একটু সাবুর দানা, একটু দুধ খাওয়ানোর চেষ্টা করি। তা এক চামুচ খাইলে দশ চামুচ মুখেই নেয় না। নিলেও বমি দিয়া দেয়। আর সারাডা রাইত মার দুধের লাইগ্যা কান্দে।'

'আপনেতো সারা রাইত ঘুমাইতে পারেন না?'

বাহাদুরের মা এই প্রশ্নের উত্তর আর মুখে দিলেন না। ক্লান্ত-অসহায় ভঙ্গিতে বুঝিয়ে দিলেন। কিন্তু মায়াকে নিয়ে প্রচণ্ড দুশ্চিন্তায় পড়ে গেলো জোহরা। সে নিশ্চিত, এই মেয়েকে আর কদিন এখানে রাখলে তার মৃত্যু অবধারিত। কিন্তু কী করবে সে? অনেক ভেবেও কোনো উপায় পেলো না জোহরা। শেষ অবধি সকল দ্বিধা, সঙ্কোচ, অভিমান ভেঙে সে তোরাব আলী লস্করের কাছে গেলো। সে ভেবেছিলো তার দাদাজান বোধহয় গম্ভীর হয়ে থাকবেন। কিন্তু তোরাব আলী লস্কর তেমন কিছুই করলেন না। বরং জোহরার কাছে সব শুনে বললেন, 'তাইলে এহন কী করতে চাস?'

'সেইটাইতো বুঝতে পারতেছিনা দাদাজান।'

'মাইয়ারেতো ডাক্তার-কবিরাজ কিছু দেহান লাগে, লাগে না?'

'ডাক্তার কবিরাজ এহন কই পাবো এইহানে?'

'সেইটাইতো চিন্তা। আর ওইটুক মাইয়ারে এই অবস্থায় টেলারের জার্নি করাইয়া কোনো গঞ্জের পথে অতদূর নিয়াওতো যাওন যাইবো না।'

'হুম। কী যে করবো?'

তোরাব আলী লস্কর মৃদু হেসে বললেন, 'এক কাম কর। মাইয়াডারে কয়দিন আইনা নিজের ধারে রাখ। তারপর একটু ভালোর দিকে গেলে একটা না একটা ব্যবস্থা করন যাইবো নে।'

তোরাব আলী লস্করের কথায় জোহরা যতটা না খুশি হয়েছে, তার চেয়েও বেশি অবাক হয়েছে। এই মানুষটা কী করে বুঝলো যে সে মায়াকে এনে তার কাছে রাখতে চায়? কিন্তু কথাটা সে মুখ ফুটে বলতে চায়নি। এমনকি কোনো ইঙ্গিতও দেয় নি। তাহলে? তোরাব আলী লস্করের প্রতি এক অনির্বচনীয় ভালো লাগায় জোহরার মনটা হঠাৎ আবিষ্ট হয়ে গেলো। এই কটা দিন সে দাদাজানের কাছ থেকে ওভাবে দূরে সরে থেকেছিলো বলে এখন খুব খারাপ লাগছে। এই জগতে তার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা ওই কঠোর কঠিন মানুষটার চেয়ে তাকে আর কে বেশি ভালোবাসে? কিংবা এমন করে আর কে কাকে ভালোবাসে?

জোহরার খুব ইচ্ছে করছিলো তার দাদাজানকে জড়িয়ে ধরতে। কিন্তু বিষয়টা তার নিজের কাছেই কেমন উদ্ভট আর হাস্যকর মনে হলো। সে নিজেকে সামলে গম্ভীর গলায় বললো, 'না দাদাজান, কী দরকার ঝামেলার?'

তোরাব আলী লস্কর এবার এগিয়ে এলেন। তারপর জোহরার চিবুকে আলতো করে হাত রেখে বললেন, 'আমার ওপর অনেক রাগ না?'

New Pdf download: www.PoragEducation.com + webtalkbd.com

জোহরা কথা বললো না। তবে তার দাদাজানের চোখ থেকে সে চোখ নামিয়ে নিলো। তোরাব আলী লস্কর বললেন, 'মাইয়াডারে নিয়া আয়। আর কিছু লাগলে আমারে জানাইস।'

সেই রাতে জোহরা এক মুহূর্তের জন্যও চোখ বন্ধ করতে পারলো না। মায়ার শরীর অসম্ভব খারাপ থাকার কারণেই হয়তো সন্ধ্যার দিকে সে ঘুমিয়ে পড়লো। জোহরা ভেবেছিলো মায়াকে যে যত্ন করে সে রেখেছে, সে কারণেই হয়তো আগেভাগেই ঘুমিয়ে পড়েছে। বাহাদুরের মা অসুস্থ থাকায় হয়তো ঠিকমতো দেখভাল করতে পারেননি, আর সেকারণেই রাতভর কাঁদতো মায়া। কিন্তু জোহরার ভুল ভাঙলো রাত খানিক বাড়তেই। মায়া প্রথমে বিচ্ছিন্নভাবে বার কয়েক কান্নাকাটি করলো। তারপর আচমকা চিৎকার শুরু করলো। জোহরা রাজ্যের বিস্ময় নিয়ে মায়ার দিকে তাকিয়ে রইলো। ওইটুকু শরীর থেকে এমন তীব্র চিৎকারের শব্দ কী করে বের হচ্ছে তা সে ভেবে পেলো না। গভীর রাত অবধি নানা চেষ্টা করেও সে মায়াকে ঘুম পাড়াতে পারলো না। বরং চিৎকারের মাঝখানে বার কয়েক বমিও করলো সে। জোহরা রীতিমতো আতঙ্কিত হয়ে গেলো। কিন্তু কাউকে ডাকলো না সে। যতটা সম্ভব নিজেই চেষ্টা করলো সামলাতে। ভোররাতের দিকে মায়া একটু ঘুমাতে জোহরারও চোখ লেগে এলো। কিন্তু সেই ঘুম বেশিক্ষণ থাকলো না। ভোরের আলো ফোটার সাথে সাথে আবার ঘুম ভেঙে গেলো মায়ার। আবার শুরু হলো অবিরাম চিৎকার। জোহরা ঘুমে ঢুলু ঢুলু চোখে তাকালো। মায়া তার গা ঘেঁষে বসে আছে। জোহরা তাকাতেই তার কান্না আচমকা থেমে গেলো। কিছুক্ষণ সে স্থির দৃষ্টিতে জোহরার চোখের দিকে তাকিয়ে রইলো। তারপর ডান হাত বাড়িয়ে জোহরার চোখ ছুঁয়ে দিলো। জোহরা ঘটনা বুঝলো না। তবে মায়া যে তার কান্না বন্ধ করেছে, এতেই সে খুশি। মায়া আরো বার কয়েক জোহরার চোখে হাত বোলালো। তারপর সামনের দিকে খানিকটা ঝুঁকে জোহরার গালের সাথে গাল চেপে শুয়ে পড়লো। মায়ার গাল চিমসানো, কিন্তু তারপরও তার ওইটুকু গালের স্পর্শে কী করে এত আদর লুকিয়েছিলো জোহরা তা ভেবে পেলো না। সে এক হাত দিয়ে মায়াকে তার গালের সাথে চেপে ধরে রাখলো।

অদ্ভুত ঘটনা হলেও সেই দিনটা খুব ভালো গেলো মায়ার। সাথে জোহরারও। কিন্তু যন্ত্রণা শুরু হলো আবার রাতে। পরপর কয়েক রাত মায়াকে সামলাতে গিয়ে জোহরার অবস্থাও ভয়ানক খারাপ হয়ে উঠলো। খারাপ হলো মায়ার শরীরও। মাঝখানে জ্বরটা খানিক সেরে গেলেও আবার বাড়লো। সাথে শুরু হলো পাতলা পায়খানা আর বমিও। ওইটুক শরীর যেন আর নিতে পারছিলো না।

জোহরা বুঝতে পারছিলো মায়াকে আর বাঁচানো যাবে না। রাতভর সে মায়াকে বুকের সাথে চেপে ধরে কাঁদলো। কিন্তু সে জানে, মেয়েটাকে এভাবে বাঁচিয়ে রাখার ক্ষমতা তার নেই। ভোর নাগাদ মায়ার অবস্থা দেখে জোহরারও মনে হলো, এভাবে কষ্ট পেয়ে বেঁচে থাকার চেয়ে মেয়েটার মরে যাওয়াই ভালো। ফজরের আজানের সাথে সাথে সে ওজু করে নামাজে দাঁড়ালো। এবং জায়নামাজে দীর্ঘসময় মোনাজাতে সে মায়ার শান্তিময় মৃত্যুর জন্য প্রার্থনা করলো। ভোরের আলোয় যতক্ষণে চারদিক আলোকিত হয়ে উঠেছে, ততক্ষণে মায়া যেন এক নীরব নিস্তব্ধ জগতে নিজেকে সমর্পণ করেছে। সে গভীর নিদ্রায় শায়িত হয়ে রইলো বিছানায়।

জায়নামাজ থেকে সেই দৃশ্য দেখে জোহরার বুকের ভেতর যেন অদ্ভুত এক শান্তিতে ভরে গেলো। অন্তত বেঁচে থেকে ওই ভয়াবহ নরক যন্ত্রণাতো আর মেয়েটাকে ভোগ করতে হলো না। জোহরা বাইরে বের হয়ে বিলের ঘাটে দাঁড়ালো। সকালের ফুরফুরে হাওয়ায় শরীরটা জুড়িয়ে গেলো তার। কেমন যেন এক ধরনের ভার মুক্তি লাগছে জোহরার। সে জানে না এই অনুভূতিটা অস্বাভাবিক কিনা! তবে আশ্চর্যজনক ঘটনা হলো, মায়ার মৃত্যুতে তার খারাপ লাগছে না।

জোহরা ঘুরে দাঁড়ালো। বাহাদুর আর তার মাকে খবরটা দেয়া উচিত। কাছেই বাহাদুরের ঘর। টানা কয়েক দিন কী এক কাজে চরের বাইরে ছিলো সে। আজ সকালেই এসেছে। জোহরা বাহাদুরকে ডেকে নিয়ে এলো। কিছু বললো না। সূর্য ততক্ষণে খানিকটা উঠে গেছে। গাছপালার ফাঁক-ফোকর দিয়ে আলো আসতে শুরু করেছে। এক চিলতে তেরছা লম্বা রোদ এসে পড়েছে জোহরার ঘরের দরজায়। সে বাহাদুরকে নিয়ে সেখানে এসে দাঁড়িয়ে আচমকা আবিষ্কার করলো বিছানার ওপর মায়া বসে আছে।

তাদের দেখেই চিৎকার করে কান্না শুরু করলো সে।

New Pdf download: www.PoragEducation.com + webtalkbd.com

আজাহার খন্দকার বসে আছেন উঠানে। তার সামনে একটা কুকুর। কুকুরটা মাটিতে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা বিস্কুটের টুকরো খাচ্ছে। এখানে সেখানে চা পড়ে মাটি ভিজে গেছে। সেই মাটি চেটেও সে চায়ের স্বাদ নেয়ার চেষ্টা করছে। খানিক আগেই বিস্কুটের পিরিচসহ চায়ের কাপ ছুড়ে মেরেছেন আজাহার খন্দকার। এখন পাথরের মূর্তির মতো বসে আছেন। তার শক্ত চোয়াল নিঃশব্দে ওঠানামা করছে। আজাহার খন্দকারের সামনে বসেছিলেন মনসুরের বড় খালা আর খালু। তারা আজাহার খন্দকারের এই চেহারার সাথে পরিচিত না। আজাহার খন্দকার চায়ের কাপ ছুড়ে ফেলতেই তারা দুজন বসা থেকে উঠে দাঁড়িয়েছেন। এখন বুঝতে পারছেন না বসবেন না দাঁড়িয়েই থাকবেন। আজাহার খন্দকারের পেছনে দাঁড়িয়ে আছে মতি। সে কিছু একটা বলতে চাইছিলো। তার আগেই আজাহার খন্দকার আশ্চর্যরকম নির্লিপ্ত কণ্ঠে ডাকলেন, 'বড় আপা?

মনসুরের বড় খালা খানিক বিচলিত গলায় বললেন, 'জে।'

'আপনার ছোট মাইয়ার নাম জানি কী?'

'সুরাইয়া।'

'আপনে চান তারে মনসুরের সাথে বিয়া দিতে?'

মনসুরের বড় খালা এই প্রশ্নের উত্তর দিলেন না। তিনি চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন। আজাহার খন্দকার বললেন, 'সন্তান বিয়া করাইতে হয় তার ফ্যামিলি দেইখ্যা। আমি আপনের ফ্যামিলিতে আমার ছেলেরে কী দেইখা বিয়া করাবো?'

'কী দেইখ্যা বিয়া করাইবা মানে?'

'মানে কলাগাছের গোড়া দিয়া কলাগাছই বাইর হয়, বটবৃক্ষ বাইর হয় না। আমি আপনেরে দেইখ্যা আপনের মাইয়ারে বিয়া করাবো?'

আজাহার খন্দকারের কথা শুনে বড় খালা হকচকিয়ে গেলেন। তিনি বললেন, 'তুমি আমার সাথে এমনে কথা বলতেছো কেন?'

'আপনের সাথে আমার এমনে কথা বলার কথা না। খুবই বাজেভাবে কথা বলার কথা। কিন্তু আপনের ছোট বোন আমার স্ত্রী ছিলো। এইজন্য আরো বাজেভাবে কথা বলতে পারতেছি না। শোনেন বড় আপা, আমি দুনিয়ার সব কিছু মানতে পারি। কিন্তু আমারে কেউ বেহুদা অপমান করলে মানতে পারি না। আপনে গোবিন্দপুরে যেই কাজ করছেন, তাতে আমার উচিত ছিলো মতি মিয়ারে দিয়া আপনের গলা ধাক্কা দিয়া এই বাড়ি থেইক্যা বাইর কইরা দেওনের। কিন্তু আপনে আমার স্ত্রীর বড় বোইন। এইজন্য সেইটা করলাম না। আপনে আমার একটা উপকার করেন।'

বড় খালা কী বলবেন ভেবে পাচ্ছিলেন না। তার সারা শরীর কাঁপছে। রাগে, ক্ষোভে মাথা ঝিমঝিম করছে। তিনি ভেবেছিলেন গোবিন্দপুরের ঘটনা তিনি আজাহার খন্দকারের কাছে এমনভাবে উপস্থাপন করবেন, যাতে আজাহার খন্দকার তার প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে ওঠেন। এবং গোবিন্দপুরের বিয়ে যেহেতু অমন বাজেভাবে ভাঙা হয়েছে, সেহেতু আজাহার খন্দকার বিষয়টিকে খুব সহজভাবে নেবেন না। ওরকম অপমান যারা তাকে করেছে, তাদের সাথে সম্বন্ধ করার প্রশ্নই আসে না। সুতরাং তার কন্যা সুরাইয়ার সাথে মনসুরের বিয়েটা এখন সময়ের ব্যাপার মাত্র। কিন্তু নিষেধ করা সত্ত্বেও মতি মিয়া আগেভাগেই সব ঘটনা পুরোপুরি খুলে বলেছিলো আজাহার খন্দকারকে। ফলে ঘটনা ঘটলো পুরোপুরি উল্টো।

আজাহার খন্দকার পুরোপুরি শান্ত ও স্বাভাবিক গলায় বললেন, 'বড় আপা মনসুরের বিয়া ওই মাইয়ার সাথেই হইবো। আমি নিজে যাবো তাদের বাড়িতে। তারা রাজি না হইলে আমি তাদের হাতে পায় ধরবো। মাইয়া না নিয়া আমি ফিরবো না। আর আপনে এহন যেই উপকারটা আমার করবেন, সেইটা হইলো এরপর আর কোনদিন আপনে আমার বাড়িতে আসবেন না। আজকেই শেষ। আমি চাই না খোনকার বাড়ির পুত্রবধূরে যে অকথ্য অপমান আপনে করছেন, সেই বউ তার জীবনে আর কোনদিন আপনের ওই মুখখান দেখুক। মতি আপনের যাওনের ব্যবস্থা কইরা দিবে। কোনো অসুবিধা হইবো না।'

সামান্য থেমে তিনি মতিকে বললেন, 'আর আমার গোবিন্দপুর যাওনের ব্যবস্থা কর। সম্ভব হইলে আইজ কাইলের মইধ্যেই কর।'

আজাহার খন্দকারর অবশ্য আজ-কালের মধ্যেই গোবিন্দপুর যেতে পারলেন না। তার অপেক্ষা করতে হলো পরের সপ্তাহ পর্যন্ত। কারণ নবীগঞ্জ থেকে ভেদরগঞ্জ হয়ে লঞ্চে গোবিন্দপুর যাওয়া সহজ কাজ নয়। এইজন্য নির্দিষ্ট দিনের লঞ্চের জন্য অপেক্ষা করতে হয়। ফলে তার বিলম্ব হলো। যদিও তিনি মুহূর্তকালও আর অপেক্ষা করতে রাজি ছিলেন না। দীর্ঘ ও ক্লান্তিকর যাত্রা শেষে তিনি যখন গোবিন্দপুর পৌছালেন, তখন রাত গভীর। তার সাথে গিয়েছে তার দুই পুত্র ও মতি মিয়া। জসিম তাদের এগিয়ে নিতে এসেছিলো গোবিন্দপুর লঞ্চঘাট। রাতে তাদের

New Pdf download: www.PoragEducation.com + webtalkbd.com

বাড়িতেই ওঠার কথা। কিন্তু আজাহার খন্দকার বললেন, 'ফজরের আজানের আর বেশি বাকি নাই। আশেপাশে কোন মসজিদ থাকলে সেইখানে নামাজ পইড়াই আমি মেয়ের বাড়ি যাইতে চাই।'

জসিম বললো, 'অতো ভোরে চাচাজান, কেউতো ঘুমেরতনই উঠবো না!'

আজাহার খন্দকার বললেন, 'না উঠলে নাই। তারা ঘুম থেকে ওঠা পর্যন্ত আমি দাঁড়াই থাকবো।'

মতি মিয়া বললো, 'আপনে এত অস্থির হইতেছেন কেন? তারাতো আর বাড়ি ঘর রাইখ্যা পলাইয়া যাইতেছে না!'

আজাহার খন্দকার বললেন, 'তারা পলাইয়া যাইবো ক্যান? যে অপমান আমি হইছি, পলাইয়াতো যাওনের কথা আমার! আমি আজাহার খোনকার এক কথার মানুষ। আমি যহন কইছি ওই মাইয়ারে আমার পোলার বউ করবো, তহন সেই মাইয়া আমার পোলার বউ হইয়া গ্যাছে। খোনকার বাড়ির বউরে যেইসব কথা কইয়া অপমান করা হইছে, সেই অপমান আমার। আমি যদি তারে ঘরে নিতে না পারি, তাইলে সারা জীবন আমি আমার নিজেরে মাফ করতে পারবো না।'

তিনি তার কথা রাখলেন। কণাদের বাড়ির সামনের রাস্তায় তিনি ফজরের নামাজ শেষে দাঁড়িয়ে রইলেন একা। ভোর বেলা দেলোয়ার হোসেন হাঁটতে বেরিয়ে দেখেন তার বাড়ির সামনে শুভ্র শশ্রুমণ্ডিত একহারা গড়নের শক্ত সামর্থ্য এক বৃদ্ধ দাঁড়িয়ে আছেন। তার হাতে একখানা কাপড়ের ব্যাগ। তিনি কাছে গিয়ে সালাম দিলেন। বৃদ্ধ ভরাট গলায় সালামের জবাব দিয়ে বললেন, 'আমার নাম আজাহার খোনকার। আমি নবীগঞ্জ নিবাসী মরহুম ইয়াকুব আলী খোনকারের বড় ছেলে।'

দেলোয়ার হোসেন দ্বিধাগ্রস্ত গলায় বললেন, 'আপনাকে ঠিক চিনতে পারলাম না।'

আজাহার খন্দকার কোনো ভনিতা করলেন না। তিনি সরাসরিই বললেন, 'আমার বড় পুত্রের নাম মনসুর। তার জন্য আমি আপনার একমাত্র কন্যা কণার বিবাহের প্রস্তাব নিয়া আসছি।'

দেলোয়ার হোসেনের হাসি হাসি মুখখানা মুহূর্তেই গম্ভীর হয়ে গেলো। আজাহার খন্দকার তাকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়েই বললেন, 'আমি জানি, যে ঘটনা ঘটেছে, তারপর কোন বাবাই তার মাইয়া এইরম কোন পরিবারে দিতে চাইবো না। আমি হইলেও দিতাম না। আপনে যা করছেন, তা শুইনা আমি অবাক হইছি। এত কমে আপনে ছাইড়া দিলেন কেমনে!'

আজাহার খন্দকার একটু দম নিলেন। দেলোয়ার হোসেন খানিক ক্রোধ এবং কৌতূহল মিশ্রিত চোখে তাকিয়ে আছেন। আজাহার উদ্দিন বললেন, 'তারপরও আমি কেন আসছি? আমি আসছি আপনার কাছে হাতজোড় কইরা মাফ চাইতে। যেই ঘটনা ঘটছে, তার কোন মাফ নাই, আমি জানি। তারপরও আমার ধারণা আপনে আমাকে মাফ করবেন।'

তিনি সত্যি সত্যি দুই হাত জোড় করে দেলোয়ার হোসেনের সামনে দাঁড়িয়ে রইলেন। হঠাৎ মুখোমুখি হওয়া এই পরিস্থিতিতে তিনি কী করবেন, তা দেলোয়ার হোসেন ভেবে পেলেন না। আজাহার খন্দকার বললেন, 'আমি সারাজিবনে এমন কোন কাজ করি নাই, যার জন্য অন্য মানুষের কাছে আমার মাফ চাইতে হয়। জীবনে আইজ প্রথম আমি কারো কাছে মাফ চাইলাম। তাও আমার নিজের অপরাধের জন্য না। অন্য একজনের জন্য। মাফ করা না করা আপনের বিবেচনা। তয় আপনে মাফ না করা পর্যন্ত আমি এই বাড়ির সামনে থেইকা নড়বো না। এইভাবেই দাঁড়াই থাকবো। আমি আজাহার খোনকার এক কথার মানুষ।'

দেলোয়ার হোসেন এবার রীতিমতো বিচলিত বোধ করছেন। বাইরে কথাবার্তার শব্দ শুনে শাহিনা বেগম দরজা খুলে উঠানে এসে দাঁড়িয়েছেন। তার চোখে-মুখেও বিস্ময়। খুব ভোর হলেও দুয়েকজন মানুষও জমতে শুরু করেছে। বিষয়টি নিয়ে দেলোয়ার হোসেন সতর্ক। তার ঘরে সোমত্ত মেয়ে। আজ হোক, কাল হোক এই মেয়েকে তার বিয়ে দিতে হবে। কিন্তু এই ঘটনা একবার কারো কানে গেলে তা তিল থেকে তাল হয়ে পাঁচ কান ছড়াবে। এটা তিনি চান না। তিনি তড়িঘড়ি করে বললেন, 'আপনি বিচলিত হবেন না। যা হওয়ার হয়ে গেছে। ওসব আমি মনে রাখি নাই।'

আজাহার খন্দকার বললেন, 'এইভাবে বললে হবে না। আপনার আমারে সত্যি সত্যিই ক্ষমা করতে হবে।'

দেলোয়ার হোসেন ভারি বিপদে পড়ে গেলেন। তিনি এক পা সামনে এগিয়ে আজাহার খন্দকারের প্রসারিত হাত দুখানা ধরে নরম গলায় বললেন, 'ভাই সাহেব। আপনি এমন করবেন না। এখন আমার নিজেরেই অপরাধী লাগছে। আপনি দয়া করে আর এভাবে দাঁড়িয়ে থাকবেন না।'

আজাহার খন্দকার তারপরও জায়গা থেকে নড়লেন না। তিনি বললেন, 'আপনে আমারে মাফ করছেন, এইটা আপনেরে বলতেই হবে।'

দেলোয়ার হোসেনের এবার রীতিমতো বিরক্ত লাগছে। কিন্তু আশেপাশে জড় হতে থাকা লোকজন দেখে তিনি তা প্রকাশ করলেন না। আজাহার খন্দকারের হাত ধরে তিনি তার বাড়ির উঠানের দিকে নিয়ে যেতে যেতে বললেন, 'চলেন, ঘরে বসে কথা বলি। বাইরে রাস্তার লোকজন কী ভাবছে বলেন দেখি!'

আজাহার খন্দকারের কথাটা পছন্দ হলো। তিনি তার সাথে গুটিগুটি পায়ে বাড়ির ভেতরে গেলেন। কণা তখনো ঘুম থেকে ওঠেনি। তার মানসিক অবস্থা ভয়াবহ! সেদিন মনসুরের খালারা চলে যাওয়ার পর থেকে এমন একটি রাতও নেই যে সে ঘুমাতে পেরেছে। সারারাত জেগে থেকে ভোরের দিকে সামান্য তন্দ্রার মতো লেগে আসে তার। তারপর দিনভর থম মেরে বসে থাকে জানালার পাশে। সে জানে, তার বাবা-মার এখানে কোনো দোষ নেই। কিন্তু তারপরও জগৎ-সংসারের প্রতি কী এক তীব্র অভিমানে ক্রমশই ভেতরে ভেতরে ক্ষয়ে যাচ্ছে সে। পড়াশোনা

New Pdf download: www.PoragEducation.com + webtalkbd.com

এক প্রকার ছেড়েই দিয়েছে। কলেজেও যায় না কতদিন! কেবল বাবা কষ্ট পাবে বলে মাঝে-মধ্যে বই খুলে টেবিলে বসে থাকে। কিন্তু একটা শব্দও কখনো পড়া হয় না তার।

আজাহার খন্দকারকে বসতে দিয়ে দেলোয়ার হোসেন বললেন, 'ভাই সাহেব, আমার একটা মাত্র মেয়ে। আমি ধন-সম্পদে বিত্তশালী না হতে পারি, কিন্তু মনের দিক থেকে ধনী মানুষ। মেয়েরেও যতটুকু সম্ভব সেইভাবে মানুষ করার চেষ্টা করছি। মেয়ে যেহেতু হইছে, বিয়া শাদিতো দিতেই হবে। তাই ভালো একটা পাত্রই খুঁজতেছিলাম। কিন্তু আমার মন ভেঙে গেছে। দুনিয়াটা যদি এমন কুৎসিত, কদাকার হয়, তাহলে আমার মেয়েরে আমি ঘরেই রাখবো।'

একনাগাড়ে কথাগুলো বলে দেলোয়ার হোসেন সামন্য দম নিলেন। তারপর আবার বললেন, 'আপনার ওপরে আমার কোনো রাগ নেই। আমি বরং সেদিনের ঘটনায় আমার ব্যবহার নিয়াও একটু লজ্জিত। আমি ওরকম নাও করতে পারতাম। এইটা আশা করাটাওতো বোকামি যে দুনিয়ার সব মানুষ সুস্থ হবে, ভালো হবে, তাই না? এইটা হইলো বারো রকমের মেলা।'

আজাহার খন্দকার চুপ করে রইলেন। দীর্ঘসময় পর বললেন, 'আমার স্ত্রী নাই, গত হয়েছেন আইজ এগারো বছর। আমার দুই ছেলে। বড়জন মনসুর। আর ছোট জন মনজুর। সবাই মঞ্জু বইলাই ডাকে। তার বয়স যহন পাঁচ তহন তার মা মারা যায়। সেই থেইকা এই দুইজনের বাপ-মা আমিই। ছবি দেইখাতো মানুষের চেহারা ছবি বোঝন যায় না, কিন্তু আপনের মাইয়ার ছবি দেইখা আমার মনে হইছে, এই মাইয়াডা যদি আমার ঘরে আহে, তাইলে আমার ঘর বেহেশত হইয়া যাইবো। আমার মাইয়া নাই। এ হইবো আমার মাইয়া। আমি আর আগেকিছু ভাবি নাই। আইজ যদি ছেলের মা বাইচ্যা থাকতো, এই জঘন্য ঘটনা কোনোদিনও ঘটতো না ভাইসাহেব। যতই বাপ থাউক, মা হইলো গিয়া পোলাপানের ঠিকানা। মা ছাড়া পোলাপানের কী দশা হয়, এইটাতো নিজ চৌক্ষেই দেখলেন। আপনি আমারে মাফ কইরা দেন।'

আজাহার খন্দকারের গলা শেষ দিকে ভারি হয়ে এলো। দেলোয়ার হোসেন অপ্রস্তুত ভঙ্গিতে বললেন, 'আচ্ছা আচ্ছা ভাই। যা হয়েছে, বাদ দেন। আমি ওসব মনে রাখি নাই। অতদূর থেকে আসছেন, বসেন, চা নাস্তা কিছু খান, বিশ্রাম নেন।

'আপনে আমারে মাফ করছেন তো?'

দেলোয়ার হোসেন অগত্যা বলতে বাধ্য হলেন, 'আচ্ছা, মাফ করেছি।'

আজাহার খন্দকার সাথে সাথেই বললেন, 'তাহলে আপনের মাইয়া নিয়ে আসেন। আমি এহনই আমার মায়ের হাতে আংটি পরাই যাবো। আপনে রাজি থাকলে বিয়াও আইজই হইবো। আমি বউ নিয়া বাড়ি যাবো। পরে দশ গ্রাম দাওয়াত দিয়া অনুষ্ঠান হইবো।'

দেলোয়ার হোসেন এবার যারপরনাই বিস্মিত এবং বিরক্ত হলেন। তিনি খানিক রুষ্ট গলায়ই বললেন, 'আপনের কী মাথার ঠিক আছে? আপনের ধারণা অতকিছুর পরও আমি আপনার ঘরে আমার মেয়ে বিয়া দিবো। আমাকে আপনি কী ভাবছেন? আমার মেয়েকে আপনারা কী ভাবছেন? আপনি ভালো মানুষের মতো আসছেন, বসছেন, ঘটনার জন্য লজ্জিত হয়েছেন, এর মানে এই না যে ওই বাড়িতে আমি আমার মেয়ে বিয়ে দিবো! আর...।'

কথাটা বলবেন কী বলবেন না ভাবতে খানিক সময় নিলেও শেষ পর্যন্ত বলেই ফেললেন দেলোয়ার হোসেন, 'আর আমি মানুষ খারাপ না বলেই আপনি এখনো এইখানে আমার ঘরে বসে আছেন। আমার জায়গায় অন্য কেউ হলে এতক্ষণে...।'

আজাহার খন্দকার চুপচাপ বসে রইলেন। নিঃস্ব, অসহায়, বিধ্বস্ত এক মানুষের প্রতিচ্ছবি যেন। তার এই দীর্ঘ জীবনে এমন ঘটনা বোধহয় আর কখনোই ঘটেনি। তার মনে হচ্ছে তার পায়ের নিচের মাটি কাঁপছে। তিনি ঠিকমতো চোখে দেখছেন না। তারপরও তিনি নির্লজ্জের মতো সেখানেই বসে রইলেন। বাইরের ঘরে বাবার উত্তেজিত কণ্ঠস্বর শুনে কণার তন্দ্রাচ্ছন্নতা কেটে গেছে। সে একবার ভাবলো মাকে জিজ্ঞেস করবে। কিন্তু সাথে সাথেই আবার আগ্রহ হারিয়ে ফেললো। জগৎ-সংসারে আর কোনো কিছুর প্রতিই তার যেন কোনো আগ্রহ নেই।

আজাহার খন্দকার একবার ভাবলেন তিনি উঠে যাবেন। কিন্তু পরক্ষণেই আবার কী মনে করে উঠলেন না। তারপর অস্ফুট গলায় বললেন, 'আমি কী একটু তার সাথে কথা বলতে পারি? তার কাছেও একটু মাফ চাইয়া যাইতে চাই।'

দেলোয়ার হোসেন এবার উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। কিন্তু তাতে হিতে বিপরীত হলো। কণা কৌতুহলী হয়ে বিছানা থেকে উঠে এলো। তার বাবার সামনে শুভ্র সৌম্য চেহারার সুপুরুষ এক বৃদ্ধকে এমন জড়সড় ভঙ্গিতে বসে থাকতে দেখে সে খুবই অবাক হলো। তার বাবার উদ্ধত ভঙ্গির সামনে লোকটার অমন কাচুমাচু মুখ দেখে কণার কী যে মায়া হলো!

সে তার বাবার দিকে তাকিয়ে বললো, 'বাবা! কী হয়েছে?'

দেলোয়ার হোসেন কণার প্রশ্নের উত্তর দিলেন না। কেবল বললেন, 'তুই ঘরে যা।' কণা অবশ্য ঘরে গেলো না। সে কথা বললো আজাহার খন্দকারের সাথে। শক্ত, সার্মথ্য আজাহার খন্দকার কণার দিকে তাকিয়ে কেমন এলোমেলো হয়ে গেলেন। মেয়ের গায়ের রং সামান্য ময়লা সে ঠিক আছে, কিন্তু এমন মায়াময় মুখ, এমন গভীর কাজল চোখ তিনি তার এই জীবনে আর দেখেছেন কিনা মনে করতে পারছেন না। সেই চোখের দিকে তাকিয়ে তিনি উঠে দাঁড়ালেন। তার শরীর যেন কাঁপছে। তিনি কোনো মতে জড়ানো গলায় বললেন, 'মাগো!'

সেই ব্যাকুল কণ্ঠস্বরের গভীরে কোথাও কী এক অব্যক্ত অথচ সুতীব্র আকুতি লুকিয়ে ছিলো কণা জানে না। কিন্তু তা তার বুক এফোঁড়-ওফোঁড় করে দিলো। সে ছুটে এসে আজাহার খন্দকারের কম্পমান হাত জোড়া ধরে ফেললো। তারপর বললো, 'আপনার কী হয়েছে?'

New Pdf download: www.PoragEducation.com + webtalkbd.com

সেই উত্তর আর আজাহার খন্দকারের দিতে হলো না। তার জল ছলছল চোখের কোণায় আটকে থাকা অশ্রুবিন্দু দেখে কণা যেন এক নিমেষেই কত কিছু পড়ে ফেলতে পারলো। কতকিছু বুঝে ফেলতো পারলো। তারপরও আজাহার খন্দকার ভেজা গলায় বললেন, 'আমি তোমার এক বৃদ্ধ বাবা, তোমার কাছে মাফ চাইতে আসছি মা...।'

কণা তাকে আর কিছু বলতে দিলো না। মুহূর্তেই সে যেন দেলোয়ার হোসেনের ছোট্ট কণা থেকে আজাহার খন্দকারের পরিণত মা হয়ে গেলো। সে তার বাবার রক্ত চক্ষু, মায়ের ভর্ৎসনা উপেক্ষা করে আজাহার খন্দকারের পাশে দীর্ঘ সময় বসে রইলো। আজাহার খন্দকার তার সাথের ব্যাগখানা থেকে বহু পুরনো একখানা আংটি বের করে কণার পাশে রাখলেন। তারপর বললেন, 'এই আংটিখানা আমার মায়ের, সে দিয়ে গিয়েছিলো মনসুরের মারে। কিন্তু তার ভাগ্যে রইলো না, এই আংটি সে তোমারে পরায়। এইজন্য আমি নিয়া আসছি। এই আংটি তোমারে পরানোর ক্ষমতা আমার নাই। আমি রাইখ্যা যাইতেছি। তোমার পরতে ইচ্ছা না হইলে ফেরত পাঠাই দিও।'

তিনি ব্যাগ থেকে একখানা শাড়ি, আর একখানা গলার হার বের করলেন, 'এইগুলানও মনসুরের মায়ের কাছেরতন তোমার পাওনের কথা। কিন্তু সেই ভাগ্য দুইজনের কাউরই হইলো না। এইগুলানও আমি রাইখ্যা যাইতেছি। বাকি তোমার ইচ্ছা।'

কণা অবশ্য আজাহার খন্দকারকে যেতে দিলো না। সে সেই আংটি নিজে নিজেই পরে ফেললো। দূরে তার বাবা দেলোয়ার হোসেন প্রবল অবিশ্বাস চোখে নিয়ে তার এত দিনকার অন্তর্মুখী, ভীরু, লাজুক মেয়েটির দিকে তাকিয়ে আছেন। তার মা শাহিনা বেগম অবশ্য তখনো বুঝতে পারছেন না, তিনি কী করবেন? তার কী খুশি হওয়া উচিত, নাকি রাগ! তবে তিনি আবিষ্কার করলেন, তিনি মনে মনে এক ধরনের আনন্দ বোধ করছেন। যদিও মুখে কপট অভিমান ও রাগের ভঙ্গি নিয়ে তিনি দরজার কাছে দাঁড়িয়ে রইলেন।

সেই দিনই গভীর রাতে মনসুরের সাথে বিয়ে হয়ে গেলো কণার।

জোহরা দ্বিতীয়বারের মতো কালীগঞ্জ বন্দরের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করেছে। তবে এবার সে তোরাব আলী লস্করের অনুমতি নিয়েই যাচ্ছে। তার সাথে আছে বাহাদুর, হানিফ আর হামিদুল। জোহরার কোলে নিথর পড়ে আছে মায়া। যেন মৃতপ্রায় লাশ। গতকাল রাত থেকে মায়ার অবস্থা আরো খারাপ হয়েছে। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে সেই গভীর রাতেই মায়াকে নিয়ে রওয়ানা হয়েছে জোহরা। তোরাব আলী লস্কর নিজ থেকেই জোহরাকে অনুমতি দিয়েছেন। সকালের রোদ তেতে উঠছে ক্রমশই। মায়ার বুকে ক্ষীণ হৃৎস্পন্দনের আভাস। তবে তা কেবল জোহরাই টের পাচ্ছে। তার বুকের সাথে লেপ্টে আছে মায়ার হাড় জিরজিরে ছোট্ট শরীর।

বাহাদুর কাতর গলায় বললো, 'আমার কাছে একটু দিবিনি জোহরা?'

জোহরা বললো, 'না বাহাদুর ভাই। তার শইলে ওম দরকার। কী বাতাস দেখছেন? আমার বুকের মইধ্যে আছে, ভালো আছে।'

বাহাদুর বললো, 'ও বাঁইচ্যা আছে জোহরা? আমারে সত্যি কইরা ক।'

'বাঁইচ্যা না থাকলে এত কষ্ট কইরা ওই অতদূরের কালীগঞ্জ বন্দরে তারে লইয়া যাইতেছি ক্যান? খালি যে কষ্ট কইরা যাইতেছি তা-ও তো না, কতবড় ঝুঁকি নিতেছি বুঝতেছেন? পদে পদে বিপদ আমাগো।'

বাহাদুর আর কথা বললো না। তার নিজেকে মনে হচ্ছে পৃথিবীর সবচেয়ে নিঃস্ব এবং অসহায় মানুষ। হানিফ বললো, 'আগেরবার মাছ বেচতে যাওনের সময় তুই তো টলার থেইকা নামস নাই। এইবার কী করবি?'

'এইবারতো নামতেই হইবো। তয়, আপনে আগে নাইমা দেখবেন চাইরপাশের অবস্থা কী? পুলিশ-টুলিশ আছে কী না আশেপাশে। আর ডাক্তাররে

New Pdf download: www.PoragEducation.com + webtalkbd.com

কিছু বুঝতে দেওন যাইবো না। আপনে না গিয়া হামিদুল গেলে সবচেয়ে ভালো। সে গিয়া দেইখা আসবো ডাক্তার আছে কোনখানে? ডাক্তারের কাছে লোকজনের ভীড় কেমন! পরিস্থিতি বুইঝা আমি নামবো।'

হানিফ তার জায়গা ছেড়ে এসে জোহরার গা ঘেঁষে বসলো। তারপর মায়ার কপালে একটু হাত দিয়ে বললো, 'তা শইলতো ঠাণ্ডা। সে বাইচ্যা আছেতো?'

'আছে। আপনে একটু হামিদুলের কাছে যাইয়া বসেন। ছ্যামড়াডা একলা একলা সেই রাইত থেইক্যা ইঞ্জিনের ধারে বইসা আছে!'

'সমস্যা নাই। ও পারবো। ছোট হইলে কী হইবো, তেজ আছে পোলার।'

'সব সময় তেজ দিয়া সবকিছু হয় না। শইলেও শক্তি থাহন লাগে।'

'আরে তুই খালি খালি চিন্তা করস। কথায় আছে না, ছোট মরিচের ঝাল বেশি! হামিদুল হইলো ছোট মরিচ।'

হানিফ আসলে জোহরার এতটা কাছে থাকার সুযোগ নষ্ট করতে চাইছিলো না। বিষয়টা হামিদুল যেমন বোঝে, বোঝে বাহাদুরও। বাহাদুর তাই নিজ থেকেই উঠে গিয়ে হামিদুলের পাশে বসলো। তারপর বললো, 'খালিতো যাওনই না, আসনওতো লাগবো। তুই এক কাম কর হামিদুল। ছইয়ের তলায় একটু ঘুমাইয়া ল। একটু ঘুমাইলে শইলে আবার তাগত পাইবি।'

হামিদুল সত্যি সত্যিই ক্লান্ত। সে আর কথা না বলে চুপচাপ ছইয়ের তলায় এসে শুয়ে পড়লো। জোহরাও ক্লান্ত। শেষ কবে যে সে সারারাত ঘুমিয়েছিলো তা কেবল সে-ই জানে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা একটানা একঘেয়ে ইঞ্জিনের শব্দে তার চোখও ঘুমে ঢুলু ঢুলু হয়ে আসছে। কিন্তু সে সর্বশক্তি দিয়ে জেগে থাকার চেষ্টা করছে। শেষ পর্যন্ত অবশ্য পারলো না। ক্লান্তি আর অবসাদের কাছে হার মানতে হলো তাকে। পাশে বসা হানিফের কাঁধে মাথা রেখে নিজের অজান্তেই ঘুমিয়ে পড়লো জোহরা। তার ঘুম ভাঙলো চারপাশের কোলাহলে। সে চট করে তাকিয়ে দেখে চারপাশে অন্ধকার নেমে এসেছে। কালীগঞ্জ বাজারের নদীতে এসে পড়েছে ট্রলার। ফলে ট্রলারের গতি কমিয়ে আনতে হয়েছে।

চারপাশে নানানরকম নৌকা, ট্রলারের শব্দ। মানুষের হৈ-হুল্লোড়। জোহরা কতক্ষণ ঘুমিয়েছে জানে না। তবে চট করে চোখ মেলে হানিফের কাঁধে নিজের মাথা দেখে কেমন আড়ষ্ট হয়ে গেলো সে। খানিক লজ্জাও। হানিফ অবশ্য এই পুরোটা সময় একটুও ঘুমায়নি। ঘুমন্ত জোহরার মুখের দিকে নিষ্পলক তাকিয়ে ছিলো সে। কী স্নিগ্ধ, কী নিষ্পাপ একখানা মুখ! হানিফের খুব ইচ্ছে হচ্ছিলো, তার বুকের কাছে মায়া ছড়ানো মুখখানা একটু ছুঁয়ে দেখতে। একটু হাত বুলিয়ে আদর করতে।

জোহরার উষ্ণ নিঃশ্বাসে তার শরীর কেমন ঝিমঝিম করছিলো। নানান অবদমিত ইচ্ছেও যেন বেপরোয়া হতে চাইছিলো। নিজেকে বহু কষ্টে সংবরণ করেছে সে। হানিফ জানে, জোহরা সেই মেয়ে না যাকে সে জোর খাটিয়ে আদায়

করতে পারবে। বরং জোহরা যদি কখনো হানিফের আচরণে মুগ্ধ হয়ে ধরা দেয়, তবেই কেবল তার পক্ষে জোহরাকে পাওয়া সম্ভব। কিন্তু সেই পথ কী অসীম ধৈর্য্যের, কী কঠিন পরীক্ষার তা ভেবে প্রায়ই অস্থির লাগে হানিফের। নিজের এই অস্থিরতাটাকে খুব ভয় পায় সে। আর তাই জোহরার কাছে নিজেকে সংবরণ করে রাখার সর্বোচ্চ চেষ্টা করে হানিফ।

জোহরা চোখে-মুখে পানি দিয়ে সামান্য কিছু খেয়ে নিলো। হামিদুল ঘুম থেকে উঠে আবার ট্রলারের হাল ধরেছে। বাহাদুর বললো, 'এহনই কি নামবোনি জোহরা?'

জোহরা বললো, 'রাইত এহন কয়টা বাজে বাহাদুর ভাই? বেশি রাইত হইয়া গেলে কী ডাক্তার পাওন যাইবো নি?'

বাহাদুর বললো, 'তাতো একটু হইছেই। সন্ধ্যা হইছে বহু আগে।'

বিষয়টা নিয়ে জোহরা চিন্তিত। রাত বেশি হয়ে গেলে যদি ডাক্তার না পাওয়া যায়, তাহলে এইখানেই পরদিন ভোর অবধি অপেক্ষা করতে হবে তাদের। কিন্তু এই ঝুঁকিটা সে নিতে চাইছে না। হানিফের দিকে তাকিয়ে জোহরা বললো, 'হামিদুলরে একলা পাঠাইলে ও কীনা কী বোঝে, এক কাম করেন, আপনেও ওর পিছে পিছে যান। গামছা দিয়া মুখটা একটু ঢাইকা যাইয়েন। কওনতো যায় না কে না কে চিন্যা ফালায়।'

হনিফ উদ্ধত স্বরে বললো, 'এইহানে আমারে কে চিনবো? আর চিনলেই বা কী, কোমরে এইটা কী দেখছোস? ভূড়ি গালাইয়া ফালামু না?'

'হিসসস।' জোহরা মুখে আঙুল চাপা দিয়ে হানিফকে সতর্ক করার ভঙ্গিতে বললো, ' কোনো দুর্ঘটনা জানি না ঘটে হানিফ ভাই। এইহানে আমরা কোন ঝামেলা করতে আসি নাই। এইটা মাথায় রাইখেন।'

বাহাদুর কান পেতে মায়ার বুকের শব্দ শোনার চেষ্টা করলো। জোহরা বললো, 'বাহাদুর ভাই, আপনে সবসময় টলার রেডি রাখবেন। চোউখ-কান খোলা রাখবেন। এক কাম করি আমিও তাগো লগে যাই, যত তাড়াতাড়ি পারি আমরা চইলা আসবো।'

'তুই না কইলি পরে নামবি? আগে ওরা অবস্থা দেইখ্যা আসবো!'

'এহন মনে হইতেছে, হাতে আর সময় নাই বাহাদুর ভাই। রাইত কত হইছে কে জানে! তারপর দেখা গেলো ডাক্তার নাই, তহন?'

জোহরার কথার যৌক্তিকতা মেনে নিয়েই বাহাদুর বললো, 'তাইলে এক কাম কর। হামিদুলরে রাইখ্যা যা। বেশি মানুষ যাওনের দরকার নাই। তুই আর হানিফ যা। মাথায় একটু ঘোমটা দিয়া যাবি। লোকে ভাববে বাপ-মা অসুস্থ বাচ্চা লইয়া আইছে। কারো কোনো সন্দেহ হইবো না।'

বাহাদুরের কথাটা সুবিবেচনাপ্রসূত। পরিস্থিতি বিবেচনায় এর চেয়ে ভালো কৌশল আর হয় না। কিন্তু জোহরার আচমকা কেন যেন খুব লজ্জা লাগতে লাগলো। তার জীবনে সম্ভবত এই প্রথম একটা অদ্ভুত অচেনা বিশেষ অনুভূতি

New Pdf download: www.PoragEducation.com + webtalkbd.com

মুহূর্তের জন্য হলেও তাকে ছুঁয়ে গেলো। এবং হানিফের দিকে তাকাতে, কথা বলতে সে ভীষণ আড়ষ্ট বোধ করতে লাগলো। তবে হানিফ যেন মেঘ না চাইতেই ঝড়, জল, বৃষ্টি সব পেয়ে গেলো। সে বিগলিত কণ্ঠে বললো, 'বাহাদুর ভাই ঠিকই কইছে। তুই একটু ঘোমটা টোমটা দে জোহরা। একটু বউ বউ লাগুক। আর তোরে আর আমারে কিন্তু পাশাপাশি মানায়ও। কী বাহাদুর ভাই, জামাই-বউ লাগে না আমাগো দুইজনরে?' সে কথা বলতে বলতে এসে জোহরার গা ঘেঁষে দাঁড়ালো। জোহরা অবশ্য কোনো কথা বললো না। মায়াকে বুকের মধ্যে ভালো করে জড়িয়ে নিয়ে সে ট্রলার থেকে নামলো।

রাত প্রায় দশটা। কালীগঞ্জ বড় বন্দর হলেও এত রাতে ডাক্তার পাওয়া মুশকিল। সারি সারি টিনের দোকান গিজগিজ করছে দু পাশে। এদিকটাতে বেশির ভাগই ধান, পাট, গমসহ কাঁচা মালের পাইকারি আড়ত। তবে প্রায় প্রত্যেক আড়তের সামনেই ছোটখাটো ভ্রাম্যমাণ দোকানের মাল-সামানা দেখা যাচ্ছে। লুঙ্গি, গামছা থেকে শুরু করে কবিরাজি ওষুধ পর্যন্ত। রাত বাড়ায় বেশির ভাগ দোকানই বন্ধ হয়ে গেছে। কেউ কেউ সারাদিনের বিক্রির হিসেব মেলাতে ব্যস্ত। এমন অসংখ্য গলি, উপগলি রয়েছে কালীগঞ্জ বন্দরজুড়ে। এ অঞ্চলের খুবই প্রাচীন নদী বন্দর এটি। কিন্তু এখানে কোন গলিতে ডাক্তার বসে, তা কী করে খুঁজে বের করবে হানিফ আর জোহরা?

দিশেহারা মানুষের মতো তারা এ গলি থেকে সে গলি খুঁজে বেড়াতে লাগলো। কিন্তু কোথাও ডাক্তার বা চেম্বার খুঁজে পেলো না তারা। সবচেয়ে ভয়ংকর ব্যাপার হলো, জোহরার হঠাৎ কেন যেন মনে হলো তাদের কেউ অনুসরণ করছে। সে কথাটা ফিসফিস করে হানিফকে বললোও, 'হানিফ ভাই।'

'হুম।'

'কিছু কী নজরে পড়ছে?'

'না। ডাক্তার সব মরছে নি?'

'ডাক্তার না, কেউ কী আমাগো পিছে লাগছে?' জোহরার কথা শুনেই হানিফ ঘাড় ঘুরিয়ে পেছনে তাকাতে যাচ্ছিলো। কিন্তু তার আগেই জোহরা বললো, 'সাবধান, পেছনে চাইয়েন না। যেমনে হাঁটতে ছিলেন, তেমনেই হাঁটতে থাহেন। খালি চোউখ-কান খোলা রাইখেন।'

হনিফ তাও যতটা সম্ভব আড় চোখে পেছনে দেখার চেষ্টা করলো। এলোমেলো অনেক লোকই হেঁটে যাচ্ছে, এর মধ্যে কাউকে আলাদা করা কঠিন। সে বললো, 'কী না কী কস তুই? কেডা পেছনে লাগবো? আমরা এইহানে আইছি জানে কেডা?'

জোহরা নিজেও নিশ্চিত না। তারপরও কেন যেন মনে হয়েছিলো। সে বললো, 'বাদ দেন। একখান কথা আছে না, চোরের মনে পুলিশ পুলিশ? আমার হইছে সেই দশা।'

হানিফ হাসলো, 'আমরা কী চোর নাকি?'

জোহরা বললো, 'তাইলে কী বলবো, ডাকাইতের মনে পুলিশ পুলিশ?'

হাতের বাঁদিকে বড় একটা বটগাছ। বটগাছের নিচটা সামান্য অন্ধকার। জায়গাটা অন্যান্য জায়গার থেকে নির্জন। সেখানে হঠাৎ চোখ আটকে গেলো জোহরার। বটগাছটার গায়ে একটা বড় সাইনবোর্ড টানানো, 'ডাক্তারখানা।' সে চট করে হানিফের হাত চেপে ধরে বললো, 'এই যে ডাক্তারখানা হানিফ ভাই।'

হানিফ বললো, 'কিন্তু লোকজন আছে বইলাতো মনে হয় না!'

'চলেন ভেতরে গিয়ে দেখি।'

তারা ভেতরে ঢুকলো। এটা মূলত ডিসপেনচারি। ঘরের তিন দিকের দেয়ালজুড়ে তাক। তাকভর্তি থরে থরে ওষুধ সাজানো। একটা লোক বসে খাতায় কিছুর হিসেব তুলছে। আশেপাশে তার কোন খেয়াল নেই। ঘরের বাকিদিকের দেয়ালে সাদা একটা পর্দা ঝোলানো। পর্দার আড়ালে অন্য রুমে যাওয়ার দরজা। সেখানে সম্ভবত ডাক্তার বসেন। হনিফ ক্যাশের লোকটাকে খুব স্বাভাবিক গলায় বললো, 'ডাক্তার আছে নি ভাই?'

লোকটা মুখ না তুলেই বললো, 'ডাক্তার নাই।'

হানিফ আবার বললো, 'এইহানে না থাকলে আর কই পাওন যাইবো, বলতে পারবেন?'

লোকটা এবারও মুখ তুললো না। সে বিরক্ত গলায় বললো, 'এত রাইতে আপনের জইন্য ডাক্তার আইবো কোইথেকা? ডাক্তার কী আপনের জইন্য রাইতভর জাইগ্যা থাকবোনি?'

লোকটার হাবভাব দেখে হানিফের রাগ চড়ে যাচ্ছে। কিন্তু জোহরার কারণে সে কিছু বলতে পারছে না। এবার কথা বললো জোহরা, 'ভাই, আমার মাইয়াডা খুব অসুস্থ। উপায় না দেইখ্যা এই রাইতে এতদূর আইছি। এহন যদি ডাক্তার না পাই, তাইলে আমার মাইয়াডা...!'

জোহরা প্রায় কান্নার ভঙ্গিতে কথাগুলো বললো। লোকটা এবার মুখ তুলে তাকালো। মাঝবয়সি স্বাস্থ্যবান লোক। মাথায় সামান্য টাক পড়েছে। তবে নাকের নিচে চুলের অভাব নেই। মোটাসোটা বিছার মতন গোঁফ। জোহরাকে দেখে যেন লোকটা খানিক আগ্রহী হলো। গোঁফের কারণে স্পষ্ট মুখভঙ্গি বোঝা না গেলেও কণ্ঠস্বরে তার উষ্ণতা টের পাওয়া গেলো, 'বলেন কী সমস্যা?'

'মাইয়াডার অনেক দিন ধইরা জ্বর। কিছু খায় না, ঘুমায় না। সারা রাইত জাইগ্যা থাহে।'

লোকটা কুতকুতে চোখে তাকালো, 'কিছুই খায় না?'

'কিছুই না।'

সে হানিফের দিকে তাকালো, 'এ কী হয় আপনের? স্বামী?'

New Pdf download: www.PoragEducation.com + webtalkbd.com

জোহরা মুখে জবাব দিলো না। তার ভীষণ লজ্জা লাগছে। কিন্তু মাথা ওপর নিচ করে সে হ্যাঁ সূচক উত্তর দিলো। লোকটা তার হাতের খাতাটা বন্ধ করে উঠে এলো। তারপর হানিফের দিকে তাকিয়ে বললো, 'আপনে কী করেন?'

এতক্ষণে হানিফের কিছুটা রাগ চড়ে গেলো। সে বললো, 'আমি কী করি সেইটা দিয়া আপনের কী দরকার? রোগী দেহনের কাম রোগী দেহেন। আর আপনে কী ডাক্তার নি? ডাক্তার কই সেইটা বলেন।'

লোকটা কিছুটা থমকে গেলো। জোহরার সাথে হানিফকে দেখে সে কিছুটা হতাশ বোঝাই যাচ্ছে। কিন্তু হানিফের কাছ থেকে এমন কথা বলার ভঙ্গি সে আশা করেনি। সে বললো, 'আমিই ডাক্তার। কেন আমারে দেইখ্যা আপনের ডাক্তার মনে হয় না?'

হানিফ চট করে বলে ফেললো, 'না মনে হয় না।'

জোহরা ভেবেছিলো লোকটা রেগে যাবে, কিন্তু সে রাগলো না। বরং হা হা হা করে হাসলো। তারপর হাসতে হাসতেই বললো, 'চোহারা দেইখ্যা কী মানুষ বোঝন যায় ভাই? তাইলেতো আপনেরে দেইখ্যাও বোঝনের উপায় নাই যে এত সুন্দর বউর জামাই আপনে। হা হা হা।'

লোকটা সম্ভবত রসিকতা করার চেষ্টা করছে। কিন্তু শেষের কথাটায় হানিফ যারপর নাই অপমানিত বোধ করেছে। যেকোনো মুহূর্তে সে যেকোনো কিছু করতে পারে। জোহরা পরিস্থিতি সামাল দিতে হানিফকে বললো, 'তুমি একটা কাম করো। মায়ার জইন্য একখান গামছা কিন্যা আনো। শইলডা সারাক্ষণ খালি ঘামে। একটু পরপর না মুইছা দিলে আবার জ্বর আইবো।'

জোহরার কথাটুকু কী যে মিষ্টি লাগলো হানিফের কানে। তার এখন সত্যি সত্যি মনে হচ্ছে, সে আর জোহরা স্বামী-স্ত্রী। আর মায়া তাদের সন্তান। সে আর দ্বিরুক্তি না করে মায়ার জন্য গামছা আনতে চলে গেলো।

হানিফ চলে যেতেই লোকটা বললো, 'আপনের জামাই কী আপনেরে ভয় পায়? তা অবশ্য পাওনেরই কথা। ওই চেহারায় এমন বউ পাইলে ভয় না পাইয়া যাইবো কই? তা কন কী সমস্যা?'

'মাইয়াডা সারা রাইত কান্দে। আর জ্বর, বমি, পাতলা পায়খানা লাইগাই রইছে। রাইতে ঘুমায়ই না। কাউরে ঘুমাইতেও দেয় না।'

'কিছু যদি না-ই খায়, তাইলে বমি করে কেমনে?'

'ওই এক দুই চামুচ সাবু দানা জোর কইরা খাওয়ান যায়। আর কিছু না।'

'আপনের দুধ? আপনের দুধও খায় না?'

জোহরা আচমকা গুটিয়ে গেলো। সে প্রথমে লোকটার কথা বুঝলো না। খানিক সময় লাগলো তার বুঝতে। কিন্তু সে নিশ্চিত হতে পারলো না, দুগ্ধপোষ্য শিশুর খাবার সম্পর্কে যেকোনো মাকেই ডাক্তাররা এভাবেই প্রশ্ন করে কিনা! সে আমতা আমতা করে জবাব দিলো, 'দুধ পায় না।'

লোকটা এবার হাসলো, 'পায় না কেন? দেইখ্যাতো মনে হয়না দুধের অভাব আছে! দেইখ্যাতো মনে হয় দুধে ভরপুর। হা হা হা!'

জোহরা মুহূর্তেই সতর্ক হয়ে গেলো। সে এদিক-সেদিক তাকিয়ে দেখলো আশেপাশে কোথাও কেউ নেই। রাত প্রায় এগারোটা। যেকোনো বিবেচনায়ই অনেক রাত। তার হঠাৎ ভয় লাগতে লাগলো। সে তখনো তার বুকের মধ্যে মায়ার অতি ক্ষীণ নিঃশ্বাসের শব্দ টের পাচ্ছে। যেকোনো উপায়েই হোক এই নিঃশ্বাসটুকু সে ধরে রাখতে চায়। কিন্তু কীভাবে? তার সামনের এই লোকটা যে ডাক্তার নয়, সে বিষয়ে জোহরার কেন যেন আর কোনো সন্দেহই রইলো না। তার মনে হলো, এই বিশ্রি লোকটা বড়জোর এই দোকানের কর্মচারী হতে পারে।

জোহরা সামান্য দম নিয়ে লোকটার চোখে চোখ রেখে স্থির, শান্ত গলায় বললো, 'আপনে তো ডাক্তার না, তাইলে এতক্ষণ এত কথা বললেন ক্যান?'

জোহরার কথায় কি ছিলো কে জানে, তবে লোকটা সামান্য ভড়কে গেলো। সে বললো, 'নামে ডাক্তার না হইলেও কামে আমি ডাক্তারই। তেরো বছর ধইরা এই দোকানে আমি কাম করি। ডাক্তারির স্বরে অ, স্বরে আ সব এহন আমার মুখস্ত। আসল ডাক্তারের চাইতেও রুগী এহন আমার কাছেই বেশি আহে।'

জোহরা ঠিক আগের ভঙ্গিতেই বললো, 'আমার আসল ডাক্তার দরকার, নকল ডাক্তার না। আসল ডাক্তার কই পাবো সেইটা বলেন?'

লোকটা বুঝতে পারলো, জোহরার সাথে সে সুবিধা করতে পারবে না। এ আর দশটা গ্রাম্য মেয়ের মতো না। সে তাই হাল ছেড়ে দিয়ে আবার খাতার হিসেব মেলানোয় ব্যস্ত হয়ে পড়লো। জোহরা বললো, 'কী ব্যাপার? ডাক্তার কই পাবো বললেন না?'

লোকটা এবার রুক্ষ গলায় বললো, 'ডাক্তার কই পাইবেন সেইটা আমি ক্যামনে বলবো? এত রাইতে ডাক্তার আপনের জইন্য বইসা রইছে?'

'এত রাইতে যদি আপনে অসুস্থ হইয়া যান, তাইলে ডাক্তার কই পাইবেন? তহনতো ডাক্তারের কাছে যাইবেন, যাইবেন না?'

লোকটা এবার রীতিমতো খেঁকিয়ে উঠলো, 'আমি অসুস্থ হইলে আপনের কাছে যাবো না। আপনে এহন বাইর হন, আমি দোকান বন্ধ করবো।'

'যদি না যাই?' জোহরা সাপের মতোন হিসহিস করে কথাটা বললো। লোকটা ত্বড়িৎ মুখ ফিরিয়ে তাকালো। তারপর জায়গায় জমে গেলো। আধহাতের মতন লম্বা, সরু, চকচকে একটা ছুরি জোহরার হাতে। সে ছুরিখানা এমনভাবে ধরে আছে যেন সেটি তার হাতেরই অংশ। আলাদা কিছু নয়। জোহরা ঠাণ্ডা গলায় বললো, 'এহন যদি আমি আপনের গলার নিচে একখান পোচ দিয়া আপনেরে এইহানে রাইখ্যা যাই, তাইলে এই এত রাইতে সবচাইতে কাছাকাছি আপনে কোন ডাক্তারের কাছে যাইবেন?'

লোকটা বার দুই ঢোক গিলে জোহরার দিকে তাকালো। হানিফ ততক্ষণে চলে এসেছে। সে দাঁড়িয়ে পরিস্থিতি বোঝার চেষ্টা করছে। জোহরা সামান্য সামনে ঝুঁকে বিদ্যুৎ গতিতে লোকটার হাফ হাতা শার্টের ফাঁক দিয়ে ঠিক কনুই বরাবর ছুরিটা

New Pdf download: www.PoragEducation.com + webtalkbd.com

চালালো। লোকটা কিছু বোঝার আগেই গলগল করে রক্ত বের হতে শুরু করলো। চিৎকার করতে গিয়েও জোহরার তর্জনী চাপা ঠোঁটের দিকে তাকিয়ে আচমকা চুপ হয়ে গেলো। এই এতক্ষণে সে তার বিপদের ভয়াবহতা আঁচ করতে পেরেছে। জোহরা হানিফের দিকে ফিরে বললো, 'গামছা পাইছেন?'

'হু, পাইছি।'

'গামছাডা দিয়া তার কনুই সুন্দর কইরা বাইন্ধা দ্যান। রক্ত জানি আর বাইর না হয়। বাইরে থেইক্যাও যেন কেউ না দ্যাখতে পায়।'

হানিফ তার হাত বেঁধে দিলো। কিন্তু লোকটার ভয় তখনো কাটেনি। সে রীতিমতো কাঁপছে। জোহরা বললো, 'এহন কন, আশেপাশে সবচাইতে কাছাকাছি ডাক্তার কই পাবো। আমাগো মতন আপনেরও এহন ডাক্তারের ধারে যাওন দরকার। আর এহনও দরকার মনে না হইলে একটু পরেই মনে হইবো। কারণ, এরপরের পোচটা দিবো আপনের গলার নিচ বরাবর।'

লোকটা শেষ পর্যন্ত তাদের ডাক্তারের ব্যবস্থা করে দিলো। তার পুরো জীবনে সে সম্ভবত এমন ভয়াবহ পরিস্থিতির মুখোমুখি এর আগে কখনো হয়নি। ঘটনায় আকস্মিকতায় সে হতবিহ্বল হয়ে গেছে। তীব্র আতঙ্কে জড়সড় হয়ে গেছে সে। ফলে বাকি সময়টুকুতে আর কোনো ঝামেলা করলো না লোকটা। বরং সর্বোচ্চ সহযোগিতাই করলো। ডাক্তার দেখানো শেষে তার দোকান থেকেই প্রয়োজনীয় ওষুধপত্র নিয়ে জোহরারা যখন ট্রলারে ফিরে এলো তখন গভীর রাত।

ট্রলার ঘাট তখন অনেকটাই চুপচাপ। মানুষের কোলাহলও তেমন নেই। জোহরাদের ফিরতে দেরি দেখে বাহাদুর আর হামিদুল দুশ্চিন্তায় অস্থির হয়েছিলো। দূর থেকে পন্টুনের ইলেক্ট্রিকের ম্লান হলুদ আলোয় জোহরা আর হানিফকে ঢাল বেয়ে নেমে আসতে দেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো তারা। এবার ভালোয় ভালোয় ফিরে যেতে পারলেই হয়। মেয়েটার জন্য বুকের ভেতরটা পুড়ে খাঁক হয়ে যাচ্ছে বাহাদুরের।

ট্রলারের দিকে অগ্রসারমান হানিফ আর জোহরার লম্বা ছায়া পড়েছে পন্টুনের ওপরে। পেছনের বৈদ্যুতিক আলোয় তাদের দেখতে লাগছে ছায়ামূর্তির মতোন। খুব শান্ত, স্বাভাবিক ভঙ্গিতে হেঁটে আসছে তারা। যেন কোনো ভয় নেই, তাড়া নেই, শঙ্কা নেই। কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে হামিদুল হঠাৎ চিৎকার করে উঠলো, 'হানিফ ভাই, জলদি দৌড় দ্যান, পিছে পুলিশ!'

হানিফ ঝট করে পেছনে ফিরে তাকালো। চার পাঁচজনের একটা দল টর্চ হাতে ছুটে আসছে তাদের দিকে। দলটার মধ্যে ডিসপেনসারির লোকটাও রয়েছে। সে ছুটছে সবার আগে। কিন্তু মোটা ভুঁড়ির কারণে ক্রমশই পিছিয়ে পড়ছে সে। দলটার পাঁচজনের মধ্যে অন্তত দুজনের পরনে পুলিশের পোশাক। বাকিরা সাধারণ পোশাকে। হানিফ জোহরার বাহু ধরে হঠাৎ হ্যাচকা টান দিয়ে ছুটলো ট্রলারের দিকে। কিন্তু আচমকা ধাক্কার তাল সামলাতে না পেরে জোহরা শাড়িতে পা বেঁধে পড়ে গেলো মাটিতে। অবশ্য নিশ্চল মায়াকে সে কোলছাড়া করলো না।

ঘটনা বোঝার আগেই হানিফ ততক্ষণে অনেকটা পথ এগিয়ে গিয়েছে সামনে। জোহরা উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে চিৎকার করে হানিফকে বললো ট্রলারে উঠে যেতে। কিন্তু হানিফ তার কথা শুনলো না। সে আবার দৌড়ে পেছনে চলে এলো তাকে তুলে নিতে। কিন্তু ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গেছে। পেছনের লোকগুলো প্রায় কাছাকাছি চলে এসেছে তাদের। জোহরা অবশ্য তবুও হাল ছাড়লো না। সে চিৎকার করে হামিদুলকে বললো ট্রলার স্টার্ট দিতে। তারপর সর্বশক্তিতে আবার ট্রলারের দিকে ছুটতে শুরু করলো। কিন্তু মাটিতে হোঁচট খেয়ে পড়ে যাওয়ায় তার বৃদ্ধাঙ্গুলের নখ উল্টে দরদর করে রক্ত ঝরতে শুরু করেছে। অসহ্য যন্ত্রণায় দাঁত মুখ চেপে রেখেও মুহূর্তের জন্যও দৌড় থামালো না জোহরা। কিন্তু সে যতক্ষণে ট্রলারের কাছে পৌছালো, ততক্ষণে হানিফ উঠে গেছে ট্রলারে। কিন্তু পেছন থেকে পুলিশের দলের অগ্রবর্তী দুজনও তার কাছাকাছি পৌছে গেছে। ঘাটের নিচু জায়গা থেকে সিঁড়ি ছাড়া ট্রলারে উঠতে হলে জোহরাকে আগে তার পরনের শাড়ি খানিকটা গুটিয়ে নিতে হবে। কিন্তু মায়াকে কোলে নিয়ে সেটি সম্ভব নয়। সে তাই মায়াকে একরকম ছুড়েই দিলো হানিফের দিকে। হানিফ তাকে লুফেও নিলো। কিন্তু তার একদম কাছে চলে আসা পুলিশের লোকটি খপ করে তার বাহু আকড়ে ধরলো। ট্রলারের ইঞ্জিনের কাছ থেকে হামিদুল তখন আর স্পষ্ট বুঝতে পারছেনা কি ঘটছে! সে ততক্ষণে ঘাট থেকে ট্রলারের মুখ ঘোরাতে শুরু করেছে। একটু একটু করে ট্রলারের গলুই সরে যেতে শুরু করেছে দূরে। জোহরার সারা শরীর প্রবল আতঙ্কে প্রায় অসাড় হয়ে আসতে লাগলো। জোহরার কাছে পৌছে যাওয়া অন্য লোকটি ততক্ষণে হাত বাড়িয়ে তার কোমর আকড়ে ধরেছে।

অসহায়, নিরুপায় জোহরা তখন বেপরোয়া। সে আচমকা তার কোমর থেকে ছুরিটা বের করে ফেললো। তারপর চালিয়ে দিলো ডান পাশের লোকটার বাহু বরাবর। দূরের বৈদ্যুতিক বাল্বের ম্লান আলোতেও ছুরিটা যেন বিদ্যুৎ চমকালো। লোকটি হঠাৎ তীব্র চিৎকারে জোহরার হাত ছেড়ে দিয়ে মাটিতে বসে পড়লো। জোহরা চেষ্টা করলো তাকে জাপটে ধরা অন্য লোকটাকেও ছাড়িয়ে নিতে। কিন্তু তার সাথে শক্তি এবং কৌশলে কোনভাবেই জোহরা কুলিয়ে উঠতে পারছিলো না। শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়েই সে লোকটার মুখ বরাবর ছুড়িটা চালিয়ে দিলো। বারবার, এলোমেলো, বেপরোয়া। কতবার চালিয়েছে জোহরা জানে না। তবে লোকটা হঠাৎ কাটা গাছের মতো ঢলে পড়লো মাটিতে। তারপর নিচু ঢাল বেয়ে তার শরীরটা গড়িয়ে নেমে যেতে লাগলো নদীতে।

যতক্ষণে তার দলের বাকি লোকগুলো ঘাটে এসে পৌছালো, ততক্ষণে জোহরা ট্রলারে উঠে গেছে। হামিদুলও ট্রলারের মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছে নদীর দিকে। রাতের এই ঘুটঘুটে অন্ধকারে পুলিশের বাকি দলটির আর সাহস হলো না তাদের ধাওয়া করার। গহিন রাত আর গভীর জলের বুক চিরে ছোট্ট ট্রলারটি দ্রুত এগিয়ে যেতে থাকলো লঙ্কর চরের দিকে। কিন্তু পেছনে ফেলে যেতে লাগলো নতুন এক শঙ্কার সূচনা।

New Pdf download: www.PoragEducation.com + webtalkbd.com

কণা জানে, যে অপরাধ সে করেছে, তার ক্ষমা নেই। কিন্তু মানুষ যখন জেনেশুনে অপরাধ করে, তখন হয় সে তার নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারায়, অথবা তার অপরাধবোধ কাজ করে না, কিংবা সেই অপরাধ করা ছাড়া তার সামনে আর কোনো বিকল্প পথ খোলা থাকে না। কণার কোনটি? কণা এই সবগুলোই ভেবে দেখেছে, কিন্তু সে সুনির্দিষ্টভাবে আলাদা করতে পারেনি, ঠিক কেন এবং কীভাবে ওই অবিশ্বাস্য ঘটনাটি সে ঘটিয়েছে! সে যখন আংটিটা নিজে নিজেই হাতে পরলো, তখন তার বাবা দেলোয়ার হোসেন হতভম্ব চোখে তার দিকে তাকিয়ে ছিলেন। কিন্তু তার চোখে যেন কোনো দৃষ্টি ছিলো না, মুখে যেন কোনো কথা বলার শক্তি ছিলো না। যেন তিনি শূন্য, নিঃস্ব, অনুভূতিহীন নিঃসাড় এক মানুষ।

সেই সারাটি দিন তিনি আর একটা কথাও বললেন না। কণার দিকে মুহূর্ত কয়েক স্থির তাকিয়ে থেকে আচমকা উঠে গিয়েছিলেন দেলোয়ার হোসেন। তারপর বড় ভাইকে খবর দিয়েছিলেন। খবর দিয়েছিলেন অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন, পাড়া প্রতিবেশীদেরও। তারপর যতটুকু সম্ভব আড়ম্বর করেই বাড়ির উঠোনে বিয়ের আয়োজন করলেন। কণা ও মনসুরের জন্য দিনে দিনে বিয়ের কাপড়-চোপর কিনলেন। বাড়ি ঘর সাজালেন। এক দিনে একটা মানুষের পক্ষে যা যা করা সম্ভব, তার সবই তিনি করলেন। শুধু কারো সাথে কোনো কথা বললেন না। যেন হঠাৎ করেই তার বাকশক্তি পুরোপুরি রোহিত হয়ে গেছে।

আর কণা সারাটা দিন তার ঘরে চুপচাপ বসে বসে রইলো, কাঁদলো। বার কয়েক তার মনে হলো বাবার সাথে কথা বলবে সে। কিন্তু সাহসে কুলালো না। হঠাৎই যেন কী এক দুর্ভেদ্য দ্বিধার দেয়াল মাথা তুলে দাঁড়ালো পিতা আর কন্যার মধ্যে। সেই দেয়াল টপকানোর সাধ্য যেন কারোই নেই।

মায়ের ব্যাপারটা অবশ্য কণা বুঝলো না। তার মা বার কয়েক এসে তাকে দেখে গেলেন। প্রতিবারই তিনি কপট রাগের সাথে কিছু কটু কথা শুনিয়ে গেলেন। যদিও সাথে কিছু বুদ্ধি-পরামর্শও ছিলো। আর দরজার বাইরে হেঁটে যাওয়ার সময় কণার চোখে চোখ পড়তে প্রতিবারই ইশারায় বাবার সাথে কথা বলতে বলেছেন। কিন্তু কণার সাহসে কুলায়নি। সে জানে না বাবার সামনে গিয়ে সে কি করে দাঁড়াবে!

বাবা অবশ্য তার ঘরে একবার এলেন। সাথে নিয়ে এলেন পাশের বাড়ির মজিদকে। মজিদকে দিয়ে তিনি কণার ঘরের বইখাতা সব সরিয়ে ফেললেন। কণা কিছু বলতে গিয়েও পারলো না। তার আইএ পরীক্ষার এত এত প্রস্তুতি, এত এত বইখাতা সব কোথায় সরিয়ে ফেললেন বাবা? কণাকে আর পড়াশোনা করাবেন না তিনি? কিন্তু বাবাইতো বলেছিলেন, মনসুরের সাথে বিয়ে হলেই কেবল তার পড়াশোনাটা চালিয়ে নেয়া সম্ভব। তাহলে? বাবা কী তাহলে রাগ করে কণাকে নিয়ে তার এতদিনের স্বপ্নটাকে ছুড়ে ফেলে দিচ্ছেন! কিন্তু এখন কী করবে কণা?

কণার আর কিছুই করার রইলো না। রাতে মনসুরের সাথে তার বিয়ে হয়ে গেলো। দেলোয়ার হোসেন যখন তার হাতখানা মনসুরের হাতে তুলে দিলেন, কণার তখন বাবার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে চিৎকার করে কাঁদতে ইচ্ছে করছিলো। কিন্তু সে পারলো না।

রাতে মনসুরকে শুতে দেয়া হলো কণার ঘরে। কণার কী যে লজ্জা করছিলো! বাড়িভর্তি লোকজন, অথচ মনসুর থাকবে তার ঘরে, কী লজ্জার ব্যাপার! সে ঘরে ঢুকে খাটের এককোনায় জড়সড় হয়ে বসে রইলো। মনসুর ঢুকলো তার কিছুক্ষণ পর। কিন্তু কণা কোনো কথা বললো না। মনসুর দীর্ঘসময় ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে রইলো। কণা নড়লো না, উঠলো না, ফিরে তাকালো না অবধি। সে তার ভাঁজ করা হাঁটুর ভেতর মুখ গুঁজে স্থির বসে রইলো। মনসুর দু পা হেঁটে গিয়ে আলতো করে তার মাথায় হাত রাখলো। কিন্তু কণা যেমন ছিলো, তেমনই বসে রইলো। মনসুর অস্ফুটে ডাকলো, 'কণা।'

কণা জবাব দিলো না। মনসুর হাঁটু গেড়ে কণার সামনে মাটিতে বসে পড়লো। তারপর কণার মুখের ওপর থেকে ঘোমটাটা সরালো। তার চোখ বেয়ে নেমে যাচ্ছে অবিরল কান্নার জল। সেই জলে লেপ্টে যাওয়া চোখের কাজল আর ধুয়ে যাওয়া প্রসাধনীতেও কী যে সুন্দর লাগছিলো কণাকে!

মনসুর তার হাত বাড়িয়ে কণার গালটা ছুঁয়ে দিলো। তারপর ফিসফিস করে বললো, 'সব ঠিক হয়ে যাবে তুমি দেখো, সব।'

কণা কথা বললো না। তবে মনসুরের হাতটা তার গালের সাথে চেপে ধরলো। মনসুর বললো, 'হাতটা এভাবেই ধরে রেখো, সবসময়?'

কণা মৃদু শব্দ করে কাঁদলো। মনসুর বললো, 'তাহলে দেখবে এই কান্নাটাও একদিন আনন্দময় স্মৃতি হবে। এই মুহূর্তটাও।'

New Pdf download: www.PoragEducation.com + webtalkbd.com

কণা কাঁদছে। কান্নার দমকে তার শরীর কাঁপছে। মনসুর বললো, 'একটা কথা বলি?'

কণা এবার চোখ তুলে চাইলো। মনসুর বললো, 'বাবা আজ যে কষ্টটা পেয়েছেন, একদিন সেটা থাকবে না। আমি কথা দিচ্ছি।'

কণা এবার হাউমাউ করে কেঁদে ফেললো, 'কিন্তু বাবাকে আমি এত কষ্ট দিয়েছি, এত কষ্ট দিয়েছি। বাবা আর সারা জীবনেও ...।'

কান্নায় কণার গলা বুজে এলো। সে কথা শেষ করতে পারলো না। মনসুরের ইচ্ছে হচ্ছিলো কণাকে জড়িয়ে ধরতে। তার মনে হচ্ছিলো মানুষটা কাঁদুক। আরো কাঁদুক। কেঁদে কেঁদে নিজের বুকের ভেতর জমে থাকা তীব্র অপরাধবোধ আর কষ্টের পাথরটাকে গলিয়ে দিক। কিন্তু সেই কান্নাটা হোক তার বুকের ভেতর। তবে অনেক ভেবেও কেন যেন কণাকে জড়িয়ে ধরার সাহস সে করে উঠতে পারলো না।

দীর্ঘ সময় পর কণার কান্না থামলো। মনসুর বললো, 'আমি কী এমন কিছু করতে পারি, যাতে তোমার মন ভালো হয়ে যায়?'

কণা কথা বললো না। তবে ধীরে উঠে গিয়ে জানালাটা খুলে দিলো। বাইরে নারকেল গাছ। নারকেল গাছের পাতার ফাঁকে বিশাল চাঁদ উঠেছে। সে দীর্ঘসময় স্থির, নিস্পন্দন সেই চাঁদের দিকে তাকিয়ে রইলো। জোছনার অদ্ভুত আলোয় তার চোখের কোল বেয়ে নেমে আসা জলের দাগ চকচক করছে। মনসুর পেছন থেকে এসে সসঙ্কোচে তার কাঁধে হাত রাখলো। কণা ফিরেও তাকালো না। মনসুর তার কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিস করে বললো,

'একটা তোমার মতো চাঁদের জন্য মেয়ে,
আমি জোছনা সকল হেলায় ভুলে থাকি,
একটা তোমার মতো মনের জন্য মেয়ে,
আমি হৃদয়টাকে যত্নে তুলে রাখি।'

কণা ঘাড় ঘুরিয়ে মনসুরের দিকে তাকালো। মনসুর এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো তার দিকে। জানালার বাইরে নারকেল পাতার ফাঁক দিয়ে এক ফালি তেরছা জোছনার আলো এসে পড়েছে মনসুরের মুখে। সেই আলোতে অদ্ভুত স্নিগ্ধ লাগছে মনসুরকে। দেখে মনে হচ্ছে এই মানুষটাকে সে জনম জনম ধরে চেনে। কণা হঠাৎ ফিসফিস করে বললো, 'আমাকে আবার একটু শোনাবেন?'

মনসুর বললো, 'কী?'

'এই যে খানিক আগে শোনালেন?'

মনসুর হাত বাড়িয়ে কণাকে বুকের ভেতর টেনে নিলো। তারপর জানালার সাথে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে কণার মাথাটা তার কাঁধে টেনে নিয়ে আবার বললো,

'একটা তোমার মতো চাঁদের জন্য মেয়ে,
আমি জোছনা সকল হেলায় ভুলে থাকি,
একটা তোমার মতো মনের জন্য মেয়ে,
আমি হৃদয়টাকে যত্নে তুলে রাখি।'

কণা বললো, 'আপনি আমাকে এমন করে সবসময় ভালোবাসবেনতো?'

মনসুর বললো, 'কেমন করে?'

কণা বললো, 'এই যে এমন, যেমন করে আমি টের পাই।'

কণার উত্তর শুনে মনসুর সামান্য চমকালো। সে বললো, 'কিন্তু কখনো যদি এমন হয় যে, আমি তোমাকে ভালোবাসি, কিন্তু তুমি টের পাচ্ছো না?'

'উহু, এমন কখনো হয় না।'

'কী হয় না?'

'ভালোবাসা লুকিয়ে রাখা যায় না। কেউ যদি কাউকে সত্যি সত্যি ভালোবাসে, তবে সে তা টের পাবেই।'

'তাই?'

'হু, ঘৃণা লুকিয়ে রাখা যায়, ভালোবাসা লুকিয়ে রাখা যায় না। ওটা সত্যি সত্যি থাকলে টের না পেয়ে উপায় নেই।'

কথাটা মনসুরের ভারি পছন্দ হলো, ঘৃণা লুকিয়ে রাখা যায়, ভালোবাসা লুকিয়ে রাখা যায় না। সে বললো, 'এবার আমি একটা কথা বলি?'

'হ।'

'আমায় কি এখন তুমি করে বলা যায়?'

কণা মুখ ভেঙচি কেটে বললো, 'উহু।'

মনসুর কপট রাগের ভান করে বললো, 'কেন?'

'কারণ, আপনি আমার আপন।'

'মানে?'

'মানে আপন মানুষকে আপনি বলতে হয়। দেখছেন না, আপন আর আপনি, কত মিল? আমার কেন যেন মনে হয়, আপন থেকেই আপনি এসেছে!'

মনসুর হাসলো, 'তুমি যে এত সুন্দর করে কথা বলো, আগেতো জানা ছিলো না।'

কণা দুষ্টুমির ভঙ্গিতে বললো, 'আগেই সব জানা হয়ে গেলে বিপদ মশাই। মেয়েদের অনেক কিছু লুকিয়ে রাখতে হয়। যাতে পুরুষরা নিত্য নতুন আবিষ্কার করতে পারে। না হলে তাদের আগ্রহ কমে যায়।'

'আর মেয়েদের আগ্রহ ধরে রাখতে হলে পুরুষদের কী করতে হয়।'

'ভালোবাসতে হয়।'

'শুধুই ভালোবাসতে হয়?'

'হ।'

'আর পুরুষদের ধরে রাখতে বুঝি ভালোবাসতে হয় না?'

'হয়। তবে ভালোবাসার সাথে আরো অনেক কিছুই লাগে। মেয়েদের অতকিছু লাগে না।'

'সত্যি তো?'

New Pdf download: www.PoragEducation.com + webtalkbd.com

কণা উষ্ণ গলায় বললো, 'হু।'

মনসুর বললো, 'তাহলে আমার প্রতি তোমার আগ্রহ কোনোদিন কমবে না।'

'কেন?'

'কারণ, জগতে আমার চেয়ে বেশি ভালো আর তোমাকে কেউ কখনো বাসবে না!'

কণা আচমকা আদুরে বেড়ালের মতো মনসুরের বুকের ভেতর মিলিয়ে গেলো। তারপর ফিসফিস করে বললো, 'সারা জীবন এই বুকটা আমার আশ্রয় হোক।'

বাইরে তখন মেঘের আড়ালে চাঁদ ঢাকা পড়ে গেছে। একটা প্রায় গাঢ় অন্ধকার হঠাৎ করেই যেন আগলে ধরলো কণা আর মনসুরকে। মনসুর হাত বাড়িয়ে টেবিলে রাখা হারিকেনের মৃদু আলোটাকেও বন্ধ করে দিলো। তারপর কণাকে দু হাতে শক্ত করে বুকের সাথে চেপে ধরলো। কী এক অবর্ণনীয় ভালো লাগায় কণার শরীর অবশ হয়ে যেতে লাগলো। সে অস্ফুট স্বরে শব্দ করলো, 'উফ।'

মনসুর বললো, 'লাগছে?'

কণা বললো, 'উহুম।'

মনসুর হঠাৎ কণার কানের কাছে ঠোঁট নিয়ে বললো,

'তোমাকে চেয়েছি অন্ধকারের মতন, একাকী ভীষণ, গভীর এবং গাঢ়,

তোমাকে চেয়েছি প্রার্থনা ও প্রেমে, যতটা রয়েছো তার চেয়ে বেশি আরো।'

কণা কথা বললো না। সে শুধু অনুভব করে যেতে লাগলো। ঘুটঘুটে অন্ধকারে অপার্থিব অনুভূতির স্পর্শে বুঁদ হয়ে থাকা একজোড়া মানব-মানবী ধীরে ধীরে পরস্পরকে নিজের করে নিতে লাগলো।

এসআই একরামুল হক বসে আছেন ওসি মইনুল হোসেনের রুমে। মইনুল হোসেন বার কয়েক কথা বলার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু রাগে, ক্ষোভে, ক্রোধে উন্মত্ত প্রায় মইনুল হোসেনের মুখ দিয়ে স্পষ্ট কোনো শব্দ বের হচ্ছে না। তার ওপরে একরামুল হক তার চেয়ে বয়সে বড় বলে যা ইচ্ছা তা বলতেও পারছেন না। শেষ পর্যন্ত অবশ্য তিনি চিৎকার করে একজন পুলিশ কনস্টেবলকে ডাকলেন। তারপর পকেট থেকে দশ টাকার একখানা নোট ছুঁড়ে দিয়ে বললেন সিগারেট নিয়ে আসতে। কনস্টেবল অবশ্য গেলো না। সে দ্বিধান্বিত অবস্থায় দাঁড়িয়ে রইলো। মইনুল হোসেনকে সে কখনো সিগারেট খেতে দেখেনি। এমনকি এই অফিসে তার সামনে বসে কেউ কখনো সিগারেট ধরায়ও না। মইনুল হোসেন চিৎকার করে উঠলেন, 'এইখানে দাঁড়াই দাঁড়াই কি তামাশা দেখছিস হারাম...।'

তিনি শেষের শব্দটা সমাপ্ত করলেন না। দাঁতে দাঁত চেপে বললেন, 'সিগারেট নিয়া আয়। ক্যাপস্টান আনবি। আউট!'

কনস্টেবল রুমের বাইরে যেতেই তিনি বললেন, 'একরাম সাহেব।'

'জি স্যার।' একরামুল হকের গলা কাঁপছে।

'আপনার কি ক্ষতি আমি করেছি!'

'জি স্যার?' একরামুল হক দ্বিধাগ্রস্ত গলায় বললো।

'আপনি কেন আমার চাকরিটা খেতে চাইছেন, বলেন?'

'আমি আপনের চাকরি খাইতে চাইবো কেন? কী বলছেন স্যার?'

'না হলে আপনি এগুলো কী করছেন? কালীগঞ্জ কী আমাদের থানার আন্ডারে?'

'জিনা স্যার।'

New Pdf download: www.PoragEducation.com + webtalkbd.com

'তাহলে? তাহলে কেন আপনি কালীগঞ্জে আমাদের ফোর্স পাঠালেন। কেন?'

একরামুল হক কাঁচুমাচু গলায় বললেন, 'অতবড় একটা ঘটনা ঘটলো স্যার। পুলিশের কাছ থেইকা আসামি ছিনাই নিয়া গেলো। অতগুলা মানুষ আহত হইলো। আর আমরা বইসা থাকবো? আমরা কোনো ব্যবস্থা নেবো না?'

'অবশ্যই ব্যবস্থা নেবেন। ব্যবস্থা নিতেতো আপনারে কেউ না করে নাই। কিন্তু ব্যবস্থা নিতে গিয়া আপনি এইটা কী করলেন? এহন এই লাশের দায়িত্ব কে নেবে?'

'নুরুন্নবীতো মরে নাই স্যার। চোখে সামাইন্য আঘাত পাইছে!'

'চুপ! একদম চুপ! একদম চুপ!' মইনুল হোসেন নিজেকে সামলানোর চেষ্টা করেও পারলেন না। তিনি তারস্বরে চিৎকার করে উঠলেন। তারপর বললেন, 'আপনি তারে দেখছেন? তার ওই মুখ দেখে তারে আর চেনার কোনো অবস্থা আছে? দুটা চোখের একটাতেও সে আর কোনদিন চোখে দেখতে পারবে? পারবে না। সে বাঁচলেই কী আর না বাঁচলেই কি! আর তার গলার নিচে যে আঘাতটা আছে, যে পরিমাণ রক্ত তার গেছে, এরপরও আপনার ধারণা সে বাঁচবে!'

একরামুল হক কিছু একটা বলতে গিয়েও মইনুল হোসেনের ক্রোধোন্মত্ত চেহারা দেখে চুপ করে গেলেন। মইনুল হোসেন বললেন, 'আমি এখন ওপর মহলে কী জবাব দেবো বলেন? এই সময়ে আমি তাদের কী এইটা বোঝাবো যে এই অপারেশন অতি জরুরি অপারেশন ছিলো? এই অপারেশনে আমাদের ফোর্স না গেলে কালকের মধ্যেই সরকার পতন হয়ে যেতো? হ্যাঁ? এইটা বলবো, বলেন? লস্কর ডাকাতদের ধরার সাথে সরকারের কোনো ইন্টারেস্ট আমি দেখাতে পারবো?'

তিনি একটু থামলেন। তারপর আবার বললেন, 'আমাদের স্পষ্ট করে বলে দেয়া হয়েছে সরকারবিরোধী কোন আন্দোলন, মিছিল, মিটিং প্রতিহত করা ছাড়া আর কোনকিছুইতেই সিরিয়াসলি লোকবল নিয়োগ করা যাবে না! আর সেইখানে আমরা কী করেছি? একটা মানুষও খুন করছি! আমার চাকরি থাকবে?'

'স্যার, ঘটনাতো ইচ্ছে কইরা...।'

'হয় নাই, তাইতো? এটা আপনার বলতে হবে কেন? কেউ কী রাস্তায় ট্রাক চাপা পড়ে মরে গেলে ইচ্ছা করে মরে? মরে দুর্ঘটনায়। এখন যেইখানে দুর্ঘটনার ঝুঁকি যতো বেশি, সেইখানে তত বেশি সাবধান হতে হবে না? আপনি সাবধান ছিলেন?'

'জে, স্যার। ছিলাম।' একরামুল হক কথা বলার সুযোগ পেয়ে যেন উৎসাহিত হলেন। তিনি বললেন, 'কালীগঞ্জ পুলিশের লগে পরামর্শ কইরাই আমি দুইজন ফোর্স লাগাই রাখছিলাম ওইখানে। আর বইলা রাখছিলাম কোনো হেল্প লাগলে তারা জানি করে। মাইয়াডা খুব ডেঞ্জারাস স্যার। গল্প সিনামার মতো ঘটনা। সে-ই নাকি এহন লস্করগো চর চালায়। তোরাব আলী বুড়া হইয়া গ্যাছে। এহন এই মাইয়ার কথায়ই সবাই উঠবস করে। আমাগো আগের ঘটনায় কী হইলো? কী ঘটনা, কন? এমন ঘটনা আমার চাকরি জীবনে ঘটে নাই! ওইটুকু মাইয়া আমাগো

অতগুলা পুলিশরে ঘোল খাওয়াই ছাইড়া দিলো। একটা ইজ্জতের ব্যাপার আছে না স্যার? আইজ এত বছর পুলিশের চাকরি করতে করতে চুল ফালাইলাম পাকাইয়া। এহন আইসা যদি ওইটুক এক মাইয়ার কাছে...!'

একরামুল হকের কথার মাঝখানে তাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, 'তো এখন কী করলেন, ওইটুক মাইয়ার কাছে?'

'আমরাতো স্যার খবর নেওনের জইন্যই লোক লাগাইয়া রাখছিলাম। কালীগঞ্জ বড় বন্দর, আমাগো থানার আন্ডারে না, এইসব বিবেচনা কইরাই সে তার যাতায়াত ওইদিকে বাড়াইয়া দিছে। বিষয়ডা আমি ধরতে পারছিলাম। এই জইন্যই স্যার...।'

'আপনি থামেন একরামুল সাহেব। আপনার যদি এতই ধরার ইচ্ছা থাকে ফুল ফোর্স নিয়ে তাদের চরে এটাক করেন না কেন?'

একরামুল হক এই কথায় নিজের অজান্তেই জিভে কামড় বসালেন। তারপর বললেন, 'সেই চেষ্টা এর আগে যে দুয়েকবার হয় নাই, তা না। তয় ওই চরে তো কেউ যায় নাই! ধু-ধু পানির বিল। মাইলের পর মাইল। একেতো ওইখানে অনেকবার যাওয়া-আসা না থাকলে চর খুঁইজা পাওয়া খুব কঠিন। দুই, খোলা বিলে কোনো ট্রলার গেলেই বহুদূর থেইক্যাই তারা দেখতে পায়। তহনতো বোঝেনই, আগে থেইক্যাই তারা রেডি হইয়া যায়। এইজন্য আগে বার কয়েক চেষ্টা কইরাও কোনো ফল হয় নাই। তা ছাড়া তাদের জন্য এতবড় ঝুঁকি কেউ নিতে চায় না।'

'হুম।' মইনুল হোসেন রাগ করলেও, বিষয়টি নিয়ে তিনিও চিন্তিত। ঘটনাটি নিয়ে একটা অদ্ভুত কৌতূহল, রহস্যময়তা এবং আগ্রহ অনুভব করছেন তিনি। বিশেষ আগ্রহবোধ করছেন মেয়েটিকে নিয়ে। কে এই মেয়ে? নুরুন্নবীর মুখ দেখে তিনি আঁতকে উঠেছেন। কোনো ষোল-সতেরো বছরের মেয়ের পক্ষে এত নৃশংসভাবে কারো মুখ ছুরি দিয়ে এমন ফালাফলা করে দেয়া যায়, এটি তিনি বিশ্বাস করতে পারছেন না। হাসপাতালে নুরুন্নবীর চেহারা দেখার পর তিনি পরপর দুরাত ঘুমাতে পারেননি। চোখ বন্ধ করলেই তার বিভৎস, ক্ষতবিক্ষত চেহারাটা চোখের সামনে ভেসে উঠেছে। দুটো চোখেই প্রায় গেলে দেয়া হয়েছে। জন্মের তরে তার অন্ধ হয়ে যাওয়াটা প্রায় নিশ্চিত। তার ওপর গলার কাছে গভীর এক ক্ষত। সেই ক্ষত দিয়ে প্রচুর রক্তক্ষরণও হয়েছে। নুরুন্নবীর অবস্থা আসলেই শোচনীয়!

একরামুল হক মিনমিন করে বললেন, 'নুরুন্নবীর অবস্থা আসলে কেমন স্যার?'

মইনুল হোসেন এই প্রশ্নের সরাসরি উত্তর দিলেন না। তিনি বললেন, 'আজ কালের মধ্যে জেলা শহর থেকে ঢাকায় পাঠানোর ব্যবস্থা হচ্ছে। অনেক ঝামেলা পোহাতে হয়েছে আমাকে। আপনি এক কাজ করুন, যতটা সম্ভব এই ঘটনা চেপে যাওয়ার চেষ্টা করুন। ঘটনা ঘটেছে গভীর রাতে, সুতরাং আমরা না বললে সাধারণ

New Pdf download: www.PoragEducation.com + webtalkbd.com

মানুষের জানার কথা না। তারা জানলে পুলিশের প্রতি তাদের আস্থা তলানিতে গিয়ে ঠেকবে। আর একটা কথা, আমাদের পুলিশের মধ্যেও যতটা সম্ভব ঘটনা চেপে রাখার চেষ্টা করেন। না হলে অন্য পুলিশদের মধ্যেও এর ইমপ্যাক্ট পড়বে।'

'জি স্যার।'

'আরেকটা কাজ করেন। ওই দিন কালীগঞ্জ বন্দরের ওষুধের দোকানের লোকটাকে খবর দেন।'

'জি, আচ্ছা।'

লোকটার নাম শরাফত। তাকে নিয়ে আসা হলো পরদিনই। শরাফত মিয়ার মুখ ভয়ে শুকিয়ে আছে। সে কাঁচুমাচু গলায় বললো, 'আমি ছার ঘটনার কিছুই জানি না।'

'কি জানেন না?'

'ওইদিন কি হইছে না হইছে, কিছুই জানি না!'

'কিছুই না জানলে আপনি পুলিশরে খবর দিছিলেন কেন?'

'আমার কোনো দোষ নাই ছার। তারা আমারে চাকু দিয়া গুঁতা দিছে।'

'গুঁতা দিছে?'

'জে ছার।'

'কই গুঁতা দিছে?'

'এই যে ছার, দেহেন ছার।' শরাফত তার ডান কনুইর ব্যান্ডেজ দেখালো। মইনুল হোসেন বললেন, 'এক গুঁতায়ই এত বড় ব্যান্ডেজ? দেখি, ব্যান্ডেজ খোলেন।'

শরাফত অবাক চোখে খানিক তাকিয়ে রইলো। তারপর মইনুল হোসেনের কঠিন মুখভঙ্গি দেখে হন্তদন্ত হয়ে ব্যান্ডেজ খুললো।

মইনুল হোসেন শরাফতের কনুইয়ের নিচের ক্ষত দেখে বিস্মিত হয়ে গেলেন। গভীর এবং দীর্ঘ ক্ষত। তিনি বললেন, 'এ-তো ভয়াবহ অবস্থা! কী করছিলেন আপনি?'

'আমি কিছু করি নাই ছার। বিশ্বাস করেন ছার, আমি কিছু করি নাই।'

'কিচ্ছু করেন নাই? এমনি এমনিই আপনারে চাকু দিয়ে গুঁতা দিছে?'

'জে ছার।'

'তাইলেতো কালীগঞ্জ বন্দরের আর সবাইরেও দেয়ার কথা ছিলো। আর সবাইরে না দিয়ে শুধু আপনারেই কেন দিলো?'

শরাফত এই প্রশ্নের উত্তর দিলো না। সে মুখ নামিয়ে ফেললো। মইনুল হোসেন বললেন, 'আপনারে কোথায় বসে চাকু মেরেছে?'

'ট্রলার ঘাটে, যহন তারে ধরতে গেছি, তহন। যেই ধরছি, অমনে দিলো পোচ।' শরাফত যেন আচমকা একটা শক্ত কারণ খুঁজে পেলো। মইনুল হোসেন বললেন, 'তাহলে আপনি পুলিশের কাছে খবর দিতে গেলেন কিভাবে? কিভাবে বুঝলেন যে ওরাই লঙ্কর চরের ডাকাত দলের সদস্য?'

এই কথায় শরাফত খানিক থতমত খেয়ে গেলো। অবশ্য তারপর সাথে সাথেই আবার নিজেকে গুছিলে নিয়ে সে বললো, 'তারা আসছিলো আমার দোকানে ওষুধ নিতে।'

'ওষুধ নিতে? কিসের ওষুধ? অসুস্থ কে ছিলো?'

'ওই মাইয়াটার কোলে দেড় দুই বছরের একটা মাইয়া আছিলো। সেই মাইয়ার জ্বর, পাতলা পায়খানা। আরো অনেক সমস্যা। তার জইন্য।'

'যে মেয়েটা চাকু মেরেছে, সে দেখতে কেমন?'

'দেখতে খুবই খারাপ। বিচ্ছিরি চেহারা। কপালে ভ্রু নাই। নাক ব্যাঁকা। গায়ের রংও ময়লা।'

'তো এইসব দেখেই আপনি বুঝে ফেললেন সে ডাকাত?'

'হুম, না মানে, এইসব দেইখ্যাতো আর ডাকইত না ভালো মানুষ চেনন যায় না!'

'তাহলে? তাহলে আপনি নিশ্চিত হলেন কীভাবে যে সে ডাকাত। এবং সাথে সাথে গিয়ো পুলিশে খবর দিলেন?'

শরাফত এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারলো না। মইনুল হোসেন বললেন, 'শোনেন শরাফত মিয়া, পুলিশের সাথে অকারণে মিথ্যা বলবেন না। অকারণে মিথ্যা বললে যেই দোষ করেন নাই, দেখা গেলো সেই দোষেও আপনি ফেঁসে গেছেন। তখন? তারচেয়ে যা ঘটেছে, সেটা সত্যি সত্যি বলেন। আর আপনার মিথ্যা বলার ধরন খুবই কাঁচা। আপনিতো সেইদিন নিজ থেকেই গিয়ে পুলিশকে জানিয়েছিলেন যে আপনাকে ছুরি মেরে ডাকাতরা পালিয়েছে। আপনার দোকান থেকে সব নগদ টাকা পয়সা নিয়ে গেছে। আপনার হাতে চাকু মেরেছে। আপনি সেই রক্তাক্ত হাতও দেখিয়েছিলেন পুলিশকে। দেখান নি?'

'জে ছার।'

'তাহলে এতক্ষণ মিথ্যা কথা বললেন কেন?'

'ভুল হইয়া গেছে ছার। আর বলবো না।'

'তাহলে এবার সত্যিটা বলেন। কি হয়েছিলো আপনার সাথে? নাহলে ওই যে বাঁশটা দেখছেন? ওটা পেছন দিক দিয়ে ঢুকিয়ে দেবো!'

শরাফত মিয়া আচমকা নিতে পারলো না কথাটা। সে গোল গোল চোখ করে মইনুল হোসেনের দিকে তাকালো! তার এই চেহারা সে দেখেনি। পরের সময়টুকুতে সে কাঁপতে কাঁপতে পুরো ঘটনা খুলে বললো। সব শুনে মইনুল হোসেন বললেন,

'মেয়েতো আসলেই ডেঞ্জারাস!'

'জে ছার। খুবই ডেঞ্জারাস। এইরম মেয়েছেলে আমি জীবনে দেহি নাই।'

'দেখার সময় এখনো যায় নাই। নিজের চরিত্র ঠিক না করতে পারলে ভবিষ্যতে আরো দেখতে হবে। যাই হোক, এবার আসল কথায় আসি, আপনার মনে হয় তারা স্বামী স্ত্রী না? ওই মেয়েও তাদের না?'

New Pdf download: www.PoragEducation.com + webtalkbd.com

'জি না ছার, তারা স্বামী স্ত্রী না, ওই মেয়েও তাগোর না।'

'হুম। আর সে কী সত্যিই টাকা-পয়সা নিয়ে গেছে?'

'আল্লাহর কসম ছার। যাওনের সময় ক্যাশে যত টাকা পয়সা ছিলো, সব সে লইয়া গেছে। আমারে বললো আর কী কী ওষুধ আছে তাগো কাজে লাগতে পারে। আমি একটা কাগজে রোগ আর সেই রোগে কোন ওষুধ লাগতে পারে সেইগুলা লেইখা লেইখা দিলাম। অনেক ওষুধ। সে বললো, ওষুধ যদি ভুল হয়, আর খাওনের পর যদি কারো কোনো অসুবিধা হয়, তাইলে সে পরের বার আইসা আমারে খুন কইরা রাইখা যাইবো!'

'কী বলছেন আপনি?'

'জে ছার। খালি তা-ই না। যাওনের সময় দোকান থেইকা বাইরও হইলো। তারপর আবার ফিরা আইসা বললো, ক্যাশে যা নগদ ট্যাকা পয়সা আছে, একটা ব্যাগে কইরা দিয়া দিতে।'

'আপনি দিয়ে দিলেন?'

'কী করবো ছার? ওই মাইয়ারে বিশ্বাস নাই, আমারে খুন করা তার এক সেকেন্ডের মামলা!'

শরাফত মিয়ার কথা শুনে মইনুল হোসেন সত্যি সত্যি চিন্তায় পড়ে গেলেন। সেই সারাটা দিন তিনি আর কারো সাথেই কোনো কথা বললেন না। তবে দিন তিনেকের মাথায় তিনি ওসি একরামুল হককে ডেকে পাঠালেন, 'ওসি সাব।'

'জি স্যার।'

'একটা কাজ করতে হবে। কাজটা সহজও আবার কঠিনও।'

'কী কাজ স্যার?'

'আশেপাশের যতগুলা বন্দর, হাট, বাজার, গঞ্জ আছে সবগুলার একটা লিস্ট দেবেন আমাকে।'

'আশেপাশে বলতে কত মাইলের মধ্যে?'

'আশেপাশের কয়েক থানায় যত আছে।'

'জে স্যার। তারপর?'

'তারপর সেইসব হাট-বাজার, গঞ্জ-বন্দরে যত ওষুধের দোকান আর ডাক্তারখানা আছে, সবগুলাতে খবর নেবেন গত কয়েক মাসে একসাথে অনেক রুগী আসছে কোন কোন দোকানে বা ডাক্তাখানায়।'

'কেন স্যার?'

'আজাহার খন্দকারের আড়তে ডাকাতির সময় তোরাব আলী লস্কর যে চিঠি পাঠাইছিলো, মনে আছে?'

'জে স্যার।'

'সেই চিঠিতে তোরাব আলী লস্কর লিখেছিলো, তার চরে নানান অসুখ-বিসুখ ছড়িয়ে পড়ছে। এই সময়ে গ্রামে গ্রামে কলেরা, জ্বর-জারি ছড়ায়। নানান পানিবাহিত অসুখও ছড়ায়। তাদের ওইখানেতো ওষুধপত্র-ডাক্তার থাকার কথা না। তাহলে?'

'তাইলে তারা সুযোগ বুইঝা আশেপাশের কোনো গঞ্জে ডাক্তার দেখাইতে আসে!'

'একদম। আমার ধারণা আগেও তারা আসছে। সামনেও আসবে। আপনি ভালো করে খোঁজ খবর নেন। তবে সাবধান আগেই আবার অতি উৎসাহী হয়ে কাউরে ধরতে যেয়েন না কিন্তু।'

'জে না, স্যার। আর সেই ভুল করবো না।'

'আপনি শুধু চোখ-কান খোলা রেখে খোঁজখবর নেয়ার চেষ্টা করবেন। আর তাদের গতিবিধি লক্ষ্য করার চেষ্টা করবেন। তারপর আমাকে জানাবেন।'

'জি স্যার।'

'সাবধান একরামুল সাহেব। কোনভাবেই অসতর্ক হওয়া যাবে না। অস্থির হওয়া যাবে না।'

'জি না স্যার।'

একরামুল হককে বিদায় দিয়ে মইনুল হোসেন চুপচাপ বসে রইলেন। তার মাথা থেকে নুরুন্নবীর মুখখানা তিনি দূর করতে পারছেন না। আরো দূর করতে পারছেন না ষোল-সতেরো বছরের ভয়ংকর এক কিশোরীকে দেখার সুতীব্র ইচ্ছেও।

New Pdf download: www.PoragEducation.com + webtalkbd.com

আজাহার খন্দকার কণাকে রেখে যেতে চাইছিলেন না। তিনি চাইছিলেন, এবারই তার সাথে করে কণাকে নিয়ে যেতে। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে পরের সপ্তাহের আগে আর নবীগঞ্জ ফেরার লঞ্চ নেই। লঞ্চে ফিরতে হলে তাকে পরের সপ্তাহ পর্যন্ত অপেক্ষা করতেই হবে। কিন্তু অতদিন অপেক্ষা করতে তিনি রাজি হলেন না। বিষয়টি নিয়ে নতুন জটিলতা শুরু হতে পারতো। কিন্তু হলো না দেলোয়ার হোসেনের জন্য। তিনি যেন নির্লিপ্ত হয়ে গেছেন। শাহিনা বেগম বললেন, 'বেয়াইতো কণারে এহনই নিয়া যাইতে চাইতেছে?'

দেলোয়ার হোসেন জবাব দিলেন না। মনোযোগ দিয়ে খাতা দেখছিলেন। শাহিনা বেগম বার কয়েক একই প্রশ্ন করাতে তিনি অবশেষে কথা বললেন। তবে খাতা থেকে মুখ তুললেন না। বললেন, 'নিয়ে যেতে চাইলে যাবে।'

'কী বলছো তুমি? কাইল বিয়া হইলো, আর আইজই এইভাবে মাইয়া নিয়া যাইবো?'

'এখন যতটা না সে তোমার মেয়ে, তার চেয়ে বেশি তাদের বউ। সুতরাং সিদ্ধান্তও তাদের।'

'এইটা কী ধরনের কথা বললা? বিয়া হইছে দেইখা আমার মাইয়া আর আমার নাই! সে এহন তাগোর বউ হইয়া গেছে!'

'এটা নিয়ে এত আঁতকে ওঠারতো কিছু নাই। যা সত্য তা স্বীকার করতে সমস্যা কই?'

শাহিনা বেগম স্বামীর গা ঘেঁষে দাঁড়ালেন। তারপর খানিক মিহি গলায় বললেন, 'তুমি এহনও রাগ ধইরা রাখছো। ও ছোট মানুষ, অত কিছু বোঝে নাই।

আর বেয়াইর কী দোষ? সে নিজে কী কিছু করছে? আমাগো বেয়াই কিন্তু লোক ভালো। তার সাথে আমি কথা বইলা দেখছি। কণারে কী আদরটাই না সে করে! দেখলে বোঝন যায়, বুঝলা? নিজের মাইয়া নাইতো, দেখবা, একদম নিজের মাইয়ার মতো কইরা রাখবো আমাগো কণারে।'

'তাহলেতো ভালোই হলো। মেয়ে যত দ্রুত তার বাপের কাছে চলে যাবে, তত ভালো। শুধু শুধু তারে আটকে রাখতে চাইছো কেন?'

'তুমি না! এহনও রাগ কমে নাই। কণা তোমার কাছে আইতে পারতেছে না ডরে। তুমি একটু তার কাছে যাও। গিয়া কথা বলো। সে সারাটা দিন, সারাটা রাইত কানছে!'

'কেন, কান্নাকাটি কেন? সেতো তার ইচ্ছেমতোই সবকিছু পেয়েছে। তাহলে আবার কান্নাকাটি কিসের?'

শাহিনা বেগম স্বামীর হাত থেকে খাতাগুলো টেনে সরিয়ে নিলেন। তারপর তার সামনে মুখোমুখি বসে বললেন, 'তুমি জানো না কেন? তোমারে ছাড়া সে কোনোদিন একবেলা ভাত খাইছে? সারাক্ষণ বাপ বাপ বাপ! আমারইতো বিরক্ত লাগতো। আর সেই মাইয়া গত কাইল সকাল থেইকা আইজ এই বিকাল পর্যন্ত তোমার সামনে আইসা দাঁড়াইতে পারে নাই। কথা বলাতো দূরের কথা!'

দেলোয়ার হোসেন সামান্য হাসলেন। তারপর বললেন, 'মেয়ে বড় হলে আর বাপের থাকে না। প্রথমে হয়ে যায় মায়ের। তারপর হয় জামাই, শ্বশুর শাশুড়ির। সে যে এত বড় হয়ে গেছে, সেটাতো আমি বুঝি নাই। আর বুঝলামই যখন, তখন আর মায়া বাড়াই লাভ কী? বাপতো আর মেয়ের মতো হতে পারবে না! সে তাই মেয়ের সুখের কথাই ভাববে। আমিও তাই করলাম।'

'তুমি কিন্তু এহন বাচ্চাগো মতো করতেছো। সে তো বুঝছে যে সে ভুল করছে। কিন্তু মনসুর ছেলেটা কিন্তু ভালো। তুমিওতো রাজিই আছিলা। আর ফ্যামিলিডাও ভালো। ছোট দেওরটারে তো দেখছো, নাম মঞ্জু, ক্লাস টেনে পড়ে। কণার একটা ছোট ভাইও হইলো। কণার চাইতে তিন চাইর বছরের ছোট ছেলেটা। মা নাই। চিন্তা করছো, ওই ফ্যামিলিতেতো এহন কণাই সব? ওর কত দায়িত্ব! এহন তুমি যদি এমন করো, তাইলে ওর কেমন লাগবো বলো? দুনিয়াতে তোমার চাইতে বেশি কাউরে ও পছন্দ করে? ওর বুকটা ফাইট্টা যাইতেছে, কিন্তু সে না পারতেছে কইতে, না পারতেছে সইতে!'

দেলোয়ার হোসেন বললেন, 'তারা যদি ওরে কালকেই নিয়া যেতে চায়, যাবে। কিন্তু কীসে করে যাবে? লঞ্চতো নাই।'

'কাইলই কেন নিয়া যাইতে হইবো? বিয়া হইছে ভালো কথা। এহন সামনে তার আইএ পরীক্ষা। কত পড়াশোনা আছে। পরীক্ষাডা দিক। তারপর সে যাইবো।'

দেলোয়ার হোসেন আবারও হাসলেন, 'তোমার ধারণা সে আর পড়াশোনা করবে?'

New Pdf download: www.PoragEducation.com + webtalkbd.com

'ক্যান? করবে না ক্যান?'

'করবে না কারণ সে মায়ায় পড়ে গেছে। মায়া এমন এক জিনিস, যা মানুষকে অন্ধ করে দেয়। হিতাহিত জ্ঞান বুদ্ধি লোপ পাইয়ে দেয়। মায়ার প্রভাব ভালোবাসার চেয়েও বেশি।'

'তোমাগো বাপ-মাইয়ার অতো কঠিন কঠিন কথা আমি বুঝি না। তুমি ওর যাওন ফিরাও, যেমনেই হোক।'

দেলোয়ার হোসেন অবশ্য ফেরালেন না। তিনি বরং হাসি হাসি মুখে আজাহার খন্দকারের সাথে কথা বললেন। নবীগঞ্জ যাওয়ার লঞ্চ আছে আর পরের সপ্তাহে। কিন্তু আজাহার খন্দকার পরের সপ্তাহ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে চাইলেন না। তিনি চান পরদিনই নবীগঞ্জের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হতে। কিন্তু উপায় কি? এই নিয়ে রাতভর নানান বাহাস চললো। নানান পরিকল্পনা, যুক্তি-তর্ক, মতামত। শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত হলো দুই ইঞ্জিন বিশিষ্ট বড়সড় একখানা ট্রলার ভাড়া করে, সেই ট্রলার নিয়ে প্রায় দুইদিনের পথে নবীগঞ্জে যাত্রা করবে তারা।

শাহিনা বেগম নিশ্চিত ছিলেন কণা এখন যেতে চাইবে না। এমনিতেই পড়াশোনা, পরীক্ষা নিয়ে তার বরাবরই দুশ্চিন্তা। তার ওপর অতদূরের পথে এখন গেলে আবার কবে না কবে আসতে পারবে কে জানে! তারচেয়ে পরীক্ষা শেষে সে একেবারেই যাবে! কিন্তু তাকে হতভম্ব করে দিয়ে কণা জানালো সে পরদিনই যাবে। ঘটনা প্রথমে বিশ্বাস হলো না শহিনা বেগমের। তিনি ভাবলেন বাবার সাথে অভিমান করেই তার এই সিদ্ধান্ত কীনা! কিন্তু কথা বলে বুঝলেন, কণা যাবেই।

এই নিয়ে শাহিনা বেগমেরও মন খারাপ হয়ে গেলো। কিন্তু তিনি তা কাউকেই বুঝতে দিলেন না। না মেয়েকে, না মেয়ের বাবাকে। মেয়ে যখন যাবে তো যাক। সবাই অবুঝ হলেও মা-তো আর অবুঝ হতে পারে না!

পরদিন সকাল সকাল রওয়ানা হলেন আজাহার খন্দকার। বড় ট্রলার। ট্রলারে বিছানা, বালিশ, রান্না-বান্নার ব্যবস্থা থেকে শুরু করে দীর্ঘ যাত্রায় প্রয়োজন হতে পারে এমন প্রায় সকল ব্যবস্থাই রয়েছে। ট্রলার ছাড়ার কথা ছিলো ফজরের নামাজের পরপরই। কিন্তু খানিক দেরি হয়ে গেলো। দেরি হওয়া কারণ কণা। খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠেই মনসুর গিয়েছিলো বাইরে। দীর্ঘ যাত্রাপথের কিছু জোগারযন্ত্র তখনো বাকি রয়ে গিয়েছিলো। কণাকে ঘুম থেকে তুলে প্রস্তুত হতে বলে সে বের হলো। সব গোছগাছ করে ফিরতে ফিরতে ঘণ্টাখানেক লাগলো। কিন্তু ফিরে এসে দেখা গেলো কণা তখনো ঘর থেকে বের হয়নি। বরং ভেতর থেকে তার ঘরের দরজা বন্ধ। বেশ কয়েকবার দরজায় নক করার পরও সে দরজা খুললো না। খানিক অপেক্ষা করার পর মনসুর হঠাৎ অস্থির হয়ে গেলো। সে আরো বার কয়েক দরজা ধাক্কানোর পর শাহিনা বেগমকে ডাকলো। শাহিনা বেগম ভেতরে ভেতরে ভয় পেয়ে গেলেও বাইরে প্রকাশ করলেন না। তিনি এসে দরজার কাছে কান পেতে

কিছু শোনার চেষ্টা করলেন। কিন্তু পারলেন না। ভেতর থেকে কোন শব্দ শোনা যাচ্ছে না। উদ্বিগ্ন শাহিনা বেগম যতটা সম্ভব নিজেকে শান্ত রেখেই কণাকে ডাকলেন, 'কণা, মা।'

মনসুর এবং শাহিনা বেগমকে অবাক করে দিয়ে কণা ঘরের দরজা খুলে বের হয়ে এলো। তার পরনে বিয়ের শাড়ি। মুখে হালকা প্রসাধনী। কপালে ছোট্ট টিপ। কিন্তু তাকে দেখেই বোঝা যাচ্ছে এতক্ষণ ঘরের দরজা বন্ধ করে একা একা কেঁদেছে সে। মুখ ফুলে ভারি হয়ে আছে তার। তবে মায়ের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসলো সে, 'বাবা কই মা?'

'তোর বাবা মনে হয় ট্রলার ঘাটে। আর জসিম যাইতেছে তোর সাথে। এ ছাড়া আরো দুই তিনজন মাঝিরও ব্যবস্থা করতে হইছে।'

'মাঝি ক্যান আবার? ট্রলারেতো লোক আছেই দুজন। জসিম ভাই আছে, তারপর আবার এত লোক দিয়ে কী হবে?'

'দূরের পথ। সাবধানের মাইর নাই। দুইজন লোক বেশি থাকলে একটা সাহস থাকে।'

কণা হাসলো, 'ঠিক আছে মা।'

ঘাটে পৌছাতে পৌছাতে মার সাথে টুকটাক নানান কথাবার্তা হলো কণার। কণাকে এখন আর দেখে মনে হচ্ছে না সে খানিক আগেই কেঁদেছে। সে হেসে হেসে পাশের বাড়ির ভাবির কাছ থেকে বিদায় নিলো। তার দুয়েকজন কলেজ বান্ধবী এসেছে, তাদের কাছ থেকে বিদায় নিলো। মজিদের ছোট্ট ছেলেটাকে কোলে নিয়ে বার কয়েক চুমুও খেলো সে। তারপর মার দিকে ফিরে বললো, 'আমাকে নিয়ে ভেবো না মা, আমি ভালো থাকবো।'

শাহিনা বেগমের হঠাৎ যে কী হলো! তিনি হুড়মুড় করে ভেঙে পড়লেন কণার বুকে। তারপর মরা বাড়ির মানুষের মতো চিৎকার করে কাঁদতে লাগলেন। তার সেই কান্না থামালেন বড় চাচি।

দেলোয়ার হোসেন দাঁড়িয়ে ছিলেন একদম ট্রলারের কাছে। খানিকটা এগিয়ে এসে কণার হাত ধরে নিচু ঢাল বেয়ে তিনি নামিয়ে আনলেন নিচে। কণা বললো, 'বাবা।'

দেলোয়ার হোসেন মেয়ের কাঁধে হাত রাখলেন। তারপর বললেন, 'সাবধানে থাকিস।'

'তুমি কবে আসবে বাবা?'

'আসবো।'

'বাবা?'

'হুম।'

'মা'র দিকে খেয়াল রেখো?'

New Pdf download: www.PoragEducation.com + webtalkbd.com

'রাখবো।'

'তুমি ঠিকঠাক থেকো।'

'থাকবো।'

'বাবা?'

'হুম।'

'আমাকে একটু জড়িয়ে ধরবে?'

দেলোয়ার হোসেন কণাকে জড়িয়ে ধরলেন। কণার কী কান্না পাচ্ছিলো? কিংবা দেলোয়ার হোসেনের? অনেক অনেক কথা কী তাদের বলার ছিলো? কে জানে! তবে তারা কেউ কিছুই বললো না আর। কেবল সেই ছোট্ট মেয়েটাকে যেমন করে এই এতটা বছর বুকের ভেতর আগলে রেখেছিলেন, তেমন করেই আরো কিছুক্ষণ আগলে রাখলেন দেলোয়ার হোসেন। কণাও ছোট্ট শিশুটি হয়ে বাবার বুকের ভেতর ডুবে রইলো। যেন শুষে নিতে থাকলো বাকি জীবনের ওম। তারা কেউ কোনো কথা বললো না। কাঁদলো না। হুড়মুড় করে ভেঙে পড়লো না কোনো অভিমানের জমাট দেয়াল। আজাহার খন্দকার পাশে এসে দাঁড়ালেন। তার পাশে মনসুর। দেলোয়ার হোসেন বললেন, 'আজ থেকে এই মেয়ে আপনার বেয়াই সাহেব।'

আজাহার খন্দকার কণার মাথায় হাত রাখলেন। কণা মুখ তুলে তাকালো। দেলোয়ার হোসেন বললেন, 'পৃথিবীতে সবচেয়ে ভাগ্যবান কারা জানেন?'

'কারা?'

'যাদের মেয়ে নেই।'

আজাহার খন্দকার খানিক মন খারাপের ভঙ্গিতে বললেন, 'মাইয়ার বাপ সবচেয়ে বেশি ভাগ্যবান। আপনে এইসব কী বলতেছেন বেয়াই সাহেব?'

'আমি ঠিকই বলছি। আর আপনি সেই ভাগ্যবানদের একজন। যার কোনো মেয়ে নেই। পেলে পুষে বড় করা মেয়েটাকে অন্য কাউকে এভাবে কখনো দিয়ে দিতে হবে না আপনার।'

কিছু বলতে গিয়েও আজাহার খন্দকার আর কথা বললেন না। চুপ করে গেলেন। তিনি যেন বুঝে ফেলেছেন এই কথার সান্ত্বনা কিংবা উত্তর তার কাছে নেই। দেলোয়ার হোসেন অবশ্য মনসুরকে তেমন কিছু বললেন না। কেবল ছোট্ট মঞ্জুর মাথায় হাত বুলিয়ে দোয়া করে দিতে দিতে বললেন, 'তোমার বোনটাকে দেখে রেখো বাবা?'

মঞ্জু ঘাড় কাঁত করে হ্যাঁ সূচক মাথা নাড়লো। শেষ মুহূর্তে আজাহার খন্দকার দেলোয়ার হোসেনকে জড়িয়ে ধরলেন। তারপর গাঢ় কণ্ঠে বললেন, 'আপনের মাইয়া এক মুহূর্তের জন্যও বুঝতে পারবো না, সে শ্বশুরবাড়ি আছে না নিজের বাড়ি আছে! আজ থেইক্যা এই মাইয়া আপনের যেমন, তেমনি আমারও।'

দেলোয়ার হোসেন মৃদু হাসলেন, জবাব দিলেন না। ইঞ্জিনের বিকট শব্দে ট্রলারের গলুইটা ঘাট থেকে দূরে সরে যেতে থাকলো। দূরে সরে যেতে থাকলো এক প্রগাঢ় অভিমানী বাবা, কিংবা এক ঘোরগ্রস্ত কন্যা। চারপাশে দাঁড়িয়ে রইলো কত কত মানুষ, তাকিয়ে রইলো কত কত চোখ। কিন্তু সেই চোখগুলো মুহূর্তের জন্যও দেখতে পেলো না ওই হাসি হাসি মুখের বাবা আর ওই ঘোরগ্রস্ত কন্যার বুকের ভেতর তখন কী বয়ে যাচ্ছে! সেই মানুষগুলো জানলো না, দুটি অভিমানী হৃদয় তাদের অজ্ঞাতে কেমন করে ভেসে যাচ্ছে, ভেঙে যাচ্ছে!

জানলো কেবল তাদের একাকী মুহূর্তগুলো। সেই সকাল থেকে সারাটা দিন নিজের ঘরের দরজা বন্ধ করে বসে রইলেন দেলোয়ার হোসেন। তারপর হাউমাউ করে কাঁদলেন। একা। তার সেই কান্না কোনো এক অদ্ভুত উপায়ে হয়তো পৌঁছে গিয়েছিলো সুবর্ণপুর নদীর ধু-ধু জলরাশির বুকে বিন্দুর মতো ভেসে যাওয়া ট্রলারখানিতে। সেখানে তখন সন্ধ্যা নামছে। দূরে ডুবে যাচ্ছে লাল সূর্য। উড়ে যাচ্ছে এক ঝাঁক সন্ধ্যার গাঙচিল। সেই গাঙচিলগুলো আচমকাই যেন ঘরে ফেরা বাদ দিয়ে থমকে গেলো। তাদের হয়তো মনে হলো, তাদের কেউ ডাকছে। কোনো এক একা, একলা মেয়ে। সে হয়তো তাদের ডেকে ফিসফিস করে বলছে, আমি আমার বাবার কাছে যাবো। আমাকে তোমরা তোমাদের ডানায় ভর করে আমার বাবার কাছে পৌঁছে দাও। আমি তার বুকের ভেতর সেই ছোট্ট মেয়েটি হয়ে ঘুমুতে চাই। কিন্তু মেয়েটি আর ঘুমুতে পারলো না। সে জেগে রইলো গভীর চোখের জলে ভেসে যেতে যেতে। তার ছোট্ট বুকের ভেতর দুকুল উপচানো কান্নায় পাড় ভাঙা নদীর শব্দ শুনতে শুনতে।

New Pdf download: www.PoragEducation.com + webtalkbd.com

হানিফ প্রায় এক নিঃশ্বাসে সব বলে গেলো তোরাব আলী লস্করের কাছে। তার সামনে মোকাররম, বাহাদুর, আয়নাল হক, জালালুদ্দিনসহ আরো অনেকেই বসা। দু-দুজন পুলিশকে ছুরি মেয়ে ধরাশায়ী করে জোহরা পালিয়ে এসেছে, এই ঘটনা শোনার সাথে সাথে উপস্থিত আর সকলে উল্লাস করে উঠলো। জোহরা অবশ্য এখানে নেই। গত কয়েকদিনের দীর্ঘ ক্লান্তিকর যাত্রায় সে মুমূর্ষুপ্রায়। তা ছাড়া মায়ার শরীর এখনো যেমন ছিলো তেমনই। গতকাল বিকেলে চরে পৌছেই ডাক্তারের নির্দেশানুযায়ী ওষুধ শুরু করেছে সে। কিন্তু তাতেও দৃশ্যমান কোনো উন্নতি লক্ষ্য করা যায়নি। উপস্থিত সকলের উল্লাস থামতেই তোরাব আলী লস্কর গলা খাকড়ি দিয়ে গলা পরিষ্কার করলেন। তারপর হানিফকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'পুলিশ দুইজনের অবস্থা কী?'

হামিদুল দাঁড়ানো ছিলো ভিড়ের পেছন দিকে। সে সেখান থেকে গলা উঁচু করে বললো, 'আমার মনে হয় একজন শ্যাষ। জোহরা বু চাক্কুডা এমনে মারলো যেন পোচাইয়া কেলা গাছ কাটতেছে। যেমনে ইচ্ছা তেমনে পোচাইছে। না মরলেও চোউখ দুইখান শ্যাষ।'

উপস্থিত জনতা আরো একবার উল্লাস করলো। কিন্তু মাঝখানে হাত তুলে সবাইকে শান্ত হবার নির্দেশ দিলেন তোরাব আলী লস্কর। তারপর গম্ভীর গলায় বললেন, 'সে বাঁইচ্যা আছেতো?'

এবার কথা বললো বাহাদুর, 'ও আছিলো পিছে, ও ভালো দ্যাহে নাই। আমার কথা শোনেন, যেমনে পোচাইছে, তাতে ভাগ্য খুব ভালো না হইলে বাঁচন সম্ভব না। তয় ভাগ্য ভালো হওনের চাইতে খারাপ হওনই ভালো। যেমনে কোপাইছে, সে

যদি বাঁইচ্যাও থাহে, তাইলে নিজের চেহারাই আর নিজে চিনতে পারবো না। আর চোউখ বাঁচাইতে গিয়া যহন পিছে সইরা গেছে, তহন একটা পোচ পড়ছে গলার নিচে। সাথে সাথে কাটা গাছের মতন পইড়া গ্যাছে মাটিতে। তারপর গড়াইতে গড়াইতে পড়লো পানিতে। আমার ধারণা বাঁচবো না, ওইহানেই কেচ্ছা খতম।'

তোরাব আলী লস্করের মুখ গম্ভীর হয়ে গেলো। তার কপালে অনেকগুলো গভীর রেখা ফুটে উঠতে দেখা গেলো। দুই হাত ক্রমশই মুষ্টিবদ্ধ হয়ে উঠলো তার। বাহাদুর কিছু বলতে যাচ্ছিলো, তার আগেই আয়নাল হক তাকে হাতের ইশারায় থামিয়ে দিলো। উপস্থিত উল্লসিত মানুষের সকলেই প্রায় নীরব হয়ে গেলো। কালেভদ্রে তোরাব আলী লস্করের এমন চেহারা তারা দেখেছে। যে ঘটনা নিয়ে তারা এত উত্তেজিত, আনন্দিত, সেই ঘটনা যে সাধারণ কোনো ঘটনা নয়, তা এতক্ষণে তারা যেন আঁচ করতে পারছে। জালালুদ্দিন কেশে গলা পরিষ্কার করতে করতে বললেন, 'চিন্তার কিছু নাই। তুমি এত চিন্তা...।'

তোরাব আলী লস্কর হাত উঁচু করে তাকে থামিয়ে দিলেন। তারপর ফ্যাঁসফ্যাঁসে গলায় বললেন, 'আপনের বয়স হইছে জালাল কাকু, বয়স হইলে মানুষের বুদ্ধিসুদ্ধি কইম্যা যায়। এহন থেইক্যা আমার সামনে আপনে আর কথা বলবেন না। গত কিছুদিন ধইরা আপনের অনেক কথা আমি শুনছি।'

তোরাব আলী লস্কর উঠে দাঁড়ালেন। তারপর একদৃষ্টিতে মাটির দিকে তাকিয়ে উঠানের এপাশ-ওপাশ পায়চারি করতে লাগলেন। উপস্থিত সবগুলো চোখ নিষ্পলক তাকিয়ে আছে তার দিকে। তোরাব আলী লস্কর আচমকা থামলেন। তারপর তার বড় ছেলে আয়নাল হককে ডেকে বললেন, 'আয়নাল, আপাতত কিছুদিন যত দরকারই হোউক আশেপাশের কোনো গঞ্জে যাওন যাইবো না। একদমই সম্ভব না হইলে বড়জোর এক-দুইজন। তাও খুব সাবধান। আর বড়সড় কোনো ডাকাতি আপাতত করন যাইবো না। আরেকখান কাম করতে হইবো।'

'কী কাম বাজান?'

'কাইল সকাল সকাল সকাল যার যার ঘরে যত যন্ত্রপাতি আছে সব বাইর কইরা শান দিতে হইবো।'

'সব?'

'হ। খুব সাবধান। পুলিশ খুন করন সাধারণ কোনো ঘটনা না। আমাগো বাপ দাদারাও কোনো দিন পুলিশ খুনের চিন্তা করে নাই। এমনে সাধারণ মানুষ মরে, সেইটা এক কথা। কিন্তু পুলিশ খুন করন মানে সরকারের গায় হাত দেওন। দুইদিন আগেই দীঘিনালা থালে অত বড় ঘটনা ঘটাইলি, আর এহন ডাইরেক মার্ডার! এইটা কোনো সাধারণ ঘটনা না। আমার মনে কু ডাক দিতাছে। খুব সাবধান। খুব।'

উপস্থিত উচ্ছ্বসিত মুখগুলোতেও চিন্তার ভাঁজ পড়ে দেখা গেলো। আনন্দে সরগরম পরিবেশটা হঠাৎ নিস্তেজ হয়ে গেলো। বাহাদুর বললো, 'কাকু, ঘটনা কী হইতে পারে?'

New Pdf download: www.PoragEducation.com + webtalkbd.com

তোরাব আলী লস্কর সাথে সাথেই জবাব দিলেন না। তবে সময় নিয়ে বললেন, 'দেশের অবস্থা এহন এইরম না হইলে পুলিশ এইহানেই বড়সড় ফোর্সই পাঠাইতো।'

'আমাগো চরে?' বাহাদুর জিজ্ঞেস করলো।

'হুম।'

'খুঁইজাইতো পাইবো না! কত কত চর, কোন চরে যাইবো? আর এই ধু-ধু বিলের মইধ্যে এইহানে আসন কী সহজ কথা?'

'গাঁধার মতোন কথা বলিস না। এইটা কী বাংলাদেশের মইধ্যে না? না বাইরে?'

'জে, মইধ্যে।'

'বাংলাদেশের মইধ্যে হইলে যেকোনো জায়গায় তারা যাইতে পারবো। সেইটা সুন্দরবন হোউক, আর বান্দরবন হোউক। কষ্ট হইবো, দুই দিন কম বেশি লাগবো। কিন্তু পাইবোই।'

আয়নাল হক বললো, 'এহন তাইলে আমাগো কী করন বাজান?'

তোরাব আলী লস্কর আবারো চুপ করে গেলেন। তারপর বললেন, 'রাইফেল আছে কয়খান?'

'দুই তিন খানতো আছে মনে হয়। কিন্তু হেইগুলানের অবস্থাতো আর চালানোর মতন নাই। সেই কবে একবার লঞ্চ ডাকাতিতে লঞ্চের আনসারগোরতন আনা হইছিলো, আর কোনো কামেতো লাগে নাই।'

'ওইগুলান কাইল বাইর কর। আমারে দে। তেল টেল দিয়া যদি চালু করন যায়।'

'আমরা কী পুলিশের লগে ওইগুলান দিয়া যুদ্ধ করবো নাকি দাদাজান?' এতক্ষণে কথা বললো হানিফ। তার চোখে মুখে উত্তেজনা, আনন্দ।

তোরাব আলী লস্কর বললেন, 'গাঁধা! পুলিশের লগে যুদ্ধ করবে!'

তিনি আয়নাল হকের দিকে ফিরে বললেন, 'শোন, পাঁচ ছয়জনের একটা দল করবি। যারা রাইফেল চালাইতে পারে। গুলি করন লাগবো না। ফাঁকা আওয়াজ করতে পারলেই হইলো। এহন হইতে আমাগো চরের আশেপাশের দুইটা চরের উঁচা টং ঘর বানাবি। সেইখানে তারা বদলি কইরা রাইত দিন পাহারায় থাকবো। সারাক্ষণ চোখ কান খোলা রাখবো। দূরে কোথাও কোন ট্রলারের চিহ্ন দেখলেই রাইফেলের ফাঁকা আওয়াজ দিয়া সবাইরে সাবধান করবে। আর ডবল ইঞ্জিনওয়ালা বড় সড় তিন চাইরখান ট্রলার সব সময় রেডি রাখতে হইবো। মাল সামানা সহ। যাতে প্রয়োজনে পরিস্থিতি বুইঝা সবাই মিল্যা চরেরতন জঙ্গলের দিকে গা ঢাকা দেওন যায়। খুব সাবধান।'

'কোন চরে করবো বাজান?'

'যেই চর পার হইয়া আমাগো এই দিক আইতে হইবো। যাতে আগেভাগেই আমরা সাবধান হইতে পারি।'

জালালুদ্দিন আচমকা বললেন, 'তুই হুদাই এত চিন্তা করতেছোস তোরাব। জীবনে কোনোদিন পুলিশ আইছে? সেই কোন আমলে একবার দুইবার চেষ্টা করছিলো, কিন্তু সুবিধা করতে পারছিলো? পারে নাই। আর এহনতো...।'

'আপনে চুপ থাহেন!' তোরাব আলী রীতিমতো ধমকে উঠলো, 'আপনের বয়স হইছে বাতাসে। কোনোদিন পারে নাই বইলা সামনেও পারবো না, এমন কোনো কথা আছে? আগে কোনোদিন পুলিশওতো খুন হয় নাই। হইছিলো?'

তোরাব আলীর মুখের ওপর আর কেউ কোনো কথা বলার সাহস পেলো না। তবে সকলেই যেন চাইছিলো জোহরার উপস্থিতি এখানে থাকুক। তার কাছ থেকেও কিছু কথা তারা শুনতে চাইছিলো। সবারই মনে হচ্ছিলো জোহরা থাকলে এর একটা ভালো সমাধান তারা পেতে পারতো। কিন্তু পরিস্থিতির গুরুত্ব বিবেচনায় কেউ আর কোনো কথা বললো না।

তোরাব আলীর সাথে জোহরার কথা হলো পরদিন ভোরে। জোহরার ঘরের দরজা খোলা। সেই দরজার দিকে তাকিয়ে তিনি একটু থমকে গেলেন। ঠিক উল্টোদিকের জানালা দিয়ে ভোরের আলো আসছে। বিছানার ওপর আড়াআড়ি পড়েছে এক চিলতে রোদ। সেখানে ছোট একখানা মশারি টানানো। মশারির ভেতর ঘুমিয়ে আছে মায়া। আর সদ্য ঘুম ভাঙা জোহরা একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে মায়ার দিকে। দৃশ্যটা দেখে তোরাব আলী লস্করের কেমন একটা অদ্ভুত অনুভূতি হলো। জোহরার নিজেরওতো এতদিনে এমন একটা মেয়ে থাকতে পারতো! নিজের মেয়ের দিকে এমন মায়া নিয়েওতো সে তাকিয়ে থাকতে পারতো। পাশেই হয়তো ঘুমভাঙা চোখে তাকিয়ে থাকতো জোহরার স্বামী। তোরাব আলী লস্করের বুক থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো। আচ্ছা, জোহরাটা এমন কী করে হলো?

মুখজুড়ে কী মায়া, মনটা কী নরম, চলনে বলনে কী ধীর-স্থির! অথচ মুহূর্তেই আবার ক্ষীপ্র, হিংস্র, বাঘিনী। আর সেইরাতের ঘটনায় সেই পুলিশ সদস্য যদি সত্যি সত্যিই মারা যেয়ে থাকে তাহলে? তাহলে জোহরাতো একজন ভয়ংকর খুনিও!

কথাটা আর ভাবতে পারলেন না তোরাব আলী লস্কর। বুক চিরে একটা হাহাকার বের হয়ে এলো। মেয়েটা নয় বছর বয়সে বাবা হারিয়েছে। তারও আগে মা। বলতে গেলে তোরাব আলী লস্করের নিজের হাতের ওপরই মানুষ হয়েছে সে। বাবা বলতেও তার এই তোরাব আলী– দাদাজান, মা বলতেও তাই। হয়তো এ কারণেই আর সকল নাতি-নাতনির চেয়ে এই মেয়েটার জন্যই তার বুকের ভেতরটা সবসময় তড়পায়। মনে হয়, এই মেয়েটার এখানে ভুল করে জন্ম। তার জন্ম হওয়া উচিত ছিলো শহুরে, সভ্য, শিক্ষিত কোনো ঘরে। তাহলে নিশ্চিত করেই সে হতে পারতো বিশাল কোনো মানুষ! কিন্তু তার নিয়তি তাকে রেখে গেছে এখানে। বিষয়টা মানতে কী যে কষ্ট হয় তোরাব আলীর!

New Pdf download: www.PoragEducation.com + webtalkbd.com

তিনি ঘরে ঢুকলেন। জোহরা মুখ ঘুরিয়ে তাকালো। তারপর মিষ্টি করে হেসে বললো, 'দেখছো দাদাজান, কেমনে ঘুমায়? আবার ঘুমের মধ্যেই হাসে, কথা কয়। ম্মাহ, ম্মাহ বইলা ডাকে। কান্দেও।'

'সব বাচ্চারাই এমন করে।'

'আমি কী আর এর আগে এমনে কইরা কোনো বাচ্চাকাচ্চা দেখছি?'

'তুইও এমন করতি।' তোরাব আলী হাসলেন।

'এহ, আইছে! জীবনেও না।' জোহরা তার দাদাজানের কথা যেন বাতাসে উড়িয়ে দিলো।

তোরাব আলী বললেন, 'কী বিপদেই না তোরে আমি ফালাইলাম!'

'কিসের বিপদ দাদাজান?'

'ওই দিন আমি না কইলে কী তুই কালীগঞ্জ যাইতি? আর না গেলে এই বিপদেও তোর পড়তে হইতো না। আল্লাহর রহমত। যদি আরো খারাপ কিছু হইতো!'

'কী খারাপ হইতো?'

'যদি ছুইটা না আইতে পারতি? যদি আরো বড় বিপদ হইতো?'

'যদি তে সবকিছুই হয় দাদাজান। আসল হইলো গিয়া বাস্তবে কী হইছে? যদিতে তো আমাগো তারা নাও দেখতে পারতো, তাই না? মায়ার মা নাও মরতে পারতো। মায়ার অসুখ নাও হইতে পারতো। যদি এইসব না হইতো, তাইলে কী আমার ওইহানে যাওন লাগতো?'

'তা লাগতো না। কিন্তু বাস্তবে যেইটা হইলো, সেইটাওতো কম কিছু না।'

'বেশির কী দেখলা? আমরাতো সব ভালোয় ভালোয় ফিইরাই আইছি। আইছি না? ওহ, তোমারে বলতে ভুইলা গেছি। হেইদিন আসনের সময় মায়ার জন্য এই মশারিখানও কিন্যা আনছিলাম। এইটা আছিলো হানিফ ভাইর কাছে। মাইয়াটা সারা রাইত মশার যন্ত্রণায় ঘুমাইতে পারে না।'

'এহন কী সারারাইতই এমনে ঘুমায়?'

জোহরার মুখ ম্লান হয়ে গেলো, 'না দাদাজান। জ্বর, পায়খানা কমছে, কিন্তু রাইতে ঘুমায়ই না। সারারাইত মার দুধ খোঁজে। মুখে একটু আঙুল দিয়া রাখলে চোষতে চোষতে ঘুমাই যায়। আবার আঙুল সরাই ফালাইলে চিক্কুর। এই দ্যাহো, চোষতে চোষতে আমার আঙুলের কী দশা করছে!'

তোরাব আলী বললেন, 'কী যে করি এরে নিয়া। রাইতে না ঘুমাইতে ঘুমাইতে তোর চোউখের নিচেও কালি পইরা গেছে। আয়নার দিকে চাইয়া দেখছোস?'

জোহরা হাসলো, 'তোমার না কাজল চোউখ-অলা মাইয়া পছন্দ? এইজন্য আল্লায় আমার চোউখে আপনাআপনি কাজলের ব্যবস্থা কইরা দিছে। হা হা হা।'

জোহরা হাসছে। তোরাব আলী লস্কর মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। যেন জগতে এর চেয়ে সুন্দর কোনো দৃশ্য আর নেই। যেন এর চেয়ে সুন্দর করে আর কোনো মেয়ে হাসতে পারে না।

তবে একটা বিষয় তোরাব আলী লস্কর বোঝেন না, এই জোহরাই মাঝে মাঝে এমন করে তাকায়, এমন করে হাসে, তখন তাকে দেখলে ভয়ে কলিজা হিম হয়ে আসে। আপাতদৃষ্টিতে ওই দুটি মানুষে, হাসিতে, তাকানোতে কোনো তফাৎ নেই। কিন্তু তারপরও তিনি টের পান। এই যে এখন, জোহরার হাসি দেখে তার বুকের ভেতরটা যেন প্রশান্তিতে জুড়িয়ে যাচ্ছে। অথচ ঠিক অন্যসময় কোনো এক অজানা আশঙ্কায় বুকের ভেতরটা হিম হয়ে আসে। কী যেন কী এক রহস্য এই মেয়ের মধ্যে আছে!

তোরাব আলী বললেন, 'তোর ওই দিন ডর লাগে নাই, যহন অতগুলা মানুষ আইসা তোরে ধরলো? তাও পুলিশ?'

'অতগুলা নাতো দাদাজান। দুইজন মাত্র। তাও একজন ভালো কইরা ধরতে পারে নাই। আরেকজন ধরছিলো। কোপাইয়া ওর চেহারা মুখপোড়া হনুমান বানাইয়া দিছি। হা হা হা।'

জোহরা আবার হাসছে। প্রবল হাসিতে তার গা কাঁপছে। তোরাব আলী লস্কর ভয়ংকর আতঙ্ক নিয়ে সেই হাসির দিকে তাকিয়ে রইলেন। ঠিক খানিক আগের সেই জোহরাই, ঠিক খানিক আগের সেই হাসিই, কিন্তু তারপরও তার দুটো হাসি যেন এক নয়। যেন এই হাসির কোথাও অলক্ষ্যে, অজানা কিছু একটা রয়েছে। আর সেই অজানা কিছু একটাই তার মেরুদণ্ড বেয়ে শিরশির করে নেমে যাচ্ছে।

তিনি জোহরাকে একটু পরীক্ষা করে দেখার জন্যই যেন বললেন, 'তুই কী জানোস, ওই পুলিশটা মইরা গেছে?'

'মইরা গেছে! কী কও?' জোহরা ভীষণ অবাক হলো।

'হুম। হাসপাতালে নেওনের পর তার মৃত্যু হইছে।'

জোহরা সামান্য চুপ করে থেকে নির্বিকার কণ্ঠে বললো, 'মরছে ভালো হইছে। না মরলে অর জীবন হইতো হাবিয়া দোজখ। ওই চেহারা লইয়া ঘরেরতন বাইরাইতে পারতো না। মানুষ ডরে দিতো চিক্কুর। ভুল আমারই হইছে, বাঁচাইতে গিয়া জায়গা মতন পোচ দেইনাই। উচিত আছিলো পেট বরাবর একখান দেওনের। এক পোচেই কেল্লা ফতে। নাড়িভুঁড়ি সব বাইর হইয়া যাইতো। আরে ব্যাটা, তুই করস পুলিশের চাকরি, তোর অত বড় পেট থাকবো কেন? অত বড় পেট লইয়া তুই আসামি ধরবি, না পেট ধরবি? আর ওই অতবড় কোমরে প্যান্ট বান্ধনের লাইগ্যাতো জাহাজের কাছির দড়ি ছাড়া কাম হইবো না। হা হা হা।'

তোরাব আলী লস্কর এবার আর কথা বললেন না। তার জোহরার দিকে তাকাতে রীতিমতো ভয় লাগছে। তিনি আচমকা উঠে দাঁড়ালেন। জোহরা বললো, 'কই যাও তুমি?'

'যাই, ওইদিকে কিছু কাজ-কর্ম আছে।'

'দাঁড়াও, একটা জিনিস আছে।'

New Pdf download: www.PoragEducation.com + webtalkbd.com

'কী জিনিস?' তোরাব আলী অবাক হলো।

জোহরা তার চৌকির তলা থেকে একটা বড়সড় কাপড়ের ব্যাগ বের করে দিলো তোরাব আলীর হাতে, 'ধরো।'

'কী এইটা?'

'নিজেই খুইলা দ্যাহো।'

তোরাব আলী খুললেন। ভেতরে এলোমেলো হয়ে পড়ে আছে নতুন পুরনো অনেকগুলো টাকার নোট। পরিমাণে কম মনে হচ্ছে না। তিনি বিস্ময়ে চোখ কপালে তুলে বললেন, 'এত ট্যাকা তুই কই পাইলি?'

জোহরা মৃদু হাসলো, ' হেইদিনই আনছিলাম। ওই যে হারামজাদা ওষুধের দোকান্দার, ওর ক্যাশে, আলমারিতে, ট্রাঙ্কে, যেইহানে যত ট্যাকা আছিলো, সব লইয়া আইছি। হারামি ব্যাটা। আমার লগে বদমাইশি। আনতাম না, কিন্তু জিদ উইঠা গেছিলো ওর ওপরে। ওষুধও লইয়া আইছি অনেক। ওই দ্যাহো।'

জোহরা চোখের ইশারায় ঘরের বেড়ার সাথে লাগানো কাঠের তাকে সার দিয়ে সাজানো ওষুধের দিকে ইঙ্গিত করে দেখালো। তোরাব আলী লস্কর আর কোনো কথা বললেন না। তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। তিনি শুধু শুধু এই মেয়েকে নিয়ে এতদিন আকাশ কুসুম কল্পনা করছিলেন। এই মেয়ের জন্য এই চরের জন্যই। এর চেয়ে ভালো কোনো জায়গা এরজন্য এই পৃথিবীতে নেই। কে জানে, হয়তো তাদের বংশের ভয়ংকর কোনো পূর্বপুরুষের রক্তই তার গায়ে বইছে!

জোহরার অবশ্য খুব ঘুম পাচ্ছিলো। কিন্তু সে অপেক্ষা করছিলো মায়ার জেগে ওঠার। গত কয়েকটা দিনে কিছুটা হলেও সুস্থ হয়েছে সে। শুধু রাতের কান্নাটা তার কমেনি। সারারাত কেঁদে শেষ রাতের দিকে সে ঘুমায়। ঘুম থেকে উঠলে কিছু একটা খাওয়াতে পারলেই সারাদিন আর চিন্তা নেই, চরের আর বাচ্চাদের সাথে হুটোপুটি করে বেলা কেটে যায় তার। ওই সময়টুকুতে জোহরা ঘুমায়।

দিন কয়েক যেতে মায়া অনেকটাই সুস্থ হয়ে উঠলো। শুধু রাতের ওই কান্নাটা ছাড়া। রোজ রাতে একইরকমভাবে কাঁদে সে। তবে একটা অদ্ভুত ব্যাপার হলো, মায়া আচমকা জোহরাকে মা ডাকতে শুরু করছে। এই ডাক তাকে কেউ শিখিয়ে দেয়নি। এমনকি তার মা শেফালিকেও সে কখনো পুরোপুরি মা ডাকতে পারেনি। ঠোঁট উল্টে কোনোমতে ডাকতো, 'ম্মাহ।' কিন্তু গত দুদিন ধরে জোহরা স্পষ্ট করেই শুনছে, মায়া তাকে মা বলে ডাকছে। যদিও জোহরা একাই এটা শুনেছে, আর কেউ শোনেনি।

প্রথম দুয়েকবার ডাকটা শোনার পর জোহরার কেমন উদ্ভট লেগেছিলো বিষয়টা! কিন্তু আরো দিন দুই যেতে সে ভেতরে ভেতরে একটা অস্থিরতা অনুভব

করা শুরু করলো, মায়া আবার কখন তাকে মা বলে ডাকবে! যদিও সে জানে, আর সবার সামনে বসে এই ডাকটা শুনতে তার ভীষণ লজ্জা লাগবে, কিন্তু একা একা মায়ার মুখ থেকে ওই ডাকটুকু শুনতে তার কী যে ভালো লাগে! সেও তখন মায়ার ঠোঁটের কাছে ঠোঁট নিয়ে ফিসফিস করে বলে, 'বল, মা।'

মায়া বলে না। জোহরার তখন খুব মন খারাপ হয়। সে অভিমানের ভান করে দূরে গিয়ে শাড়ির আঁচলে মুখ ঢেকে শুয়ে পড়ে। মায়া কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থাকে, তারপর হামাগুড়ি দিয়ে গিয়ে জোহরার মুখের কাপড়টা সরিয়ে দিয়ে ডাকে, 'মা।'

জোহরার যে তখন কী অসম্ভব ভালো লাগে! তার মনে হয়, এই জগতে এর চেয়ে আনন্দ বোধহয় আর কিছুতেই নেই। সে আজকাল সময় পেলেই মায়ার সাথে এই লুকোচুরি খেলায় মেতে ওঠে। দিনটা তার ভালোই যায়। জোহরা যেন খানিক স্থিতি পেয়েছে। বিষয়টি নিয়ে তোরাব আলী লস্করও খুশি। এমন স্থির, শান্ত, ঘরকুনো জোহরাকেই তিনি চান। কিন্তু রাতের বিষয়টা সেই একই। প্রায় পুরোটা রাতই জেগে থাকতে হয় জোহরার। এমনকি মায়া শেষ রাতের দিকে ঘুমিয়ে গেলেও। মায়া ঘুম থেকে জেগে উঠলে তাকে কিছু খাইয়ে বাইরের বাচ্চাদের সাথে খেলতে দিয়ে তারপর সে ঘুমায়। কিন্তু অদ্ভুত ঘটনাটা ঘটলো সেদিন।

সারারাতের কান্নাকাটি শেষে ভোর রাতের দিকে ঘুমালো মায়া। জোহরা জেগেই ছিলো। কিন্তু সেদিন আর বেশিক্ষণ জেগে থাকতে পারলো না সে। কদিন থেকে একটু জ্বর জ্বরও লাগছিলো, মায়া জেগে ওঠার আগেই তাই ঘুমিয়ে পড়েছিলো জোহরা। তার ঘুম ভাঙলো অস্বস্তিকর এক অনুভূতিতে। ঘুম ঘুম চোখে জোহরা দেখলো, মায়ার ঘুম ভেঙে গেছে। সে বসে আছে তার বুকের কাছে। ছোট ছোট হাতে জোহরার বুকের ওপর থেকে সে শাড়ির আঁচল সরিয়ে ফেলেছে। এখন ব্লাউজের বোতাম খোলার চেষ্টা করছে। কিন্তু বার কয়েক চেষ্টা করেও খুলতে পারলো না। নাছোড়বান্দা মায়া শেষ পর্যন্ত তার মুখটা নামিয়ে আনলো জোহরার বুকের কাছে।

ঘটনাটিতে জোহরা এত অপ্রস্তুত হয়ে গেলো! সে জানে এই ঘরে আর কেউ নেই, সে আর মায়া-ই শুধু, তারপরও চকিতে একবার চারপাশটা দেখে নিলো। তারপর রাজ্যের বিরক্তি নিয়ে মায়াকে দূরে ঠেলে সরিয়ে দিলো। নিজের স্খলিত ব্লাউজ, শাড়ির আঁচল ঠিকঠাক করলো। কিন্তু সমস্যা হলো, সেই থেকে আবার কান্না শুরু হলো মায়ার। প্রায় দিনভরই সে কান্নাকাটি করলো। রাতেও তার কান্না থামলো না। রাত গভীর হতে থাকলো। মায়ার সাথে সাথে ক্লান্ত, অবসন্ন হয়ে পড়তে থাকলো জোহরাও। শেষ রাতের দিকে কী মনে করে মায়াকে হঠাৎ কাছে টানলো জোহরা। তারপর ব্লাউজের বোতাম খুলে মায়ার ঠোঁটের ফাঁকে তুলে দিলো তার অনাস্বাদিত, অনাঘ্রাত, কুমারী স্তনের বোঁটা। মায়া যেন মুহূর্তেই এই এতদিনে

New Pdf download: www.PoragEducation.com + webtalkbd.com

তার মাকে খুঁজে পেলো। সে চুকচুক করে এক কুমারি কিশোরীর বুক থেকে মাতৃদুগ্ধ শুষে নিতে গিয়ে আসলে শুষে নিতে থাকলো মাতৃত্ব। এই মাতৃত্বের উৎস কোথায় কেউ জানে না। না মায়া, না জোহরা। না সেই গভীর রাতের নিঃশব্দ হাওয়ার বুকে ভেসে বেড়ানো কোনো এক মৃত মায়ের আত্মা। কেউ না।

মায়া কেবল জানে, এই এত এত দিন বাদে আবার তার ঠোঁটের ভেতর সে তার মাকে খুঁজে পেয়েছে। জোহরা কেবল জানে, নিজের অজান্তেই কেমন কেমন করে সে যেন হয়ে উঠেছে পরিপূর্ণ এক মা। এই মা হতে তার বিয়ে দরকার হয়নি, স্বামী দরকার হয়নি, যৌনতার দরকার হয়নি, গর্ভধারণ করতে হয়নি। কিন্তু তারপরও তার এই মাতৃত্ব জগতের আর কোনো মাতৃত্বের চেয়ে বিন্দুমাত্র গৌন নয়, নগণ্য নয়। ক্ষুদ্র নয়, অকিঞ্চিৎকর নয়। বরং এই বিশ্বচরাচরের আর সকল মাতৃত্বের মধ্যেও এই অপ্রকাশ্য মাতৃত্বটুকু যেন হয়ে রইলো অনন্য, অবিস্মরণীয়, চিরঞ্জীব।

কণা ভেবেছিলো নতুন ঘর, নতুন মানুষ, নতুন নিয়ম-কানুনে সহসা অভ্যস্ত হতে পারবে না সে। কিন্তু ঘটনা ঘটলো উল্টো। ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠতেই আজাহার খন্দকার তার জন্য নাশতা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন। নদীর তাজা মাছ আর ক্ষেতের সবজি নিয়ে তিনি নিজেই আগ্রহ করে রান্না ঘরের মেঝেতে কাটাকুটিতে বসে যান। বাড়িতে কাজের লোকের অভাব নেই। নিয়মিত কাজ করছে রাবুর মা, ফরিদা বানু, খালেক। তাদের সাথে অনিয়মিতভাবে আরো দুচার জনতো রয়েছেই। তারা চোখ বড় বড় করে দেখে, আজাহার খন্দকার রান্নাঘরের মেঝেতে বসে মাছ কুটছেন। তার প্রিয় তরকারি রান্না করতে নিজেই চুলার পাশে বসে পড়ছেন। এমন সংসারী মানুষ কী কখনো ছিলেন আজাহার খন্দকার? মনে পড়ে না কারো। বরং রাতদিন তিনি পড়ে থাকতেন বাজারের আড়তে কিংবা এর-ওর সালিস ব্যবস্থায়! রোজ ফজরের আজানের পরপরই কিছু একটা খেয়ে বাড়ি থেকে বের হয়ে যেতেন তিনি, আর ফিরতেন গভীর রাতে। কেনইবা ফিরবেন? এই ঘরে তার জন্য কে থাকতো? থাকতো তো কেবল ইট কাঠের একটা কাঠামো। কিন্তু ইট-কাঠের কাঠামোতেই কী ঘর হয়? ঘর হতে হলে ঘরের দরজায় মানুষ থাকতে হয়। সেই মানুষের মনে মায়া থাকতে হয়, চোখে অপেক্ষা থাকতে হয়। না হলে কিসের মায়ায় ঘরে ফিরবে মানুষ?

সেই আজাহার খন্দকারের ঘরভর্তি এখন মায়া। কণাকে দেখলেই তার মনে হয়, স্রষ্টা শেষ অবধি তার বুকের ভেতর শুকিয়ে যাওয়া নদীটাকে আবার কানায় কানায় পূর্ণ করে দিয়েছেন। কী ভীষণ মায়া মেয়েটার মুখজুড়ে! কী অপার্থিব আদুরে গলায় সে তাকে ডাকে, 'বাবা!'

New Pdf download: www.PoragEducation.com + webtalkbd.com

আজাহার খন্দকার তার চেয়েও মায়াময় কণ্ঠে জবাব দিতে চেষ্টা করেন, 'কীগো মা?' কিন্তু তার মনে হয়, যতটা মায়া তিনি ছড়াতে চান, তার কিছুই তিনি প্রকাশ করতে পারেন না। এই এক আক্ষেপ তার বুকে। নিজের ভেতরের ভালোবাসা তিনি সহসা কাউকে বোঝাতে পারেন না।

কিন্তু কণা বোঝে। সে সেই প্রথম দিনই বুঝেছে! অমন বয়স্ক একজন মানুষ যখন অসহায় ছোট্ট এক শিশুর মতোন করুণ গলায় তাকে ডেকেছিলো– মাগো! ওই শব্দটুকু মুহূর্তেই তার জগতটা এলোমেলো করে দিয়েছিলো। কে বলেছে মানুষ দেখে মানুষ চেনা যায় না! কণা ঠিকঠিক চিনতে পেরেছিলো। সে জানে, তার বাবা দেলোয়ার হোসেন খুব কষ্টই পেয়েছিলেন। কিন্তু কণা এও জানতো, তার ওই কষ্ট পাওয়াটা সাময়িক। কিংবা কিছুটা অনর্থকও।

আজাহার খন্দকারতো কোনো দোষ করেননি! তাহলে তাকে কেন অপমানিত, বঞ্চিত হতে হবে! একজন মানুষের অপরাধে কেন অন্য একজন নিরাপরাধ মানুষের শাস্তি পেতে হবে? আর মানুষটা কী শিশুর মতো সরল! কেমন করে অতটা দূরের পথ ওভাবে ছুটে গেলেন! তারপর বাড়ির সামনে অমন ভিখেরির মতোন দাঁড়িয়ে রইলেন। অথচ কত বড় মানুষ তিনি, কত নাম ডাক তার! আর এসকলই তিনি করেছেন কেবল তার জন্যই, আর কারো জন্য নয়।

কণার নিজেকে তখন জগতের সবচেয়ে মূল্যবান মানুষ বলে মনে হয়েছিলো। মনে হয়েছিলো, এই মানুষটিকে সে কোনোভাবেই ফেরাতে পারবে না! এখনো তা-ই মনে হয়। কখনো কখনো আজাহার খন্দকারের অতিরিক্ত যত্ন যে তাকে খানিক বিরক্ত করে না, তা নয়। কিন্তু সে জানে, এমন ভালোবাসা যারা কখনো পায়নি, তারাই কেবল বুঝতে পারবে এর সত্যিকারের মূল্য। সেও তাই বোঝার চেষ্টা করে। আজাহার খন্দকার তৃতীয় দিনই তার হাতে ঘরের চাবি তুলে দিয়েছেন। তুলে দিয়েছেন সিন্দুকের একগোছা অতিরিক্ত চাবিও। আলমারি, বাক্স যেখানে যা রয়েছে তার কর্তৃত্বও। আর হেড়ে গলায় বলেছেন, 'এই সব জিনিস আছিলো আমার মার হাতে। তোমার শাশুড়ি আর নেওনের সময় পায় নাই। তার আগেইতো আল্লাহ তারে নিয়া গেলো। এক মার হাত থেইকা নিছিলাম, এহন আমি তাই আমার আরেক মার হাতে তুইল্যা দিলাম। মানুষ বুড়া হইলে হয় গুড়াগাড়া, পোলাপান। তার তহন আর অতো হিসাব-নিকাশ থাহে না। বোধ-বুদ্ধি থাহে না। তহন তার একজন মা লাগে। আসল মা। এই ভাইগ্যতো সবাইর হয় না, আমার হইছে। তুমি আমার মা।'

কণার কী যে ভালো লাগে! সে মনে মনে ভেবেছিলো, সপ্তাহখানেক পর বাবা তাকে নিতে আসলেই সে বাড়ি ফিরে যাবে। তারপর এ কয়দিনে যতটা সম্ভব পড়াশোনা করে আইএ পরীক্ষাটাও দিয়ে দেবে। কিন্তু দিন যত যাচ্ছে, এই সংসার ছাড়া জগতের আর সবকিছুই কেমন যেন অপ্রয়োজনীয় হয়ে যাচ্ছে তার কাছে।

আজকাল মনসুরও অবশ্য একটু একটু ঘরকুনো হয়ে যাচ্ছে। যে কীনা দিনমান বাইরে বাইরে ঘুরে বেড়াতো, ছেলেবেলার বন্ধুদের সাথে চায়ের দোকানে আড্ডা মেরে যার দিন কাটতো, সেও আজকাল সুযোগ পেলেই কণার গা ঘেঁষে বসে থাকতে চায়। কণা মনে মনে খুশি হলেও বাইরে বুঝতে দেয় না। সে বলে, 'আপনার বাইরে কোনো কাজ নেই?'

মনসুর বলে, 'আছেতো!'

'তাহলে? সারাদিন এই যে ঘরে বসে থাকেন!'

'সারাদিন কই বসে থাকি?'

'উহু, সারাদিন আর কই? এই দিনের আলোয়, আর রাতের অন্ধকারে। বাকি সময়তো বাইরে বাইরেই থাকেন, তাই না?' কণা টিপ্পনী কেটে বলে।

মনসুর বলে, 'এখন এমন করছো, একবার চলে গেলে কিন্তু আর পাবে না।'

'কোথায় চলে যাবেন?'

'অনেক দূরে।'

'আমার থেকে দূরে গিয়ে থাকতে পারবেন?'

'না পারলে যাবো কেন!'

'যাবেন না তাহলে?'

'উহু।'

'তাহলে পড়াশোনা?'

'দেশের অবস্থা ঠিকঠাক না হলে বাবাতো আমাকে ঢাকায় যেতে দেবেন না। এখন আরো বেশি দেবেন না।'

'কেন?'

'এই যে এখন তুমি আছো! আগে না হয় আমি একা ছিলাম, এখনতো তুমিও জুটে গেলে।'

'হুম, তাতে কী! আমারওতো আপনার সাথে ঢাকায় যাওয়ার কথা। বাবা প্রথম কী বলেছিলো, মনে নেই? আপনার সাথে বিয়ে হলেই কেবল আমার পড়াশোনাটা চলবে!'

মনসুর হাসলো, 'তোমাকে দেখেতো মনে হচ্ছে না, পড়াশোনা করার কোন ইচ্ছে তোমার আছে।'

'ঠিক আছে। এবার বাড়ি গিয়ে আর পরীক্ষা না দিয়ে আসছি না মশাই। তারপর পরীক্ষার রেজাল্ট দিলেই ঢাকা।'

'আমারতো মনে হয় না তুমি ঢাকা গিয়ে থাকতে পারবে।'

'কেন পারবে না?'

'এই যে বাবার জন্য! বাবাও তোমাকে ছাড়া থাকতে পারবে না। মরেই যাবে।'

New Pdf download: www.PoragEducation.com + webtalkbd.com

কথাটা কণার একদম বুকে এসে বিঁধলো, তাইতো, আজাহার খন্দকার তাকে ছাড়া কি করে থাকবেন? তার চেয়েও বড় কথা, কণাকেতো তিনি কোথাও যেতেই দেবেন না!

তবে এ বাড়িতে কণার সাথে সবচেয়ে কম ভাব যার, তার নাম মঞ্জু। সে সব সময় একা একা থাকে। কারো সাথেই তেমন কথা বলে না। শুধু যে কণার সাথেই, তাও না। সে সবার সাথেই কম কথা বলে। স্কুলে যায়, স্কুল থেকে বাড়ি ফিরে নিজের ঘরে দরজা বন্ধ করে বসে থাকে। সেদিন কণা ইচ্ছে করেই তার ঘরে গেলো, 'কী খবর মঞ্জু? কেমন আছো?'

'হুম, ভালো।'

'হুম, ভালো কী? কতটুকু ভালো?'

'ভালো।'

'শুধুই ভালো?'

'হুম।'

'এই ছেলে!' কণা এবার খানিক ধমকে উঠলো, 'এভাবে কারো সাথে কথা বলা যায়?'

'কীভাবে?'

'কেউ যখন কাউকে জিজ্ঞেস করে কেমন আছো, তখন তারওতো উত্তরে জিজ্ঞেস করা উচিত আপনি কেমন আছেন?'

'হুম।'

'হুম কি?'

'আমারতো জানতে ইচ্ছে করে না আপনি কেমন আছেন, তাইলে কেন জিজ্ঞেস করবো!'

'ওমা! এ কেমন কথা হলো মঞ্জু? আমি কেমন আছি, সেটা তোমার জানতে ইচ্ছে করে না?'

'শুধু আপনারই না, কারোটাই জানতে ইচ্ছে করে না।'

'কারোটাই না? ক্লাসের কোনো মেয়েরটাও না? যাকে মনে মনে ভালো লাগে!'

'আমাদের স্কুলে মেয়ে নেই।'

'থাকলে জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে হতো?'

মঞ্জু এই কথার জবাব দিলো না। কণা বললো, 'তুমি আমাকে আপনি করে বলবে না। ভাবিকে কেউ আপনি করে বলে? বিচ্ছিরি শোনায় না?'

মঞ্জু তাও জবাব দেয় না। সে চুপ করে থাকে। এই নিয়ে মনসুরের সাথে কণার কথা হয়েছে। মনসুর বললো, 'ও ছোটবেলা থেকেই অমন।'

'অমন সেটাতো বুঝলাম, কিন্তু অমন কেন?'

'কী জানি! হয়তো মা ছিলো না বলে। আমিতো অনেকখানিই পেয়েছি, ও তো একদমই পায়নি। এর ওর কাছে বড় হয়েছে। নিজের চাওয়া পাওয়াটা হয়তো কখনো বলতে পারেনি, বুঝতেও পারেনি। মা না থাকলে বচ্চাদের কত কত সাইকোলজিক্যাল প্রবলেম যে হয়!'

কথাটা কণার মনে ধরলো। সেই থেকে সে মঞ্জুকে একটু আলাদা করেই সময় দেয়ার চেষ্টা করে। তবে তাতে লাভ বিশেষ হলো না। মঞ্জু যেমন ছিলো তেমনই রইলো। তবে মাঝে মধ্যে হাত খরচের টাকা, স্কুলের বেতন এসব নিয়ে চুপচাপ এসে কণাকে বলে যায় সে। কণা যাতে বাবাকে বলে! এইটুকু কণা আদায় করেই নিয়েছে। মাত্র অল্প কদিনেই নিষ্প্রাণ এক বাড়ির সচল হৃৎপিণ্ড হয়ে উঠলো যেন সে।

তবে দিন কয়েক যেতেই বাড়ির জন্য মনটা খুব অস্থির হয়ে উঠলো তার। সে ভেবেছিলো বাবা পরের সপ্তাহের লঞ্চেই আসবে। কিন্তু দেলোয়ার হোসেন এলেন না। সেই থেকে কণার অস্থিরতা বেড়ে গেলো আরো কয়েকগুণ! বাবার কিছু হয় নিতো! সে পরের লঞ্চেই জসিমকে জরুরি খবর দিয়ে গোবিন্দপুর পাঠালো। সে গিয়ে যেন কণাকে নিতে দেলোয়ার হোসেনকে পাঠায়।

কণা চাইলে জসিমের সাথেও চলে যেতে পারতো! কিন্তু আজাহার খন্দকার নতুন বউকে প্রথমবার এভাবে বাপের বাড়ি নাইওর পাঠাবেন না। তিনি তার বেয়াইর অপেক্ষায়। দেলোয়ার হোসেনকে তিনি বুঝিয়ে দিতে চান, এ বাড়িতে তার মেয়েকে বিয়ে দিয়ে তিনি কোনো ভুল করেননি।

দেলোয়ার হোসেন এলেন পরের সপ্তায়। তার স্কুলে তখন স্কুল কমিটির কী একটা নির্বাচন চলছিলো, সেটা রেখে তিনি আসতে পারছিলেন না।

সেদিন ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে কণা ফজরের নামাজ পড়লো। তারপর উঠান পেরিয়ে বাইরের চাতালটাতে একটু হাঁটতে বের হলো। মনসুর তখনো ঘুমাচ্ছে। কণা বাইরে বেরিয়ে দেখলো হালকা কুয়াশা পড়েছে চারদিকে। হেমন্ত এখনো শুরু হয়নি। তবে হবে হবে করছে। ভোরের শরীরজুড়ে শীতের স্পষ্ট আগমনী বার্তা। উঠান পেরুতেই রাস্তা। রাস্তার ওপাশে বড় খোলা বাগান। বাগানের সাথেই পুকুর। পুকুর পাড়ে খন্দকার বাড়ি জামে মসজিদ। কণা মসজিদের দিকটাতে গেলো না। এত ভোরে মুসল্লিরা দেখলে আবার কী না কী ভাবে! মসজিদের উল্টোদিকে রাস্তায় অনেকখানি পথ হাঁটলো সে। তার গায়ে পাতলা চাদর। চাদরে ঘোমটা টেনে ঘাসের মধ্যে হাঁটছিলো কণা। ভোরের শিশির ভিজিয়ে দিচ্ছিলো তার পা। কী এক গা শিরশিরে অনুভূতি!

ঠিক এই মুহূর্তে মানুষটা পিছে এসে দাঁড়ালো। গলা খাঁকড়ি দিয়ে বললো, 'খন্দকার বাড়িটা কোন দিকে?'

গলাটা শুনে কণা জমে গেলো! শিশির ভেজা ঘাসের স্পর্শে এভাবে জমে যাওয়ার কথা না! তারপরও সে যেন নড়তে ভুলে গেলো। কতদিন, কতদিন এই গলাটা সে শোনেনি! কণা পেছন ফিরে তাকালো। তারপর ঘোমটাটা সরিয়ে জলোচ্ছ্বাসের মতো সে ঝাঁপিয়ে পড়লো মানুষটার বুকে, 'বাবা! বাবা!।'

New Pdf download: www.PoragEducation.com + webtalkbd.com

ততক্ষণে মসজিদে ফজরের নামাজ শেষ হয়েছে। মুসুল্লিরা সব সুর করে দোয়া দরুদ পড়তে পড়তে বাড়ি ফিরছেন। তাদের বাড়ি ফেরার রাস্তায় একজন মধ্যবয়স্ক মানুষের বুকে খন্দকার বাড়ির বড় বউকে এভাবে হু-হু করে কাঁদতে দেখে তারা থমকে দাঁড়ালো। চারপাশে এই যে এত এত মানুষ, তা যেন তারা দেখছেই না। মধ্যবয়স্ক মানুষটাও এবার হাউমাউ করে কান্না শুরু করলেন, 'মারে, ও মা, মাগো!'

তাদের দুজনের কান্নায় সকালের স্নিগ্ধ বাতাস যেন ভারি হয়ে উঠলো। ভোরের অস্পষ্ট আলো যেন আরো থমকে গেলো। কিন্তু সেই ভারি হাওয়া আর থমকে যাওয়া ম্লান আলোতেও ভিড়ের মধ্যে আরো একজনের কান্নার শব্দ শোনা গেলো। তিনি চেষ্টা করছিলেন তার কান্নার শব্দ আটকে রাখতে। কিন্তু পারলেন না। বাবা মেয়ের এই অপার্থিব মিলন দৃশ্য তাকে ভাসিয়ে নিয়ে গেলো। আজাহার খন্দকারও পিতা-কন্যার সেই কান্নায় মিলে-মিশে একাকার হয়ে গেলেন।

শীতের আগমনে নদীতে ধীরে ধীরে পানি কমতে শুরু করেছে। এই সময়ে ডাকাতের উৎপাত খানিক কম হয়। ঝড় বাদলের আশঙ্কাও। ফলে লঞ্চের যাত্রীও কিছু বাড়ে। আর এ কারণেই ভেদরগঞ্জ থেকে গোবিন্দপুর রুটে সপ্তাহের মাঝখানে ছোটখাটো আরো একখানা লঞ্চও চালু হয়েছে। দেলোয়ার হোসেন সেই হিসেব করেই এসেছিলেন। দিন তিনেক থেকে কণাকে নিয়ে তিনি চলে যাবেন। কিন্তু আজাহার খন্দকার রীতিমতো আয়োজনের মহোৎসব শুরু করলেন। দেলোয়ার হোসেন স্বপ্নেও ভাবেননি এমন আপ্যায়ন তিনি পাবেন। তার বরং লজ্জাই লাগছিলো। যে অপমানটা তিনি আজাহার খন্দকারকে করেছিলেন, তার কিছুটাও যদি তিনি ফিরিয়ে দিতেন, তাহলে আর মুখ দেখাতে পারতেন না তিনি।

মনে মনে অবশ্য একটা শঙ্কা, খানিক মানসিক প্রস্তুতি নিয়েই তিনি এসেছিলেন। কিন্তু আজাহার খন্দকার তাকে হতচকিত করে দিয়েছেন। খন্দকার বাড়ির বড় ছেলে মনসুর। মনসুরের শ্বশুর এসেছে। এই নিয়ে হাটে-বাজারে অবধি একটা হৈহৈ রব উঠে গেলো যেন। তিনি চা খেলে কোনো দোকানে তাঁর কাছ থেকে দাম নেয় না। তিনি মসজিদে নামাজ পড়তে গেলে সকলে হন্তদন্ত হয়ে প্রথম কাতারে তাঁকে জায়গা করে দেয়। রাস্তায় হাটতে বের হলে মানুষের সমীহ, সম্ভ্রম দেখে তিনি অবাক হয়ে যান। এবং এই এত বড়, এত সম্মানী একজন মানুষ তার মেয়ের জন্য ওভাবে তাঁর বাড়ির সামনে গিয়ে করজোড়ে নতজানু হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন, এটি ভাবতেই এখন যেন লজ্জায় তাঁর মাথা কাটা যায়। তারওপরে কী ব্যবহারটাই না তিনি করেছিলেন!

কণার ওপর যে ক্ষোভ, যে কষ্ট তিনি বুকে পুষে রেখেছিলেন। তাও যেন একটু একটু করে মিলিয়ে যেতে থাকলো। দেলোয়ার হোসেনের বরং মনে হলো, কণা

তাকে একটা ভয়াবহ অপরাধবোধ থেকে মুক্তি দিয়েছে। প্রায়শ্চিত্য করার সুযোগ দিয়েছে। এমন মানুষ যদি তার ঘরের দরজা থেকে শূন্য হাতে ফিরে আসতো, তবে সারাজিবন তিনি নিজেকে ক্ষমা করতে পারতেন না। এখন বরং কণার কাছে কৃতজ্ঞই লাগছে তার। তিনটে দিন যেন চড়ুই পাখির ডানায় ফুড়ুৎ করে উড়ে গেলো। একইসাথে অবাক এবং মুগ্ধ দৃষ্টিতে কণাকে দেখেন দেলোয়ার হোসেন। এই সেদিনের কণা, কেমন সংসারী হয়ে গেছে! কোমরে শাড়ির আঁচল গুঁজে কেমন একটা গৃহিণী গৃহিণী ভাব নিয়ে সে সব কাজ সামলে নিচ্ছে।

দেলোয়ার হোসেন খুশি যেমন হন, আড়ালে দীর্ঘশ্বাসও চাপেন। এই মেয়েকে নিয়ে কত স্বপ্নই না তাঁর ছিলো! কিন্তু এও ভাবেন, শেষ অবধি সকলইতো ওই শান্তির জন্যই, ভালো থাকার জন্যই। মেয়ে যদি এভাবে ভালো থাকে, থাকুক না!

তবে আড়ালে আবডালে তিনি কণার পড়ার কথাটাও বলেন। সেদিন রাতে কণা আচমকা বাবার গলা জড়িয়ে ধরে বললো, 'তুমি কী সত্যি সত্যি আমার বইগুলো ফেলে দিয়েছো বাবা?'

দেলোয়ার হোসেন হাসলেন, 'ফেলে দিলেই কী, আর না দিলেই কী! তোরতো আর ছোট কোনো ভাই-বোন নেই যে ওগুলো পড়বে!'

'তুমি একটা পাগল বাবা।'

'কেন?'

'আর অভিমানীও। বাচ্চাদের মতো।'

'কেন বলতো?'

'তুমি সত্যি সত্যিই ভাবছো, আমি আর পড়াশোনা করবো না?'

এবার গম্ভীর হলেন দেলোয়ার হোসেন, 'না ভাবার কী আছে? যেটা সত্যি, সেটা ভাবার দরকার পড়ে না।'

এবার কণাও গম্ভীর হলো। সে বললো, 'তুমি আমাকে চেনো না বাবা।'

'তুই আমার মেয়ে, আর আমি তোকে চিনি না?'

'উহু, চেনো না। আর চেনো না বলেই, সেদিন অমন অবাক হয়েছিলে। কখনো ভেবেছিলে, আমি অমন করতে পারি? তাও তোমার অবাধ্য হয়ে, অনুমতি না নিয়ে?'

দেলোয়ার হোসেন এবার আর জবাব দিলেন না। চুপ করে রইলেন। কণা বললো, 'আমি পরীক্ষাটা দেবো বাবা।'

দেলোয়ার হোসেন কণার কথাকে খুব একটা গুরুত্ব দিলেন না। তিনি বললেন, 'তাহলে সংসার করবে কে?'

কণা উঠে তার ঘরে যেতে যেতে বললো, 'যে রাঁধে, সে চুলও বাঁধে বাবা।' দেলোয়ার হোসেন বিভ্রান্ত চোখে মেয়ের দিকে তাকিয়ে আছেন। কণা ফিরে এলো মুহূর্তখানে পরেই। তার হাতে একগাদা বই-খাতা। সে বই-খাতাগুলো তার বাবার সামনে বিছানায় নামিয়ে রাখতে রাখতে বললো, 'এগুলো দেখেছো?'

New Pdf download: www.PoragEducation.com + webtalkbd.com

'কী এগুলো?'

'বই।'

'কীসের বই?

'আমার আইএ পরীক্ষার বই।'

'তুই এগুলো কই পেলি? বাড়ি থেকে আসার সময় নিয়ে এসেছিলি?'

'উহু।'

'তাহলে?'

'এগুলো তোমাদের জামাই আমাকে কিনে এনে দিয়েছে।'

'মনসুর!' দেলোয়ার হোসেন যারপরনাই অবাক হলেন।

কণা বললো, 'হু।'

এ বাড়িতে আসার পর থেকেই দেলোয়ার হোসেনের বিস্ময় যেন কাটছেই না। একের পর এক অভাবনীয় ঘটনায় তার হতবুদ্ধ অবস্থা। তিনি সন্দিগ্ধ গলায় বললেন, 'কিন্তু তোর কলেজ? টিচার? এগুলো ছাড়া পড়বি কী করে?'

কণা হাসলো, 'তুমি ভুলে যাচ্ছো বাবা। তোমাদের জামাই ডাক্তারি পড়ছে। মেডিকেলে পড়তে হলে আইএ পাশতো তাকে করতে হয়েছে, হয়েছে না? আর ভালো ছাত্র না হলে মেডিকেলে পড়াও যায় না বাবা।'

'মনসুর তোকে পড়ায়?'

'রোজ। আমি পড়তে না চাইলে আমাকে জোর করে পড়ায় বাবা। বলে, তোমার বাবার সবচেয়ে বড় স্বপ্নটা আমরা নষ্ট হতে দেবো না।'

দেলোয়ার হোসেন তার চোখ লুকানোর জন্য আড়াল খুঁজছেন। কিন্তু কণার মুখোমুখি বসে চোখ লুকানোর জন্য আড়াল কোথায় পাবেন তিনি? কণা তার শাড়ির আঁচল তুলে দেলোয়ার হোসেনের চোখ মুছিয়ে দিতে লাগলো। দেলোয়ার হোসেন কান্নাজড়ানো গলায় বললেন, 'সবসময় বাবা-মাই সঠিক বোঝে, কথাটা বোধহয় ঠিক না। কখনো কখনো সন্তানও তার বাবা-মায়ের চেয়ে ঠিকটা বুঝতে পারে। বাবা মায়েরও ভুল হতে পারে। এই কথাটা আমরা বাবা মায়েরা কখনোই বুঝতে চাই না। তুই আমাকে মাফ করে দে মা।'

'কেন বাবা?'

'এই বিয়ে নিয়ে তোর সাথে আমি কী অন্যায়টাই না করলাম।'

কণা হাসলো, 'আমিও কী কম অন্যায় করেছি বাবা?'

দেলোয়ার হোসেন জবাব দিলেন না। কণা তার বাবার মাথাটা কাঁধে নিয়ে মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে বললো, 'তুমি কী একটা কথা জানো বাবা?'

'কী?'

'এই পৃথিবীতে আমি তোমার চেয়ে বেশি ভালো আর কাউকেই বাসি না?'

দেলোয়ার হোসেন এবারও কথা বললেন না। কণা বললেন, 'বাবা আর মায়ের মধ্যে কী আলাদা করা যায়? যায় না। আমিও পারি না। তারপরও আমার সবসময় মনে হয় এই পৃথিবীতে যদি আমাকে একজন মাত্র মানুষ বেছে নিতে বলা হয়, তাহলে আমি তোমাকে বেছে নেবো বাবা।'

দেলোয়ার হোসেনের হাউমাউ করে কাঁদতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু তিনি নিজেকে সংবরণ করলেন। কণা বললো, 'আমি জানতাম বাবা, আজ হোক, কাল হোক, আমি তোমাকে খুশি করতে পারবো। তোমাদের জামাইকে দেখে, তার সাথে কথা বলে এই বিশ্বাস আমার জন্মেছিলো। আর উনি, মানে বাবা যখন ওভাবে আমাদের বাড়িতে গেলেন, অমন করে বললেন, বিশ্বাস করো আমার ভেতর থেকে তখন আপনাআপনিই যেন কিছু একটা হলো, আমাকে পুরোপুরি এলোমেলো করে দিলো। আমার মনে হলো, ওই মানুষটার আমাকে খুব দরকার। তোমার যেমন আমাকে দরকার, তার চেয়েও বেশি। কিন্তু আমি জানতাম, তুমি তখন কষ্ট পেলেও, আমি তোমাকে পরে খুশি করার সুযোগটা অন্তত পাবো। কিন্তু ওই বৃদ্ধ মানুষটাকে তখন ফিরিয়ে দিলে, কষ্ট দিলে, তাকে আর কখনো আমি পাবো না বাবা।'

দেলোয়ার হোসেনের মনে হলো, চোখের সামনে রোজ একটু একটু করে বাবা-মা তাদের মেয়েকে যতই বড় করুক না কেন, তারা কখনোই বুঝতে পারেন না যে তাদের অজ্ঞাতসারে কোনো এক ফাঁকে সেই মেয়েটি এমন বড় হয়ে যায়! এমন করে সে নিজেই হয়ে যায় তাদেরও বাবা-মা!

দেলোয়ার হোসেনের বুকের ভেতর ভার হয়ে থাকা জমাট দুঃখের পাথরটা কখন যে কর্পূরের মতো হাওয়ায় উড়ে গেলো, তিনি তা টেরই পেলেন না। ঠিক সেই মুহূর্তে তার নিজেকে মনে হলো জগতের সবচেয়ে সুখী বাবা।

দেলোয়ার হোসেন কণা আর মনসুরকে নিয়ে যাবেন পরদিন বিকেলে। যাত্রার সব প্রস্তুতিও প্রায় সম্পন্ন। কিন্তু তারপরও কণা আর মনসুরকে সাথে নিয়ে ফেরা হলো না তার। যাত্রার দিন দুপুরে আচমকা অসুস্থ হয়ে পড়লেন আজাহার খন্দকার। সকাল থেকেই ভয়ানক শ্বাসকষ্ট শুরু হলো তার। দুপুর নাগাদ সেটি আরো বাড়লো। শেষ অবধি কণাকে রেখেই ফিরে যেতে হলো দেলোয়ার হোসেনের। আজাহার খন্দকারের এই শারীরিক অবস্থায় কণাকে নিয়ে যাওয়ার কথা তিনি কোনোভাবেই বলতে পারলেন না। যদিও আজাহার খন্দকার বারবার বলছিলেন তিনি সুস্থ হয়ে যাবেন। এমন সমস্যা তার প্রায়ই হয়। দুয়েকদিন বাদে আবার ঠিকও হয়ে যায়। কিন্তু তারপরও দেলোয়ার হোসেন কণাকে রেখে গেলেন। যদিও আজাহার খন্দকার তাকে কথা দিলেন, তিনি সুস্থ হওয়ামাত্র কণাকে নিয়ে তারা সকলে মিলে দীর্ঘ সময়ের জন্যই গোবিন্দপুর যাবেন।

New Pdf download: www.PoragEducation.com + webtalkbd.com

আয়নাল হকের সামনে কাঁচুমাচু মুখে দাঁড়িয়ে আছে হানিফ। আয়নাল হক বললো, 'কী, খাড়াই আছোস ক্যান? তোরে যা বলা হইছে, সেইটা কর।'

হানিফ বললো, 'আব্বা একখান কথা।'

'কী কথা?'

'এই বিষয়ে জোহরার লগে একটু কথা কইয়া নিলে ভালো হইতো না?'

'কোন বিষয়ে?'

'এই যে চরের পাহারা বসানোর বিষয়ে?'

আয়নার হক কপাল কুঁচকে বললো, 'এই বিষয়ে জোহরার সাথে কী কথা?'

'না মানে ওর আর কোনো বুদ্ধি আছে কীনা!'

আয়নাল হক এবার খানিক বিরক্ত হলো, 'সবসময় খালি জোহরা জোহরা করস ক্যান? সমস্যা কী?'

হানিফ এই প্রশ্নের জবাব দিলো না। জবাব দিলো বাহাদুর। হানিফ তাকে শিখিয়ে দিয়েছে। বিকেলে বাহাদুর আয়নাল হককে বললো, 'ও কাকু, একখান কথা।'

'কী কথা?'

'হানিফরে বিয়া-শাদি দিবেন না?'

'এহনই কিসের বিয়া-শাদি? কাম কাইজ আগে ঠিকঠাক মতো শিখুক। তারপর বিয়া।'

'সে কিন্তু কাম কাইজ ভালোই শিখছে। বড় পালোয়ান সে।'

'গায়ে গতরে পালোয়ান হইলেই হয় না। পালোয়ান হইতে হয় বুদ্ধিতে। তার মাথা ভর্তিতো গোবর।'

'এইটা আপনে ঠিক কইলেন না কাকু। আপনেরা তারে পাত্তা দেন না দেইখ্যা। তারে একলা ছাইড়া দেন, দেখবেন সে তার নিজ বুদ্ধিতেই সব কাজ আদায় কইরা নিবো।'

'কেউ কাউরে এমনে এমনেই পাত্তা দেয় নারে বাহাদুর। পাত্তা আদায় কইরা লইতে হয়।'

বাহাদুর কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললো, 'আইজ হোউক, কাইল হোউক, পোলা বড় হইলে বিয়াতো করাইতেই হইবো।'

'তো করাইতে হইলে করামু। পোলার বাপ হইছি, পোলার বিয়া করাবো না?'

'মাইয়া দেখমু নি কাকু?'

'মাইয়া দ্যাহা আছে। আর দেহন লাগবো না।'

'কোন মাইয়া?'

'কোন মাইয়া আবার?' আয়নাল হক কিছুটা বিরক্ত গলায়ই বললো, 'চরে মনে হয় লাখে লাখে মাইয়া আছে! লাখে লাখে মাইয়াতো এইহানে নাই। যা আছে, তার মইধ্যেরতনই করাইতে হইবো।'

'সেইটাইতো। এর মইধ্যেরতনই কারে পছন্দ কইরা রাখছেন?'

'কেডা আবার? আমাগো জোহরা।'

বাহাদুর মনে মনে হাসলো। শুধু শুধুই সে এতক্ষণ চিন্তা করেছে। হানিফ শুনলে আনন্দে এক শ ডিগবাজি খাবে। খেলোও সে। বাহাদুরের মুখে ঘটনা শুনে খুশিতে তার পাগলপ্রায় অবস্থা হলো। বাহাদুর বললো, 'তাইলে আর চিন্তা কী? তোর পথতো কিলিয়ার! জোহরার মতোন বউ পাবি, তোর ভাইগ্যতো আসমানের চান্দের লাগান।'

এই কথায় আনন্দের বদলে হানিফ যেন একটু চিন্তিতই হয়ে গেলো। সে বললো, 'কিন্তু বাহাদুর ভাই, জোহরার মতিগতি কি ঠেহেন?'

'জোহরার আর মতিগতি কী?'

'না মানে, সে কী রাজি হইবো?'

'রাজি হইবো না মানে? এই চরে কী আর কোনো রাজপুত্তুর আছে নি? আর সে কিন্তু তোরে পছন্দ করে।'

'সত্য কইতাছো বাহাদুর ভাই?'

'একদম সত্য। হেইদিন টলারে পুরাডা পথ সে তোর কান্ধে মাথা দিয়া ঘুমাইলো। তুই বুঝোস নাই? কাউরে পছন্দ না করলে অমনে ঘুমায়?'

'উহু।'

'তারপর তোরা যহন টলারেরতন নামলি, প্রথমে কিন্তু তার যাওনের কথা আছিলো না। কথা আছিলো তোর আর হামিদুলের। কিন্তু সে কী করলো? হামিদুলরে বাদ দিয়া তোরে লইয়া গেলো। তাও আবার জামাই-বউ সাইজা। হা হা হা। তুই একটা গাঁধা। তোর বাপে ঠিকই কয়, খালি গায়-গতরেই আছোস, মাথায় কিছু নাই।'

New Pdf download: www.PoragEducation.com + webtalkbd.com

হানিফ মাথা চুলকাতে চুলকাতে বললো, '[illegible] ঠিকই কইছো বাহাদুর ভাই। বিষয়টা আমারো মনে হইছিলো। তার মুখ খেয়াল করছিলা? কেমন লাল হইয়া গেছিলো।'

বাহাদুর হাতের উল্টোদিকে হানিফের মাথায় আলতো চাটি মেরে বললো, 'এইডাতো ঠিকই খেয়াল করছো!'

হানিফ যেন লজ্জায় খানিক গুটিয়ে গেলো। তারপর বললো, 'ভাই, কিন্তু আব্বায় বিয়ার বিষয় কি কইলো?'

'এহনো তেমন কিছু কয় নাই। তয় মনে হইলো কিছু একটা হইবোই।'

'তুমি একটু মাঝে মইধ্যে তারে মনে করাইয়া দিও। তয় ভাই, একখান কথা।'

'কী?'

'দাদাজানের ভাও কিন্তু ভালো ঠেহি না।'

'ক্যান?'

'কী জইন্য জানি, সে আমারে পছন্দ করে না। সবসময় দেখবা, আমার লগে কেমন জানি করে! এহন জোহরারের আমার লগে বিয়া দেওন লইয়া সে না আবার কোনো বাগড়া দেয়। আমার আসল ভয় তারে লইয়াই।'

'আরে ধুর। তোর ধারে না দিলে, এই চরে আর কার ধারে দিবো? আর মেয়া বিবি রাজি থাকলে কাজি লাগে না, বোঝলা?'

'তারপরও বাহাদুর ভাই।'

'ওইরম হইলে যহনেরডা তহন দ্যাহা যাইবো নে। তুই এহন তোর কামে যা।'

'ভাই, চর পাহারার বিষয় জোহরার লগে একটু আলাপ করলে হইতো না? তার লগেতো কথাই কওন যায় না। ঘরেরতনই বাইর হয় না সারাদিন। কী হইলো কওতো!'

'কী আর হইবো? মাইয়া মানুষ, তাগো মনের ঠিক আছে?'

'একটু ব্যবস্থা করো না? আমি গেলেইতো দাদাজানে চোউখ গরম কইরা চায়।'

'আচ্ছা, যামুনে।'

পরদিন বাহাদুর গেলো। মায়া আজকাল জোহরাকে ছেড়ে এমনকি তার কাছেও আসতে চায় না। এই নিয়ে সামান্য দুঃখ হলেও বাহাদুর নিজেকে বুঝিয়ে নিয়েছে। সে আর কতটুকু যত্ন করতে পারতো মেয়েটার? তার চেয়ে জোহরা যেভাবে আগলে রাখছে তার কোন তুলনা হয় না। বাহাদুর কখনো ভাবতেই পারেনি যে মায়া এমন মায়ের আদরে বেড়ে উঠতে থাকবে! একথা-সেকথার পর বাহাদুর আচমকা বললো, 'হানিফরে তোর কেমন লাগেরে জোহরা?'

জোহরা হাসলো, 'একেক সময় একেকরকম। মাঝে মনে হয়, মাথায় বুদ্ধি সুদ্ধি কিছু নাই। আবার মনে হয়, খারাপ না। কেউ ঘসলে মাজলে ঠিক হইয়া যাওনের সুযোগ আছে।'

জোহরার কথা শুনে বাহাদুরও হাসলো, 'হা হা হা। তা ঘসবো মাজবো কেডা?'

'একখান বিয়া করাই দাও বাহাদুর ভাই। তারতো বয়স হইছে।'

'এই চরে মাইয়া আছে কেডা যে তারে বিয়া করামু?'

'মাইয়ার অভাব নি? আমারে কও, আমি খুঁইজা দেই?'

বাহাদুর চট করে কথাটা বলে ফেললো, 'তুই থাকতে আর দূরে যামু ক্যান খুঁজতে!'

জোহরা খিলখিল করে হাসলো, 'ও, এই কথা কইতে আইসা এত ভং ধরলা? তা এইডাতো সরাসরি কইলে পারতা? ক্যান, হানিফ ভাই নি আমারে বিয়া করতে চায়?'

'ক্যান, তুই বুঝোস না?'

জোহরা একটু চুপ করে থেকে বললো, 'বুঝি না তা না। তয় কী বাহাদুর ভাই, আমার না বিয়া শাদি ভাল্লাগে না।'

'কী ভাল্লাগে তাইলে?'

'একেক সময় একেক জিনিস ভাল্লাগে। কোন জিনিসই বেশি দিন ভাল্লাগে না।' জোহরা একটু থামলো। তার চোখে কেমন উদাস দৃষ্টি। তারপর আবার বললো, 'তোমারে একখান কথা কই বাহাদুর ভাই, দাদাজান জানি জানে না।'

'কী কথা?'

'আমার না একখান ডাকাতিতে যাওনের খুব শখ! কোনদিনতো দেখলাম না, কেমনে তোমরা এইগুলান করো।'

'এহনতো নিষেধ আছে। দাদাজান নিষেধ করছে।'

'ক্যান?'

'তুই জানোস না? তোর লাইগ্যাইতো।'

'আমার লাইগ্যা আবার কী?'

'ওই যে পুলিশের ঘটনায়। দাদাজানের ধারণা পুলিশের ওপর পরপর এত বড় দুইখান ঘটনায় তারা ছাড় দিবো না। বড়সড় কিছু করবো। এইজন্য আপাতত সাবধান থাকতে হইবো।'

জোহরা আবারো হাসলো, 'শোন, সাবধান থাহন মানে খালি ঘরের দরজা বন্ধ কইরা বইসা থাহন না। সাবধান মানে বিপক্ষ দল ধারণা করতে পারবে না, তাগোর বুদ্ধিতে কুলাইবো না এমন কাম করনও। ধরো, আমরা যদি এহন একদম ভ্যাদা মাছের লাহান চুপ মাইরা থাহি, তাইলে এইডা আর কি হইলো? এইডাইতো সবাই ধারণা করবো যে অতবড় ঘটনার পর আমরা গা ঢাকা দিবো। কথা ঠিক নি?'

'হুম।'

'এইজন্য আমাগো এহন এমন কিছু করন উচিত যে পুলিশ যাইবো বলদ হইয়া। তারা চিন্তাও করতে পারবো না।'

New Pdf download: www.PoragEducation.com + webtalkbd.com

'এমন কী করন যায়?'

জোহরা খানিক চুপ করে থেকে বললো, 'দাদাজানে কী কইছে?'

'সে কইছে, আপাতত কেউ জানি কোন গঞ্জে, বন্দরে না যায়। তার ধারণা পুলিশ এহন সবখানে ওত পাইতা রইছে। গেলেই ধরবো। এই জন্য খুব দরকার না হইলে কাউর কোনহানে যাওন বন্ধ। রাইত দিন পাহারাও চলতেছে চরে। দাদাজানের ভয়, পুলিশ না চর এটাক করে! এমনকি ডাকাতিই বন্ধ।'

'তাইলে চলবো ক্যামনে? এইরম কয়দিন? তারওপর নানান মাল সামানা কিনতেওতো কোথাও না কোথাও যাইতে হইবো। হইবো না?'

'সেইটাইতো। কিন্তু দাদাজানের হুকুম।'

'দাদাজানের কথা সত্য, পুলিশ এহন চাইর দিকে লোক লাগাইয়া রাখবো। যাতে আমাগো কাউরে পাইলেই ধরতে পারে। আর একজন ধরতে পারলেই তারা যদি চায়, তাইলে তারে দিয়া পথ চিনাইয়াই চইলা আসতে পারবো।'

'হুম। জালাল দাদু কথা কইতে গেছিলো। কিন্তু এইসব শুইনা চুপ কইরা গেছে। আর কিছু কওনের সাহস পায় নাই। তয় দাদাজানে কইছে, খুব বেশি দরকার হইলে বড় জোর একজন বা দুইজন যাতে যায়।'

জোহরা আবারো চুপ করে গেলো। তার চোখে মুখে রহস্যময় অভিব্যক্তি। সে হঠাৎ বললো, 'এক কাম করলে কেমন হয়?'

বাহাদুর উৎসুক কণ্ঠে বললো, 'কী কাম?'

'তার আগে কওতো, নদীতে এহন পানি কেমন? পানি নামতে শুরু করছে না?'

'হুম। এইদিকে যা-ও আছে। বন্দর বা গঞ্জের দিকে আরো কম।'

'এই সময়তো আমরা কাম কাইজে এমনিতেও কম যাই, না?'

'হুম। পুলিশও জানে এইটা। এইজন্য এইসময় লঞ্চের এক ট্রিপের জায়গায় দুই তিন ট্রিপও দেয়।'

'হুম।' জোহরা যেন প্রমাদ গুনলো। তারপর বললো, 'এক কাম করো।'

'কী কাম?'

'আগামী সাত দিন যে যেইহানে আছে, সবাইরে লইয়া ইচ্ছা মতো মাছ ধরো। যত পারো।'

'ক্যান? মাছ দিয়া কি হইবো?'

'সেইটা পরে দেহন যাইবো, আগে মাছ ধরনের ব্যবস্থা করো। আর বড় বড় দুইখান ডবল ইঞ্জিনের টলার রেডি রাহো।'

বাহাদুর চিন্তিত গলায় বললো, 'তোর মতলব কি?'

জোহরা ভ্রু নাচিয়ে হাসলো। রহস্যময় হাসি। তারপর বললো, 'সময় হইলেই জানবা। অনেকদিন ঘরে বইস্যা থাকতে থাকতে শইলে জং ধইরা গেছে!'

বাহাদুর নিচু গলায় বললো, 'সাবধান জোহরা। এমন কিছু করিস না, আবার নতুন বিপদ আহে। এমনিতেই বিপদের শেষ নাই। তার ওপরে এইবার দাদাজানের কথার বাইরে গেলে দাদাজান মাইরাই ফেলবো।'

জোহরা বাহাদুরের কথা পাত্তা দিলো না। সে ব্যস্ত হয়ে পড়লো মায়াকে নিয়ে। মায়া ঘুমাচ্ছে। তার স্বাস্থ্য ভালো হচ্ছে। সে যখন ফোকলা দাঁতে হাসে, জোহরার মনে হয় তাকে কাঁচা খেয়ে ফেলতে। খেয়ে ফেলতে না পারলেও সে তাকে সারাটাক্ষণ দলামলাই করে। তার এই আদুরে অত্যাচার উপভোগও করে মায়া। সেও তাই সারাক্ষণ জোহরার গা ঘেষেই থাকে। এই সঙ্গটুকুর চেয়ে আর কী আনন্দের আছে পৃথিবীতে, জোহরা জানে না।

সাত দিন লাগলো না। চারদিনেই মাছে পরিপূর্ণ হয়ে উঠলো জলাশয়। চরের মাঝখানে একটা জলাশয়ের মতো কাটা আছে। নদী বা বিল থেকে ধরে আনা মাছ সংরক্ষণের সবচেয়ে ফলপ্রসু উপায়। জালে ধরা পড়া মাছগুলো এনে জলাশয়ে ছেড়ে দেয়া হয়। তারপর মাছ বিক্রির উদ্দেশ্যে গঞ্জে যাত্রা করার দিন খুব ভোরে সেগুলো জলাশয় থেকে জাল দিয়ে তুলে ফেলা হয়। খুবই স্বল্প সময়ের ব্যাপার। কিন্তু সপ্তাহখানেক আগে ধরা মাছও তখন একদম তাজা অবস্থায় নিয়ে যাত্রা শুরু করা যায়।

যাত্রা শুরু করার আগের দিন জোহরা তার দাদাজানের ঘরে গেলো। তোরাব আলী লস্কর চিন্তিত ও গম্ভীর মুখে বসে আছেন। জোহরা বললো, 'তোমার মুখ এমন গোমড়া ক্যান দাদাজান?'

তোরাব আলী বললেন, 'ওই মাইয়া তোরে মা ডাকে?'

'কোন মাইয়া?'

'বাহাদুরের মাইয়াডা? মায়া না কী জানি নাম?'

'হুম, ডাকে!'

'আর তুইও সেই ডাক শুইন্যা আহ্লাদে গদগদ?'

'হ দাদাজান। আমার ভাল্লাগে।'

'ভাল্লাগলে নিজের মাইয়ার ডাক শোন।'

'নিজের মাইয়ার ডাক শোনতে হইলেতো বিয়া-শাদি করন লাগবো।'

'বিয়া শাদি করন লাগলে করবি।'

'কারে করমু দাদাজান?'

'কারে করমু মানে? তোরেতো আমি কইছিই, আমার এক দোস্তের কথা, সেইখানে নিয়া আমি তোর বিয়া দিবো। এহন যদি বিয়ার আগেই মাইয়ার মা ডাক শোনোস, তাইলে কী হইবো? কেউ তোরে বিয়া করবো? এমনিতেই সমস্যার শেষ নাই।'

'করবো দাদাজান করবো।'

'কেডা করবো?'

New Pdf download: www.PoragEducation.com + webtalkbd.com

'হানিফ ভাই করবো।'

'হানিফ! কোন হানিফ?'

তোরাব আলী লস্কর যেন প্রথমে তার কানকে বিশ্বাস করতে পারলেন না। জোহরা হাসি মুখে বললো, 'আয়নাল কাকুর পোলা হানিফ ভাই।'

'জোহরা!' তোরাব আলী লস্কর যেন অগ্নিশর্মা হয়ে উঠলেন, 'ওই গর্দভের সাথে তোর বিয়া দিবো আমি! তুই কী ভাবছোস?'

'তোমার অত কষ্ট কইরা দেওন লাগবো না। আমিই কইরা নিতে পারবো।'

তোরাব আলী লস্কর হতভম্ব চোখে জোহরার দিকে তাকিয়ে রইলেন। কিন্তু কিছুই বলতে পারলেন না আর। জোহরাই বললো, 'তারে আমার পছন্দ। আমার পছন্দের মানুষের সাথে আমার বিয়া হইবো না?'

তোরাব আলী লস্কর রীতিমতো অসহায় বোধ করছেন। এই মেয়েকে নিয়ে তিনি কেন যে তার প্রত্যাশার পারদটাকে নিচে নামিয়ে আনতে পারেন না, তা জানেন না! যতবারই তিনি ভেবেছেন, একে নিয়ে আর কিছু ভাববেন না, সে যেমন ইচ্ছা তেমনই করুক, ঠিক ততবারই মনে হয়েছে, আরেকবার বোঝালেই বোধহয় সে তার কথা শুনবে। কিন্তু কোনো লাভ নেই। সে এসবের ধার ধরে বলে মনেও হয় না। জোহরা এবার আসল কথা তুললো, 'দাদাজান?'

'বল।'

'তোমারেতো আসল কথাই বলা হয় নাই?'

'আসল কথা কী?'

'আইজ রাইতেই আমরা কামে যাইতেছি?'

'কিসের কামে!' তোরাব আলী যেন আকাশ থেকে পড়লেন!

'মাছ বেচতে!'

'মাছ বেচতে মানে?'

'তুমিই নাকি বলছো, আপাতত ডাকাতি বন্ধ, তাইলে আয়-রোজগার বন্ধ থাকবো? এতগুলা মানুষের পেট। একটা হিসাব-নিকাশ আছে না?'

'জোহরা? তুই কিন্তু...।' রাগে তোরাব আলী লস্করের হাত-পা কাঁপছে। তিনি আরো কিছু বলতে গিয়েও বলতে পারলেন না। জোহরা দু পা সামনে এগিয়ে এসে তার দাদাজানের মুখোমুখি দাঁড়ালো। তারপর বললো, 'তুমি এত দুশ্চিন্তা কইরো না দাদাজান। আমি ঠিকঠাক ফিইরা আসবো। তোমার চিন্তার কিছু নাই। আর এইটা নিয়া শুধু শুধু চিল্লাফাল্লা কইরো না। এক কাম করো, আমারে একটা ফুঁ দিয়া দেও। দোয়া পইড়া ফুঁ দিয়া দেও। তুমি দোয়া পইড়া ফুঁ দিয়া দিলে ইনশা আল্লাহ কোনো বিপদ হবে না।'

তোরাব আলী লস্কর আর একটা কথাও বললেন না। জোহরার দিকে ফিরেও তাকালেন না। তিনি ঘুরে বারান্দার রেলিং দেয়া প্রান্তে চলে গেলেন। সেখানে বাইরে রাতের বিস্তৃত অন্ধকার বিল। ঠাণ্ডা হাওয়া আসছে জলের শরীর ছুঁয়ে। সেই

হাওয়াও তার বুকের ভেতরটা শীতল করতে পারছে না! এ কোন বিপদ তিনি কোলে-পিঠে করে বড় করেছেন! একে সামলানোর সাধ্যতো তার নেই। শুধু যে সামলানোর সাধ্যই নেই, তাও না। একে ধারণ করার বা বারণ করার ক্ষমতাও তার নেই। তিনি অসহায় চোখে অন্ধকারে তাকিয়ে রইলেন। জোহরা আরো বার দুয়েক তার দাদাজানকে ডাকলো। কিন্তু তিনি সাড়া দিলেন না। জোহরা বারান্দা থেকে বের হওয়ার আগে আলতো করে তার দাদাজানের পিঠে হাত ছুঁইয়ে গেলো।

ট্রলার ঘাটে সবকিছু গোছগাছ শেষ। দু খানা বড় ট্রলার। একটিতে মাছ ভর্তি। সাথে পাঁচ-ছয়জনের ছোট একটা দল। আরেকটিতে জোহরাসহ দশজন। মোট ষোল জনের যাত্রা। নিকট অতীতে এতবড় দল নিয়ে খুবই কমই কোনো কাজে বের হয়েছিলো লস্করেরা। অথচ আজকের এই যাত্রায় গত বছর তিরিশ-চল্লিশেক ধরে লস্কর চরের সকল কিছু যার কথায় নিয়ন্ত্রিত হয়েছে সেই তোরাব আলী লস্করের কোনো সম্মতি নেই, অংশগ্রহণ নেই। তার সিদ্ধান্তের পরোয়াও কেউ করেনি। কিন্তু ট্রলার ছাড়ার ঠিক আগ মুহূর্তে একটা লম্বা ছায়ামূর্তিকে ধীর পায়ে ট্রলারঘাটের দিকে হেঁটে আসতে দেখা গেলো। ট্রলার স্টার্ট নেয়া সত্ত্বেও জোহরার হাতের ইশারায় আবার তা থেমে গেলো। তোরাব আলী লস্কর খুব ধীরে এসে ঘাটে দাঁড়ালেন। জোহরা তাকে দেখে ছোট্ট লাফে ট্রলার থেকে নেমে তার কাছে গেলো। তোরাব আলী লস্কর কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন। চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো জোহরাও। নিঃশব্দ, স্থির হয়ে রইলো দুখানা ট্রলারের প্রতিটি মানুষও। কেউই কোনো শব্দ করলো না। যেন নিঃশ্বাসের শব্দ অবধি না। তোরাব আলী লস্কর হাত উঁচু করে জোহরার মাথাটা দু হাতে চেপে ধরলেন। তারপর বিড়বিড় করে কীসব পড়ে বার কয়েক তার মাথায় ফুঁ দিয়ে দিলেন। তারপর অনুচ্চ গলায় বললেন, 'কই যাস?'

জোহরার প্রায় নিঃশব্দে বললো, 'নবীগঞ্জ।'

'নবীগঞ্জ?' তোরাব আলী লস্করের শিরদাঁড়া বেয়ে যেন তীব্র ভয়ের শীতল স্রোত নেমে গেলো। তিনি বললেন, 'তুই কী জানোস যে ওইহানেই নবীগঞ্জ থানা? ওই থানার পুলিশটাই তুই খুন করছোস? ওই থানার পুলিশের কাছ থেইকাই তুই বাহাদুর আর মোকাররমরে ছাড়াই আনছোস? জানোস তুই?'

জোহরা ওপর-নিচ মাথা নাড়লো, 'জানি দাদাজান?'

'তাইলে?'

জোহরা কোন জবাব দিলো না। তোরাব আলী লস্কর নিরুপায় মানুষের মতো বললেন, 'তুই কী জানোস, ওই থানার সব পুলিশ লাগানো হইছে আমাগো খোঁজে? সব হাটে, বাজারে, গঞ্জে, বন্দরে তারা সবাই ওঁত পাইতা রইছে আমাগো একজন কাউরে ধরার জন্যে? আর তোরে যদি পায়, তাইলে...।'

জোহরা বললো, 'জানি দাদাজান। সবই জানি।'

'তাইলে?'

New Pdf download: www.PoragEducation.com + webtalkbd.com

'সেই জন্যেই যাইতেছি। শুনছি ওইহানের নতুন পুলিশ অফিসার আইছে। তার নাকি আমারে দেহনের খুব শখ। তার লগে একটু দ্যাহা কইরা আসি গিয়া।'

তোরাব আলী ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন, 'তাইলে এই মাছ লইয়া যাইতেছোস ক্যান?'

'পুলিশরে দিয়া মাছ বেচাবো দাদাজান।'

'মানে?'

'মানে আইসা বলবো। এহন সময় নাই। তুমি ঠিকঠাক ফুঁ দিছো তো?'

তোরাব আলী লস্কর আর কোন কথা বললেন না। তিনি নির্বাক, নিশ্চল পাথরের মূর্তির মতোন সেই অন্ধকারে দাঁড়িয়ে রইলেন। জোহরা নিচে নেমে গিয়ে ট্রলারের সামনে দাঁড়ালো। তারপর আবার কী মনে করে ফিরে এলো। তোরাব আলী লস্কর জিজ্ঞাসু চোখে তাকালেন। জোহরা বললো, 'আর তোমার একখান কামও বাকি আছে।'

'আমার কী কাম?'

'তোমার বয়স হইছেতো, এই জন্য চিন্তা বেশি করো। আর বেশি চিন্তা করতে গিয়া অনেক কিছু ভুইলা যাও।'

'কী ভুইলা গেছি?'

' তোমার একটা হিসাব বাকি আছে নবীগঞ্জে।'

তোরাব আলী হুট করে বুঝলেন না, তার কী হিসেব বাকি আছে! তিনি চিন্তিত মুখে জোহরার দিকে তাকিয়ে রইলেন। জোহরা বললো, 'আমি হিসাব বাকি রাখবো না। হিসাব মিটাইয়াই আসবো। তুমি চিন্তা কইরো না।'

তোরাব আলী আরো কিছু বলতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু জোহরা তার দাদাজানকে সেই সুযোগ আর দিলো না। সে ঘুরে ট্রলারের দিকে যাত্রা শুরু করতে করতে বললো, 'এইটা তোমার জন্য উপহার। তোমার উপহার আমি নিয়াই আসবো।'

বিভ্রান্ত, হতবুদ্ধ, শঙ্কিত তোরাব আলী লস্কর অন্ধকারে দাঁড়িয়ে রইলেন। তার চোখের সামনে দুখানা ট্রলার টিমটিমে হারিকেনের আলো নিয়ে ক্রমশই অন্ধকারের ভেতর হারিয়ে যেতে লাগলো।

আজকাল বিকেল নামতেই শীতের আগমনী টের পাওয়া যায়। জানালার পর্দার ফাঁক গলে এক চিলতে আলো এসে পড়েছে পুলিশের ওসি মইনুল হোসেনের টেবিলে। কী মনে করে খানিক আয়েশি ভঙ্গিতে তিনি তার পা জোড়া তুলে দিলেন সেই রোদের মধ্যে। বাইরে কেমন মন খারাপ করা বিষণ্ন এক বিকেল। এই সময়টায় এক ধরনের শূন্যতাবোধ হয় মইনুল হোসেনের। আজও হচ্ছে। তবে শূন্যতাবোধের সাথে বিশ্রি একটা অস্বস্তিও হচ্ছে।

কয়েক সপ্তাহ হয়ে গেলো তিনি আশেপাশের প্রায় সবগুলো গঞ্জে, নদী বন্দরে পুলিশ ফোর্স লাগিয়ে রেখেছেন। এসআই একরামুল হককেও সারাক্ষণ তটস্থ করে রেখেছেন । কিন্তু ডাকাতরা যেন হঠাৎই ভোঁজবাজির মতো হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে। বিষয়টা এখন তার কাছে একটা ব্যক্তিগত চ্যালেঞ্জের মতো মনে হচ্ছে। পরপর যে ঘটনাগুলো ঘটেছে তা রীতিমতো পুলিশের নাকের ডগায় বসে পুলিশকে বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শন করার মতো। বিষয়টা তিনি মেনে নিতে পারছেন না। তবে তার চেয়েও বেশি যা হচ্ছে, তা হলো জোহরা নামের ষোলো-সতেরো বছরের সেই কিশোরীকে নিয়ে এক ধরনের প্রবল কৌতূহল।

এ যেন গল্প উপন্যাস থেকে উঠে আসা কোনো এক রহস্যময় চরিত্র! তবে সবচেয়ে খারাপ ব্যাপার হচ্ছে, জোহরাকে নিয়ে চারদিকে নানান কিচ্ছা কাহিনী ছড়াতে শুরু করেছে। যার অধিকাংশেরই কোনো ভিত্তি নেই। কিন্তু বেশির ভাগ মানুষই নিজে তেমন দুঃসাহসিক কর্মকাণ্ড করার সাহস পায় না বলে তারা দুঃসাহসিক গল্প বানিয়ে আনন্দ পায়। জোহরার ব্যাপারটিও তেমন। তাকে নিয়ে নানা দুঃসাহসিক গালগল্প লোকমুখে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করেছে। মইনুল হোসেন

New Pdf download: www.PoragEducation.com + webtalkbd.com

সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছিলেন পুলিশ কনস্টেবল নুরুন্নবীর ঘটনাটি আড়াল করে রাখতে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেটি সম্ভব হয়নি। নুরুন্নবী যদিও প্রাণে বেঁচে গেছে, কিন্তু মইনুল হোসেন জানেন, নুরুন্নবী প্রাণে বেঁচে গেলেও এই বেঁচে থাকা তাকে উপহার দেবে মৃত্যুর চেয়েও ভয়ংকর এক বাস্তবতা। সারাটা জীবন এক দুঃসহ যন্ত্রণাময় জীবন যেমন সে কাটাবে, তেমনি তার ওই মুখখানা আপনি আপনিই ছড়াতে থাকবে জোহরা নামের কিশোরী এক মেয়ের অবিশ্বাস্য সব কিংবদন্তির গল্প।

নুরুন্নবীর ওই বিভৎস, ভয়ংকর মুখখানা দেখামাত্রই মানুষের মুখে মুখে আরো ডালপালা ছড়াতে থাকবে সেই গল্প। এরই মধ্যে অবশ্য ছড়িয়ে পড়েছেও যে লস্কর ডাকাতদের এক কিশোরী মেয়ে ছ-সাতজন পুলিশকে একাই ধরাশায়ী করে পালিয়েছে। শুধু তা-ই না, দুজন পুলিশ তার চাকুর আঘাতে খুনও হয়েছে। কিন্তু পুলিশ সেই সংবাদ প্রকাশ না করে ধামাচাপা দেয়ার চেষ্টা করছে।

ঘটনাটি মইনুল হোসেনের জন্য যারপরনাই লজ্জার, পরাজয়ের, হতাশার। তবে তারচেয়েও বড় কথা হলো, দেশের এই অস্থির সময়েও এই ঘটনায় পুলিশ সুপার সাহেব তাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। এবং বিষয়টি নিয়ে যে তারা চিন্তিত সেটিও তাকে জানিয়ে দেয়া হয়েছে। সমস্যা হচ্ছে এই মুহূর্তে তার করণীয় কি সে বিষয়ে মইনুল হোসেন নিজেই নিশ্চিত নন। একবার তিনি ভেবেও ছিলেন যে ওপর মহলে অনুরোধ করে বিশেষ কোনো ফোর্সের ব্যবস্থা করে লস্কর চরে সরাসরি বড়সড় কোন অভিযান চালাবেন। কিন্তু পরবর্তীতে সেই সিদ্ধান্ত থেকে তিনি নিজে নিজেই আবার সরে এসেছেন। একদমই কিছু না জেনে শুনে এমন কাজ করা ঠিক হবে না। অন্ধকারে ঢিল ছুড়লে সেটি বরং বুমেরাং হয়ে ফিরে আসবার আশঙ্কাও কম নয়। তার আগে আরো খোঁজ খবর নিতে হবে। লস্কর চরের অবস্থান, তাদের শক্তি, প্রতিরোধ ব্যবস্থা সম্পর্কে একটা স্পষ্ট ধারণা থাকতে হবে। না হলে যেকোনো অভিযানই ব্যর্থ হবার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। আর এমন কোনো বড় অভিযানে ব্যর্থ হলে তার পরিণাম হবে দীর্ঘস্থায়ী ও ভয়াবহ।

মইনুল হোসেন একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন। কই কোন শহর, মফস্বলে আরাম আয়েশে দায়িত্ব পালন করবেন! তা না হয়ে, পড়ে রইলেন এই অজপাড়া দুর্গম এক বিল অঞ্চলে।

থানায় এই মুহূর্তে লোকজন তেমন নেই। জনা পাঁচেক পুলিশ কনস্টেবল রয়েছে। একজন পিয়ন আছে। আর ঝাড়ুদার। তিনি চিৎকার করে সেন্ট্রি কামালুদ্দিনকে ডাকলেন। অদ্ভুত ব্যাপার হচ্ছে তিনি ডাকার আগেই কামালুদ্দিনকে দেখা গেলো তার ঘরের দরজায়। সে বুকের কাছে আড়াআড়ি থ্রি নট থ্রি রাইফেল ধরে দাঁড়িয়ে আছে। মইনুল হোসেন বিরক্ত গলায় বললেন, 'রাইফেলের ওজন বেশি নাকি কামাল?'

'জেনা ছার। বাইরে টুলে বইসা ছিলাম। কতক্ষণ আর এমন বইসা থাকন যায়, এইজন্য আর পজিশন মতোন লই নাই।'

ধমক দিতে গিয়েও হেসে ফেললেন মইনুল হোসেন। এদের ধমক দিয়ে লাভ নেই। সারাদিন থানায় বসে থাকতে থাকতে এদের শরীরে খিল ধরে গেছে। একরামুল হককে বলে বাইরের ডিউটি থেকে কয়েক জনকে বদলি করে পরেরবার এদের পাঠাতে হবে। তাতে যদি এদের আলসেমি কিছু কাটে। মইনুল হোসেন বললেন, 'বলো, কী জন্য আসছো?'

'একজন মেয়ে ছেলে আসছে, ছার। আপনের সাথে দেখা করতে চায়।'

'আমার সাথে?'

'জে ছার।'

'সাথে আর কে আছে?'

'মনে হয় তার ছোড ভাই। আমি না না বলছি, শোনে নাই। শেষে মাইয়াডা দিছে কাইন্দা। কী নাকি জরুরি কথা আছে, আপনেরে ছাড়া কওন যাইবো না।'

মইনুল হোসেন খানিক ভাবলেন। এই থানায় গ্রামের মেয়েছেলেরা সাধারণত আসে না। তারা পুলিশ ভয় পায়। আর আসলেও তারা যায় এসআই একরামুল হক বা অন্যদের কাছে। সরাসরি তার কাছে কেউ আসে না। তিনি বললেন, 'কী কারণে আসতে চায়?'

'কারণতো বলে না। বলে, আপনের কাছে বলবে।'

'আগে জিজ্ঞেস করে আসো ঘটনা কী? বলবা, ঘটনা না বললে অনুমতি মিলবে না।'

'জে ছার।'

কামালুদ্দিন মিনিট দুয়েকের মধ্যে আবার ফিরে এলো। তার চোখে-মুখে উত্তেজনা, 'ছার, সাঙ্ঘাতিক ব্যাপার!'

'কী সাঙ্ঘাতিক ব্যাপার?'

'সে সিরিয়াস খবর লইয়া আইছে।'

'কী সিরিয়াস খবর?'

কামালুদ্দিন কয়েক পা এগিয়ে মইনুল হোসেনের একদম কাছে চলে এলো। তারপর গলা নামিয়ে বললো, 'লস্কর ডাকাইতগো খবর।'

'কী!' মইনুল হোসেন টেবিল থেকে পা নামিয়ে সোজা হয়ে বসলেন।

'জি ছার! বলতেছে, তার কাছে নাকি জোহরার বিষয়ে খবর আছে। সে নাকি ভেদরগঞ্জ বাজারে তারে দেখছে। আইজ কাইলের মইধ্যেই আবার নবীগঞ্জের দিকে আইবো!'

মইনুল হোসেন মুহূর্তেই সতর্ক হয়ে গেলেন। তারপর রুদ্ধশ্বাস কণ্ঠে বললেন, 'নিয়ে আসো, কুইক।'

একজন অল্প বয়সী মেয়ে ঘরে ঢুকলো। তার পরনে হালকা আকাশি রঙের শাড়ি। দীর্ঘ যাত্রায় ক্লান্তির ছাপমাখা মুখখানা ধুলোয় ধূসরিত। মুখে কালিঝুলি লেগে আছে। তবে এসব ছাপিয়েও কোথায় যেন একটা স্পষ্ট ঝাঁঝালো সৌন্দর্য উঁকি

New Pdf download: www.PoragEducation.com + webtalkbd.com

দিচ্ছে। পেছনে বারো-তেরো বছরের এক শীর্ণকায় কিশোর। মইনুল হোসেন কপাল কুঁচকে বললেন, 'কী নাম তোমার।'

'আছমা।'

'বাড়ি কই?'

'ভেদরগঞ্জ।'

'ঘটনা কি খুলে বলো।'

মেয়েটা ভয়ে কাঁপছে। সে বার দুই কথা বলতে গিয়ে ঢোক গিললো। তারপর বললো, 'ছার, পানি খাবো।'

মইনুল হোসেন পানির জন্য পিয়নকে ডাকতে গিয়েও ডাকলেন না। ঘটনা শোনার জন্য তার আর তর সইছে না। তিনি নিজের টেবিল থেকেই জগ আর গ্লাস এগিয়ে দিলেন। মেয়েটা ধীর পায়ে তার টেবিলের সামনে গেলো। তারপর জগ থেকে গ্লাসে পানি ঢেলে ঢকঢক করে এক নিঃশ্বাসে খেয়ে ফেললো। মইনুল হোসেন স্পষ্ট দেখতে পেলেন জগ থেকে পানি ঢালার সময় তার হাত থরথর করে কাঁপছে। মেয়েটার জন্য তার মায়াই লাগছে। এই প্রথম বোধহয় সে কোন থানায় এসেছে!

মেয়েটা আবারও গ্লাসে পানি ঢালতে লাগলো। তার হাত এখনো কাঁপছে। তবে আগের চেয়ে কম। অদ্ভুত ব্যাপার হলো, এবার আর সে পানি ঢালা শেষে গ্লাসটা তার মুখের কাছে তুললো না। বরং হঠাৎই যেন তার শরীরে বিদ্যুৎ খেলে গেলো। সে চোখের পলকে গ্লাসভর্তি পানি ছুড়ে মারলো মইনুল হোসেনের মুখে। মইনুল হোসেন যতক্ষণে ঘটনা বুঝতে পেরেছেন, ততক্ষণে দেরি হয়ে গেছে। তিনি হতভম্ব অবস্থায় মেয়েটার ছুড়ে মারা পানি থেকে নিজেকে রক্ষা করতে গিয়ে ডান দিকে তার মুখ এবং শরীর সরিয়ে নেয়ার চেষ্টা করলেন। কিন্তু তাতে লাভ হলো না। পানির ঝাপটা এসে সরাসরি তার চোখে-মুখে আঘাত করেছে। কয়েক সেকেন্ডের জন্য তিনি তার দুই চোখে কিছুই দেখতে পেলেন না। কিন্তু এইটুকু সময়েই মেয়েটি তার সামনে টেবিলে রাখা পিস্তলটা তুলে নিলো।

হতভম্ব মইনুল হোসেন আরো একটা জিনিস খেয়াল করেননি। পেছনের কিশোর ছেলেটির হাতে গোল ফাঁসের মতো বাননো একগাছি শক্ত দড়ি। সে বিস্ময়কর ক্ষিপ্রতায় সেই দড়ি ছুঁড়ে মেরে মইনুল হোসেনকে চেয়ারের সাথে আটকে ফেললো। ঘটনার আকস্মিকতায় বিমূঢ় মইনুল হোসেন ডানে-বায়ে মাথা ঝাঁকিয়ে তার চুল, চোখ, নাক, মুখ থেকে পানি ঝেড়ে ফেলার চেষ্টা করলেন। হাতের ব্যবহার তিনি করতে পারছেন না, কারণ তার হাত বাঁধা পড়ে গেছে চেয়ারের সাথে।

মেয়েটি ধীরে সুস্থে একখানা চেয়ার টেনে নিয়ে মইনুল হোসেনের পাশেই রাখলো। তারপর সেই চেয়ারখানাতে বসে পড়লো। মইনুল হোসেন বুঝলেন, মেয়েটি তার মুখোমুখি বসেনি কারণ সে একই সাথে সামনের দরজা এবং জানালার দিকে চোখ রাখতে চায়। তিনি হতবিহ্বল গলায় বললেন, 'কে তুমি?'

মেয়েটি হাসলো, শান্ত, স্নিগ্ধ, সুন্দর, 'আমার নাম জোহরা।'

মইনুল হোসেন বুঝতে পারছিলেন, কিন্তু তারপরও জোহরার মুখ থেকে তার নাম শুনে নিশ্চিত হতে চাইছিলেন। নাম শুনে দীর্ঘসময় কোনো কথা বললেন না তিনি। হতাশভঙ্গিতে মাথার ওপর ছাদের দিকে তাকিয়ে রইলেন। যেন লজ্জায়, অপমানে নিজেকে লুকানোর চেষ্টা করছেন তিনি। জোহরা বললো, 'আপনের না আমারে দেখনের খুব শখ। এইজন্য আপনের সাথে দেখা করতে আইছি।'

মইনুল হোসেন কথা বললেন না। জোহরা বললো, আমিতো আসমানের চাঁন না। 'ওপরে চাইয়া থাকলে আমারে দেখবেন কেমনে? আমারে দেখতে হইলেতো নিচে চাইতে হইবো।'

মইনুল হোসেন তাকালেন। মেয়েটা যে এত ভয়ংকর, তা খানিক আগেও তিনি চিন্তা করতে পারেননি। এখনো তার মুখ দেখে কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। সে নির্বিকার, নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে বসে আছে। এই এতবড় ভয়াবহ কাণ্ডটা যে সে ঘটিয়ে ফেলেছে, তা তার মুখ দেখে বোঝার উপায় নেই। শান্ত, স্থির, কমনীয় এক কিশোরী মুখ। কিন্তু কথা বলার সময় তার ঠোঁটের কোণায় কেমন রহস্যময় একটুকরো হাসি লেগে থাকে। ওই হাসিটুকু ভয়ংকর। অন্য সকলের হাসি থেকে ওই সামান্য এক চিলতে হাসিই যেন তাকে মুহূর্তে আলাদা করে ফেলে।

জোহরা বললো, 'আমার হাতে সময় বেশি নাই। আমি চইলা যাবো। তার আগে আপনের একখান কাজ করতে হইবো।'

মইনুল হোসেন কৌতূহলী চোখে তাকালেন। জোহরা বললো, 'আমার দাদাজান তোরাব আলী লস্করের নির্দেশে এহন ডাকাতি, রক্তারক্তি বন্ধ আমাগো। কিন্তু পেটতো আর বন্ধ থাহে না। অতগুলা মানুষ, খাওয়া-খাদ্যতো লাগে। এইজন্য ট্যাকা পয়সা, মাল সামানা দরকার। কিন্তু উপায় কী?'

মইনুল হোসেন কথা বললেন না। জোহরাই আবার বললো, 'এইজন্য লস্কর ডাকইতরা এহন মাছের ব্যবসা শুরু করছে। আগে আছিলো ডাকাইত এহন হইছে মাউচ্ছা। হা হা হা।'

লস্কর ডাকাতদের মাছ বিক্রির মতো অদ্ভুত কাণ্ডকারখানার কথা মইনুল হোসেনও শুনেছেন। কিন্তু বিষয়টা তার কাছে কেমন অদ্ভুতুড়ে ঠেকেছিলো। আজ সরাসরি জোহরার মুখে কথাটা শুনে তিনি একটু অবাকই হলেন। জোহরা বললো, 'আমরা এক ট্রলার মাছ নিয়া আসছি। তাজা মাছ। কিন্তু এই মাছ বেচনের জন্য যেই সময় দরকার, সেই সময় আমাগো হাতে নাই। আর আপনেতো জানেনই, সেইটা নিরাপদও না। তাই আপনের কাছেই আসলাম। আপনে যদি একটু মাছগুলান বেচার ব্যবস্থা করে দেন?'

'মানে!' জোহরার কথা শুনে মইনুল হোসেন যারপরনাই বিস্মিত হলেন!

জোহরা বললো, 'মাছগুলা ট্রলার থেইকা নামানোর ব্যবস্থা হইতেছে। মাছের যা ন্যায্য দাম হয়, সেইটা আপনে আমাগো ব্যবস্থা কইরা দিবেন। সব যে ট্যাকাতেই দিতে হইবো, তাও না। নগদ দামের বদলে কিছু কিছু দরকারি জিনিসপত্রও আমাগো লাগবো। তাই নগদ ট্যাকা যা হয় দেওনের ব্যবস্থা করবেন। আর বাকি দাম আমাগো দরকারি জিনিসপত্র দিয়া পোষাইয়া দিলেই হইবো।'

New Pdf download: www.PoragEducation.com + webtalkbd.com

দিচ্ছে। পেছনে বারো-তেরো বছরের এক শীর্ণকায় কিশোর। মইনুল হোসেন কপাল কুঁচকে বললেন, 'কী নাম তোমার।'

'আছমা।'

'বাড়ি কই?'

'ভেদরগঞ্জ।'

'ঘটনা কি খুলে বলো।'

মেয়েটা ভয়ে কাঁপছে। সে বার দুই কথা বলতে গিয়ে ঢোক গিললো। তারপর বললো, 'ছার, পানি খাবো।'

মইনুল হোসেন পানির জন্য পিয়নকে ডাকতে গিয়েও ডাকলেন না। ঘটনা শোনার জন্য তার আর তর সইছে না। তিনি নিজের টেবিল থেকেই জগ আর গ্লাস এগিয়ে দিলেন। মেয়েটা ধীর পায়ে তার টেবিলের সামনে গেলো। তারপর জগ থেকে গ্লাসে পানি ঢেলে ঢকঢক করে এক নিঃশ্বাসে খেয়ে ফেললো। মইনুল হোসেন স্পষ্ট দেখতে পেলেন জগ থেকে পানি ঢালার সময় তার হাত থরথর করে কাঁপছে। মেয়েটার জন্য তার মায়াই লাগছে। এই প্রথম বোধহয় সে কোন থানায় এসেছে!

মেয়েটা আবারও গ্লাসে পানি ঢালতে লাগলো। তার হাত এখনো কাঁপছে। তবে আগের চেয়ে কম। অদ্ভুত ব্যাপার হলো, এবার আর সে পানি ঢালা শেষে গ্লাসটা তার মুখের কাছে তুললো না। বরং হঠাৎই যেন তার শরীরে বিদ্যুৎ খেলে গেলো। সে চোখের পলকে গ্লাসভর্তি পানি ছুড়ে মারলো মইনুল হোসেনের মুখে। মইনুল হোসেন যতক্ষণে ঘটনা বুঝতে পেরেছেন, ততক্ষণে দেরি হয়ে গেছে। তিনি হতভম্ব অবস্থায় মেয়েটার ছুড়ে মারা পানি থেকে নিজেকে রক্ষা করতে গিয়ে ডান দিকে তার মুখ এবং শরীর সরিয়ে নেয়ার চেষ্টা করলেন। কিন্তু তাতে লাভ হলো না। পানির ঝাপটা এসে সরাসরি তার চোখে-মুখে আঘাত করেছে। কয়েক সেকেন্ডের জন্য তিনি তার দুই চোখে কিছুই দেখতে পেলেন না। কিন্তু এইটুকু সময়েই মেয়েটি তার সামনে টেবিলে রাখা পিস্তলটা তুলে নিলো।

হতভম্ব মইনুল হোসেন আরো একটা জিনিস খেয়াল করেননি। পেছনের কিশোর ছেলেটির হাতে গোল ফাঁসের মতো বাননো একগাছি শক্ত দড়ি। সে বিস্ময়কর ক্ষিপ্রতায় সেই দড়ি ছুঁড়ে মেরে মইনুল হোসেনকে চেয়ারের সাথে আটকে ফেললো। ঘটনার আকস্মিকতায় বিমূঢ় মইনুল হোসেন ডানে-বায়ে মাথা ঝাঁকিয়ে তার চুল, চোখ, নাক, মুখ থেকে পানি ঝেড়ে ফেলার চেষ্টা করলেন। হাতের ব্যবহার তিনি করতে পারছেন না, কারণ তার হাত বাঁধা পড়ে গেছে চেয়ারের সাথে।

মেয়েটি ধীরে সুস্থে একখানা চেয়ার টেনে নিয়ে মইনুল হোসেনের পাশেই রাখলো। তারপর সেই চেয়ারখানাতে বসে পড়লো। মইনুল হোসেন বুঝলেন, মেয়েটি তার মুখোমুখি বসেনি কারণ সে একই সাথে সামনের দরজা এবং জানালার দিকে চোখ রাখতে চায়। তিনি হতবিহ্বল গলায় বললেন, 'কে তুমি?'

মেয়েটি হাসলো, শান্ত, স্নিগ্ধ, সুন্দর, 'আমার নাম জোহরা।'

মইনুল হোসেন বুঝতে পারছিলেন, কিন্তু তারপরও জোহরার মুখ থেকে তার নাম শুনে নিশ্চিত হতে চাইছিলেন। নাম শুনে দীর্ঘসময় কোনো কথা বললেন না তিনি। হতাশভঙ্গিতে মাথার ওপর ছাদের দিকে তাকিয়ে রইলেন। যেন লজ্জায়, অপমানে নিজেকে লুকানোর চেষ্টা করছেন তিনি। জোহরা বললো, 'আপনের না আমারে দেখনের খুব শখ। এইজন্য আপনের সাথে দেখা করতে আইছি।'

মইনুল হোসেন কথা বললেন না। জোহরা বললো, আমিতো আসমানের চাঁন না। 'ওপরে চাইয়া থাকলে আমারে দেখবেন কেমনে? আমারে দেখতে হইলেতো নিচে চাইতে হইবো।'

মইনুল হোসেন তাকালেন। মেয়েটা যে এত ভয়ংকর, তা খানিক আগেও তিনি চিন্তা করতে পারেননি। এখনো তার মুখ দেখে কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। সে নির্বিকার, নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে বসে আছে। এই এতবড় ভয়াবহ কাণ্ডটা যে সে ঘটিয়ে ফেলেছে, তা তার মুখ দেখে বোঝার উপায় নেই। শান্ত, স্থির, কমনীয় এক কিশোরী মুখ। কিন্তু কথা বলার সময় তার ঠোঁটের কোণায় কেমন রহস্যময় একটুকরো হাসি লেগে থাকে। ওই হাসিটুকু ভয়ংকর। অন্য সকলের হাসি থেকে ওই সামান্য এক চিলতে হাসিই যেন তাকে মুহূর্তে আলাদা করে ফেলে।

জোহরা বললো, 'আমার হাতে সময় বেশি নাই। আমি চইলা যাবো। তার আগে আপনের একখান কাজ করতে হইবো।'

মইনুল হোসেন কৌতূহলী চোখে তাকালেন। জোহরা বললো, 'আমার দাদাজান তোরাব আলী লস্করের নির্দেশে এহন ডাকাতি, রক্তারক্তি বন্ধ আমাগো। কিন্তু পেটতো আর বন্ধ থাহে না। অতগুলা মানুষ, খাওয়া-খাদ্যতো লাগে। এইজন্য ট্যাকা পয়সা, মাল সামানা দরকার। কিন্তু উপায় কী?'

মইনুল হোসেন কথা বললেন না। জোহরাই আবার বললো, 'এইজন্য লস্কর ডাকইতরা এহন মাছের ব্যবসা শুরু করছে। আগে আছিলো ডাকাইত এহন হইছে মাউচ্ছা। হা হা হা।'

লস্কর ডাকাতদের মাছ বিক্রির মতো অদ্ভুত কাণ্ডকারখানার কথা মইনুল হোসেনও শুনেছেন। কিন্তু বিষয়টা তার কাছে কেমন অদ্ভুতুড়ে ঠেকেছিলো। আজ সরাসরি জোহরার মুখে কথাটা শুনে তিনি একটু অবাকই হলেন। জোহরা বললো, 'আমরা এক ট্রলার মাছ নিয়া আসছি। তাজা মাছ। কিন্তু এই মাছ বেচনের জন্য যেই সময় দরকার, সেই সময় আমাগো হাতে নাই। আর আপনেতো জানেনই, সেইটা নিরাপদও না। তাই আপনের কাছেই আসলাম। আপনে যদি একটু মাছগুলান বেচার ব্যবস্থা করে দেন?'

'মানে!' জোহরার কথা শুনে মইনুল হোসেন যারপরনাই বিস্মিত হলেন!

জোহরা বললো, 'মাছগুলা ট্রলার থেইকা নামানোর ব্যবস্থা হইতেছে। মাছের যা ন্যায্য দাম হয়, সেইটা আপনে আমাগো ব্যবস্থা কইরা দিবেন। সব যে ট্যাকাতেই দিতে হইবো, তাও না। নগদ দামের বদলে কিছু কিছু দরকারি জিনিসপত্রও আমাগো লাগবো। তাই নগদ ট্যাকা যা হয় দেওনের ব্যবস্থা করবেন। আর বাকি দাম আমাগো দরকারি জিনিসপত্র দিয়া পোষাইয়া দিলেই হইবো।'

New Pdf download: www.PoragEducation.com + webtalkbd.com

কণার আর সহসা গোবিন্দপুর ফেরা হলো না। আজাহার খন্দকারের অত বড় পাটের আড়ত পুড়ে ছাই হয়ে গেলো! এই অবস্থায় ঘর থেকে নড়ার অবস্থা নেই তার। আজাহার খন্দকার পুরোপুরি ভেঙে পড়েছেন। প্রথমে তিনি ভেবেছিলেন স্বাভাবিক কোনো দুর্ঘটনা। কিন্তু পরদিন খুব ভোরেই মইনুল হোসেন এলেন আজাহার খন্দকারের বাড়িতে। তিনি তোরাব আলী লস্করের চিঠিখানা পৌঁছে দিলেন তার হাতে। গতকালের ঘটনা চারপাশে বাতাসের আগে ছড়িয়েছে। এই অবস্থায় শুধু থানা আক্রান্ত হয়েছে, এমন ঘটনা চাউর হলে বিপদ। থানার প্রতি সাধারণ মানুষের আস্থা তলানিতে গিয়ে ঠেকবে। মইনুল হোসেন তাই চাইছিলেন আজাহার খন্দকারের আড়তের ঘটনাটিকে বড় করে দেখাতে। সমস্যা হচ্ছে, চিঠি পড়ে আজাহার খন্দকার রীতিমতো চুপসে গেলেন। তিনি এই আশঙ্কাটাই এতদিন করছিলেন। তোরাব আলী লস্কর যে ছেড়ে দেয়ার মানুষ না তা তিনি জানেন। আর জানেন বলেই একটা তীব্র ভয় তার মনে ছিলো। কিন্তু পরিণতিটা যে এমন হবে, তা তিনি কস্মিনকালেও ভাবতে পারেননি। চিঠিটা বারকয়েক পড়েছেন আজাহার খন্দকার। সেখানে লেখা,

'খোনকার সাব,
আমার সালাম নিবেন।
ইতি- তোরাব আলী লস্কর।'

মাত্র এই একটি লাইন। কিন্তু আজাহার খন্দকারের ধারণা এই একটি লাইনের ভেতরেই অব্যক্ত এমন কিছু কথা আছে, যা তিনি ধরতে পারছেন না। বিষয়টা তাকে আরো আতঙ্কিত করে ফেললো। সেদিনের সেই কৃতকর্মের জন্য এখন

নিদারুণ অনুশোচনায় দগ্ধ হচ্ছেন তিনি। তখন ভালোয় ভালোয় তোরাব আলী লস্করের চাহিদানুযায়ী টাকা-পয়সা দিয়ে দিলেই আজ আর কোনো সমস্যা থাকতো না।

মাত্র কয়েকদিন আগের ঝলমলে আজাহার খন্দকার হঠাৎ যেন গোড়া কাটা গাছের মতো চুপসে গেলেন। সারাক্ষণ একা একা ঘরে বসে থাকেন। কারো সাথে কথা বলেন না। কেউ শত ডাকলেও সাড়া দেন না। ঠিক মতো খান না, ঘুমান না। বিষয়টি নিয়ে সকলেই চিন্তিত। কণা, মনসুর তাকে নানাভাবে সান্ত্বনা দেয়ার চেষ্টা করেছে, কিন্তু তাতে লাভের লাভ কিচ্ছু হয়নি।

খন্দকার বাড়ির নাম-ডাক, মান-মর্যাদা, সামাজিক অবস্থান, আয়-ব্যয়সহ নানান আর্থিক হিসেব-নিকেশের জন্য এই একটি পাটের আড়ত যে কতটা গুরুত্বপূর্ণ ছিলো, তা মাসখানেকের মধ্যেই টের পাওয়া গেলো। কিন্তু এর বিকল্প খুঁজে পাওয়া গেলো না। যদিও এই সময়ে শক্ত হাতে খন্দকার বাড়ির হাল ধরলো কণা। কিন্তু সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতাতো তার নেই। সে একদিন মনসুরকে ডেকে বললো, 'আপনি একটু বাবাকে নিয়ে বাইরে টাইরে ঘুরতে বের হন।'

'কোথায় ঘুরতে বের হবো?'

'বাইরে কোথাও। নদীর ধারে, গঞ্জে, বাজারে।'

'উহু।'

'কেন?'

'বাইরে ঘুরতে বের হলেই বাবা বাজারে যেতে চাইবেন। আর এই মুহূর্তে আমি তাকে বাজারে নিয়ে যেতে চাই না।'

'কেন?'

মনসুর খানিক চুপ করে থেকে বললো, 'কারণ বাবা দৃশ্যটা নিতে পারবেন না। ওইখানে ওই অত বড় পাটের আড়তটা ছিলো কম করে হলেও পঞ্চাশ বছর। প্রতিদিন ঘুম থেকে উঠেই তিনি সেখানে যেতেন। এই এতটা বছর, রোজ। সেই জায়গাটা এখন একদম ফাঁকা। শূন্য। পোড়া ছাইয়ের স্তূপ পড়ে আছে জায়গাটিতে। তোমার কী ধারণা বাবা বিষয়টা নিতে পারবেন? আর বাবার প্রেসারও এখন অনেক বেশি। খুব সাবধান থাকতে হবে।'

'কিন্তু কিছু একটাতো করতে হবে। ওই আড়তটাইতো আমাদের সবকিছুর উৎস ছিলো। এখন কিছু একটা না করে এভাবে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকলে হবে?'

'কী করবো বলোতো?'

কণা যেন একটু বিরক্তই হলো, 'সেটাও কী আমি বলে দেবো? আপনি বুঝতে পারছেন না, আপনার এখন অনেক দায়িত্ব!'

মনসুর মাথা চুলকে বললো, 'কখনওতো এসব দায়িত্ব পালন করিনি।'

'তাহলে কোন সব দায়িত্ব পালন করছেন আপনি?'

New Pdf download: www.PoragEducation.com + webtalkbd.com

মনসুর অনেক চিন্তা করেও খুঁজে পেলো না সে আসলে কী দায়িত্ব পালন করেছে! কণা বললো, 'আমিও কী কখনো এই এতকিছু করেছি?'

মনসুর ডানে-বায়ে মাথা নাড়লো। কণা বললো, 'আপনি ঘরের বড় ছেলে, বিপদে-আপদে আপনার দায়িত্ব সবচেয়ে বেশি। আর এই মানুষটা সেই এতটুকু থেকে আপনাদের বাবা-মায়ের মতো করে বড় করেছেন না?'

মনসুর জবাব দিলো না। মাথা নিচু করে বসে রইলো। কণা বললো, 'সে আপনাদের সব দায়িত্ব নিয়েছে। এখন আপনার সময় তার দায়িত্ব নেয়ার। শুধু তারই না, মঞ্জুও রয়েছে। ওতো ছোট। সামনে ওর ভবিষ্যৎও আছে। আপনি যদি এখন দায়িত্ব না নেন, তাহলে এই সংসারটা খড়কুটোর মতো ভেসে যাবে।'

মনসুর সোজা হয়ে বসলো। তারপর নরম গলায় বললো, 'এই এতটা বছর বাবা আমাকে কখনো কিছু বুঝতে দেননি। বিশাল মানুষটা তার বুক দিয়েই সব ঝড়-ঝাপটা থেকে আগলে রেখেছিলেন। তখন মনে হয়নি, সবকিছু এত কঠিন। এখন বুঝতে পারছি। আর মানুষটাকে ওভাবে নিস্তেজ হয়ে পড়ে থাকতে দেখতে ভাল্লাগছে না আমার। আমি নিতে পারছি না কণা।'

কণা মনসুরের মাথাটা তার বুকের ভেতর টেনে নিলো। তারপর বললো, 'বিপদ আপদতো মানুষের জীবনেই আসে, তাই না? আবার মানুষই সেই বিপদ আপদ থেকে মুক্ত হয়। এখন আমাদের বিপদ। এখন যদি আমরা সবাই এভাবে ভেঙে পড়ি, তাহলে হবে?'

'আমি কী করবো বলোতো? আমার পড়াশোনাটাও শেষ হলো না। দেশের অবস্থাও এমন। আর দেশের অবস্থা ভালো হলেই বা কী? আমিতো আর বাবাকে এভাবে এখানে ফেলে রেখে ঢাকা চলে যেতে পারবো না!'

কণা ম্লান হাসলো, 'না পারেন না। আপনি একা না শুধু, কোনো সন্তানই তা পারে না।'

'কিন্তু তুমি? তোমার কী হবে?'

'আমার আবার কী হবে?'

'তোমার পরীক্ষা?'

এই কথায় কণা সাথে সাথেই জবাব দিতে পারলো না। চুপ করে রইলো। তবে চুপ থাকা সময়টুকুতে সে যেন নিজেকে একটু গুছিয়ে নিলো। তারপর ভারি গলায় বললো, 'এখন পরীক্ষা নিয়ে ভাবতে হবে না, পরীক্ষা পরেও দেয়া যাবে। কিন্তু এই বিপদ পরে কাটানো পর্যন্ত অপেক্ষা করা যাবে না।'

কণার কথাগুলো মনসুরের বুকের ভেতর আঘাত করলো। আসলেইতো, এখন পুরো দায়িত্বটাই তার। অধিকন্তু কণা একা যা করছে, তা অভাবনীয়, অপ্রত্যাশিত। পরের কয়েকদিন মনসুর খুব ছোটাছুটি করলো। সে কখনোই তাদের স্থাবর-অস্থাবর সহায় সম্পত্তির কোনো খোঁজখবর নেয়নি। কিন্তু পরিস্থিতি মানুষকে বদলাতে বাধ্য করে, নতুন নতুন পথ চেনায়। সেই পথে গিয়ে মনসুর আবিষ্কার করলো, তাদের

হাতে নগদ টাকা-পয়সা তেমন নেই। যা ছিলো তার বেশিরভাগই পাট কেনায় খরচ হয়ে গিয়েছিলো। বাজারে তখন পাটের দাম কম থাকায় তার বাবা প্রচুর পাট কিনে আড়তে মজুদ করে রেখেছিলেন, যাতে বাজারে আবার দাম বাড়লে বেশি দামে বিক্রি করতে পারেন। কিন্তু সেই পাট সব পুড়ে ছাই হয়েছে।

মনসুর ভাবছিলো আগের জায়গাতেই যদি কোনোভাবে নতুন একটা আড়ত সে দাঁড় করাতে পারে, তাহলে বাবাকে আবার সেখানে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে দিতে পারবে। তাতে যদি বাবা কিছুটা হলেও ভালো বোধ করেন। কিন্তু সেটি করতে গেলেও যে পরিমাণ নগদ অর্থের দরকার তা এই মুহূর্তে তাদের নেই। বিকল্প আরো কত কিছুই যে মনসুর ভাবলো, কিন্তু তার সবকিছুই এসে আটকে গেলো ওই নগদ টাকার প্রশ্নেই।

বাড়ির সিন্দুকে গয়না ছাড়া যে পরিমাণ নগদ টাকা রয়েছে তা দিয়ে ওরকম একখানা আড়ত করা কোনভাবেই সম্ভব নয়। সম্ভব না গয়না কিংবা জমি বিক্রি করে টাকার ব্যবস্থা করাও। এর কোনটিই আজাহার খন্দকার মেনে নিতে পারবেন না। বরং এই সময়ে এতে তার মানসিক অবস্থা আরো ভঙ্গুর হয়ে যাওয়ার শঙ্কা রয়েছে।

এতদিনকার বোহেমিয়ান, নিশ্চিন্ত জীবনের মনসুর হঠাৎ করেই যেন আটকে গেলো সংসার নামক বাধাময় পরিস্থিতির চোরাবালিতে। রোজ ভোরবেলা মতি মিয়াকে নিয়ে সে ঘর থেকে বের হয়, আর ফেরে গভীর রাতে। তার কষ্টক্লান্ত মুখের দিকে তাকালে কণার খুব অসহায় লাগে। কিন্তু কী করবে সে? তার সাধ্যমতো চেষ্টাও সে করছে। কিন্তু সব কিছু নিয়ন্ত্রণের সাধ্য তার নেই। কেবল মনসুরের দিকে তাকালে নিজেকে বড় অসহায় মনে হয় কণার।

পর পর আরো কয়টা দিন মনসুর পাগলের মতো হন্যে হয়ে ঘুরলো। আজাহার খন্দকারের কিছু টাকা-পয়সা পাওনা রয়েছে লোকজনের কাছে। সেগুলো আদায়ের জন্য মতি মিয়াকে নিয়ে সকাল থেকে সন্ধ্যা এ গ্রাম থেকে ও গ্রাম ঘুরে বেড়ালো মনসুর। কিন্তু লাভ বিশেষ হলো না। অল্প কিছু টাকা যা-ও আদায় করা গেলো, তাতে কাজের কাজ কিছু হবে না। ফেরার পথে মতি মিয়া বললো, 'আমি একখান কথা কই?'

'বলেন।'

'তুমি আপাতত আড়তের চিন্তা বাদ দেও। আড়ত দেওন অতো সোজা কথা না।'

'তাহলে উপায় কী মতি কাকু? সবকিছুতো নিজ চোখেই দেখছেন।'

'হুম। দেখতেছি দেইখ্যাই কইতেছি। ধরো, আবার আড়ত দিলা, আবার আইসা যদি লস্করের লোকজন আগুন লাগাই দেয়, তহন কি করবা? তার জিদ কিন্তু কমে নাই।'

New Pdf download: www.PoragEducation.com + webtalkbd.com

বিষয়টা মাথায় ছিলো না মনসুরের। মতি মিয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা কথা বলেছে। আজাহার খন্দকার নিজেও বলেছেন, এক লাইনের যেই চিঠিখানা তোরাব আলী লস্কর তাকে পাঠিয়েছেন, সেই চিঠিখানা স্বাভাবিক কোনো চিঠি নয়। বরং সেই চিঠির ওই একটামাত্র লাইনজুড়েই বড়সড় রহস্য রেখে দিয়েছেন তোরাব আলী লস্কর। আজাহার খন্দকারের ধারণা, আড়তের ঘটনা কেবল শুরু। তোরাব আলী লস্কর তাকে সহজে ছেড়ে দেবেন না। বরং সুযোগ পেলেই তিনি আবারও চড়াও হবেন। তার একজন লোক খুন হবার, দুজন ধরিয়ে দেয়ার প্রতিশোধ তিনি নেবেনই।

তার ওপরে তোরাব আলী লস্করের নাতনি জোহরার কথাও মনসুর শুনেছে। যা শুনেছে তার সামান্যও যদি সত্যি হয়, তবে তা রীতিমতো ভয়াবহ ব্যাপার! মনসুর প্রথম প্রথম বিষয়টাকে পাত্তা দিতে চায়নি, কিন্তু গ্রাম-গঞ্জে মানুষের মুখে মুখে বিষয়টি যেভাবে ছড়িয়ে পড়েছে তাতে পাত্তা না দিয়েও উপায় নেই। চায়ের দোকান থেকে শুরু করে হাট-বাজার, স্কুল, মসজিদ, খেলার মাঠ, বন্ধ ঘরের দরজার আড়ালে সর্বত্র ওই একই নাম। যদিও বিষয়টা খানিক বাড়াবাড়িও মনে হয়েছে মনসুরের কাছে। গ্রাম-গঞ্জে এমন বহু গুজব, তিলকে তাল করে ছড়ানো প্রচুর গাল-গল্প সে শুনেছে। কিন্তু তারপরও মতি মিয়ার কথাটাকে সে ফেলে দিতে পারলো না।

মনসুর চিন্তিত স্বরে বললো, 'তাহলে কী করা যায় বলেনতো কাকু?'

মতি মিয়া চট করে বললো, 'এক কাম করলে কেমন হয়?'

'কী কাজ?'

'তুমি একটা ডাক্তারখানা দিয়া বইসা গেলে কেমন হয়? আশেপাশে কিন্তু কোনো ডাক্তারখানাও নাই। রুগীরা কত কষ্ট কইরা পায়ে হাইট্যা যায় নবীগঞ্জ বড় বাজারে, খেয়াল করছো? তারপর সেইখানেও কিন্তু ভালো ডাক্তার পাওন যায় না। এইটা কিন্তু দুই দিক দিয়াই ভালো। ধরো আয় রোজগারও হইলো, আবার তোরাব আলী লস্করের ক্ষতি করনের রিস্কও কইমা গেলো। মানে যেমনে ধরো আগুন লাগাইলো আড়তে, ওইরকমতো আর করতে পারবো না! কী কও?'

মনসুর সাথে সাথেই জবাব দিলো না। চুপ করে রইলো। মতি মিয়া মনসুরের কাঁধে হাত রেখে বললো, 'আর নগদ টাকা-পয়সাও বেশি লাগবো না, একটু ভাইবা দেইখো। এর চাইতে ভালো আর কোনো উপায় কিন্তু নাই।'

বিষয়টা মনসুর ভাবলো। মতি মিয়া যা বলেছে, আসলেই এর চেয়ে ভালো আর কোন বুদ্ধি এই মুহূর্তে হয় না। কিন্তু একটা কথা ভেবে মনসুরের মনটা কেমন খারাপ হয়ে গেলো। তার জীবনটা কী তাহলে এই নবীগঞ্জেই নির্ধারিত হয়ে গেলো! অথচ কত কত স্বপ্ন নিয়েই না সে পড়তে গিয়েছিলো ঢাকায়! কিন্তু তার ভাগ্যে এমন লেখা থাকবে তা সে ঘুণাক্ষরেও ভাবতে পারেনি। এমনকি যে রাতে তার বাবা

তাকে ঢাকায় আনতে গিয়েছিলেন, ঠিক সেই রাতেও না। ঢাকা থেকে বাড়ি ফেরার সময়ও না। তার মনে হয়েছিলো দুচার দিন বাড়িতে থেকে আজাহার খন্দকারকে বুঝিয়ে- সুঝিয়ে সে আবার ঢাকা চলে যাবে। কিন্তু পরিস্থিতি এমন করে পাল্টে যাবে এটা সে স্বপ্নেও ভাবেনি।

আরেকটা বিষয় নিয়েও মনসুরের মন খারাপ হতে লাগলো। সেটি হচ্ছে কণা। কণার বাবা কত আশা নিয়েই না তার সাথে কণার বিয়ে দিতে রাজি হয়েছিলেন। তিনি ভেবেছিলেন, কণাকে নিয়ে তার সারাজিবনের স্বপ্নটুকু পূরণ করার দায়িত্ব নেবে মনসুর। কণাকে ঢাকায় রেখে তার উচ্চ শিক্ষার সকল ব্যবস্থা সে করবে। কিন্তু এখন কী করবে মনসুর? অনেক ভেবেও এই প্রশ্নের কোনো উত্তর মনসুর পেলো না। তবে সে মনে মনে নিজের কাছেই নিজে একটা শপথ করলো, আজ হোক কিংবা কাল হোক, কণার পড়াশোনাটা সে করাবেই। তা যে করেই হোক। নিজের স্বপ্ন নিজে ভাঙায় কোনো অন্যায় নেই, কিন্তু কথা দিয়ে কথা না রাখা যেমন অন্যায়, তেমনি দায়িত্ব নিয়ে অন্যের স্বপ্ন ভাঙা তার চেয়েও বড় অন্যায়। এই অন্যায় সে কোনভাবেই করতে চায় না। কখনো করবেও না।

সেদিন মাঝরাতে ঘুম ভেঙে গেলো কণার। সে ডান পাশে হাত বাড়িয়ে দেখে মনসুর নেই। বুকের ভেতরটা আচমকা কেঁপে উঠলো তার। নিভু নিভু হারিকেনের আলোটা খানিক বাড়িয়ে দিলো সে। মনসুর কোথাও নেই। কণা বিছানা থেকে নামলো। গ্রাম বলেই মাঝরাতে ভীষণ ঠাণ্ডা পড়ে গেছে। হাত বাড়িয়ে চাদরটা গায়ে চাপালো সে। তারপর ঘর থেকে বাইরে বের হয়ে এলো। ভারি কুয়াশা পড়ে গেছে বাইরে। আকাশে চাঁদ উঠেছে। কিন্তু ভারি কুয়াশা ভেদ করে চাঁদের আলো যেন নেমে আসতে পারছে না। ফলে এক ধরনের নীলচে শুভ্রতা যেন লেপ্টে আছে কুয়াশার শরীরজুড়ে। হুট করে অতিপ্রাকৃত মায়াময় এক জগত ভেবে বিভ্রম হয়। কণা এদিক সেদিক তাকালো। মনসুর কোথাও নেই। তার খানিক ভয়-ভয়ও লাগছে। সে সতর্ক পায়ে উঠানে নামলো। বিশাল উঠানটা দখিন দিকে যেখানে শেষ হয়েছে, সেখান থেকে শুরু হয়েছে বিস্তৃত বিল। মৌসুমের এই সময়টাতে এসে বিলের পানি কমতে শুরু করেছে। যদিও পুরোপুরি শুকিয়ে যায়নি এখনো। সেই বিলের কাছটাতে বাঁশের একখানা মাচার মতো বানানো। সেখানে একজন মানুষের ছায়ামূর্তির মতন দেখা গেলো। কণা হেঁটে সামনে এগোলো। মনসুর বসে আছে স্থির, নিশ্চুপ। কণা তার কাঁধে আলতো হাত রাখলো। মনসুর ফিরে তাকালো না, যেমন বসে ছিলো, তেমন বসেই রইলো। কণা বললো, 'ঠাণ্ডা লাগবেতো?'

মনসুর কথা বললো, 'লাগবে না।'

New Pdf download: www.PoragEducation.com + webtalkbd.com

'লাগবে না?'

'উহু।'

'কেন?'

মনসুর এবার ফিরে তাকালো। তারপর মৃদু হাসলো, 'এই যে তুমি আছো।'

'আমি থাকলে ঠাণ্ডা লাগবে না?'

'উহু।'

'আপনি কী জানতেন যে আমি আসবো?'

'হুম, জানতাম।'

'কী করে?'

'যেমন করে তুমি এলে।'

'আমি কেমন করে এলাম?'

'সে- তো তুমিই ভালো জানো!'

'হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেলো। মনে হলো আপনি পাশে নেই।'

মনসুর হাত বাড়িয়ে কণাকে তার পাশে বসালো, 'এভাবেই জানতাম।'

'আপনি জানতেন আমি টের পাবো?'

'হুম।'

'যদি না পেতাম? যদি না আসতাম?'

'তাহলে একা একা বসে থাকতাম।'

'খুব মন খারাপ হতো?'

'হতো।'

'আপনি কী জানেন, আপনি খুব ছেলেমানুষ?'

'জানি। জগতে সবাই ই কম বেশি ছেলেমানুষ।'

'সবাই-ই?'

'হুম।'

'কী করে?'

'পৃথিবীতে সবারই একটা নিজের মানুষ থাকে। নিজের একটা জায়গা থাকে। সবচেয়ে শক্ত, কঠিন যে মানুষটা, তারও। সে চায় সেই জায়গাটাতে গিয়ে সে তার কঠিন আবরণটা খুলে সম্পূর্ণ নিরাভারণ হয়ে যেতে। ভানহীন, শিশুর মতো।'

'আমি আপনার সেই জায়গা?'

মনসুর কথা বললো না। সে আচমকা দু হাতে কণার গাল চেপে ধরে তার মুখটা টেনে নিলো তার মুখের কাছে। তারপর দীর্ঘ চুমু খেলো। কণা জলে তোলা

মাছের মতো ছটফট করছিলো। মনসুর অবশ্য ছাড়লো না। সে দুই হাতে শক্ত করে কণাকে জড়িয়ে ধরলো। তারপর কণার কানের কাছে ঠোঁট নিয়ে গিয়ে ফিসফিস করে বললো, 'এত লজ্জা কিসের? তুমিতো আমার বিয়ে করা বউ!'

কণা সন্ত্রস্ত গলায় বললো, 'কেউ যদি দেখে ফেলতো?'

'দেখে ফেললে দেখে ফেলতো! নিজের বউকে নিজে চুমু খেতে পারবো না?'

'তাই বলে এখানে?'

মনসুর মাথা তুলে আকাশের দিকে তাকালো! কী অদ্ভুত অপার্থিব আলো নেমে আসছে পৃথিবীতে। সে ঘোরলাগা গলায় বললো, 'ভালোবাসার জন্য এর চেয়ে ভালো আর কোন জায়গা জগতে আছে?'

'নেই?'

'উহু।'

কণার যেন খানিক মন খারাপ হলো। সে বললো, 'আমিতো ভাবি পৃথিবীর সবচেয়ে খারাপ জায়গাটাও আপনি থাকলে আমার কাছে সবচেয়ে সুন্দর হয়ে উঠবে।'

মনসুর হাসলো, 'তুমি একটা পাগল।'

কণা হাসলো না। মন খারাপ করেই রইলো। মনসুর বললো, 'এই যে দেখলে?'

'কী?'

'তুমি কেমন ছেলেমানুষ হয়ে গেলে! কেমন আদুরে, অভিমানী, যুক্তিহীন!'

'আপনার তাই মনে হয়?'

'হুম, তাই মনে হয়। অথচ তোমার চারপাশের আর সকল মানুষের কাছে তুমি কত অন্যরকম একটা মানুষ। তাই না?'

কণা জবাব দিলো না। মনসুর বললো, 'এটাই। আমাদের সবার বুকের ভেতরই একান্ত নিজের একটা জগৎ থাকে, নিজের একটা মানুষ থাকে। সেই মানুষটার কাছে আমরা শিশু হয়ে যেতে চাই। আমরা চাই সেই মানুষটা আমার খামখেয়ালি বুঝুক। আমার রাগ, অভিমান, ভালোবাসা, দুঃখ, আনন্দ সব বুঝুক। আমি না বলতেই বুঝুক।'

কণা তার ডান হাতখানা বাড়িয়ে মনসুরের গাল ছুঁয়ে দিলো। তারপর বললো, 'আপনি এমন সুন্দর করে কী করে বলেন!'

'কেন আমার সুন্দর করে বলতে নেই?'

'তা না। যেন কবিতার মতো করে বলেন। প্রথম রাতের কথা মনে নেই? কী সুন্দর করে বললেন! আর সেই চিঠিটাও।'

'আছে ওটা?'

New Pdf download: www.PoragEducation.com + webtalkbd.com

'থাকবে না আবার? সারা জীবন থাকবে!'

'আর আমার কাছে কী থাকবে?'

কণার হঠাৎ মনে হলো, আসলেইতো! মনসুরকেতো সে কখনো এমন কিছু দেয়নি, যা মনসুরের কাছে সারাজিবন রয়ে যাবে। সে খানিক কী ভাবলো! তারপর বললো, 'আপনার কাছেতো আমিই আছি। আমিই থাকবো।'

'তাহলে আমি তোমার কাছে নেই? আর সারাজিবন থাকবো না?'

এই কথায় কণার বুকের ভেতরটা কেমন কেঁপে উঠলো। সে মনসুরের আরো গা ঘেঁষে বসলো। তারপর ওম জড়ানো গলায় বললো, 'এমন আর কখনো বলবেন না।'

মনসুর বললো, 'আচ্ছা বলবো না। কিন্তু তুমি কিন্তু এখনো আমাকে আপনি করেই বলে যাচ্ছো।'

'আমার ভালো লাগে যে!'

মনসুর হাসলো, 'আমার বুঝি তুমি শুনতে ইচ্ছে হয় না?'

কণা বললো, 'অন্য কোনো মেয়ের কাছ থেকে শুনে নিয়েন।'

'নেবো?'

কণার চোখ হঠাৎ ছলছল করে উঠলো। সে বললো, 'পারবেন? তখন আপনার আমার কথা মনে পড়বে না?'

মনসুর আবরো শক্ত করে জড়িয়ে ধরে কণাকে চুমু খেলো। তারপর বললো, 'কাউকে কারো কখন মনে পড়ে জানো?'

'কখন?'

'যখন সে ভুলে যায়।'

'মানে?'

'মানে, ভুলে গেলে আবার নতুন করে মনে করতে হয়। মনে পড়াতে হয়। তোমাকেতো আমি কখনো ভুলতেই পারবো না। মুহূর্তের জন্যও না। তাহলে নতুন করে আবার মনে পড়তে হবে কেন?'

কণা মানুষটার দিকে তাকিয়ে রইলো। একটা মানুষ এত সুন্দর করে কথা বলে কীভাবে! সে বললো, 'আপনি এই যে কবিতা লেখেন, সব কী আমায় ভেবে লেখেন?'

মনসুর কী ভাবলো, তারপর বললো, 'তোমাকে দেখার পর থেকে তোমাকে ভেবেই।'

'তারমানে আগে অন্য কাউকে ভেবে লিখতেন?'

'তাতেতো ক্ষতি কিছু নেই। তোমাকে দেখার পরতো আর কাউকে ভেবে কিছু লিখিনি!'

'কিন্তু তার পর যদি আবার অন্য কাউকে দেখে লিখতে ইচ্ছে হয়?'

এই প্রশ্নের জবাব কী দেবে মনসুর! সে হাসলো। কণা বললো, 'আপনি কী জানেন?'

মনসুর বললো, 'কী?'

'আমার মতো এমন করে আর কেউ কখনো আপনাকে ভালোবাসতে পারবে না।'

মনসুর বললো, 'জানি।'

'তাহলে আর কাউকে নিয়ে কখনো কিছু লিখবেন না। সব আমায় নিয়ে।'

মনসুর আবারো হাসলো।

কণা বললো, 'মনে থাকবে?'

মনসুর বললো, 'থাকবে।' তারপর সে আবারো শক্ত হাতে কণাকে বুকের সাথে জড়িয়ে ধরলো। কণা বললো, 'আপনার খুব মন খারাপ তাই না?'

মনসুর জবাব দিলো না। কণা বললো, 'আপনি আপনার চেহারাটা আয়নায় দেখেছেন?'

মনসুর হাসলো, 'তুমিইতো আমার আয়না। রোজ যেমন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আমায় দেখো আর দেখিয়ে দাও, তাতে আলাদা করে আয়না দিয়ে কী হবে!'

কণা হাসলো, 'আচ্ছা, আমি না হয় আপনার আয়না হলাম। কিন্তু কী যে অবস্থা হয়েছে চেহারার, সে খেয়াল আছে? এত দুশ্চিন্তা করলে কী করে হবে?'

মনসুর এবার খানিক গম্ভীর হলো। সে বললো, 'কী করবো বলো? বাবাকে আর ওই অবস্থায় দেখতে পারছি না। কোনো উপায়ও খুঁজে পাচ্ছি না। তার মধ্যে আরো একটা ঝামেলা।'

'কী ঝামেলা?'

'বাজারে বাবার কিছু ঋণটিনও ছিলো মনে হয়।'

'বাবা কিছু বলেছেন? মানে সত্যি কি না?'

'সত্যিই। বাবাও কিছু টাকা লোকজনের কাছে পেতেন, কিন্তু তারা সেগুলো ঠিকঠাক দিচ্ছে না। খুব দিশেহারা লাগছে। অতগুলো টাকার পাট। আবার অনেকের কাছ থেকে বাবা নগদ টাকা দিয়ে কেনেনওনি। বিক্রি করে টাকা দেবেন, এমন চুক্তিও ছিলো।'

কণাও এবার চিন্তিত হয়ে পড়লো। সে বললো, 'আমি কী বাড়িতে বাবার কাছে কিছু টাকা চেয়ে পাঠাবো?'

New Pdf download: www.PoragEducation.com + webtalkbd.com

মনসুর বললো, 'উহু।'

'উহু, কেন?'

'কারণটা জানি না, তবে আমি নিতে পারবো না।'

'কেন? আমার বাবা আপনার বাবা না?'

'সে তো অবশ্যই। কিন্তু...। আচ্ছা, আগে আমাকে আরেকটু চেষ্টা করতে দাও, তারপর না হয় দেখা যাবে। প্লিজ?'

'আচ্ছা। কিন্তু স্যার, নিজের দিকেও একটু খেয়াল রাখতে হবে যে!'

মনসুর কণার হাত ধরলো, 'তুমি এত ভালো কেনো কণা?'

কণা এই কথার জবাব দিলো না। সে মনসুরের বুকের ভেতর ছোট্ট পাখির মতো ঢুকে গেলো। মনসুর ফিসফিস করে বললো, 'এই!'

কণা বললো, 'উমম।'

'দেখলে?'

'কী?'

'শীত কোথায় পালিয়ে যাচ্ছে?'

কণা ওম জড়ানো গলায় বললো, 'উমম।'

মনসুর গাঢ় গলায় বললো, 'এমন হিমের রাতে তুমি হলে ঘোর, কুয়াশাও হয়ে যায় আদুরে চাদর।'

কণা আর কোনো কথা বললো না। সেই অদ্ভুত মায়াময় আলোর রাতে কণা আর মনসুর ক্রমশই ডুবে যেতে থাকলো আদুরে চাদরে।

তোরাব আলী লস্করের আজকাল মনে হয়, তার অবস্থা অনেকটা 'গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল' টাইপ হয়ে যাচ্ছে। তিনি বুঝে গেছেন, জোহরাকে সামলে রাখার ক্ষমতা তার নেই। শুধু যে সামলে রাখার ক্ষমতাই নেই, তা-ও না, জোহরাকে ধরে রাখার ক্ষমতাও তার নেই। জোহরা সমুদ্রের মতো খেয়ালী। যতক্ষণ সে শান্ত, ততক্ষণ তার চেয়ে সুন্দর, স্নিগ্ধ, মায়াময় আর কিছুই নেই। তখন তাকে দেখে বোঝার উপায় থাকে না, ভেতরে ভেতরে কী ভয়াবহ প্রলয় নিয়ে সে ঘুরে বেড়াচ্ছে! শান্ত, কোমল, স্নেহশীলা এক সরল কিশোরী। কিন্তু হঠাৎ জলোচ্ছ্বাসে সেই জোহরাই যেন যেকোনো সময় ডেকে আনতে পারে ভয়ংকর ধ্বংসযজ্ঞ। তখন তার সামনে দাঁড়ানোর ক্ষমতা কারো নেই।

কত হবে জোহরার বয়স? ঠিকঠাক হিসেব না থাকলেও ষোল পেরিয়ে সতেরো কিংবা সতেরো পেরিয়ে হয়তো আঠারোয় পড়েছে সে। কিন্তু এইটুক এক মেয়ে কী করে এমন অবিশ্বাস্য বিপরীতমুখী দুটি সত্তা ধারণ করে, তোরাব আলী জানেন না।

আগে একটু-আধটু সংশয় থাকলেও তোরাব আলী লস্কর এখন পুরোপুরি দ্বিধাহীন, জোহরাকে তিনি নিজেও ভয় পান।

জোহরা নবীগঞ্জ থেকে ফিরেছে প্রায় বারো ঘণ্টা। এর মধ্যে তোরাব আলী লস্করের সাথে তার কোনো কথা হয়নি। দেখাও হয়নি। সন্ধ্যা বেলা তোরাব আলী লস্কর একা একা চরের প্রান্ত ধরে হাঁটছেন। এই জায়গাটা একটু নির্জন। চরে প্রায় শদুয়েকের মতো গৃহস্থ রয়েছে। নানান বয়সী মানুষ, তাদের কাজ-কর্ম, হৈ-হুল্লোড়ে তাই বেশির ভাগ সময়ই সরব হয়ে থাকে চারপাশ। তোরাব আলী লস্করের আজকাল যেন এসব আর সহ্য হয় না। অদ্ভুত ব্যাপার হলো বেশ কিছুদিন থেকে

New Pdf download: www.PoragEducation.com + webtalkbd.com

নিজের জন্ম, মৃত্যু, জীবন ও কর্ম এই বিষয়গুলো তাকে খুব ভাবায়। এই যে তিনি ডাকাত হয়ে জন্মেছেন, জীবনজুড়ে কত কত মানুষের মৃত্যু, ক্ষয়ক্ষতির কারণ তিনি হয়েছেন, এর দায় কী শুধুই তার? এই জন্মতো তিনি চেয়ে নেননি! তাহলে? তাহলে এর দায়ভার কেন তাকে নিতে হবে!

তোরাব আলী লস্কর সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাসী মানুষ। আর সে কারণেই এক ধরনের মৃত্যুচিন্তা তার হয়। সেই চিন্তাজুড়ে থাকে ভয়। একইসাথে স্রষ্টার প্রতি তীব্র এক অভিমানও তিনি অনুভব করেন। কিন্তু সেই অভিমানও যেন গত বেশ কিছুদিন ধরে ক্রমশই সংশয়াবৃত হয়ে যাচ্ছে। এর কারণ জোহরা। তোরাব আলী লস্কর জানেন, তার নিজের ভাগ্য কেউ কখনো বদলে দেয়ার চেষ্টা করেনি, কিন্তু তিনিতো জোহরার ভাগ্য বদলে দেয়ার চেষ্টা করেছিলেন। চেষ্টা করেছিলেন তার জন্মের অভিশাপটুকু মুছে দিয়ে তাকে নতুন একটা জীবন দিতে। কিন্তু তারপরওতো জোহরা তা গ্রহণ করলো না। বরং সে বেছে নিলো তার জন্মের পরিচয়ই। যেন নিজেই নির্ধারণ করে নিলো নিজের ভাগ্য।

আসলেই কী তাই? মানুষ কী নিজেই তার নিজের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করতে পারে? নাকি এর সকলি পূর্ব নির্ধারিত? এ এক জটিল হিসেব, দুরূহ চিন্তার সমীকরণ। তোরাব আলী লস্কর যতই ভাবেন, ততই ভেবে কোনো কুল পান না। তবে আজকাল জোহরাকেও তিনি ভাগ্যের হাতেই ছেড়ে দিয়েছেন। এ ছাড়া অবশ্য আর কোনো উপায়ও তার জানা নেই। জোহরাকে নিয়ন্ত্রণ করার সাধ্য কারো নেই।

শীত পড়তে শুরু করেছে। তার গায়ে পাতলা একটা ফতুয়া। সন্ধ্যার হিমেল হাওয়ায় তোরাব আলী লস্করের শরীরটা কেমন কেঁপে উঠলো। ঠাণ্ডা থেকে নিজেকে খানিক রেহাই দিতেই হাত দু খানা বুকের কাছে আড়াআড়ি বাঁধলেন তিনি। আর ঠিক সেই মুহূর্তেই পেছনে কারো পায়ের শব্দ শুনলেন। তিনি ফিরে তাকাতে দেখলেন, জোহরা ত্রস্ত পায়ে হেঁটে আসছে। তার পরনে আজ সালোয়ার কামিজ। বহুদিন এই পোশাকে তাকে দেখেননি তোরাব আলী লস্কর। আজ তাকে দেখে মনে হচ্ছে বেণী দোলানো ছোট্ট এক খুকী উড়ে উড়ে ছুটে আসছে। জোহরা তার পাশে এসে দাঁড়ালো। তারপর বললো, 'এইটা একটু গায় দেওতো দাদাজান।'

তোরাব আলী লস্কর দেখলেন। লম্বা আলখাল্লার মতো ভারি এক পোশাক জোহরার হাতে। তিনি নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে বললেন, 'কী এইটা?'

'কী তাতো দেখতেই পাইতেছো। এইটা হইলো শীতের কোট। বিদেশি লোকজন পরে। নবীগঞ্জ বাজারের পুরনো জামাকাপুড়ের মার্কেটে পাইছি। দেইখা মনে হইলো তোমার গায় লাগবো, তাই নিয়া আইলাম। পইরা দ্যাহো।'

'এহন না। পরে পরবো নে।' তোরাব আলী লস্কর এড়ানোর চেষ্টা করলেন। কিন্তু জোহরা নাছোড়বান্দা, 'ঢং কইরো নাতো দাদাজান। মানুষ বুড়া হইলে তাগো ঢং বাড়ে। তোমারো বাড়তেছে। দেও, গায়ে দেও।'

জোহরা এক প্রকার জোর করেই আলখাল্লার মতো পোশাকটা গায়ে পরিয়ে দিলো তোরাব আলীর। পোশাকটা ভালো। ভেতরে একটা আরামদায়ক ওম। দেখতেও একটা অভিজাত ব্যাপার আছে। নিজেকে কেমন কেউকেটা গোছের মানুষ মনে হচ্ছে তোরাব আলী লস্করের।

জোহরা বললো, 'তোমারেতো নায়কের লাহান লাগতেছে দাদাজান। তয় বুড়া নায়ক। চুল পাকনা। আফসোস, এই অবস্থায় রূপবানরে ফিরা্য পাইলেও জুয়ান রূপবান পাইবা না, পাইবা বুড়া রূপবান। হা হা হা।'

তোরাব আলী লস্কর বুঝতে পারছেন জোহরা তাকে স্বাভাবিক করার চেষ্টা করছে। সেদিন রাতে যে সে তোরাব আলী লস্করকে পুরোপুরি অগ্রাহ্য করে চলে গিয়েছিলো, এবং কাজটাতে যে তোরাব আলী লস্কর বড়সড় আঘাত পেয়েছেন, তাও সে বুঝতে পেরেছে। হয়তো এ কারণেই এখন এক ধরণের অপরাধবোধও কাজ করছে তার মধ্যে। জোহরার ওপর ঠিক এই কারণেই রাগ ধরে রাখতে পারেন না তোরাব আলী লস্কর। তার কেন যেন মনে হয়, জোহরার ওপর অন্য কারো যেমন কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই, তেমনি নিয়ন্ত্রণ নেই জোহরার নিজেরও। জোহরা নিজেই জানে না, কখন সে কী করবে! ফলে মুহূর্তেই স্নিগ্ধ জল থেকে প্রলয়ঙ্করী জলোচ্ছ্বাস হয়ে ওঠে সে।

জোহরা বললো, 'দাদাজান?'

'হুম।'

'তুমি আমার ওপর খুব রাগ না?'

তোরাব আলী লস্কর এবার আর উত্তর দিলেন না। জোহরা তার গা ঘেঁষে হাঁটতে হাঁটতে বললো, 'তোমারে একখান কথা বলবো, কথাখান শুনলে তুমি আমার ওপর খুশি হইয়া যাইবা।'

'কী কথা?'

'কওতো কী কথা?'

'তুই নবীগঞ্জ থানার পুলিশরে দিয়া মাছ বেচাইছোস, থানার ভিতরে পুলিশরে আটকাই রাখছোস, সেই কথা?'

'উহু। সেই কথা না।'

'তাইলে আর কোন কথা? সবইতো হানিফ আর বাহাদুর আমারে কইছে।'

'উহু সব কয় নাই। সব কথা তোমারে কইতে না কইরা দিছিলাম। আসল কথাখান আমি বলবো দেইখ্যা তারা তোমারে বলে নাই।'

তোরাব আলী লস্কর হঠাৎ থমকে দাঁড়ালেন, 'আসল কথাখান কী?'

'তুমি আন্দাজ করো?'

তোরাব আলী লস্কর আন্দাজ করতে পারলেন না। জোহরা বললো, 'যাওনের আগে কইছিলাম না তোমার জন্য একখান উপহার আনবো?'

তোরাব আলী লস্কর আবার হাঁটা দিলেন, 'উপহারতো আনছসই, এই যে সাহেবি কোট। গরমের মইধ্যে কোট গায় দিয়া ঘুরতেছি!'

New Pdf download: www.PoragEducation.com + webtalkbd.com

জোহরা হাসলো, 'এহন গরম না দাদাজান। শীতকালই। তোমার রাগ এহনো কমে নাই।'

তোরাব আলী লস্কর কথা বললেন না। জোহরা বললো, 'তুমি আসলেই বুড়া হইয়া গেছো। তোমার আইজকাইল কিছুই মনে থাহে না। কেন? যাওনের সময় তোমারে কইয়া যাই নাই, তোমার একখান কাম আমি কইরা আসবো? তোমার একখান হিসাব আমি মিটাইয়া আসবো?'

'আমার আবার কী হিসাব?'

'আজাহার খোনকারের লগে তোমার একখান হিসাব আছিলো, ভুইলা গেছো? তুমি তারে চিঠি দেওনের পরও সে লোকজন নিয়া আমাগো ওপরে হামলা করলো। বাহাদুর ভাই আর মোকাররম ভাই ধরা পড়লো। আর লোকমান ভাইতো পুলিশের গুলিতে মারাই গেলো। তার লাশওতো আমরা পাই নাই। তুমি তহন কও নাই যে, যেমনেই হোউক আজাহার খোনকারের জীবন তুমি জাহান্নাম বানাই ছাড়বা?'

তোরাব আলী লস্কর সামনে পা ফেলতে গিয়েও আচমকা থমকে দাঁড়ালেন। সন্ধ্যার ম্লান হয়ে যাওয়া আবছা আলোয় তার অন্ধকার মুখখানা হঠাৎ যেন উজ্জ্বল হতে শুরু করলো। শক্ত হতে থাকলো তার চোয়াল। তিনি কঠিন অথচ ঠাণ্ডা গলায় বললো, 'তুই কী করছোস?'

জোহরা হাসলো। মৃদু হাসি। এই হাসি তোরাব আলী লস্কর চেনেন। এই হাসির ভেতর লুকিয়ে আছে ভয়ংকর নৃশংস এক মানুষের প্রতিচ্ছবি। তিনি বললেন, 'তাড়াতাড়ি ক। আমি ভুলি নাই। আমি সময় আর সুযোগের অপেক্ষায় আছিলাম। আমি কিচ্ছু ভুলি নাই।'

জোহরা বললো, 'আজাহার খোনকারের অত বড় পাটের আড়তটা আমি আগুন দিয়া পোড়াইয়া ছাই কইরা দিয়াসছি!'

তোরাব আলী লস্করের যেন জোহরার কথা বিশ্বাস হলো না। তিনি হড়বড় করে বললেন, 'কী কস তুই?'

'জে দাদাজান। তুমি যদি দেখতা, তোমার পরানডা জুড়াই যাইতো। দাউদাউ কইরা আগুন উঠতেছে আসমানে। আর নিচে পুড়তেছে খোনকার সাবের আড়ত। হা হা হা।'

জোহরা হাসছে। হাসিতে তার শরীর কাঁপছে। তোরাব আলী লস্কর বিড়বিড় করে বলতে থাকলেন, 'আমি নিজ চৌক্ষে দৃশ্যটা দেখতে পারলাম না। আমি নিজ চৌক্ষে দৃশ্যটা দেখতে পারলাম না।'

জোহরা বললো, 'তুমি থাকলে কী যে খুশি হইতা দাদাজান। তোমার চাইতে বেশি খুশি আর কেউ হইতো না।

কথা সত্য। তোরাব আলী লস্করের এখন খুব আফসোস হচ্ছে। তার মনে হচ্ছে, জোহারার সাথে তিনিও গেলে পারতেন। আজাহার খন্দকারের ওপর যে আক্রোশ তিনি পুষে রেখেছেন, তা প্রশমনে এর চেয়ে ভালো কিছু আর হয় না।

আচ্ছা, তোরাব আলী লস্কর কী আজকাল সবকিছুতে একটু বেশিই দুশ্চিন্তা করেন? একটু বেশিই বিপদের কথা, সাবধানতার কথা ভাবেন? তার এই অধিক সতর্কতাই কী তাহলে গত কয়েকবছরে লস্করদের অনেক বেশি কোণঠাসা করে ফেলেছিলো? আর জোহরা কী ঠিক সেই সময়টাতেই লস্করদের কোণঠাসা, দমবন্ধ পরিস্থিতি থেকে আবার একটু একটু করে বের করে আনতে শুরু করেছে? ফিরিয়ে আনতে শুরু করেছে লস্করদের সোনালি সময়ের সেই দোর্দণ্ড প্রতাপ?

তোরাব আলী লস্করের মাথায় এই প্রশ্নগুলো হঠাৎ ঘুরপাক খেতে শুরু করলো। এই প্রথম তার মনে হতে লাগলো, বয়সের কারণেই তিনি হয়তো অনেকটা মিইয়ে গেছেন। কোনো কিছু করার আগে তাই প্রয়োজনের চেয়ে বেশিই দুশ্চিন্তা করেন তিনি। যা হয়তো ক্রমাগত ভেঙে দিচ্ছে চরের অন্য সবার মনোবলও।

সেই সারাটা রাত এইসব নানা ভাবনায় তোরাব আলী লস্কর ঘুমাতে পারলেন না। চোখ বন্ধ করতেই তার যৌবনের নানান দুঃসাহসিক ঘটনার দৃশ্য চোখের সামনে একের পর এক ভেসে আসতে লাগলো।

একবার বহুদূরের গোসাইর হাটে ডাকাতি করতে গেলো লস্কররা। তোরাব আলীর বয়স তখন চৌদ্দ কী পনেরো। দলের প্রধান ছিলেন রইদুদ্দিন লস্কর। তোরাব আলীর বড় চাচা। তিনি সবাইকে পইপই করে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন, কতক্ষণের মধ্যে কাজ শেষ করে সবাইকে নির্ধারিত জায়গায় চলে আসতে হবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে দলছুট হয়ে গিয়েছিলো ছোট্ট তোরাব আলী। খোলা রাস্তায় তাকে চিনে ফেললো ডাকাতি হওয়া এক জুয়েলারির দোকানের স্বর্ণকার। তোরাব আলীর কোমরে তখনো কুড়ি ভরি ওজনের সোনার বিছা বাঁধা। স্বর্ণকার চিৎকার করে তাড়া করলো তোরাব আলীকে। তোরাব আলী উপায়ন্তর না দেখে নদীর ধারের এক তিন তলা বাড়িতে ঢুকে পড়লো। তারপর সিঁড়ি বেয়ে তড়তড় করে উঠে গেলো ওপরে। কিন্তু সমস্যা হলো ছাদ পর্যন্ত উঠে গিয়ে তার হঠাৎ মনে হলো, সে তার জীবনের সবচেয়ে বড় ভুলটা করে ফেলেছে। এই ভুল শোধরানোর আর কোনো উপায় তার নেই।

সিঁড়ি বেয়ে উঠে আসছে অসংখ্য মানুষের পায়ের শব্দ। সাথে হিংস্র উল্লাস। লোকগুলো যখন ছাদে উঠলো, তোরাব আলী স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলো, তাদের চোখ ভর্তি খুনের নেশা। একজনের হাতে ধারালো বর্শা। পেছনের কজনের হাতে লম্বা বাঁশের লাঠি। তারা চারপাশ থেকে প্রায় ঘিরেই ধরেছিলো তোরাব আলীকে। তোরাব আলীর মাথা তখন কাজ করছিলো না। কিন্তু এভাবে মরে যেতেও ইচ্ছে করছিলো না তার। ঠিক তখনই তোরাব আলীর মনে হলো, ছাদ থেকে লাফিয়ে কোনোভাবে যদি নদীতে পড়া যায়, তাহলে এবারের মতো বেঁচে যাওয়ার সূক্ষ্ম একটা সম্ভাবনা থাকলেও থাকতে পারে। কিন্তু ছাদের যে প্রান্তে নদী, সেই অবধি যেতে হলেও তাকে অনেকগুলো মানুষকে পরাস্ত করে যেতে হবে। কিন্তু সেটি কীভাবে সম্ভব!

New Pdf download: www.PoragEducation.com + webtalkbd.com

হঠাৎ তোরাব আলীর চোখ আটকে গেলো ছাদের মেঝেতে। সেখানে চটের বস্তায় রোদে শুকাতে দেয়া হয়েছিলো লাল মরিচের গুঁড়ো। সেগুলো তখনো রয়ে গিয়েছিলো সেখানেই।

তোরাব আলী আচমকা বাঁজ পাখির মতো ছোঁ মেরে মরিচের গুঁড়োসহ বস্তাটা তুলে নিলো। তারপর চোখের পলকে তার সামনে বাঁধা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা উন্মত্ত লোকগুলোর মুখে ছিটিয়ে দিলো মরিচের গুঁড়ো। তারপর প্রাণপণ দৌড়ে পৌঁছে গেলো নদীর দিকের ছাদের প্রান্তে। কিন্তু লাফিয়ে পড়ার ঠিক আগ মুহূর্তে তার মনে হলো সে বোধহয় নদীর পানি পর্যন্ত পৌঁছাতে পারবে না। যদিও ততক্ষণে নিজেকে সামলে নেয়ার সুযোগ আর তার ছিলো না। সে উড়ে পড়লো নিচে। তোরাব আলীর বাঁ পায়ের নিচের অংশটা নদীর পাড়ের মাটিতে আঘাত পেলেও তার শরীরের বাকি অংশ ঝপাৎ শব্দে আছড়ে পড়লো জলে।

তোরাব আলীর মুহূর্তের জন্য মনে হয়েছিলো পায়ের পাতাটা বুঝি শরীর থেকে আলাদা হয়ে গেছে। সেই পা নিয়ে প্রায় মাইল দুয়েক সাঁতার কেটে নিরাপদ দূরত্বে পৌঁছে গিয়েছিলো সে। কিন্তু এই এত কিছুর পরও সেই ছোট্ট তোরাব আলী তার কোমরে বাঁধা কুড়ি ভরি ওজনের স্বর্ণের বিছাখানা হাতছাড়া করেনি।

ঘটনার পরে তার বড় চাচা রইদুদ্দিন লস্কর এতটাই খুশি হয়েছিলেন যে এর পরের যেকোনো কাজে তোরাব আলীর উপস্থিতি ছিলো অবশ্যম্ভাবী। সেই থেকে লস্কর চরের ভবিষ্যৎ সর্দার হয়ে ওঠার যাত্রা শুরু তোরাব আলী লস্করের।

তোরাব আলী লস্কর অন্ধকারেই দীর্ঘশ্বাস ফেললেন, এমন কত কত দুঃসাহসিক ঘটনা যে তিনি তার জীবন জুড়েই ঘটিয়েছেন, তার ইয়ত্তা নেই। কিন্তু সেই মানুষটাই বয়স বাড়ার সাথে সাথে এমন নির্জীব, নিরুত্তেজ, দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে গেলেন কী করে!

সারাক্ষণই বরং ফেলে আসা সেই জীবনের নানা কৃতকর্ম, পাপ-পুণ্য নিয়ে বিস্তর চিন্তা-ভাবনা মাথার ভেতর ঘুরপাক খেতে থাকে। অস্থির করে রাখতে থাকে তার বর্তমানকে।

আজ এই অন্ধকারে শুয়ে সেইসব সোনালী সময়ের কথা ভাবতে ভাবতে কেমন নস্টালজিক হয়ে গেলেন তোরাব আলী লস্কর। তার আচমকা মনে হলো, এই বৃদ্ধ বয়সে নিজেকে অন্তত আরো একবার সেই পুরনো দিনের মতোই কোনো এক দুঃসাহসিক অভিজ্ঞতার মুখোমুখি করতে চান তিনি।

পুলিশ কনস্টেবল নুরুন্নবী হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়েছে। তবে তাকে রাখা হয়েছে বিশেষ মানসিক স্বাস্থ্য সেবাকেন্দ্রে। তার আচার-আচরণ অদ্ভুত। সে কারো সাথে কথা বলে না। সারাক্ষণ চুপচাপ জানালার পাশে দাঁড়িয়ে আকাশ দেখে। আর খায় যৎসামান্য। তবে সবচেয়ে ভয়ংকর বিষয় যেটি, সেটি হলো রাতভর সে ঘুমায় না। সারারাত ছাদের দিকে তাকিয়ে শুয়ে থাকে। একটা মানুষ না ঘুমিয়ে একটানা কতক্ষণ থাকতে পারে তা নিয়ে নানান মতভেদ রয়েছে। নুরুন্নবীর বিষয়েও কেউ স্পষ্ট বলতে পারছে না সে আসলে টানা কতক্ষণ না ঘুমিয়ে জেগে থাকে। সে যদি মাঝেমধ্যে একটু আধটু ঘুমিয়েও থাকে, তবে সেটিও কারো পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়। কারণ জোর করেও কোনো নার্সকে তার ঘরে পাঠানো যায় না। ডাক্তাররা অবধি তার ঘরে যেতে সঙ্কোচে ভোগেন।

নুরুন্নবীর চেহারা আক্ষরিক অর্থেই বিভৎস, ভয়ংকর হয়ে গেছে। তার নাকের মাঝখানটা দুই ভাগ হয়ে একভাগ ডান দিকে সরে গেছে। দুটি চোখের একটিকে বাঁচানো গেলেও অন্য চোখের কোটরটা এখনো ফাঁকা। দুটো ঠোঁটই ওপর নিচ লম্বালম্বি কেটে চার ভাগ হয়ে গেছে। সেই চারভাগই সেলাই করে জোড়া লাগানো হয়েছে। কিন্তু তাতে মুখের অবস্থা হয়েছে আরো ভীতিকর। তার মুখের দিকে তাকানো যায় না। দেখে মনে হয় হরর সিনেমা থেকে গা হিম করে দেয়া কোনো চরিত্র হঠাৎ চোখের সামনে চলে এসেছে।

তাকে এই মুহূর্তে জনসম্মুখে বের না করার বিষয়েও স্পষ্ট নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। কিন্তু নুরুন্নবীর চিকিৎসায় যে পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন ছিলো তা বরাদ্দ করা নিয়ে নানরকম গড়িমসিও লক্ষ করা গেছে। যে ঘটনায় নুরন্নবীর এই অভাবনীয়

New Pdf download: www.PoragEducation.com + webtalkbd.com

পরিণতি, সেই ঘটনা নিয়ে সংশ্লিষ্ট সকলেই বিরক্ত। এমনকি উর্ধ্বতন মহলের কাছে সেই বিষয়টি যারপরনাই গুরুত্বহীনও। ফলে উচ্চ চিকিৎসার্থে দেশের বাইরে নিয়ে যাওয়া কিংবা দেশেই আরো দীর্ঘ চিকিৎসার ব্যাপারেও সকল দিক থেকেই প্রবল অনীহা রয়েছে।

তবে এসবের বাইরেও সবচেয়ে অদ্ভুত বিষয় যেটি হলো, তা হচ্ছে নুরুন্নবী তার চেহারা দেখার পর কোনো ধরনের প্রতিক্রিয়া দেখায়নি। দায়িত্বরত ডাক্তার থেকে শুরু করে মনোরোগ বিশেষজ্ঞসহ সকলেই ভেবেছিলেন, প্রথম যখন সে তার চেহারা দেখতে পাবে, তখন সে অস্বাভাবিক আচরণ করবে। কান্না-কাটি থেকে শুরু করে চিৎকার, চেঁচামেচি, সহিংস হয়ে ওঠা এমনকি সে আত্মহত্যার চেষ্টাও করতে পারে। কিন্তু সবাইকে রীতিমতো ভুল প্রমাণ করে নুরুন্নবী কোনো প্রতিক্রিয়াই দেখায়নি। সে তার নিজের মুখখানা আয়নায় দেখার পর নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে ছিলো। তারপর ধীরে সুস্থে বিছানায় গিয়ে কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়েছে।

নুরুন্নবীর সাথে দেখা করতে এসেছিলেন ওসি একরামুল হক এবং সাব ইন্সপেক্টর মইনুল হোসেন। কিন্তু একরামুল হক বিষয়টি নিতে পারেননি। তিনি ঘরে ঢোকামাত্র নুরুন্নবীকে দেখে বিকট চিৎকার করেছেন। তাকে তাৎক্ষণিক সরিয়ে নেয়া হয়েছে। আলাদাভাবে তার সেবা শুশ্রূষারও দরকার হয়েছে। তবে মইনুল হোসেন কিছুটা সময় নুরুন্নবীর সাথে কাটিয়েছেন।

তিনি জিজ্ঞেস করেছেন, 'এখন কেমন আছো নুরুন্নবী?'

নুরুন্নবী জবাব দেয়নি। সে তাকিয়ে ছিলো ছাদের দিকে। তাকে একটা সানগ্লাস পরতে দেয়া হয়েছে। সে সেই সানগ্লাস পরে আছে। মইনুল হোসেন বললেন, 'তোমার পরিবারের কেউ আসছিলো?'

নুরুন্নবী জবাব দেয়নি। মইনুল হোসেন বললেন, 'তুমি কী আমার সাথে কথা বলতে চাও না?'

নুরুন্নবী সেই প্রথম কথা বললো, 'কথা কইতে কষ্ট হয় ছার। ঠোঁটের ঘা এখনো পুরা শুকায় নাই।'

সপ্তাহখানেক পর আবার গিয়েছিলেন মইনুল হোসেন। সেদিন নুরুন্নবীর সাথে তার সামান্য কিছু কথা হয়েছিলো। নুরুন্নবী বলেছে, তার দুই বছরের ছেলেটাকে তার খুব দেখতে ইচ্ছা করছিলো। কিন্তু ডাক্তাররা বলেছে এই অবস্থায় অতটুকু ছেলেকে তার সামনে আনা ঠিক হবে না। বিষয়টি নুরুন্নবী মেনেও নিয়েছে। সন্তান যদি বাবার মুখ দেখে ভয় পায় তবে বাবার জন্য তার চেয়ে কষ্টের আর কিছু হতে পারে না। নুরুন্নবীর বাবা নেই, কিন্তু তার মাকেও এখন অবধি ছেলের সাথে দেখা করতে দেয়া হয়নি। তার মা বৃদ্ধ, অসুস্থ মানুষ। ডাক্তারদের পরামর্শে তাকেও এই মুহূর্তে অনুমতি দেয়া হয়নি। মইনুল হোসেন বললেন. 'তোমার স্ত্রী? সে এসেছিলো?'

নুরুন্নবী হাসার চেষ্টা করলো, 'হ, আইছিলো।'

'কথা হয়েছিলো?'

নুরুন্নবী আবারো হাসার চেষ্টা করলো, 'হ।'

মইনুল হোসেন ইতস্তত করে জিজ্ঞেস করলেন, 'কী কথা?'

নুরুন্নবী জবাব দিলো না।

মইনুল হোসেন বললেন, 'তারপর আর সে আসেনি?'

নুরুন্নবী এবারও জবাব দিলো না।

মইনুল হোসেন এরপর আর কোনো প্রশ্ন করেননি। তবে পুরো পরিস্থিতি নিয়েই তিনি বিশেষভাবে চিন্তিত। নুরুন্নবীর ঘটনায় ব্যক্তিগতভাবে তিনি যারপরনাই কষ্ট অনুভব করছেন এবং একই সাথে শঙ্কিতও বোধ করছেন। এ ছাড়াও নুরুন্নবীর বিষয়ে পুলিশের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত কী হবে তা নিয়েও তিনি যথেষ্টই চিন্তিত।

এই অবস্থায় নুরুন্নবীকে যে তার সাধারণ ডিউটিতে আর বহাল রাখা সম্ভব হবে না, মইনুল হোসেন তা জানেন। কিন্তু সেক্ষেত্রে নুরুন্নবীর বিষয়ে বিকল্প উপায়গুলো কী কী হবে, তাও তিনি ভেবে পাচ্ছেন না।

মইনুল হোসেন প্রচণ্ড অস্থিরতা নিয়ে নবীগঞ্জ ফিরলেন। এই অস্থিরতার নানাবিধ কারণ রয়েছে। এতে ব্যক্তি নুরুন্নবীর জীবন, সংসার, সম্পর্ক, অনুভূতির বিষয় যেমন রয়েছে, তেমনি রয়েছে হঠাৎ করেই যে পরিস্থিতির মুখোমুখি তিনি হয়েছেন তাও।

নবীগঞ্জ থানায় ঘটে যাওয়া সর্বশেষ ঘটনা নিয়ে মইনুল হোসেনকে শো'কজ করা হয়েছিলো। জেলা পুলিশ সুপার সবার সামনে তাকে ভয়াবহ অপমান করেছেন। একটা ষোল-সতেরো বছরের মেয়ে পুরো একটা জেলার পুলিশ ডিপার্টমেন্টর মুখে চুনকালি মাখিয়ে দিয়েছে। এরপরও মইনুল হোসেন মানুষকে মুখ দেখান কী করে, সেটা নিয়েও তিনি প্রশ্ন তুলেছেন।

মইনুল হোসেন অপমানিত হলেও এতে তার একটা লাভও অবশ্য হয়েছে। পুলিশ সুপার সাহেব বিষয়টিকে এবার যথেষ্ট গুরুত্বের সাথেই দেখেছেন। এবং দেশের এই পরিস্থিতিতেও তিনি এই নিয়ে পুলিশের উর্ধ্বতন নানা পক্ষের সাথে জরুরি ভিত্তিতে কথা বলবেন বলেও জানিয়েছেন। এ ছাড়াও মইনুল হোসেনকে বলেছেন যত দ্রুত সম্ভব নবীগঞ্জ থানা ও এর আশেপাশের অঞ্চলে তার কী কী ধরনের সহায়তা দরকার হতে পারে তারও একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা যেন তিনি পাঠান।

মইনুল হোসেন প্রথমেই ভেদরগঞ্জ, নবীগঞ্জ এবং আলীপুরের তিন ব্যবসায়ীর সাথে বসেছেন। এই তিন ব্যবসায়ীর দোকানেই গত কয়েক মাসের মধ্যে ডাকাতি হয়েছে। তবে এই তিনজনের মধ্যে তোরাব আলী লস্করের চিঠি পাওয়ার পর একমাত্র আজাহার খন্দকারই পুলিশকে জানিয়েছিলেন। বাকি দুজন এই বিষয়ে কোন উচ্চবাচ্যতো করেনইনি, বরং চুপিচুপি তোরাব আলীর চাহিদামতো পয়সাপাতিও দিয়ে দিয়েছেন।

New Pdf download: www.PoragEducation.com + webtalkbd.com

এই দুই ব্যবসায়ীর সাথে বসতে গিয়েও একই ব্যাপার লক্ষ্য করলেন মইনুল হোসেন। এই বিষয়ে কোনো ধরনের সহযোগিতা তাদের কাছ থেকে পাওয়া গেলো না। বরং জোহরার কথা ছড়িয়ে পড়ার পর তারা সকলেই যেন আর বেশি ভীত, আরো বেশি খোলসবন্দি হয়ে গেছে।

আলীপুরের আফছারুল হাকিম বড় টিনের ব্যবসায়ী। মইনুল হোসেন তার সাথে দেখা করলেন। তিনি বললেন, 'ইন্সপেক্টর সাব, প্রতিবছর কিছু ট্যাকা-পয়সা দিলে যদি তারা শান্ত থাহে, তাইলে আর অশান্তির মইধ্যে আমরা নাই।'

মইনুল হোসেন বললেন, 'কিন্তু এই দেশে একটা সরকার আছে, আইন কানুন, নিয়ম-শৃঙ্খলা আছে, আপনি সেসব দেখবেন না? এটা কোনো কথা হলো? তাহলে দেশে সরকার আছে কি জন্য?'

আফছারুল হাকিম তার ডান গালের ভেতর একটা দশাসই সাইজের পান গুঁজে দিতে দিতে বললেন, 'এইসব নীতির কথা, কালি-কেতাবের কথা থাউক ছার। অন্য কথা কন। এই যে ব্যবসা করি এত বছর, সরকারি দলের নেতা, চ্যালা-চামুণ্ডাগো কী ট্যাকা-পয়সা না দিয়া, চান্দা না দিয়া ব্যবসা করি? কই তহনতো আপনেগো খুঁইজা পাওন যায় না! তহন আপনেগো কাছে অভিযোগ লইয়া গ্যালে আপনেরা কান চুলকান। কন, একটু মানাই লন হাকিম সাব। কী করবেন, এরা দলের লোক। ক্যান, তোরাব আলী লস্করের কোনো দল নাই দেইখ্যা সে ডাকইত? আর যারা দল করে তারা সব মসজিদের ইমাম সাব? দুই দলের কামতো একই। তোরাব আলীর তাও নীতি আছে, কথা মতো কাম করলে ঝামেলা নাই, আর এরাতো যখন খাই ওঠে তহনই ভাদ্র মাসের কুত্তা হইয়া যায়। কোনো ন্যায়-নীতির বালাই নাই।'

আফছারুল হাকিমের কথা শুনে মইনুল হোসেন হতভম্ব হয়ে গেলেন। সাথে সাথে শঙ্কিতও হয়ে গেলেন। এই যদি হয় এই অঞ্চলের মান্যগণ্য লোকদের ভাবনা, তাহলে প্রশাসনের চেয়ে তোরাব আলী লস্করের ক্ষমতাশালী হয়ে ওঠা সময়ের ব্যাপার মাত্র। মবসাইকোলজি বলে একটা ব্যাপার আছে। তারা সকলেই একইরকম ভাবা শুরু করলে বিপদ। তখন পুলিশের চেয়ে ডাকাতরা বেশি প্রভাবশালী হয়ে উঠবে। তাদের মেনে নেবে সাধারণ জনগণ। এটি দীর্ঘ মেয়াদে খুবই ক্ষতিকর উদাহরণ তৈরি করবে। একইসাথে নেতিবাচক প্রভাবও ফেলবে। অতীতেও বহু জায়গায় এমন উদাহরণ দেখা গেছে যে রাষ্ট্র ক্ষমতার ভেতরেও ক্ষমতার আলাদা বলয় তৈরি করেছে কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা গোষ্ঠী।

তিনি আরো কিছু বিষয় নিয়ে কথা বলার চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু আফছারুল হাকিম তাকে চমকে দিয়ে একটা তথ্য দিলেন। তিনি বললেন, 'তোরাব আলী লস্করের একটা বিষয় আপনে খেয়াল করছেন ছার?'

'কী বিষয়?'

'সে কিন্তু ছোট ব্যবসায়ী, বা গরিব মানুষের কাছ থেইকা কোনো ট্যাকা-পয়সা দাবী করে না। ডাকাতিও করে না। সে ডাকাতি করে, পয়সা দাবি করে বড় ব্যবসায়ী, বড় গৃহস্থগো কাছ থেইকা। কিন্তু এই যে সরকারি দলের মস্তান, নেতা, এরা কী করে? এরাতো সবাইর কাছ থেইকা নেয়। কাউরে মাফ করে না। আপনেরাও তাগো কিছু কন না। তাইলে, যারা ছোট ব্যবসায়ী, গরিব মানুষ, তারা কিন্তু দলের চাইতে বরং তোরাব আলী ডাকাইতের ওপরে বেশি খুশি। বোঝলেন?'

কথাটা খট করে কানে লেগে গেলো মইনুল হোসেনের। তিনি ভেবেছিলেন সকল প্রভাবশালী ব্যবসায়ী, স্থানীয় লোকজন নিয়ে একটা সামগ্রিক প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলার চেষ্টা করবেন। কিন্তু ভেতরে ভেতরেতো ভয়াবহ অবস্থা। শুধু তাই-ই না, তিনি যখন ভেদরগঞ্জ গেলেন। তখন ভেদরগঞ্জের তেল ব্যবসায়ী রইস মোল্লা চুপিচুপি তাকে বললেন, 'শোনেন ইন্সপেক্টর ছার, ব্যবসায় লাভতো করিই। তোরাব আলীরে দেই দুই-চাইর বছরে একবার। আর আপনেগো পুলিশরেইতো দেওন লাগে মাসে মাসে। অন্যগো কথা না হয় বাদ-ই দিলাম!'

তিনি শুধু বলেই যে সন্তুষ্ট থাকলেন তা-ই না। বরং প্রকাশ্যেই একটা কাগজের প্যাকেটে করে কিছু টাকা তার পকেটে গুঁজে দেয়ার চেষ্টা করলেন। বললেন, 'লাগলে আওয়াজতো দেবেন ছার। সরাসরি বললেও কিছু মনে করবো না। আমাগো অভ্যাস আছে। এতসব কেচ্ছা কাহিনিতো শোনান লাগতো না।'

মইনুল হোসেন রেগে অগ্নিশর্মা হয়ে গেলেও এই বাস্তবতা তিনি অস্বীকারও করতে পারলেন না। একদম শুরুতে বিষয়টা যতটা সহজ তিনি ভেবেছিলেন, দিন যত যাচ্ছে, ক্রমশই তা কঠিন থেকে কঠিনতর হচ্ছে।

তবে মইনুল হোসেন কিছুটা হলেও আশার আলো দেখলেন আজাহার খন্দকারের কাছে এসে। আজাহার খন্দকার ঘর থেকে আর আজকাল বের হন না। অনেকটাই ম্রিয়মান হয়ে পড়েছেন তিনি। তবে একমাত্র তিনিই বললেন, 'কতদিন আর এই আতঙ্ক চলতে থাকবো? আমার পাটের আড়ত, আমার সারা জীবনের সঞ্চয়। এইটার ক্ষতিপূরণ কে দেবে?'

মইনুল হোসেন সান্ত্বনার সুরে বললেন, 'এটাতো চলতে দেয়া যায় না, কিন্তু আপনারা যদি সহযোগিতা না করে এভাবে ভেঙে পড়েন, তাহলে কী করে হবে? এর আগেরবার আপনার সাহসী ভূমিকার কারণেইতো আমরা অতবড় একটা দলকে রুখে দিতে পেরেছিলাম। দুজনকে ধরতেও পেরেছিলাম।' তিনি খানিক লজ্জিত ভঙ্গিতে বললেন, 'পরের ঘটনাটা দুর্ভাগ্যজনক, কিন্তু এইভাবে পরপর কয়েক জায়গায় যদি আমরা প্রতিরোধ করতে পারতাম, তাহলেই দেখতেন ওদের শক্তি কমে যেতো। তখন ওদের পুরোপুরি শেষ করে দেয়াটা সময়ের ব্যাপার ছিলো মাত্র।'

আজাহার খন্দকার বললেন, 'ওইডা করতে গিয়াইতো সর্বনাশটা হইলো আমার। তার চাইতে আমিও যদি অন্যগো মতোন চুপচাপ ট্যাকা-পয়সা দিয়া

New Pdf download: www.PoragEducation.com + webtalkbd.com

দিতাম, তাহলে আমার আইজকের এই দশা হইতো না। লক্ষ লক্ষ ট্যাকার মাল আমার। আমি এক রাইতের মইধ্যে পথের ভিখারি।'

মইনুল হোসেন যেন আজাহার খন্দকারকে উজ্জীবিত করার চেষ্টা করলেন। তিনি বললেন, 'খন্দকার সাব, একটা কথাতো মানেন, সে আপনার ওপর প্রতিশোধ নিতে এই কাজ করছে। তো ক্ষতি আপনার যা হবার তাতো হয়েই গেছে। এখন আপনি চুপচাপ এই ক্ষতি মেনে নেবেন? আপনার কিছুই করার নাই?'

'কী করবো আমি?' আজাহার খন্দকার নিরুপায় কণ্ঠে বললেন।

মইনুল হোসেন বললেন, 'আপনি চিঠিখানা পড়েছেন?'

'হু, পড়ছি।'

'পড়ে আপনার কী মনে হয়েছে?'

'কী মনে হইবো? কিছুই মনে হয় নাই।'

'কথা সত্য না। আপনি ওই এক লাইনের চিঠি পড়ে নিশ্চয়ই বুঝছেন, সে সুযোগ পেলে আপনার কাছে আবার আসবে। বোঝেননি?'

আজাহার খন্দকার জবাব দিলেন না। মইনুল হোসেন বললেন, 'এইজন্যই আপনার সতর্ক থাকতে হবে। বা খুব সতর্কভাবে কোন টোপ ফেলতে হবে আমাদের। যাতে করে আমরাও একটা সুযোগটা নিতে পারি।'

'কী করবো আমরা?'

'এখনো জানি না কী করবো! তবে কিছু একটাতো করতেই হবে। কিন্তু খন্দকার সাহেব, আপনের সহযোগিতা আমার চাই-ই চাই।'

সেদিন আর কথা আগালো না। তবে মইনুল হোসেন মনে মনে নানান হিসেব করার চেষ্টা করছেন। কীভাবে তোরাব আরী লস্কর বা জোহরাকে আরো খেপিয়ে তোলা যায়। জোহরা সম্পর্কে সে যতটুকু ধারণা করেছে, তাতে মেয়েটিকে তার দুঃসাহসী, খেয়ালি ও জেদি মনে হয়েছে। মেয়েটি নিঃসন্দেহে বুদ্ধিমতীও। তবে একইসাথে মইনুল হোসেনের এটিও মনে হয়েছে, অল্প বয়সের কারণে তার এই অতিরিক্ত সাহস এবং জেদ তাকে ভুল করতে বাধ্য করবে। আর এমন একটা ভুলই তার দরকার। আর সেই ভুলের জন্য তিনি অপেক্ষা করবেন।

এবং সেই অপেক্ষায় তার তূণেও একখানা মোক্ষম তীর রয়েছে। সেই তীরখানা হলো পুলিশ কনস্টেবল নুরুন্নবী। এই পৃথিবীতে যদি কোনো একজনমাত্র মানুষ জোহরাকে ঘৃণা করে, দেখামাত্র নৃশংসতম উপায়ে তাকে আঘাত করতে চায়, তার জন্য জীবনে যেকোনো ঝুঁকি নিতে চায়, তবে সেই মানুষটা হলো নুরুন্নবী। এবং নুরুন্নবীর ওই নির্লিপ্ত, বিভিৎস চেহারায় তিনি যা দেখেছেন, তা আর কেউ দেখতে পায়নি। সে জোহরার জন্য সাক্ষাৎ এক বিষাক্ত সাপে পরিণত হয়েছে। তার বিষের থলি এখন পরিপূর্ণ। যতক্ষণ অবধি ছোবলে ছোবলে ওই বিষ সে জোহরার ওপর উগড়ে দিতে না পারবে, ততক্ষণ অবধি তার শান্তি নেই। এখন পুরো বিষয়টিকে কেবল মোক্ষম একটি পরিকল্পনায় গুছিয়ে আনতে হবে মইনুল হোসেনকে। তারপর যেকোনো উপায়ে খেপিয়ে তুলে একটা ভুল করাতে হবে জোহরাকে!

খুব ছোট করে হলেও আগের আড়তের জায়গাটিতেই একখানা দোচালা ঘর তুলে ফেললো মনসুর। ভেতরে দু খানা কক্ষ। সামনের কক্ষের দেয়াল জুড়ে তাক। তাকের বেশির ভাগ জায়গা ফাঁকা থাকলেও অল্প কিছু ওষুধপত্রও রয়েছে। পেছনের কক্ষে রোগী দেখার ব্যবস্থা। দোকানের সামনে ছোট একটা সাইনবোর্ডও আছে। লেখা, খন্দকার ফার্মেসি।

মনসুরের এমবিবিএস শেষ হয়নি। পুরোপুরি পাশ করা ডাক্তারও সে নয়। তবে গ্রাম-গঞ্জে এমন অসংখ্য ডিসপেন্সারি রয়েছে, যেখানে ওষুধের দোকানিরাই বছরের পর বছর ধরে ডাক্তারের কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। তাদের তুলনায় মনসুর বরং ঢের বেশি দক্ষ ও যোগ্য। অল্প ক'দিনেই কিছু রোগীও তার জুটেছে। কিন্তু বুকের ভেতর সারাক্ষণ একটা খচখচানি টের পায় মনসুর। এখনো যেন চোখ বন্ধ করলেই মেডিকেল কলেজের দেয়াল, সাদা অ্যাপ্রোনের স্পর্শ, রোগীদের কান্না আর ফিনাইলের গন্ধ টের পায় সে। কে ভেবেছিলো, এই এত এতদিনের এত এত স্বপ্ন, সবকিছু এখানে এসে এভাবে থমকে যাবে!

একটা থমথমে বুকভার কষ্ট নিয়ে রোজকার দিন কাটে তার। কণা বোঝে। কিন্তু বুঝলেও কী করবে সে! অদ্ভুত এক অসহায়ত্ব নিয়ে মনসুরের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। জীবন কী আশ্চর্যরকম অনিশ্চিত, অনির্দেশ্য। আর মানুষ সেখানে কী ভীষণ অসহায়! এখানে নাটকের লিখে রাখা পাণ্ডুলিপিও মঞ্চস্থ হওয়ার ঠিক আগ মুহূর্তে হুট করে বদলে যায়। হয়ে যায় অচেনা অন্য কোনো গল্প। সেই গল্পে মানিয়ে নিতে হয় কুশীলবদের। মনসুরও চেষ্টা করছে। চেষ্টা করছে কণা কিংবা আজাহার উদ্দিনও। কিন্তু সেই মানিয়ে নেয়া বড় কষ্টের। মেঘের মতো থমথমে বুক

New Pdf download: www.PoragEducation.com + webtalkbd.com

নিয়ে হেসে যেতে হয়। ভেসে যেতে হয় জীবনের অমোঘ স্রোতে। সেই স্রোত কোথায় গিয়ে থামবে কেউ জানে না। জানে না মনসুর বা কণাও।

সেদিন রাতে দোকানের ঝাঁপ বন্ধ করছিলো মনসুর। মতি মিয়া দিন দুয়েকের জন্য ছুটি নিয়েছে। এই দুদিন তাই নিজেকেই সব সামলাতে হয় মনসুরের। দোকানের আলোটা নিভিয়ে বাইরে তালা লাগাতে এসে দেখে অন্ধকারে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। দুদিকের ঝাঁপ বন্ধ করতে অনেকগুলো তালা লাগাতে হয়। একা একা অন্ধকারে প্রায় হাঁপিয়ে উঠছিলো সে। এই সময়ে কেউ একজন হারিকেন নিয়ে এগিয়ে এলো। মনসুর তাকিয়ে দেখে, কণা!

কণা এতরাতে এখানে কী করছে? সে ভারি অবাক হলো। কণা বললো, 'আপনাকে এগিয়ে নিতে এলাম।'

মনসুর মনে মনে ভীষণ খুশি হলেও বাইরে তা প্রকাশ করলো না। সে তালাগুলো আটকে দিতে দিতে বললো, 'এতরাতে তুমি এলে কী করে?'

কণা হাসলো, 'একা আসিনিতো! মঞ্জুকে সাথে করে নিয়ে এসেছি।'

'মঞ্জু!' মনসুর খানিক অবাক হলো। সে কোথাও যেতে চায় না সহসা।

'হ্যাঁ, ওই যে দেখেন ওখানে দাঁড়িয়ে আছে।'

মনসুর তাকালো। হারিকেনের আবছা আলোয় মঞ্জুকে দেখা যাচ্ছে। মনসুর বললো, 'আমি একা যেতে পারবো না ভাবছিলে?'

'উহু। আমার একা ভালো লাগছিলো না!'

'একা কই? বাবা আছেন, মঞ্জু আছে।'

'আপনিতো নেই।'

মনসুর হাসলো, 'পাগল!'

কণা বললো, 'আপনি সারাক্ষণ এমন মুখ ভার করে থাকেন আমার ভালো লাগে না।'

'কই মুখ ভার করে থাকি? এই যে, এখনই হাসলাম?'

কণা বললো, 'আকাশে মেঘ থাকলেও কিন্তু রোদ ওঠে।'

মনসুর কণার হাত থেকে হারিকেনটা নিতে নিতে বললো, 'বাহ! ভালোইতো কথা শিখেছো!'

কণা বললো, 'সংসার করছি কার সাথে, সেটাতো দেখতে হবে।'

'সংসার করছো তাহলে?'

'নয়তো কী?'

'মা কী বলতো জানো?'

'কী?'

'সংসার আসলে সঙসার। সঙ মানেতো জানোই? পাগল। যেখানে পাগলের বসবাস, সেটাই সঙসার।'

'হুম। আর আমার মা সারাক্ষণ কী বলতো জানেন?'

'কী?'

'আমার মা বলতেন, হাজারটা তালি দিলে হয় গৃহস্থালী।'

মনসুর এবার শব্দ করেই হাসলো, 'মন্দ বলেননি কিন্তু। এখনতো বুঝতেই পারছো, ঘটনা আসলেই তাই। তারা অভিজ্ঞতা থেকে বলেছেন।'

মনসুর আর কণা হাঁটছে। তাদের থেকে অনেকটা দূরত্ব রেখে সামনে মঞ্জু। মনসুর বললো, 'মঞ্জুর পড়াশোনার কী অবস্থা?'

'এইতো চলছে। কেউ খোঁজখবর না নিলে যা হয় আর কী! আর তা ছাড়া, ও তো কারো সাথে কোনকিছু নিয়ে কথাই বলে না।'

'হুম। এটাইতো সমস্যা। অবশ্য ওর সময়ে আমিও অমনই ছিলাম।'

কণা বললো, 'আপনাকে একটা কথা বলতে চাই।'

'কী কথা?'

'এখানে না, বাড়ি গিয়ে বলবো।'

'তাহলে বাড়ি গিয়ে বললেই হতো, বলতে যে হবে সেটুকু এখানে কেন বললে!'

'হতো। তবে অস্থির লাগছিলো খুব।'

'তাহলে এখন বলছো না যে!'

'এখন এখানে এভাবে বলতে ইচ্ছে হচ্ছে না।'

'অথচ সেটা বলতেই এই এত রাতে এখানে চলে এলে, তাই না?'

'আপনাকে দেখার জন্য খুব অস্থির লাগছিলো।'

'কেন?'

'তাতো জানি না। তবে লাগছিলো। আর...।'

'আর কী?'

কণা কেমন লজ্জা পেয়ে গেলো। সে খানিক আরক্ত ভঙ্গিতে বললো, 'আমার লজ্জা করছে বলতে।'

মনসুর আচমকা থমকে দাঁড়ালো। তারপর হারিকেনটা উঁচু করে কণার মুখের কাছে ধরলো। কণা বললো, 'কী করছেন?'

'তোমাকে দেখছি।'

'আমাকে এভাবে দেখার কী হলো?'

'দেখবো না বলছো?'

কণার কী যে হলো, সে দুহাতে মুখ ঢাকলো। তারা ততক্ষণে বাড়ির কাছে পৌঁছে গেছে। মঞ্জু ঢুকে গেছে তার ঘরে। আশেপাশে কেউ নেই। চারপাশে সুনসান নীরবতা। সেই নীরবতায় মনসুর আচমকা হারিকেনটা নিভিয়ে দিলো। তারপর দুহাতে কোলে তুলে নিলো কণাকে। কণা অস্ফুটে বললো, 'আমি পড়ে যাবো তো!'

মনসুর বললো, 'পিতার হাত থেকে সন্তান কখনো পড়ে না। সে যতই ভারী হোক।'

কণা ঠোঁট উল্টে বললো, 'আর স্বামীর হাত থেকে স্ত্রী?'

মনসুর বললো, 'তোমার মতো বউ হলে সে সম্ভাবনাও নেই।'

'কেমন বউ আমি?'

New Pdf download: www.PoragEducation.com + webtalkbd.com

মনসুর এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারলো না। তবে সেই সারাটা রাত তারা জেগে রইলো। জানালার বাইরে নিঃসঙ্গ রাত। কুয়াশার চাদরে ঢাকা অন্ধকার। টিনের চালে টুপটাপ ঝরে পড়ছে শিশির। সুদূর কোথাও থেকে ভেসে আসছে সকরুণ কোনো বাঁশির সুর। একটা মন কেমন করা স্পর্শ কাঁপিয়ে দিচ্ছে বুকের গহিন। কণা মনসুরের বুকের কাছে গুটিশুটি মেরে শুয়ে আছে। সে ফিসফিস করে বললো, 'আমার কেমন লাগছে!'

'কেমন?'

'বোঝাতে পারবো না! আমার বিশ্বাস হচ্ছে না।'

'কী বিশ্বাস হচ্ছে না?'

'আমি সত্যি সত্যি মা হয়ে যাচ্ছি, আর আপনি বাবা!'

মনসুর কণাকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরলো, 'কিন্তু আমার টেনশন হচ্ছে।'

'কিসের টেনশন?'

'অনেক টেনশন। সব তোমাকে বলতে পারবো না। একটা শুধু বলি?'

'হুম।'

'এই মুহূর্তে তোমার এখানে থাকাটা ঠিক হচ্ছে না। অন্তত কিছুদিনের জন্য হলেও একবার গোবিন্দপুর ঘুরে আসা উচিত।'

'আমিও তাই ভাবছিলাম। কিন্তু আপনাকে আর বাবাকে এভাবে এখানে রেখে আমি যাই কী করে?'

মনসুর বললো, 'কিন্তু বিষয়টা কেমন হয়ে গেলো না? তুমি সেই বিয়ের পরদিনই ওভাবে চলে এলে, তারপর এখন পর্যন্ত আর একবারও যেতে পারলে না! তোমার বাবা-মায়ের কথাটাওতো আমাদের ভাবা উচিত, তাই না?'

কণা খানিক চুপ করে থেকে বললো, 'আমার খুব কষ্ট হয় জানেন?'

মনসুর বললো, 'জানি। শুধু যে জানি, তাও না। এটাও বুঝি যে আমাদের সবার কথা ভেবেই তুমি নিজ থেকে আর গোবিন্দপুর যাওয়ার কথা বলোও না!'

কণা কথা বললো না। মনসুর বললো, 'আচ্ছা, একটা কাজ করলে কেমন হয়?'

'কী কাজ?'

'আপাতত গিয়ে যদি তুমি সপ্তাহখানেকের জন্য থেকে আসো।'

কণা ম্লান গলায় বললো, 'এত কম?'

মনসুর বললো, 'শেষের দিকটাতেতো পুরোটা সময় তোমাকে ওখানেই থাকতে হবে। একটানা প্রায় পাঁচ-ছ মাস।'

'অত লম্বা সময় কেন?'

মনসুর হাসলো, 'কেন আবার? প্রথম বাচ্চা হওয়ার সময় সব মেয়েদেরই বাবার বাড়ি থাকতে হয়।' একটু থেমে সে আবার বললো, 'এইজন্যই বলছিলাম, এখন না হয় গিয়ে অল্প কিছুদিন থেকে এসো। তারপর এখানে এসে আবার কিছুদিন থেকে তারপর লম্বা সময়ের জন্য যেও। আর বাবা-মাও তাহলে বিষয়টা বুঝবেন। মন খারাপ করবেন না অতো!'

কথাটা কণার মনে ধরলো। সে বললো, 'আর কী কী নিয়ে টেনশন আপনার?'

মনসুর এই প্রশ্নের জবাব দিলো না। দীর্ঘসময় চুপ করে রইলো। কণা বললো, 'বলেন আমাকে, আপনি এমন করে থাকলে আমার অস্থির লাগে।'

মনসুর বললো, 'সবকিছু খুব দ্রুত হয়ে গেলো তাই না?'

'কী কী?'

'সবকিছুই। এই যে আমাদের জীবনটাই দেখো, কেমন হুট করেই বদলে গেলো। সেই সেদিনের তুমি, প্রজাপতির মতো রঙিন ডানা মেলে কলেজে যাচ্ছো, কত কত স্বপ্ন। আর আমি? কত কিছু করবো! বড় ডাক্তার হবো, ছাত্ররাজনীতি করবো। দেশ বদলে দেবো। আর আজ?'

কণা খানিক থমকে গেলো যেন। মনসুর বললো, 'আমার নিজের জন্য যতটা না মন খারাপ হয়, তার চেয়েও বেশি মন খারাপ হয় তোমার জন্য।'

'আমার জন্য কেন?'

'এই যে তোমায় নিয়ে তোমার বাবার স্বপ্নগুলো আমি ভেঙে দিলাম।'

'ভেঙে কই দিলেন?'

'হ্যাঁ দিলাম। দিন কয়েক আগেও আমার বিশ্বাস ছিলো, যে করেই হোক, তোমাকে নিয়ে ওনার স্বপ্নগুলো আমি পূরণ করবোই। কিন্তু দেখো, সব কেমন নেই হয়ে গেলো!'

কণা বললো, 'যে আসছে, সেও তো স্বপ্নই, বরং আরো বড় স্বপ্ন, তাই না?'

মনসুর কথা বললো না। কণা বললো, 'আপনি খুশি হননি, তাই না?'

মনসুর বললো, 'এই জীবনে এত খুশি আমি আর কখনো হয়েছি কিনা জানি না! কিন্তু তোমাকে বোঝাতে পারছি না, আমার মনে হচ্ছে, স্বার্থপরের মতো আমি অসংখ্য আনন্দ, অসংখ্য স্বপ্ন ভেঙে দিচ্ছি। এই জন্য অপরাধী লাগছে।'

কণা বললো, 'একদম না। বরং একটা অনেক বড় স্বপ্নের জন্য আমরা ছোটখাটো অনেকগুলো স্বপ্নকে বাকসোবন্দি করছি।'

'হয়তো। তবে কী জানো?'

'কী?'

'জীবন শেষ পর্যন্ত ওই আক্ষেপেরই নাম। যেমনই হোক, আমাদের আক্ষেপ থেকেই যায়।'

এই কথায় কণার বুকের ভেতর থেকেও যেন চোরা এক দীর্ঘশ্বাস বের হয়ে এলো। দীর্ঘসময় কথা বললো না দুজনের কেউই। তারপর কণাই বললো, 'আমি গেলে আপনাকেওতো অতগুলো দিন আমার সাথে গিয়ে গোবিন্দপুর থাকতে হবে।'

'হুম, তাতো হবেই।'

'তাহলে? এই যে নতুন ডিসপেন্সারিটা দিলেন, কোনোকিছুইতো এখনো ঠিকঠাক গোছানো হয়নি। এখনো কতকাজ বাকি। তারওপর এখনই যদি আবার এতগুলো দিন বন্ধ রাখেন, তাহলে?'

কথাটা মনসুরও ভাবছিলো। কিন্তু এ ছাড়া আর উপায় কী? সে বললো, 'এক কাজ করলে কেমন হয়?'

'কী?'

'মঞ্জু তোমাকে গোবিন্দপুর নিয়ে গেলো?'

New Pdf download: www.PoragEducation.com + webtalkbd.com

কণা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললো, 'কিন্তু বিয়ের পর প্রথম যাচ্ছি। সাথে আপনি না গেলে লোকজন কী বলবে? আর বাবা মাও খুব কষ্ট পাবেন।'

কণার কথা মিথ্যে নয়। এমনিতেই কণার বিয়ে নিয়ে পাড়া-প্রতিবেশীর নানান কথা। এরমধ্যে এতদিন পর যখন সে একা একা বাপের বাড়ি যাবে, তখন পাঁচজন পাঁচ কথা ছড়াবে। মনসুর তা চায় না। সে খানিক ভেবে বললো, 'একটা কাজ করলে কেমন হয়, ধরো তুমি মঞ্জুকে নিয়ে চলে গেলে। তারপর দুই তিন দিন বাদে সপ্তাহের মাঝখানে যেই লঞ্চটা আজকাল যাচ্ছে, ওটাতে আমি গেলাম। তারপর দিনকয়েক থেকে তোমায় নিয়ে আবার চলে এলাম। তাহলে তোমারও কয়েকটা দিন বেশি থাকা হলো, আর আমারও খুব বেশি সময় নষ্ট হলো না!'

কথাটা কণার মনে ধরলো। মনসুর বললো, 'তাহলে এটাই প্ল্যান। মঞ্জু তোমাকে নিয়ে যাবে। আর আমি গিয়ে নিয়ে আসবো।'

কণা বললো, 'আচ্ছা।'

পরদিন আজাহার খন্দকারকে খবরটা দিলো মনসুর। খবর শুনে যেন পাগল হয়ে গেলেন আজাহার খন্দকার। তিনি কী করবেন, না করবেন কিছুই ভেবে পেলেন না। তবে এতদিনকার অসুস্থ মানুষটা মুহূর্তেই যেন সুস্থ হয়ে উঠলেন। শুধু যে সুস্থই হয়ে উঠলেন তা-ও না, বহুদিন পর তিনি ঘর থেকেও বের হলেন। হন হন করে হেঁটে বাজারে চলে গেলেন। গিয়ে তার আড়তের জায়গাটাতে দাঁড়ালেন। সেখানে মনসুরের ডিসপেনসারির দোকান থেকে বাজখাঁই গলায় বললেন, 'এই টঙের ঘর উঠাইছস ক্যান তুই? আমার নাতি নবীগঞ্জ বাজারে আইসা দেখবো, তার দাদার এই টঙের ঘর? তা হইবো না। এইখানে আবার আড়ত হইবো। আগের চাইতেও বড় আড়ত হইবো। সেই আড়তে তার জন্য শিমুল তুলার গদি থাকবো। সে আইসা তার দাদার আড়তের গদিতে বইসা চা খাইবো।'

মনসুর বাবার পাগলামিতে কান দিলো না। তবে আজাহার খন্দকার থেমে থাকলেন না। তার পাগলামি চলতেই থাকলো। তিনি সেই দিনই এক বিঘা জমি বিক্রি করে দিলেন। জমি বিক্রির টাকায় পরের জুম্মাবার খন্দকার বাড়ি জামে মসজিদে বড় করে মিলাদ পড়ালেন। মিলাদে দুটো গরু জবাই করা হলো। দাওয়াত করা হলো আশেপাশের কয়েক গ্রামের লোকজন। তারা মিলাদ শেষে পেট পুড়ে খাওয়া-দাওয়া করলো।

আজাহার খন্দকার তার ঘরের দাওয়ায় উঁচু গদি আটা চেয়ারে বসে মানুষজনের খাওয়া দেখতে লাগলেন। তার চোখ-মুখ আনন্দে ঝলমল করছে। খন্দকার বাড়ির আজাহার খন্দকারের নাতি হবে, আর এই খবর দশ গ্রামের মানুষ জানবে না, তা কী করে হয়! বরং এই খবর খালি মুখে জানলে হবে না। জানতে হবে ভরা মুখে। গরুর মাংস দিয়ে পেটপুড়ে ভাত খাওয়ার পর সবার হাতে একখানা করে কালোজাম আর রসগোল্লা ধরিয়ে দেয়া হলো। তারা গরুর ঝাল মাংসে উদরপূর্তি করার পর মিষ্টি মুখে বাড়ি ফিরলো। বহুদিন পর আজাহার খন্দকারকে আবার আজাহার খন্দকার বলে মনে হলো। খন্দকার বাড়িকে মনে হলো পুরনো সেই খন্দকার বাড়ি।

ভয়াবহ দুঃস্বপ্ন দেখে ঘুম ভেঙে গেছে হানিফের। এখন রাত কটা সে জানে না। তার ঘরের জানালা খোলা। খোলা জানালা দিয়ে হু-হু করে শীতল হাওয়া ঢুকছে ঘরে। কিন্তু সেই শীতল হাওয়াতেও দরদর করে ঘামছে সে। হানিফ উঠে দাঁড়ালো। খানিক পায়চারি করলো ঘরের মধ্যে। তারপর দরজা খুলে বেরিয়ে এলো বাইরে। নিঃশব্দ রাতের আকাশ ভর্তি অজস্র তারা। হানিফ দীর্ঘ সময় সেই আকাশ ভর্তি তারার দিকে তাকিয়ে রইলো। কী বিশাল, কী নিঃসীম আকাশ! আকাশের বুকজুড়ে অসখ্য তারা, অথচ তারপরও সেই আকাশটাকে কেমন নিঃসঙ্গ আর দুঃখী মনে হয়।

হানিফের হঠাৎ খুব কান্না পেতে লাগলো। সে মোটেই এমন মানুষ নয়। মানুষ হিসেবে হানিফ শক্ত ধরনের। কোমল কোনো অনুভূতি সহসা তাকে ছুঁয়ে যায় না। হাসতে হাসতে মানুষ খুন করতে পারে সে। এই বয়সেও এমন একাধিক অভিজ্ঞতা তার হয়েছে। মৃত্যুমুখে দাঁড়িয়ে প্রাণভিক্ষা চাওয়া মানুষের সকরুণ কান্নাও তার বুকে এতটুকু আঁচড় কাটে না। আঁচড় কাটে না তার স্বজনদের আহাজারিও। নিজের প্রয়োজনে অবলীলায় যে কারো জীবন ও সম্পদ ছিনিয়ে নিতে পারে হানিফ। এ নিয়ে বিন্দুমাত্র অনুশোচনাও তার হয় না। বরং এক ধরনের বিকৃত আনন্দ পায় সে।

সেই হানিফ আজ এই নিঃসীম তারা ভরা রাতের আকাশের নিচে দাঁড়িয়ে কাঁদছে! তাও আবার দুঃস্বপ্ন দেখে! কী এমন দুঃস্বপ্ন দেখেছে সে?

ক্লান্ত হানিফ ঘুমিয়ে পড়েছিলো সন্ধ্যায়। গভীর ঘুম। সেই ঘুমের মধ্যেই আচমকা তার মনে হলো সকাল হয়ে গেছে। তবে ভোরের আলো তখনো

New Pdf download: www.PoragEducation.com + webtalkbd.com

পরিপূর্ণভাবে প্রকাশিত হয়নি। ঘুম ভাঙা হানিফের মনে হলো, কেউ একজন দরজার বাইরে থেকে তাকে ডাকছে। সে দরজা খুলে দেখে বাহাদুর দাঁড়িয়ে। বাহাদুরের সাথে হামিদুল আর জব্বার। হানিফ আড়মোড়া ভাঙতে ভাঙতে বললো, 'এত বেয়ানবেলা কী? এহনোতো রইদই ওঠে নাই!'

বাহাদুর বললো, 'রইদ আর উঠতো নারে হানিফ।'

হানিফ বললো, 'ক্যান? রইদ উঠতো না ক্যান? আইজ বৃষ্টি হইবো নি?'

বাহাদুর বললো, 'বৃষ্টি না, আইজ ঝড়। ঝড় হইতাছে।'

'ঝড়!' হানিফ অবাক ভঙ্গিতে চারপাশে তাকালো। কই, কোথাও কোনো ঝড়ের আভাস পর্যন্ত নেই! সে হাই তুলতে তুলতে বললো, 'কী কন বাহাদুর ভাই?'

বাহাদুর জব্বারের দিকে তাকালো, 'ওই জব্বার, যা, ঝড় দেহাইয়া আন।'

হানিফের হাত ধরে টেনে নিয়ে গেলো জব্বার। জব্বার বৃদ্ধ জালালুদ্দিনের নাতি। সে হানিফের সমবয়সী। হানিফ বললো, 'আমারে কই লইয়া যাস জব্বার?'

জব্বার জবাব দিলো না। সে হানিফকে নিয়ে গেলো চরের পশ্চিম দিকে বিলের কাছে। সেখানে বিলের ভেতরে পানির ওপরে বাঁশের মাচার মতো একখানা টংঘর তোলা হয়েছে। হানিফ অবাক গলায় বললো, 'এই ঘর কইরতন আইছে?'

জব্বার বললো, 'এই ঘর তোর দাদাজানে বানাইছে।'

'দাদাজান?'

'হ।'

'কার লাইগ্যা?'

'জোহরার লাইগ্যা।'

'জোহরার লাইগ্যা!' হানিফ ভীষণ অবাক হলো, 'জোহরার লাইগ্যা এই ঘর ক্যান?'

'জোহরার বাচ্চা হইবো। কিন্তু সেই বাচ্চার বাপ নাই। এইজন্য জোহরারে এইহানে পাঠাই দিছে। এইটা তার শাস্তি!'

হানিফরে মনে হলো তার মাথার ওপরের আকাশটা আর স্থির নেই। বন-বন করে ঘুরছে। সে আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে না। যেকোনো মুহূর্তে লুটিয়ে পড়বে মাটিতে। জব্বার শক্ত করে হানিফকে জড়িয়ে ধরলো। হানিফের মনে হলো, সে চোখে দেখতে পাচ্ছে না। সবকিছু ক্রমশই ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে। সেই ঝাপসা চোখে সে দেখলো, কেউ একজন ছোট্ট একটা ডিঙি নৌকা বেয়ে টং ঘরটার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। সে টংঘরের কাছাকাছি যেতেই ঘরের ভেতর থেকে জানালাটা খুলে গেলো। লোকটা সেই জানালা দিয়ে হাত বাড়াতেই জোহরাকে দেখা গেলো। সে জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে লোকটার সাথে কথা বলছে। হানিফ অবাক হয়ে দেখলো, জোহরার পরনে বিয়ের শাড়ি। তাকে দেখতে লাগছে পরীর মতো সুন্দর। এত সুন্দর করে সেজেছে সে! হানিফের বুকের ভেতরটা হঠাৎ মোচড় দিয়ে উঠলো। সে জব্বারকে বললো, 'জোহরার পেটে নাকি বাচ্চা? তারে দেইখ্যাতো তেমন মনে হইতেছে না!'

জব্বার হা হা হা করে হাসলো, 'মিছা কথা কইছি। তোরে ডর দেহাইতে মিছা কথা কইছি।'

হানিফের গলা শুকিয়ে গেছে। সে কোনোমতে ঢোক গিলে বললো, 'কিন্তু ওই লোকটা কে? কার লগে বিয়া হইতেছে জোহরার?'

জব্বার তখনো হাসছে। তার হাসির শব্দে মাথা ধরে যাচ্ছে হানিফের। সে ব্যাকুল গলায় বললো, 'কেডা ওই লোকটা? কস না ক্যান জব্বার? জোহরার কার লগে বিয়া হইতেছে?'

জব্বার এবার থামলো। তারপর হানিফের মাথায় আলতো চাটি মেরে সে বললো, 'গাঁধা জানি কোনহানকার। নিজেরেই নিজে চেনোস না তুই!'

জব্বারের কথার কিছুই বুঝলো না হানিফ। সে বিভ্রান্ত চোখে তাকিয়ে রইলো। জব্বার বললো, 'ওইটাতো তুই-ই। তোর লগেই জোহরার বিয়া হইতেছে!'

জব্বারের কথার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝলো না হানিফ। তার সাথে জোহরার বিয়ে হলে ওই লোকটা কে? যা সাথে অমন হেসে হেসে কথা বলছে জোহরা! আর ওই লোকটাই যদি সে হয়, তাহলে এখানে জব্বারের সাথে যে দাঁড়িয়ে আছে সে কে! হানিফের মাথায় কিছুই ঢুকছে না। সে দেখলো জানালার বাইরে দাঁড়ানো লোকটা হাত বাড়িয়ে জোহরার গাল ছুঁয়ে দিচ্ছে। জোহরা সেই হাত তার গালের সাথে চেপে ধরে কী সুন্দর করেই না হাসছে! দৃশ্যটা দেখে হানিফের চোখে পানি চলে এলো। তার একবার মনে হলো, ওই লোকটা সে নিজে! আবার পরক্ষণেই মনে হলো, ওই লোকটাকে সে চেনে না। জোহরার বিয়ে হয়ে যাচ্ছে অন্য কারো সাথে। সে চিৎকার করে জোহরাকে ডাকতে লাগলো। কিন্তু জোহরার কান পর্যন্ত সেই চিৎকারের শব্দ পৌঁছাচ্ছে না। কিংবা হানিফের গলা দিয়ে কোনো শব্দই বের হচ্ছে না। হানিফের সারা শরীর ঘামে ভিজে যাচ্ছে। তার আচমকা ঘুম ভেঙে গেলো। ঘুম ভেঙে দেখে ঘামে তার বিছানা ভিজে গেছে। সে ঘুম থেকে উঠে বাইরে চলে এসেছে। কিন্তু তার বুকের ব্যথাটা যেন এখনো সেই আগের মতোই লেগে আছে। প্রচণ্ড এক কষ্টে সে শ্বাস নিতে পারছে না। গলার কাছে দলা পাকিয়ে আছে তীব্র তেষ্টা, সুতীব্র কষ্ট!

তার খুব কান্না পাচ্ছে। এই জীবনে এমন কখনো হয়নি তার। সে হঠাৎ হাউমাউ করে কাঁদতে লাগলো। সেই গভীর রাতের ঘুটঘুটে অন্ধকারে হানিফ নামের নৃশংস এক খুনি, এক ভয়ংকর ডাকাত একা একা কাঁদতে লাগলো। নিঃসঙ্গ রাতের মতো একা হানিফ। জোহরা কী জানে, জগতে নিঃসঙ্গ মানুষের কান্নার মতো এমন গভীর আর কিছু নেই! এমন তীব্র আর কিছু নেই! সেই তীব্র গভীর অনুভূতি নিয়ে এই মাঝরাতে একা এক মানুষ তার জন্য এমন অকাতরে কেঁদে চলেছে!

New Pdf download: www.PoragEducation.com + webtalkbd.com

জোহরা জানে না। এই শীতের রাতে সে তখন মায়াকে তার বুকের ওমে জাড়িয়ে ধরে ঘুমাচ্ছে। কিন্তু হানিফের বুকের ভেতরটা পুড়ে যাচ্ছে প্রবল দহনে। তার মনে হচ্ছে সে মারা যাবে জোহরাকে দেখার তেষ্টায়। তার বুকের ভেতরের বুনো মানুষটা হঠাৎই যেন আবার জেগে উঠলো। এখন রাত কত হবে কে জানে! হানিফ ঘরে গিয়ে তার চাদরটা গায়ে জড়ালো। তারপর অন্ধকারে পা টিপে টিপে তোরাব আলী লস্করের ঘরের দিকে এগোলো। যে করেই হোক, এই মুহূর্তেই জোহরাকে এক পলকের জন্য হলেও দেখতে হবে তার। নাহলে মরেই যাবে সে। জোহরার ঘরের উল্টো দিকে জংলা ঘাসের মতো একটা জায়গা আছে। সেখানে হাত দশেক ঘাসের জমি। জমি শেষে হতেই বিল। হানিফ সেই মাঝরাতে কোমর অবধি লুঙ্গি গুটিয়ে নিয়ে জংলা জায়গাটা পার হলো। তারপর সন্তর্পণে পা ফেলে গিয়ে দাঁড়ালো জোহরার ঘরের জানালার কাছে। দীর্ঘসময় কান পেতে রইলো সে জানালায়। কিন্তু জোহরাকে দেখবে কী করে সে? এই এত রাতে তাকে ডেকে তুলবে? কিন্তু কীভাবে? আর ডেকে তুললে জোহরাই বা কী বলবে?

হানিফ জানে, জোহরাকে সে যতটা ভালোবাসে, ঠিক ততটুকু ভয়ও পায়। সে চুপচাপ দাঁড়িয়েই রইলো। আচমকা কান খাড়া হয়ে গেলো হানিফের। ঘরের ভেতর থেকে গুনগুন শব্দ ভেসে আসছে। জোহরা মৃদুস্বরে গান গাইছে। এই এতরাতে জোহরাকে গান গাইতে শুনে হানিফ ভারি অবাক হলো। সে আবিষ্কার করলো, জোহরা যে শুধু গানই গাইছে তা-ই না, সে গানের ফাঁকে ফাঁকে ফিসফিস করে কথা বলছে মায়ার সাথে। মায়াও জেগে আছে। সে জোহরার কথা শুনে খিল খিল করে হাসছে।

হানিফের কী যে ভালো লাগছে!

কালীগঞ্জ বন্দরে জোহরার সাথে স্বামী-স্ত্রীর মতো কাটানো সেই সামান্য মুহূর্তটুকু খুব মনে পড়ছে তার। মায়াকে যেন তখন সত্যি সত্যিই তাদের সন্তান মনে হচ্ছিলো! এই যে এখন মায়াটা অমন হেসে কুটিকুটি হচ্ছে, হানিফের মনে হচ্ছে, সেও যদি এখন মায়ার অন্যপাশে শুয়ে মা-মেয়ের এই খুনসুটিটা দেখতে পেতো!

হানিফকে মশা কামড়াচ্ছে খুব। যতটা সম্ভব নিঃশব্দেই মশা তাড়ানোর চেষ্টা করলো সে। বার কয়েক নিচু হয়ে বসে পায়ের ওপর থেকে পোকামাকড়ও তাড়ালো। কিন্তু বিপত্তিটা ঘটলো উঠতে গিয়ে। কখন যে তার মাথার ওপরের জানালার পাল্লাটা খুলে গেছে, খেয়ালই করেনি হানিফ। জানালার পাল্লার সাথে ঘটাং শব্দে বাড়ি খেলো সে। ডান হাতে মাথা চেপে ধরে ত্বড়িৎ পেছনে সরে এলো। কিন্তু ততক্ষণে খোলা জানালায় জোহরার মুখখানা দেখা গেলো। ঘরের ভেতরের হারিকেনের আলোটাও বাড়িয়ে দিয়েছে সে। সেই হারিকেনের আলোয় জোহরাকে কী যে সুন্দর লাগছে! তবে তার মুখটা নির্বিকার। অন্ধকারে হানিফকে না দেখা গেলেও জোহরা স্বাভাবিক গলায় বললো, 'হানিফ ভাই নি?'

হানিফ বুঝতে পারছে, আর লুকিয়ে লাভ নেই। সে চোরের মতো কাঁচুমাচু ভঙ্গিতে বললো, 'হ।'

জোহরা বললো, 'এত রাইতে এইহানে কী করেন!'

হানিফ কী বলবে ভেবে পেলো না। জোহরা বললো, 'আমারে দেখতে আইছেন? খুব দেখতে ইচ্ছা করতেছিলো, না?'

হানিফ এবারও কথা বললো না। অপরাধীর ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে রইলো। জোহরা বললো, 'এইদিকে আহেন।'

হানিফ সম্মোহিতের মতো এগিয়ে এলো। জানালার কাছে এসে দাঁড়ালো সে। জোহরার কাঁধের পাশ দিয়ে হারিকেনের এক টুকরো আলো এসে পড়েছে তার মুখে। জোহরা বললো, 'এত রাইতে যে এইহানে আইছেন, দাদাজানে দেখলে কী হইবো, জানেন?'

'হুম!'

'তাইলে?'

'আমি তোরে নিয়া একখান স্বপ্ন দেখছি। খারাপ স্বপ্ন। স্বপ্ন দেইখ্যা ঘুম ভাইঙ্গা গেলো। আর ঘুম আইলো না। তহন থেইক্যা...।'

হানিফ কথা শেষ করলো না। জোহরা বললো, 'তহন থেইক্যা কী? কন?'

হানিফ তার চোখ নামিয়ে নিলো নিচে। তারপর লজ্জাবনত গলায় বললো, 'আর ঘুম হইলো না। অস্থির লাগতে আছিলো।'

'কী দেখছেন স্বপ্নে? অন্য কেউর লগে বিয়া হইয়া যাইতেছে আমার?'

হানিফ কথা বললো না। তার কেমন কান্না কান্না লাগছে। জোহরা আচমকা হাত বাড়িয়ে হানিফের গাল ছুঁয়ে দিলো। তারপর বললো, 'এহন ঘরে যান। ঘরে গিয়া ঘুমান। কাইল কথা হইবো। এত রাইতে আপনেরে এইহানে দেখলে মাইনষে কী কইবো?'

হানিফের যেতে ইচ্ছে করছে না। তার ইচ্ছে করছে, জোহরার হাতখানা তার গালের সাথে চেপে ধরে রাখতে। স্বপ্নে সে ঠিক এই দৃশ্যটাই একটু অন্যরকম করে দেখেছিলো। কিন্তু তার মনে হচ্ছে, এই দৃশ্যটা স্বপ্নের চেয়েও সুন্দর! জোহরা কী মায়া নিয়েই না তার গালে হাত রেখেছে! হানিফের মনে হলো জোহরার হাতখানা তার গাল থেকে না সরুক। এমনই থাকুক। অবশ্য জোহরার হাত ধরার সাহস হনিফের হলো না, তবে সে মনে মনে বলতে থাকলো, জোহরা যেন তার হাতটা সরিয়ে না নেয়। জোহরা অবশ্য তার কথা শুনতে পেলো না। সে হাতটা সরিয়ে নিয়ে নরম গলায় বললো, 'যান, ঘরে গিয়া ঘুমান। কাইল দিনে কথা হইবো।'

জোহরা জানালাটা বন্ধ করে দিলো। হানিফ আরো কিছুক্ষণ ঘোরগ্রস্তের মতো সেখানে দাঁড়িয়ে রইলো। তারপর ঘুরে হাঁটা দিলো। সেই রাতে হানিফ আর ঘুমালো না। সারা রাত বসে রইলো বাড়ির উঠোনে। তার মনে হতে লাগলো, যে মায়া নিয়ে জোহরা তাকে ছুঁয়ে দিয়েছে, ওই মায়ার স্পর্শটুকু নিয়েই সে কাটিয়ে দিতে পারবে জনম জনম!

New Pdf download: www.PoragEducation.com + webtalkbd.com

পরদিন জোহরাকে ডাকলেন তোরাব আলী লস্কর। তার মুখ থমথমে। জোহরা তার সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই তিনি সরাসরি বললেন, 'হানিফরে তুই পছন্দ করস?'

জোহরা সামান্য অবাক হলো, 'ক্যান দাদাজান?'

'ক্যান দাদাজান না। ঘুরাইয়া পেঁচাইয়া কথা কইবি না। যা জিগাইছি সরাসরি উত্তর দে।'

'কী হইছে কওতো?'

'কাইল অত রাইতে সে তোর ঘরে কী করে?'

জোহরা এবার অবাক হলো, 'তুমি জানলা কেমনে?'

'কেমনে জানছি সেইটা কথা না, কথা হইলো গিয়া সে অত রাইতে তোর ঘরে কী করে?'

'উল্টাপাল্টা কথা কইতেছো ক্যান দাদাজান? সেতো আমার ঘরে আহে নাই, সে আছিলো জানালার ওইপাশে।'

'ওই একই কথা হইলো আর কী! অত রাইতে ওইহানে তার কাম কী?'

'সেইটা তুমি তারেই জিগাও, আমারে জিগাও ক্যান?'

'তুই জানালা খুইলা তার লগে ফুসুর-ফাসুর করবি, আর আমি তোরে জিগাইতে পারবো না?'

জোহরা এবার শক্ত হলো, 'আচ্ছা কও, কি জানতে চাও তুমি?'

'হানিফরে তোর পছন্দ?'

জোহরা হাসলো, 'না পছন্দ না।'

তোরাব আলী যেন সামান্য খুশি হলেন, 'পছন্দ না হইলে তার লগে এত খাতির কিসের? তারে লইয়া এইহানে যাস, ওইহানে যাস। রাইতে আবার ফিসফাস করোস। পছন্দ না হইতেই এত কিছু?'

'পছন্দ না, এইটা যেমন সত্য। আবার পছন্দ, সেইটাও সত্য।'

'এইটা কেমন কথা হইলো?'

'এইটা হইলো জেলাপির প্যাঁচ কথা। জেলাপির লাহান আড়াই প্যাঁচঅলা কথা। হা হা হা।' জোহরা হাসছে। তোরাব আলী লস্কর ভারি বিরক্ত হচ্ছেন। জোহরা তার হাসি থামিয়ে বললো, 'শোনো দাদাজান, এই চরে তার চাইতে ভালো কেউ থাকলে আর তারে আমি পছন্দ করতাম না। যেহেতু তার চাইতে আর ভালো কেউ নাই, তাই তারেই পছন্দ। হা হা হা। বুঝলা এহন?'

তোরাব আলী গম্ভীর গলায় বললেন, 'তারে তুই বিয়া করতে চাস?'

জোহরা চটপটে গলায় বললো, 'কাউরে না কাউরেতো বিয়া করতেই হইবো। তার লগে হইলে দোষ কী? সে মানুষ খারাপ না। আমারে ডরায়। আর ডরাইন্না জামাই ভালো। বউ শান্তিতে থাহে। হা হা হা।'

জোহরা আবারো হাসছে। রাগে তোরাব আলী লস্করের গা জ্বলে যাচ্ছে। কিন্তু তিনি কিছু বলতে পারছেন না। তবে সেই দিন বিকেলেই তিনি তার বড়পুত্র আয়নাল হককে ডেকে বললেন, 'ও আয়নাল, হানিফেরতো বয়স হইছে। তারে বিয়া-শাদি করান লাগে না?'

আয়নাল হক নড়েচড়ে বসলো। সে বললো, 'তাতো করানই লাগে বাজান।'

'তাইলে? মাইয়া আছেনি তার পছন্দের?'

'মনে হয়তো আছে।'

'কেডা?'

আয়নাল হক আগ্রহ নিয়ে বললেন, 'কেডা আবার? আমাগো জোহরা।'

'সে কইছে তোরে?'

'তার আর কওন লাগবো ক্যান? এইডাই ফাইনাল।'

তোরাব আলী লস্কর বিয়ের সম্ভাব্য তারিখ নিয়েও কথা বললেন আয়নাল হকের সাথে। আয়নাল হক অবশ্য বললো এত তাড়াহুড়ার কিছু নেই। হানিফের আরেকটু সময় দরকার আছে। তার ওপর এই শীতকালে কাজ-কামেও মন্দা। হাতে পয়সাপাতিও তেমন নেই। তার চেয়ে পরের বছর নতুন পানি আসলে, সেই সময় বড়সড় কয়েকটা কাজ করার পর বিয়েটা দিলেই সবচেয়ে ভালো হয়। এই বিয়েটা একটু বড়সড় আয়োজন করে না করলেই নয়। সেক্ষেত্রে খরচাপাতিরও একটা ব্যাপার আছে। এখন আপাতত মুখে মুখে কথা হয়েই থাকুক। সমস্যাতো নেই।

বিষয়টা তোরাব আলী লস্করেরও পছন্দ হলো। তিনি জানেন না কেন, এখনো তার মনে হচ্ছে এই বিয়েতে যদি শেষ পর্যন্ত জোহরার মত না থাকতো, যদি অলৌকিক কোনো উপায়ে জোহরা তোরাব আলী লস্করের ইচ্ছেমতো বিয়ে করতে রাজি হয়ে যেতো, তাহলে কতই না ভালো হতো! কিন্তু সেটি যে হওয়ার নয়, তা তোরাব আলী লস্কর স্পষ্টই বুঝে গেছেন। তারপরও মনের কোথায় যেন একটা শেষ আশা থেকেই যাচ্ছে তার। বিয়ে বিলম্বিত হওয়ায় তিনি তাই অবচেতন মনে যেন একটু খুশিই হলেন।

দিনকয়েক বাদে একদিন জোহরাকে ডাকলেন তিনি। তবে প্রথমেই আসল কথা তুললেন না। প্রথমে বললেন এলোমেলো নানান কথাবার্তা, 'ভাবতেছি এইবার শীতে আমি একখান কামে যামু।'

'কী কামে?'

'খ্যাপে। এইবার শীতে একখান খ্যাপ মারতে চাই।'

জোহরা যেন আকাশ থেকে পড়লো, 'তুমি যাইবা কামে? তাও এই শীতে?'

তোরাব আলী লস্কর যেন গম্ভীর হওয়ার চেষ্টা করলেন, 'হুম। বহুদিন হইলো কোনো কাম-কাইজে যাই না। শইলডাও ছাইড়া দিতাছে।'

New Pdf download: www.PoragEducation.com + webtalkbd.com

'বুড়াও হইয়া যাইতেছো।'

তোরাব আলী এবার হাসলেন, 'হু, শইলের চাইতে মনডাই মনে হয় বেশি বুড়া হইয়া যাইতেছে। নানান চিন্তা, দুশ্চিন্তায় ধরতেছে।'

'হাচাই দাদাজান। বহুদিন পর আসল জায়গা বুঝতে পারছো।'

'হ। অনেকদিনতো বইয়া বইয়াই কাটাইলাম। দেহি, এইবার একটু। তুই এক কাম কর।'

'কী কাম?'

'চিন্তা-ভাবনা কইরা বাইর কর, কই যাওন যায়।'

'আচ্ছা দাদাজান।' জোহরা হাসলো, তার সেই রহস্যময় হাসি। তবে আজ সেই হাসিটা দেখতে ভালো লাগছে তোরাব আলীর। মনে হচ্ছে ওই হাসিতে ভয়ের কিছু নেই। বরং জয়ের আছে অনেক কিছুই। তিনি শুধু শুধুই এই এতদিন ভয় পেয়ে এসেছেন।

তারপর এলোমেলো আরো নানান আলাপ আলোচনা চললো। অবশেষে আসল প্রসঙ্গ তুললেন তোরাব আলী লস্কর, 'তুই সত্য সত্যই হানিফের লগে বিয়া বইবি?'

জোহরা বললো, 'মিথ্যা মিথ্যিও বিয়া বওন যায়নি দাদাজান?'

'সবসময় ফাইজলামি করবি না। তুই আমারে সত্য কইরা ক।'

জোহার এবারও হেয়ালিপূর্ণ কণ্ঠে বললো, 'এহনতো সত্যই মনে হইতেছে।'

'তার মানে কী? পরে আবার মিথ্যাও মনে হইতে পারে?'

'হ পারে। পারে না? মাইনষের মন কী সবসময় একইরকম থাকে দাদাজান? তার বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রকম মনে হইতে পারে না?'

'তা পারে। কিন্তু এইজন্যতো সেতো আর ইচ্ছামতো জামাই-বউ বদলাইতে পারে না।'

'ক্যান, পারবো না ক্যান? যদি ভালো না লাগে, তাইলেও তার লগে থাকন লাগবো?'

তোরাব আলী লস্কর দীর্ঘশ্বাস লুকালেন, 'ভালো মন্দ কী আর মানুষ এই জীবনে বুঝতে পারে? আইজ যারে ভালো মনে হয়, কাইল তারে ভালো নাও মনে হইতে পারে। মন্দ মনে হইতে পারে। এইজন্য কী মানুষ আইজ একজনের লগে, কাইল আরেকজনের লগে থাকতে পারে? তাইলে সংসার টিকবো?'

জোহরা হাসলো, 'না টেকলে নাই। ভালো লাগনটাই আসল। ভালো না লাগলে সংসার টিকাইয়া লাভ কী?'

তোরাব আলী লস্কর বললেন, 'তুই একটা পাগল! আরো বড় হ, পোলা মাইয়ার মা হ। তহন বুঝবি সংসার কী জিনিস! সংসার হইলো মায়া। এই মায়া এমনই এক জিনিস, এইহানে ভালো না লাগলেও থাকতে হয়। ছাইড়া যাওন যায় না। তোর দাদিজান নাই আইজ কয় বছর? আমিতো তার জায়গায় আরেকজন

কেউরে আনতে পারলাম না। তার লগে কী আমার ঝগড়া বিবাদ হয় নাই? তারেও আমার অনেক সময় ভালো লাগে নাই। মনে হইছে দুনিয়ার সবচাইতে মন্দ মহিলা সে। কিন্তু ওই যে মায়া। মায়া লাইগ্যা গেছিলো বুকের মইধ্যে। সবকিছু ছাড়ানোর ওষুধ আছেরে বু, কিন্তু ওই মায়া ছাড়ানোর ওষুধ নাই। ঐ মায়া একবার লাইগ্যা গেলে ছাড়ানো বড় কঠিন!'

জোহরা বললো, 'তাইলে মায়া লাগতে না দিলেই হয়?'

তোরাব আলী লস্কর আবারো দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন, 'চাইলেই কী সবকিছু পারন যায়? যায় নারে। মায়া হইলো এমন এক জিনিস, যা ইচ্ছামতো কেউর ওপর লাগানও যায় না, আবার ইচ্ছামতোন কেউর ওপরতন ছাড়ানও যায় না।'

জোহরা হাসতে হাসতে বললো, 'আমারতো একটা মায়া আছেই, আমি তাইলে ওইটারে নিয়াই থাহি, কি কও দাদাজান? ওইটারে ইচ্ছা মতোন ধরনও যায়, ছাড়নও যায়। মাঝে মধ্যে একটু খালি কান্দাকাটি করে, এইটা ছাড়া আর কোনো ঝামেলা নাই। হা হা হা।'

জোহরা হাসছে। তোরাব আলী লস্কর তাকিয়ে আছেন। এ কী অদ্ভুত মেয়ে!

New Pdf download: www.PoragEducation.com + webtalkbd.com

কণার গোবিন্দপুর যাওয়ার দিন তারিখ ঠিক হয়েছে। সে যাবে পরের শুক্রবারে। বুধবার মঞ্জুর স্কুলের পরীক্ষা শেষ। ফলে শুক্রবারের লঞ্চটা তারা অনায়াসে ধরতে পারবে। মনসুর যাবে সপ্তাহের মাঝখানে মঙ্গলবারে যে ছোট লঞ্চখানা যায় তাতে। এই জন্য হাড়ভাঙা খাটুনি যাচ্ছে তার। যদিও সে কণাকে বলেছে গিয়ে দু-তিন দিনের বেশি থাকবে না। কিন্তু মনসুর জানে, এতদিন পর গেলে কমপক্ষে সপ্তাহখানেক তারও থাকতে হবে। তবে এই কথা সে কাউকে বলেনি। নিজে নিজের কাজগুলো যতটা সম্ভব গুছিয়ে আনার চেষ্টা করেছে। মনসুর সিদ্ধান্ত নিয়েছে, যেদিন গোবিন্দপুর থেকে তাদের চলে আসার কথা, সেদিন ভোরেও সে কিছু বলবে না। কণা সারাদিন মন খারাপ করে থাকবে। কান্নাকাটি করবে। থমথমে মুখ নিয়ে কাপড়-চোপড় গোছাবে! এই সময়ে সে কণাকে চমকে দিয়ে বলবে, আরো কয়েকটা দিন থেকে গেলে কেমন হয় কণা?

কণা তখন কী করবে?

মনসুর নিশ্চিত, কণা প্রথমে বিশ্বাসই করবে না। তারপর হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়বে মনসুরের গায়ের ওপর। তাকে কিল-ঘুষিতে অতিষ্ঠ করে করে তুলবে। তারপর জড়িয়ে ধরে হাউমাউ করে কাঁদতে কাঁদতে বলবে, 'তুমি এত ভালো কেন? এত ভালো কেন?'

মনসুর এর মাঝখানে একদিন কালিগঞ্জেও গিয়েছিলো। কিছু ওষুধপত্র আর প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি আনতে হয়েছে। তবে একটা ফার্মেসি দিতেও যে এত ঝামেলা, তা সে আগে বুঝতে পারেনি। ফার্মেসিতে ডাক্তারখানা চালাতে বিশেষ অনুমোদনের দরকার হয়। সেটিও এখনো জোগাড় করতে পারেনি সে। তবে

কিছুদিন সময় দিতে পারলে সব ঠিক হয়ে যাবে। এমন নানান বিষয় রয়েছে, সেগুলো নিয়ে দিনরাত খেটে যাচ্ছে সে।

কণা গোবিন্দপুর যাবে শুনে সবচেয়ে মন খারাপ করেছেন আজাহার খন্দকার। তিনি দুই দিন কণার সাথে একটা কথাও বলেননি। কণা তার পেছন পেছন ঘুরেছে, 'বাবা?'

আজাহার খন্দকার চুপ করে বসে থেকেছেন। কণা তার পাশে গিয়ে বসে বলেছে, 'ও বাবা? আপনি যদি এমন করেন, তাহলে আমার কেমন অস্থির লাগে আপনি জানেন?'

আজাহার খন্দকার তাও কথা বলেননি। তিনি কথা বলেছেন দ্বিতীয় দিন রাতে, 'তুমি গিয়া কয়দিন থাকবা?'

'বেশিদিনতো না। এই সপ্তাহখানেক।'

'সাতদিন!' আজাহার খন্দকার যেন আকাশ থেকে পড়লেন, 'এতদিন! এতদিন তোমারে ছাড়া আমি থাকবো কেমনে? এই ঘর-বাড়ি কে দেইখ্যা রাখবো? আমি বুড়া মানুষ, অসুস্থ। তুমি একটা অসুস্থ-বুড়া মানুষ এই অবস্থায় রাইখ্যা এতদিন গিয়া থাকবা?'

কণা মৃদু হেসে বললো, 'বেশিদিন কিন্তু না বাবা। বিয়ের পর আমি আর গোবিন্দপুর যাইনি কিন্তু!'

আজাহার খন্দকার খামখেয়ালি গলায় বললেন, 'বিয়ার পর মাইয়াগো আবার বাপের বাড়ি কী? তার আসল বাড়ি হইলো স্বামীর বাড়ি। আর এইটাইতো তোমার নিজের বাড়ি। নিজের বাড়ি না?'

কণা বললো, 'অবশ্যই এটা আমার নিজের বাড়ি। কিন্তু বাবা, আমার বাবা মায়েরও তো আমাকে একটু দেখতে ইচ্ছে হয়, হয় না?'

'ওহ, তারাই তোমার বাবা-মা, আর আমি কেউ না, না? এইজন্যই পরের মাইয়া আপন ভাবতে হয় না। আমি ভাবছি আমিও তোমার বাপ। আপন বাপ।'

আজাহার খন্দকারের গলায় শিশুদের মতো অভিমান। কণা তাকে দু হাতে জড়িয়ে ধরে বললো, 'এত ছেলেমানুষি করলে হয় বাবা? মাত্রতো ক'টা দিন। তারপরতো চলেই আসবো।'

আজাহার খন্দকার বললেন, 'সাত দিন থাকনের দরকার কী? এহনতো সপ্তাহের মাঝখানেই একখান লঞ্চ চলে। তিনদিন থাইক্যা আইলেইতো হয়!'

কণা বললো, 'এই শরীরে এত জার্নি আমি করতে পারবো বাবা? তারওপর আপনার ছেলেওতো বিয়ের পর আর যায়নি। আর দশজন মানুষ কী ভাববে বলেন? সেও গিয়ে দুটো দিন থাকবে না?'

কণার কথা যৌক্তিক। কিন্তু আজাহার খন্দকারের যেন মানতে ইচ্ছে করছে না। বহু যুক্তিতর্ক মান-অভিমান শেষে তিনি অবশেষে বুঝলেন। তবে তার শর্ত ওই একটা, কণা যেন কিছুতেই সাত দিনের বেশি না থাকে।

New Pdf download: www.PoragEducation.com + webtalkbd.com

বৃহস্পতিবার রাতে বাড়ি ফিরতে দেরি হলো মনসুরের। সে বাড়ি ফিরে দেখে সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। এমন কি কণাও। তাকে দরজা খুলে দিলো কাজের মেয়েটা। কণার ঘরের আলো বন্ধ। মনসুর একা একাই রাতের খাবার খেলো। এর আগে এমন কখনো হয়নি। খানিক মন খারাপ হলেও বিষয়টিকে সে পাত্তা দিলো না।

ঘরে গিয়ে দেখে কণা চুপচাপ শুয়ে আছে। মনসুর গায়ের ওপর লেপ টেনে দিতে দিতে তার কনকনে ঠাণ্ডা হাতখানা কণার গালে চেপে ধরলো। সে ভেবেছিলো কণা ঝট করে সরে যাবে। কিন্তু সে গেলো না। স্থির শুয়ে রইলো। মনসুর তাকে আপনি করে ডাকলো, 'কী হলো আপনার?'

কণা জবাব দিলো না। সে এবার কণার বাহু ধরে তার দিকে ঘোরালো। তারপর বললো, 'বলা যাবে কী হয়েছে?'

কণা মৃদু গলায় বললো, 'কিছু হয় নি।'

'কিছু না হলে ঝলমলে আকাশে মেঘ কেন?'

কণা চুপ। মনসুর বললো, 'আমি দেরি করে ফিরেছি তাই?'

কণা বললো, 'কাল আমি এই অবস্থায় চলে যাচ্ছি আর আপনি সেই কবে না কবে আসবেন! আজ রাতটা একটু তাড়াতাড়ি আসলে কী হতো?'

মনসুর হাসলো, 'আমি চেষ্টা করিনি বলছো?'

'আপনি চেষ্টা করেছেন আমি জানি। কিন্তু আজকের কাজটুকু গতকাল সেরে রাখলে হতো না?'

'সব কাজ কী একদিনেরটা অন্যদিন করা যায়?'

'নাহ, তা যাবে কেন? অন্যদেরটা যাবে না, কেবল আমারটা যাবে। কারণ অন্যরা গুরুত্বপূর্ণ, আমি না।'

'তুমি কী জানো, আমার জীবনের সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ মানুষটা হচ্ছো তুমি?'

'হুম জানবো না কেন? এই জন্যইতো আপনি আমার সাথে যেতে পারছেন না। আমাকে যেতে হচ্ছে মঞ্জুর সাথে।'

মনসুর কণাকে তার কাছে টেনে নিলো আরো। তারপর কণার কানের কাছে ঠোঁট নিয়ে গিয়ে বললো, 'এই জন্য এত অভিমান!'

'কোনো অভিমান টভিমান আমার নেই।'

'একদম সত্যি তো?'

'হুম, সত্যি।'

'তাহলে এটা কী? এই যে এখন হচ্ছে? এটা অভিমান নয়?'

'নাহ। মানুষ অভিমান করে তার সাথে, যার কাছে তার গুরুত্ব আছে। আপনার কাছে কী আমার কোনো গুরুত্ব আছে?'

'নেই?'

কণা এবার আর জবাব দিলো না। মনসুর বললো, 'আচ্ছা, আমি যদি কাল সব কাজ ফেলে গোবিন্দপুর রওয়ানা হয়ে যাই, তাহলে গুরুত্ব ঠিকঠাক থাকবেতো?'

'নাহ, আপনাকে যেতে হবে না।'

'কেন? যেতে হবে না কেন?'

'কারণ, আমি জোর করে কারো কাছ থেকে গুরুত্ব আদায় করতে চাই না। ওটা আপনাআপনি আসতে হয়।'

'আচ্ছা, আপনার ধারণা আপনার জন্য আমার অনুভূতিটা জোর করা?' মনসুর দুষ্টুমির ভঙ্গিতে বললো।

কণা বললো, 'আপনি আমাকে আপনি আপনি করে বলছেন কেন?'

মনসুর বললো, 'আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি, এখন থেকে তোমাকে আমি আপনি আপনি করেই বলবো?'

'ঢং!'

'সত্যি বলছি।'

'কেন?'

'কারণ, পরে যদি আবার বলে বসো, তোমাকে তুমি তুমি করে বলে ঠিকঠাক গুরুত্ব দিচ্ছি না। এই জন্য এই ব্যবস্থা।'

কণা আচমকা মুখ ঘুরিয়ে পাশ ফিরে শুতে গেলো। তার আগেই তাকে শক্ত করে ধরে ফেললো মনসুর। তারপর বললো, 'এবার সিরিয়াসলি বলছি। এখানে থাকাটা আমার জরুরি। কিন্তু তুমি যদি সত্যি সত্যি চাও, তাহলে আমি সবকিছু ফেলেই তোমার সাথে যাবো।'

কণা চুপ করে রইলো। মনসুর বললো, 'সত্যি বলছি। তুমিতো জানো পরিস্থিতি। যে টাকাগুলো ছিলো, তার প্রায় সবই এখানে লাগিয়ে ফেলেছি। এখন যদি কোনো কারণে এখানে লোকসান যায়, তাহলে কী হবে অবস্থা জানোইতো!'

কণা এবার কথা বললো, 'জানিতো!'

'তাহলে?'

'তারপরও মন খারাপ হয় যে!'

'মন কখন খারাপ হয় জানো?'

'কখন?'

'মন ভালো থাকার পরে আর ভালো হওয়ার আগে।'

'মানে কী?'

'মানে হচ্ছে এতক্ষণ তোমার মন খারাপ ছিলো, এইজন্য এখন তোমার মন ভালো হয়ে যাবে।'

'কীভাবে?'

মনসুর অন্ধকারেই কণার হাতে একটা খাম গুঁজে দিলো। কণা বললো, 'কী এটাতে?'

New Pdf download: www.PoragEducation.com + webtalkbd.com

মনসুর বললো, 'টাকা!'

'টাকা?'

'হুম।'

'আপনার ধারণা টাকা দিলে আমার মন ভালো হয়ে যাবে? পাগল আপনি?'

'উহু। টাকাগুলো দিলে তোমার মন ভালো হবে না। তবে অন্যদের মন ভালো হবে।'

'অন্য কারা?'

'বিয়ের পর প্রথমবার বাড়িতে যাচ্ছো। বাবা-মা, আত্মীয়-স্বজনদের জন্য কিছু কিনে নিয়ে যেতে হবে না? তারপর ধরো বাচ্চাকাচ্চারা ছুটে আসবে। ওদের জন্য কিছু নিয়ে যেতে হবে। তারপর দেখবে আরো কত কী!'

কণার সত্যি সত্যি মন ভালো হয়ে গেলো। সে ভাবেনি, মনসুর তার জন্য এতকিছু ভাবে! কিন্তু সে সেটা প্রকাশ করলো না। গম্ভীর গলায়ই বললো, 'তাতে কী? আপনি কাল লঞ্চঘাট পর্যন্ত আমাদের এগিয়ে দিতেও যাবেন না?'

'তা যাবো না কেন? অবশ্যই যাবো।'

'তাহলে তখন কিনে দিয়েন।'

মনসুর বললো, 'তারপরও থাকুক। এটা তোমার কাছে রেখো। লাগবে।'

'কিন্তু এতেই আমার মন ভালো হবে বলে আপনার ধারণা?'

মনসুর হাসলো, 'এতে তোমার অল্প মন ভালো হবে বলে আমার ধারণা।'

'তাহলে বেশি মন ভালো হবে কিসে?'

'বেশি মন ভালো হবে, ওই খামটার ভেতর তোমার জন্য একটা চিঠিও আছে। সেই চিঠিটা পড়লে।'

'চিঠি!'

'হু।'

'চিঠি কেন?'

'তোমাকে চমকে দেয়ার জন্য। তুমি টাকাগুলো বের করার জন্য খাম খুলতেই একটা চিঠি পেয়ে যেতে। তখন তোমার মন ভালো হয়ে যেতো না?'

'হুম, যেতো, কিন্তু এখনতো সব বলেই দিলেন!'

'কী করবো? না বললেতো তুমি মন খারাপ করেই থাকতে। তারপরও, চিঠিটাতো থাকলোই। ওটাতো আর এখুনি পড়ে ফেলছো না তুমি। লঞ্চে উঠে তারপর পড়বে। আর সাথে সাথে তোমার মন ভালো হয়ে যাবে!'

'আমার কিন্তু এখুনি পড়তে ইচ্ছে করছে।'

'উহু। একদম না।'

'কিন্তু ইচ্ছে করছে যে!'

'সব ইচ্ছেকে প্রশ্রয় দিতে নেই।'

কণা মনসুরের কাছে ঘনিষ্ঠ হয়ে এলো। তারপর বললো, 'আপনাকে ছেড়ে এই ক'টা দিন আমার খুব কষ্ট হবে।'

মনসুর কণার মাথাটা বুকের সাথে চেপে ধরতে ধরতে বললো, 'মানুষের জীবনে কষ্টটা খুব দরকার জানো?'

'কেন?'

'আনন্দটা পেতে। কষ্টের অনুভূতিটা না বুঝলে, আনন্দটা ঠিকঠাক উপলব্ধি করা যায় না।'

'আপনি সবসময় কেবল কঠিন কঠিন কথা বলেন। আমার ভালো লাগে না।'

'তাহলে কী ভালো লাগে তোমার?'

'এমন করে আপনার সাথে মিশে থাকতে।'

মনসুর হাসলো। তারপর কণার চুলের ভেতর নাক ডোবাতে ডোবাতে বললো,

'তোমার করতলে ভোর, তোমার শরীরজুড়ে ঘোর,
নেশায় মাতাল হলে জানি, তুমি মানে অথৈ আদর।'

পরদিন বিকেলে ভেদরগঞ্জ থেকে কণাকে গোবিন্দপুরের লঞ্চে তুলে দিলো মনসুর।

New Pdf download: www.PoragEducation.com + webtalkbd.com

কণা বাড়িতে এসেছে আজ তিনদিন হলো। এই তিনদিনে সে যেন পাখি হয়ে উড়ে বেড়ালো। সারাক্ষণ এ বাড়ি থেকে ও বাড়ি, এ ঘর থেকে ও ঘর। কিন্তু আজ দুপুর থেকেই মনটা হঠাৎ খারাপ হয়ে গেলো কণার। মনে হলো, তিনটা দিন যেন চোখের পলকে নাই হয়ে গেলো। এখন আরো কিছুদিন বাড়িতে থেকে যেতে ইচ্ছে হচ্ছে তার। অন্তত মাসখানেক। কিন্তু মনসুর যদি রাজি না হয়? কণা অনেক ভাবলো, সবচেয়ে বড় সমস্যা আজাহার খন্দকার। আসার সময় সে দেখে এসেছে আজাহার খন্দকারের শরীরটা একটু খারাপ। এখন তিনি যদি সমস্যা না করেন, তাহলে মনসুরকে বোঝানো খুব কঠিন হবে বলে মনে হলো না তার।

নবীগঞ্জে যে কণা খারাপ ছিলো বিষয়টা মোটেই তা নয়। বরং ভালোই ছিলো। একটা নতুন, অন্যরকম, আদুরে জায়গা। কিন্তু তারপরও হুট করেই অতো বড় দায়িত্ব, অতো অতো মানসিক চাপ সে নিতে পারছিলো না। যেন শান্ত এক পুকুর থেকে হঠাৎ করেই পড়ে গিয়েছিলো ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ এক সমুদ্রে। কণা ভেবে রেখেছে, মনসুর এলে সে বলবে, অন্তত মাসখানেকের জন্য থেকে যেতে চায় সে।

এখানে কী যে নির্ভার আর স্বাধীন লাগছে কণার! কোনো চিন্তা-ভাবনা নেই। সারাক্ষণ যেন হাওয়ায় ভেসে বেড়ানো। কলেজের বন্ধুরা এসেছে, পাড়াপ্রতিবেশীরা এসেছে। কত কত গল্প, কত কত ছুটে বেড়ানো! সেই চির চেনা পুরনো জায়গা, নিজের মানুষ। আহা! কী যে আপন লাগছে সবকিছু! কণার মনে হচ্ছে, এই জায়গা ছেড়ে আর কখনো কোথাও যাবে না সে।

কণা তার মা হতে যাওয়ার খবরটাও এখনো শাহিনা বেগমকে দেয়নি। সে জানে, খবরটা দিলে শাহিনা বেগম হুলস্থুল কাণ্ড ঘটিয়ে ফেলবেন। তাকে একদম

ঘরবন্দি করে ফেলবেন। কারো সাথে মিশতে দেবেন না, কোথাও যেতে দেবেন না। তার চেয়ে দুটো দিন পরেও দেয়া যাবে। সেই দুটো দিন যে এমন পলক ফেলতেই চলে যাবে, তা কে ভেবেছিলো!

খুব শীত পড়েছে গোবিন্দপুরে। দুপুর গড়িয়ে বিকেল নেমেছে। শীতের বিকেল মানে চোখের পাতায় জল। টুপ করে ঝরে গেলেও সবটা জুড়ে হাহাকার রেখে যায়। লম্বা কলাপাতার ফাঁক গলে তেরছা এক ফালি রোদ এসে পড়েছে কাঠের দোতলার রেলিংয়ে। সেখানে মাদুর পেতে বসে আছে কণা। কণার পেছনে ছোট মোড়ায় বসে মেয়ের মাথায় তেল মেখে দিচ্ছেন শাহিনা বেগম। কণা বললো, 'আমি কিন্তু আরো কটা দিন থেকে যাবো মা। তুমি তোমার জামাইকে বুঝিয়ে বলবে।'

'কেনরে? তিন মাসেই শ্বশুরবাড়ির শখ মিটে গেলো?' শাহিনা বেগম টিপ্পনী কাটলেন।

'তিন মাসতো নয়, যেন তিরিশ বছর।'

'আমিতো তিরিশ বছরই যাই না!'

'ইশ! অতো হবে না।'

'কত হবে তাইলে?'

'এই ধরো তিন চার বছর।'

'তোর তিন মাস যদি তিরিশ বছর হইতে পারে, আমার তিন চাইর বছর কত হয় রে?'

'তুমিতো বুড়ো হয়ে গেছো মা। বাচ্চা কাচ্চার মা হয়েছো। মেয়ে বিয়ে দিয়ে দিলে। তোমার আর এত বাপের বাড়ি, শ্বশুরবাড়ি কী!'

'বাচ্চাকাচ্চার মা হইলে বুঝি বাপের বাড়ির জন্য মন কান্দে না?'

'কাঁদবে না কেন? তা কাঁদে। তবে প্রথম বারের মতো তো আর নয়।'

শাহিনা বেগম জবাব দিলেন না। দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন কেবল। শীতের মনমরা বিকেলে চারপাশটা কেমন শান্ত, নিস্তব্ধ। সেই নিস্তব্ধতায় আচমকা ডানা ঝাপটে উড়ে গেলো একটা ফিঙে। বাঁশে মাচার সরু কঞ্চিটা পেন্ডুলামের মতো এ পাশ ওপাশ দুলে উঠলো। স্থির শান্ত হয়ে থাকা বিকেলটাতে যেন মৃদু ঢেউ উঠলো। সেদিকে তাকিয়ে কণা বললো, 'মেয়েদের জীবনটা কেমন বিচ্ছিরি, তাই না মা?।'

'বিচ্ছিরি কেন?'

'বিচ্ছিরি না হলে এমন নিজের ঘর, নিজের মানুষ, চেনা সবকিছু ছেড়ে হুট করেই কেমন অন্য অচেনা কোথাও চলে যেতে হয়! যাওয়ার সময়ও ঠিকঠাক বোঝা যায় না যে এই যাওয়াটাই শেষ যাওয়া। তখনো মনে হয়, এইতো দুই দিন বাদেই আবার ফিরে আসবো। তারপর আবারতো সেই চেনা ঘর, চেনা ঘ্রাণ, চেনা মুখ। কিন্তু ওই যাওয়াটাই আসলে শেষ যাওয়ার শুরু।'

New Pdf download: www.PoragEducation.com + webtalkbd.com

'তুইতো এই কয়দিনেই কত বড় হইয়া গেলি!'

'আমি সবসময়ই বড় ছিলাম মা। তোমরা কেবল পাত্তা দিতে না।'

'এইবার থেইকাতো আর না দিয়া উপায় নাই। অতদূর শ্বশুরবাড়িতে, অচেনা অজানা মানুষের মাঝে এতগুলো দিন একা একা কাটাই আইলি!'

কণা হাসলো, 'ওরা খুব ভালো মা। এত ভালো শ্বশুরবাড়ি পাওয়া ভাগ্য।'

'তাহলে যে এহন আবার না যাওনের কথা কইলি?'

কণা খানিক চুপ করে থেকে বললো, 'তুমি কিছু বোঝোনি মা?'

'কী বুঝবো?'

কণা কিছু একটা বলতে গিয়েও আচমকা মুখ লুকালো। শাহিনা বেগমের যেন সম্বিৎ ফিরলো। তিনি দু হাতে মেয়েকে জড়িয়ে ধরে বললেন, 'আমার সত্য সত্যই বয়স হইয়া গেছে রে মা। আল্লাহর হাজার শোকর। কিন্তু মনসুর আইবো কবে?'

'মনসুর আসবে মা। আজকালের মধ্যেই চলে আসবে।'

'আইজ, কাইল রওয়ানা দিলেওতো প্রায় দেড়-দুই দিন লাইগা যাইবো পৌছাইতে!'

'তাতো লাগবেই মা। লঞ্চ-ইস্টিমারের পথ। তারপর আবার নৌকা-ট্রলার ছাড়াওতো উপায় নেই।

মনসুর অবশ্য দুয়েকদিনের মধ্যে আসতে পারলো না। আজাহার খন্দকারের শরীরটা খারাপ দেখে এসেছিলো কণা। মনসুর চলে এলে তিনি পুরোপুরি একা হয়ে যাবেন। মঞ্জুও চলে এসেছে কণার সাথে। ফলে মনসুরের একটু দেরি হওয়াটা স্বাভাবিক। তার ওপর হাতের কাজও অনেক বাকি রয়ে গিয়েছিলো তার। কণা লঞ্চে ওঠার সময় অপরাধীর মতো মুখভঙ্গীতেই মনসুর বলেছিলো, আরো কয়েকটা দিন দেরিও হতে পারে তার আসতে। কারণ মতি মিয়াকে দিয়ে ডিসপেনসারি চালানো খুব কঠিন কাজ। সে পড়াশোনা কিচ্ছু জানে না। ওষুধের গায়ে লেখা নাম অবধি পড়তে পারে না। ফলে তার দুয়েকজন কর্মচারিও দরকার। যারা অন্তত কিছুটা হলেও পড়াশোনা জানে। কয়েকজনের সাথে প্রাথমিকভাবে কথাও হয়েছে তার। তাদের সাথে চূড়ান্ত কথাবার্তা বলে, বাদবাকি কাজগুলো শেষ করেই সে চলে আসবে।

তখন মন খারাপ হলেও এখন অবশ্য ভালোই লাগছে কণার। এখন মনে হচ্ছে, মনসুর বরং আর ক'টা দিন দেরি করেই আসুক। মনসুর আসতে যতো দেরি করবে, কণার জন্য ততই ভালো। সে ততোদিন বেশি বাড়িতে থাকতে পারবে।

প্রথম দিন কয়েক আনন্দেই কাটলো কণার। মনসুরের আসতে দেরি হচ্ছে দেখে মনে হচ্ছিলো, বাড়ির এই অসাধারণ ভালো সময়টা আরো কিছুদিন বেশি থাকতে পারবে সে। কিন্তু দিন দশেক কেটে যাওয়ার পর হঠাৎই দুশ্চিন্তা হওয়া শুরু করলো কণার। এত দেরিতো করার কথা না মনসুরের!

সে কথা বললো মঞ্জুর সাথে, 'মঞ্জু, তোমার ভাইয়াতো এখনো আসলো না?'

'কোনো কাজে আটকাই গেছে মনে হয়।'

'তাই বলে এত দিন? আমরা টেনশন করবো, সেটাতো সে জানে, জানে না?।'

'কী জানি!'

'কিছু না জানলে হবে মঞ্জু?'

'কী করবো তাহলে?'

'একটু খোঁজখবর নেয়া দরকার না?'

'কীভাবে নেবো?'

এই প্রথম মঞ্জুর ওপর সত্যি সত্যিই রাগ হলো কণার। সে রুক্ষ গলায় বললো, 'তুমি বাচ্চা ছেলে না মঞ্জু। তুমি যথেষ্ট বড় হয়েছো। সংসারে তোমারও কিছু দায়-দায়িত্ব রয়েছে। আড়তে আগুন লাগার মতো অতবড় অঘটন ঘটে গেলো বাড়িতে, দুশ্চিন্তায় সবার পাগল হওয়ার দশা। আর তুমি? যেন কোথাও কিছু ঘটেনি। তুমিতো বাচ্চা ছেলে না।'

মঞ্জু কথা বললো না। চুপচাপ মাথা নিচু করে বসে রইলো। কণা জানে, এ বাড়িতে বসে মঞ্জুর সাথে এভাবে কথা বলা ঠিক হচ্ছে না তার। কিন্তু সে নিজেকে আর সামলে রাখতে পারছে না। হয়তো ভেতরে ভেতরে মনসুরের জন্য একটু বেশিই উদ্বিগ্ন বোধ করছে সে!

কণা বললো, 'তুমি আমার চেয়ে বয়সে খুব একটা ছোট নও, হয়তো বছর দু-তিনের ছোট। কিন্তু তোমার আচার-আচরণ দেখে মনে হয় তুমি এখনো ক্লাস টু থ্রির বাচ্চা। এই যে তোমার ভাইয়া সপ্তাহখানে আগে আসবে বলে এখনো এলো না, এটা নিয়ে তোমার টেনশন হওয়ার কথা না?'

মঞ্জু এবারও কথা বললো না। রাগে কণার গা জ্বলে যাচ্ছে। সে আর কিছু বললো না মঞ্জুকে। তবে রাতের বেলা খারাপ লাগতে লাগলো, দুপুরে মঞ্জুর সাথে ওভাবে কথা বলা ঠিক হয় নি তার। সে আবারো মঞ্জুর ঘরে গেলো, 'দুপুরে আমার ওভাবে কথা বলা ঠিক হয়নি মঞ্জু। তুমি মন খারাপ করো না।'

মঞ্জু মৃদু কণ্ঠে বললো, 'আমি কিছু মনে করিনি।'

'কিন্তু আমার কেন যেন খুব টেনশন হচ্ছে।'

'আমি একটা কাজ করবো?'

'কী কাজ?'

New Pdf download: www.PoragEducation.com + webtalkbd.com

'পরের লঞ্চে বাড়ি চলে যাবো? গিয়ে ভাইয়াকে পাঠিয়ে দেবো?'

'কিন্তু তোমার ভাইয়া যদি ওইদিনের লঞ্চেই চলে আসে?'

মঞ্জু এই কথার ওপরে আর কথা বললো না। সে চুপ করে রইলো। কণাও। বেশ কিছুক্ষণ পর কণা বললো, 'আচ্ছা এক কাজ করি, আরেকটা শুক্রবার পর্যন্ত অপেক্ষা করি। তারপরও যদি না আসে, তাহলে আমিও তোমার সাথে চলে যাবো। আমার খুব টেনশন হচ্ছে।'

মঞ্জু ঘাড় কাঁত করে বললো, 'আচ্ছা।'

সেই রাতে বাবা-মায়ের সাথেও কথা বললো কণা। দুজনই তাকে আশ্বস্ত করলেন এই বলে যে, আজাহার খন্দকার যেহেতু অসুস্থ ছিলেন, হয়তো সে কারণেই আটকে আছে মনসুর। অসুস্থ বাবাকে একা রেখে দুম করে চলে আসা যায় না। তিনি একটু সুস্থ বোধ করলেই হয়তো চলে আসবে। এত দুশ্চিন্তার কিছু নেই। কিন্তু কণার আড়ালে বিষয়টি নিয়ে তারাও খুব চিন্তিত হয়ে পড়লেন। দেলোয়ার হোসেন নবীগঞ্জে নানাভাবে খবর নেয়ারও চেষ্টা করলেন। কিন্তু সেটিও আসলে হুট করেই সম্ভব ছিলো না।

পরের দিনগুলো ক্রমশই অসহনীয় লাগতে লাগলো কণার কাছে। প্রতিটি মুহূর্ত যেন একেকটা বছর। সারাটাক্ষণ উৎকর্ণ হয়ে রইলো সে, এই বুঝি মনসুর এলো। কারো একটা পায়ের আওয়াজ, কারো কণ্ঠস্বরের শব্দ, কোনো একটা পাখির ডাক, একটা পাতার শব্দ সকলই যেন চমকে দিতে থাকলো তাকে। কিন্তু কেটে গেলো পরের সপ্তাহটিও। কোনো খবরই মিললো না মনসুরের!

পরের শুক্রবার মঞ্জুকে নিয়ে নবীগঞ্জ রওয়ানা দেয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলো কণা। কিন্তু সেই শুক্রবার একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটলো। স্বয়ং আজাহার খন্দকারকে দেখা গেলো কণাদের ঘরের সামনে। দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ শুনে ছুটে গিয়েছিলো কণা। গিয়ে দেখলো আজাহার খন্দকার দাঁড়িয়ে আছেন। তার চোখে মুখে তীব্র রাগ। তিনি কণাকে দেখেই রাগান্বিত গলায় বললেন, 'তোমাদের কী কোনো আক্কেল পছন্দ কিছু আছে?'

কণা কোনোমতে ঢোক গিলে বললো, 'কেন বাবা?'

'কেন বাবা মানে?' এবার রীতিমতো ধমকে উঠলেন আজাহার খন্দকার, 'আইজ কতদিন হয় তোমরা আইছো?'

কণা তার উৎকণ্ঠা চেপে রেখে বললো, 'বাবা, আমরাতো প্রতিদিনই যাওয়ার জন্য অপেক্ষা করি।'

'কিসের অপেক্ষা করো তোমরা? আইজ পনেরো ষোলোটা দিন আমি একলা বুড়া মানুষটা পইড়া আছি বাড়িতে, আর তোমরা আইসা এইহানে আমোদ ফূর্তি করতেছো। তোমাগো কী বিবেক-বুদ্ধি বলতে আল্লাহ কিছু দেয় নাই?'

কণা এবার কিছুটা রুক্ষ স্বরেই বললো, 'কিন্তু বাবা, আপনার ছেলে বললো, সে আসবে। সে না আসলে আমরা যাই কী করে? তার জন্যইতো আমরা এতদিন অপেক্ষা করে আছি!'

'মানে!' আজাহার খন্দকার যেন আকাশ থেকে পড়লেন। তিনি স্তম্ভিত গলায় বললেন, 'তুমি কী কও বউ? মনসুর আহে নাই?'

'না বাবা।'

আজাহার খন্দকারের শরীর কাঁপছে। তিনি হঠাৎ শক্ত হাতে দরজার পাল্লাটা ধরলেন। তারপর কোনো মতে ঘরের ভেতর ঢুকে চেয়ারে বসে পড়লেন। তারপর ফ্যাকাসে কণ্ঠে আবারও বললেন, 'মনসুর আহে নাই?'

কণা আতঙ্কিত গলায় বললো, 'না বাবা!'

আজাহার খন্দকারের শরীর ঘামতে লাগলো। তার গলা ভেঙে এলো। তিনি থরথর করে কাঁপছেন। কণার বাবা-মা ততক্ষণে দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়েছেন। এসেছে মঞ্জুও। আজাহার খন্দকার নিজের শরীর ও মনের সব শক্তি সঞ্চয় করে যেন পরের কথাটা বললেন, 'বউ, তুমি আহনের তিনদিন পরইতো মনসুর চইলা আইছে!'

New Pdf download: www.PoragEducation.com + webtalkbd.com

মনসুরের লাশ পাওয়া গেলো পাঁচ দিন পর।

শুধু যে তার একার লাশই পাওয়া গেলো এমন না। তার সাথে আরো দুজনের লাশ পাওয়া গেলো সুবর্ণপুর নদীতে। নদী থেকে লাশ উত্তোলনের সময় উপস্থিত ছিলেন সাব ইন্সপেক্টর মইনুল হোসেন। যদিও যেখানে লাশ পাওয়া গেছে, সেই এলাকার দায়িত্বরত পুলিশ অফিসার নন মইনুল হোসেন। তারপরও খবর শুনে তিনি ওসি একরামুল হককে নিয়ে ঘটনা সরেজমিনে দেখতে এসেছেন। লাশ পাওয়া গেছে সুবর্ণপুর নদীর গভীরে। পচা গলা লাশ দেখে আলাদা করে চেনার কোনো উপায় নেই। তিনজনের স্বজনরাই লাশ সনাক্ত করেছেন তাদের পোশাক আশাক দেখে। মনসুরের লাশ সনাক্ত করেছেন তার বাবা আজাহার খন্দকার।

কণা গোবিন্দপুর চলে আসার দিন তিনেক পরেই ঘটনা ঘটেছে। মনসুরের জরুরি কিছু কাজ ছিলো ভেদরগঞ্জে। সকাল সকালই তাই বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলো সে। আগের রাতে আজাহার খন্দকারকেও সে বলে রেখেছিলো যে ভেদরগঞ্জের কাজ শেষে বিকেলের লঞ্চে গোবিন্দপুর রওয়ানা হয়ে যাবে। শরীর খারাপ থাকা সত্ত্বেও আজাহার খন্দকার আগ্রহ নিয়েই মনসুরকে যেতে বলেছিলেন। কারণ মনসুর যত তাড়াতাড়ি গোবিন্দপুর যাবে, তত তাড়াতাড়ি সে কণাকে নিয়ে ফিরে আসতে পারবে।

কিন্তু দিন যত গড়িয়েছে, আজাহার খন্দকার ততই অস্থির হয়ে পড়েছিলেন। শরীর খারাপ বলে কোনো খোঁজখবরও নিতে পারেননি। রোজ অপেক্ষায় ছিলেন, এই বুঝি কণাকে নিয়ে মনসুর ফিরে এলো। কিন্তু দশ-বারো দিন পার হয়ে যাওয়ার

পরও যখন মনসুর ফিরে এলো না, তখন বাধ্য হয়েই তিনি রওয়ানা দিলেন গোবিন্দপুরের দিকে। মনে মনে তীব্র অভিমান, রাগ আর কষ্ট পুষেই আজাহার খন্দকার গোবিন্দপুর গিয়েছিলেন।

মনসুর গোবিন্দপুর যায়নি, এই খবর শোনার সাথে সাথেই ভয়াবহ বিপদের আশঙ্কায় বুকের ভেতরটা কেঁপে উঠেছিলো তার। কিন্তু আজাহার খন্দকার তখনো ভাবতে পারেননি যে সেই ভয়াবহ বিপদ মানে মনসুর আর নেই!

লাশ মাটি দেয়া হয়েছে খন্দকার বাড়ি জামে মসজিদের সামনে। ঘটনার পর থেকে আজাহার খন্দকার আর কোনো কথাবার্তা বলছেন না। তিনি পাথরের মূর্তির মতো বসে থাকেন ঘরের বারান্দায়। মইনুল হোসেন পরপর কয়েকদিন এসেও আজাহার খন্দকারের সাথে কোনো কথা বলতে পারেননি। তিনি ঘণ্টার পর ঘণ্টা আজাহার খন্দকারের সামনে চেয়ারে বসেছিলেন। কিন্তু আজাহার খন্দকার তার দিকে ফিরেও তাকাননি। যেন মইনুল হোসেনকে তিনি চেনেনই না। এই জীবনে দেখেনওনি কখনো।

এই ঘটনায় মইনুল হোসেন যারপরনাই বিচলিত। ভেদরগঞ্জ থেকে গোবিন্দপুরগামী লঞ্চে ডাকাতির খবর তারা পেয়েছিলেন। কিন্তু ডাকাতি হয়েছিলো কালীগঞ্জ বন্দর ছাড়িয়েও সুবর্ণপুর নদীর গভীরে। গোবিন্দপুর যেতে হলে বিপদসঙ্কুল ওই এলাকাটি পার হয়েই যেতে হয়। দুর্গম ওই অঞ্চলটি মইনুল হোসেনের আওতাভুক্ত নয়। ফলে ডাকাতির খবর তিনি পেয়েছিলেন ঘটনা ঘটারও দিন কয়েক পর। লঞ্চে যাত্রীদের সাথে ডাকাতদের সংঘর্ষ এবং সংঘর্ষে হতাহতের অস্পষ্ট খবরও তিনি পেয়েছিলেন। তবে ঘটনায় কতজন আহত বা নিহত হয়েছে সে বিষয়ে স্পষ্ট কোনো তথ্য তিনি পাননি। না পাওয়ার কারণ, লঞ্চে ভ্রমণকারী যাত্রীদের কোনো তালিকা কারো কাছেই ছিলো না।

আজাহার খন্দকারের বড় ছেলে মনসুরও যে ওই লঞ্চে ছিলো, সে বিষয়েও মইনুল হোসেন কিছুই জানতেন না। ফলে বিষয়টি আগ বাড়িয়ে নিজেদের কাঁধে নিতে চাননি তারা। এমনিতেই সাম্প্রতিক সময়ের নানা ঘটনায় তারা আছেন কোণঠাসা অবস্থায়। গুরুতর কিছু নাজুক পরিস্থিতির মুখোমুখিও তাদের হতে হয়েছে। সবকিছু মিলিয়ে বিষয়টিকে একভাবে চেপেই যেতে চেয়েছিলেন মইনুল হোসেন।

কিন্তু ঘুরেফিরে পুরো ঘটনাটিই আবার চলে এসেছে তার কাঁধে। চাইলেও এখন আর এই ঘটনার দায় তিনি পুরোপুরি এড়াতে পারেন না। মইনুল হোসেন অবশ্য এড়াচ্ছেনও না। বরং আজাহার খন্দকারের প্রতি এক ধরনের তীব্র

New Pdf download: www.PoragEducation.com + webtalkbd.com

সহানুভূতি অনুভব করছেন তিনি। একইসাথে নিজেকে পুরোপুরি ব্যর্থ এবং অপরাধীও মনে হচ্ছে তার। অনেক ভেবে চিন্তেও মইনুল হোসেন বুঝতে পারলেন না, হঠাৎ করেই ডাকাতদের এমন খুনে মানসিকতার হয়ে ওঠার কারণ কী? এর আগে নিকট অতীতে এমন খুন-খারাবিতে মেতে উঠতে দেখা যায়নি তাদের।

সেই দিনই মইনুল হোসেন জেলা পুলিশ সুপারের সাথে দেখা করতে গেলেন। ফিরলেন গভীর রাতে। পরদিন সকালে জেলা পুলিশ সুপারের বিশেষ চিঠি নিয়ে তিনি রওয়ানা হলেন ঢাকায়। ঢাকা থেকে ফিরলেন সাতদিন পর। তার সাথে ফিরলো পুলিশ কনস্টেবল নুরুন্নবীও।

নুরুন্নবীকে নবীগঞ্জ থানায় বিশেষ দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। তবে সেই বিশেষ দায়িত্ব আহামরি কিছু না। বরং তার জন্য অসম্মানজনকই। নুরুন্নবীর সাথে দীর্ঘ আলাপ আলোচনার পর তাকে রাজি করিয়েছেন মইনুল হোসেন, এখন থেকে নবীগঞ্জ থানায় রাধুনী হিসেবে কাজ করবে নুরুন্নবী। বিনিময়ে পুলিশের একজন সাধারণ কনস্টেবল হিসেবে যে সকল সুযোগ-সুবিধা, বেতন-ভাতা সে আগে পেতো, তার সবই বহাল থাকবে। তবে শর্ত হচ্ছে, অপ্রয়োজনে থানা থেকে বের হতে পারবে না সে।

মইনুল হোসেন অবশ্য যেকোনো উপায়ে নুরুন্নবীকে তার সাথে যুক্ত করতে চেয়েছিলেন। তার ইচ্ছে পূরণ হয়েছে। এখন বাকি বিষয়গুলো ঠিকঠাক গুছিয়ে আনতে হবে। কিন্তু এর জন্য সময় দরকার। দীর্ঘ সময়।

সমস্যা হচ্ছে মইনুল হোসেন কিছুই গুছিয়ে আনতে পারছেন না। আশেপাশে যত জায়গাতেই তিনি পুলিশ ফোর্স নিযুক্ত করে রেখেছিলেন, তারা তাকে আহামরি কোনো তথ্যই দিতে পারলো না।

প্রথমে মইনুল হোসেন ভেবেছিলেন, আজাহার খন্দকারের সাথে পূর্বশত্রুতার জের ধরেই তোরাব আলী লস্করের দল মনসুরকে খুন করেছে। সেক্ষেত্রে বাকি দুটি লাশের ক্ষেত্রেও একই রকম কোনো না কোনো কারণ থাকতে পারে। আর এই সন্দেহেই খুন হওয়া বাকি দুই লাশের পরিবারের সাথেও কথা বললেন তিনি। নানান খোঁজ-খবর নিলেন। কিন্তু কোন তথ্যই তারা দিতে পারলো না। বরং তারা জানালো, তাদের কারো সাথে কখনো কোনোধরনের সম্পর্কই ছিলো না তোরাব আলী লস্করের।

বিরক্ত, হতাশ মইনুল হোসেন ডেকে পাঠালেন ওসি একরামুল হককে। একরামুল হক বললেন, 'স্যার, সরাসরি চর এটাক করা ছাড়াতো আর কোনো উপায় নাই।'

মইনুল হোসেন বললেন, 'আপনি কী সুস্থ আছেন একরাম সাহেব? দুম করে কই এটাক করবেন আপনি? আপনি এগজ্যাক্ট লোকেশন চেনেন?'

'জে না স্যার।'

'তাহলে? আর এতদিন পর্যন্ত যেই কাজ কেউ কখনো করে নাই, সেই কাজই আমরা এখন এই পরিস্থিতিতে করবো? তারপর যদি আবারও ব্যর্থ হই, তখন?'

একরামুল হক অসহায় ভঙ্গিতে বললেন, 'কিন্তু কী করবো স্যার? সুস্থ থাহনের মতো কোনো অবস্থা কী তারা রাখছে? একের পর এক কী হইতেছে, এইগুলান কোনো কথা কন?'

মইনুল হোসেন হাল ছেড়ে দেয়ার ভঙ্গিতে বললেন, 'আপনাকে আর কী বলবো, আমার নিজেরই দিশেহারা লাগছে!' কিছুক্ষণ থম মেরে থেকে তিনি আবার বললেন, 'একটা কথা একরাম সাহেব।'

'জি স্যার।'

'কালীগঞ্জ বন্দরের সেই শরাফত মিয়ার কথা মনে আছে? ওই যে ডিসপেন্সারির লোকটা?'

'জে স্যার।'

'তারে আবার একটু ডাকেন, তার সাথে আমার জরুরি কথা আছে।'

একরামুল হক পরদিনই শরাফত মিয়াকে হাজির করলো। মইনুল হোসেন বললেন, 'আপনি বলছিলেন জোহরার সাথে যে বাচ্চা মেয়েটা ছিলো, সেটা জোহরার মেয়ে না?'

'না, ছার, তার মাইয়া না। লগের ছ্যামড়াডাও তার জামাই না।'

'তার মানে অন্য কারো বাচ্চা নিয়ে সে ডাক্তার দেখাতে এসেছিলো?'

'জে ছার।'

'কিন্তু কেন? সে কী চরের আর সব বাচ্চাকাচ্চাদেরও ডাক্তার দেখাতে নিয়ে আসে?' মইনুল হোসেন একরামুল হকের দিকে ফিরে তাকালেন, 'আপনার রিপোর্ট কী বলে? এর আগে তাকে কখনো এই ধরণের ঘটনায় দেখা গেছে?'

একরামুল হক বললো, 'জে না স্যার।'

'তার মানে এই ঘটনাটা কোনো কারণে বিশেষ ঘটনা। তাইতো? কিন্তু কী কারণে?'

মইনুল হোসেন অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে রইলেন। তারপর আচমকাই উঠে দাঁড়ালেন। একরামুল হক অবাক ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করলেন, 'কোনো সমস্যা স্যার?'

'আপনি এক কাজ করেন।'

'কী কাজ স্যার?'

'সেদিন নবীগঞ্জ থানায় এসে আমাদের আটকে রেখে নবীগঞ্জ বাজার থেকে জোহরা যেসব জিনিসপত্র নিয়ে গেছিলো, দোকান্দারদের সাথে কথা বলে তার একটা তালিকা বের করেনতো। প্রয়োজনে সবার কাছে আলাদা আলাদা জিজ্ঞেস করেন। পুরো লিস্ট আমার চাই।'

New Pdf download: www.PoragEducation.com + webtalkbd.com

একরামুল হক সাথে সাথেই উঠে দাঁড়ালেন। পরের সারাটা দিন তিনি দোকানিদের সাথে কথা বললেন। দুজন কনস্টেবল নিয়ে যতটা সম্ভব সঠিক একটা তালিকা তৈরি করলেন।

মইনুল হোসেন সেই তালিকা খুঁজে খুঁজে দেখলেন। চাল, ডাল, নুন, তেল, সাবান থেকে শুরু করে নানা ধরনের নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস সেই তালিকায় রয়েছে। তবে দুটো জিনিসে তার চোখ আটকে গেলো। এক, শীতের সময়ে খোলা বাজারের পুরনো জামা কাপড়ের দোকান থেকে সে একটা পুরনো ওভার কোট নিয়েছে। এবং দুই, বাচ্চাদের জামা-কাপড়ের দোকান থেকে এক জোড়া নতুন জামা ও জুতো নিয়েছে সে। দোকানির সাথে কথা বললেন মইনুল হোসেন। দেড় থেকে দুই বছর বয়সের বাচ্চাদের পোশাক ও জুতোও সেদিন নেয়া হয়েছে। সে নিজে সরাসরি নেয়নি। সম্ভবত বাহাদুর বা হানিফকে দিয়ে নিয়েছে।

মইনুল হোসেন বললেন, 'একরামুল সাহেব, একটা বিষয়তো স্পষ্ট যে বাচ্চাটার প্রতি তার আলাদা দুর্বলতা আছে?'

'কিন্তু স্যার, ওভারকোটওতো নিছে!'

'হুম। ওটা ধরেন সে তোরাব আলী লস্করের জন্য নিয়েছে। কিন্তু জামা আর জুতা যে সে সেই বাচ্চাটার জন্যই নিয়েছে, এটা আমি নিশ্চিত। এবং ওই বাচ্চাটা তার কাছে বিশেষ কিছু।'

'তাতে আমাগো লাভ হইলো কী?'

'একটা লাভতো আছেই।'

'কী লাভ?'

'বাচ্চাদের অসুখ-বিসুখ করে বেশি। সুতরাং আবারো কোনো না কোনো সময় ওই বাচ্চাকে নিয়ে তার কোথাও না কোথাও আসার সম্ভাবনা আছে। শুধু যে অসুখ বিসুখ হলেই আসবে, তাও না। আমার কেন যেন মনে হচ্ছে, ওই বাচ্চাটার জন্যই যেকোনো কারণেই হোক, সে আবারো আসবে। আসবেই।'

মইনুল হোসেনের কথা যে একরামুল হকের খুব পছন্দ হলো তা না। তবে বিষয়টি নিয়ে তিনিও ভাবতে শুরু করেছেন। মইনুল হোসেন হঠাৎ বললেন, 'আরেকটা কথা।'

'জি ছার?'

'দীঘানালা খালের আসামি ছিনতাইয়ের ঘটনায় হারাধনরেতো আপনি জিজ্ঞাসাবাদ করছিলেন?'

'জে স্যার।'

'সেই ফাইলটা আমাকে দেন।'

'ফাইলতো নাই স্যার। এমনি মুখে মুখে কথা হইছিলো।'

মইনুল হোসেন খুবই বিরক্ত হলেন। তিনি কঠিন গলায় বললেন, 'সমিলের মালিক হারাধনকে আমার লাগবে। তাকে খবর দেন।'

'কেন স্যার, সে আবার কী করছে?'

'কিছু করে নাই, কিন্তু তাকে আমার লাগবে।'

'কোনো সমস্যা স্যার?'

মইনুল হোসেন গম্ভীর গলায় বললেন, 'আমার এখন কেন যেন মনে হচ্ছে, সেইদিন দীঘানালার আসামি ছিনতাইয়ের ঘটনায় কোনো না কোনোভাবে হারাধনের একটা যোগসূত্র আছেই!'

একরামুল হক কিছুই বুঝলেন না। তিনি বড় বড় চোখ করে মইনুল হোসেনের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তবে মইনুল হোসেন তখন তাকিয়ে আছেন একরামুল হকের পেছনে দরজার দিকে। সেখানে দাঁড়িয়ে আছে নুরুন্নবী। কালো চাদরে নুরুন্নবীর মুখমণ্ডল ঢাকা।

New Pdf download: www.PoragEducation.com + webtalkbd.com

মনসুরের মৃত্যুর ঘটনা কণা শুনেছে মসজিদের মাইকে।

সুবর্ণপুর নদীতে তিন তিনটি লাশ পাওয়ার ঘটনায় চারদিকে তীব্র আতঙ্ক তৈরি হয়েছে। গ্রামে গ্রামে মসজিদের মাইকে ঘোষণা দিয়ে সাধারণ মানুষকে সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে। যদিও দেলোয়ার হোসেন কিংবা শাহিনা বেগম কেউই এই ঘটনা কণাকে বলার সাহস করে উঠতে পারেননি। পারার কথাও না। জগতে কন্যা সন্তানের বাবা মায়ের জন্য এর চেয়ে কঠিন কোনো কাজ আর হয় না।

কণা প্রথমে ঘটনা বিশ্বাস করেনি। সে ভেবেছিলো কোথাও একটা বড়সড় ভুল হচ্ছে। খুব বড়সড় ভুল। কিন্তু তারপর হঠাৎই তার মাথার ভেতরটা শূন্য হয়ে যেতে লাগলো। বুকের ভেতর কলিজা ছিঁড়ে ছিন্নভিন্ন হয়ে যাওয়ার মতো সর্বপ্লাবী ব্যথা, অবিশ্বাস্য তোলপাড়। মনে হচ্ছিলো মহাপ্রলয় হয়ে যাচ্ছে শরীর ও মস্তিষ্কজুড়ে। বুকের পাঁজর ভেদ করে ঢুকে যাচ্ছিলো অবর্ণনীয়, অসহনীয় যন্ত্রণা। মুহূর্তেই সবকিছু ভেঙেচুড়ে, টেনেহিঁচড়ে একাকার করে দিয়ে যেন সমূলে উপড়ে নিয়ে যাচ্ছিলো এক অসংজ্ঞায়িত অসীম শূন্যতা!

কণা দৌড়ে মার কাছে গেলো, তারপর বাবার কাছে। তারা দুজনই দাঁড়িয়েছিলেন স্তব্ধ, স্থির। তাদের কান্নাক্লান্ত টকটকে লাল চোখগুলো ছলছল করছে জলে। কণা আচমকা চিৎকার করে উঠলো। তীব্র এক চিৎকার। সেই চিৎকারের সাথে এই জগতের আর কোনো চিৎকারের তুলনা হয় না। তারপর আর কিছু মনে নেই কণার। টানা আটচল্লিশ ঘণ্টা যেন নিথর, নিষ্প্রাণ হয়ে পড়েছিলো সে।

জ্ঞান ফেরার পর তার অবস্থা হলো আরো ভয়াবহ। ক্রমাগত প্রলাপ বকতে শুরু করলো সে। কাউকে চিনতে পারলো না, কারো কথা বুঝতে পারলো না।

কখনো উন্মাদের মতো হাসছে, কখনো কাঁদছে। টানা তিনদিন না খেয়ে রইলো সে। চতুর্থদিন থেকে একনাগাড়ে খিঁচুনি শুরু হলো। শেষ অবধি কণাকে ভর্তি করতে হলো গোবিন্দপুর হাসপাতালে। দিনের পর দিন উচ্চমাত্রার ঘুমের ওষুধ আর ইনজেকশন দিয়ে ঘুম পারিয়ে রাখা হতে লাগলো তাকে।

মনসুরের লাশ নিয়ে যাওয়া হয়েছে নবীগঞ্জে। সেখানেই দাফন করা হলো তাকে। কিন্তু এর কিছুই জানতে পারলো না কণা। দিনের পর দিন সে অচেতন পড়ে রইলো হাসপাতালের বিছানায়। যেন মৃত এক মানুষ। হাসপাতালে ভর্তির তের দিনের মাথায় বাড়িতে নিয়ে আসা হলো কণাকে। কিন্তু কণার আচার-আচরণ তখনো অস্বাভাবিক। সে সারাক্ষণ বিড়বিড় করে মনসুরের সাথে কথা বলে। শুধু যে মনসুরের সাথে কথা বলে তা-ই না। সে কথা বলে তার পেটের সন্তানের সাথেও। তার ধারণা তার মেয়ে হবে। সে সেই মেয়ের সাথে কথা বলে। কণার ধারণা, তার মেয়েও তার কথার জবাব দেয়। কণা তার কাছে অভিযোগ করে, 'তোর বাবার কাণ্ডটা দেখলি?'

'কী কাণ্ড মা?'

'সেই যে গেলো, আর ফেরার নাম আছে?'

'বাবা কই গেলো মা?'

'বাজারে।'

'বাজারে কেন গেলো?'

'বাজারে গেলো আমার জন্য তেল আনতে। দেখেছিস আমার চুলের অবস্থা? আজ কতদিন হলো আমি চুলে তেল দেই না!'

'বাবাতো তোমার জন্য তেল আনতে যায় নি মা।'

'তাহলে কই গেছে।'

মেয়ে আর এবার জবাব দিলো না। কণাও খানিক চুপ করে রইলো। তারপর খানিক চিন্তা-ভাবনা করে আবার বললো, 'বয়স হয়ে গেছেতো, এইজন্য ভুল হয়ে যায়। তোর বাবাতো গেছে আমার জন্য কাজল আনতে! কতদিন চোখে কাজল দেই না!'

'বাবার বুঝি কাজল খুব পছন্দ?'

'খুব।'

'কিন্তু মা...?'

'কী?'

'বাবাতো কাজল আনতেও যায়নি।'

'কাজল আনতেও যায়নি?'

'উহু।'

'তাহলে কোথায় গেছে?' কণার এবার মন খারাপ হয়ে যায়।

New Pdf download: www.PoragEducation.com + webtalkbd.com

'বাবাতো গেছে দাদুবাড়িতে।'

'দাদুবাড়িতে!'

'হুম।'

'কেন?'

'তাতো জানি না মা।'

'কখন আসবে?'

'আর আসবে না মা।'

'আর আসবে না কেন?'

'তাতো জানি না।'

'তুই আসলে কিচ্ছু জানিস না। তোর বাবা ঠিক ঠিক চলে আসবে।'

'কবে আসবে মা?'

কণা এবার যেন চিন্তিত হয়ে পড়ে। সে দেয়াল থেকে ক্যালেন্ডার নামায়। তারপর ক্যালেন্ডারের পাতা থেকে দিন গুনে গুনে বের করার চেষ্টা করে, মনসুর কবে আসবে! কিন্তু ঘণ্টাখানেক যেতে না যেতেই তার মন খারাপ হয়ে যায়। সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করে। মনসুর কেন আসে না!

কণা যে একাই কাঁদে, তা না। কণার সাথে আরো কাঁদেন দেলোয়ার হোসেন ও শাহিনা বেগম। কণার কান্না দেখা যায়, তাদের কান্না দেখা যায় না। তারা কাঁদেন লুকিয়ে, আড়ালে-আবডালে।

কণার পেট ক্রমশই স্ফীত হতে শুরু করেছে। মনসুর মারা যাওয়ার প্রায় তিন মাস গত হয়েছে। প্রকৃতির নিয়েমেই ধীরে ধীরে সবকিছু স্বাভাবিকও হতে শুরু করেছে। কণাও খানিকটা। যদিও এখনো প্রায়ই উল্টাপাল্টা বকে সে। হঠাৎ হঠাৎ পাগলের মতো আচার আচরণ করে। কিন্তু বেশির ভাগ সময়ই চুপ করে থাকে। কারো সাথে কথা বলে না। তবে পরিস্থিতির সাথে মানিয়ে নেয়ার চেষ্টা করছে সেও।

আসলে কণা যা করে, তা হলো মনসুরের বিষয়টা ভুলে থাকার চেষ্টা। সে ভাবতে চেষ্টা করে, মনসুর কোথাও না কোথাও আছে। হয়তো দূরে কোথাও। হয়তো তার ফিরতে দেরি হচ্ছে। কিন্তু সেই ভাবনা বেশিক্ষণ স্থায়ী হয় না। যখনই তার মনে পড়ে মনসুর সত্যি সত্যিই আর কোথাও নেই, তখনই তার বাঁধ ভেঙে যায়। সে তখন হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ে। কিংবা হয়ে যায় খুনি, উন্মাদিনী!

চার মাসের মাথায় হঠাৎ একদিন গোবিন্দপুরে এসে হাজির হলেন আজাহার খন্দকার। কিন্তু তার উপস্থিতি যেন খুব একটা খুশি করতে পারলো না কাউকে। বরং দেলোয়ার হোসেন, শাহিনা বেগম দুজনই কেমন আড়ষ্ট হয়ে রইলেন। আজাহার খন্দকারও যেন নিষ্প্রভ, নির্জীব এক মানুষ। তবে কোনো ভূমিকা না করে আলাপটা সরাসরিই তুললেন আজাহার খন্দকার, 'বেয়াই সাহেব, কথাটা এহন

উঠুক আর পরে উঠুক, উঠতোই। এইজন্যই আমি তিন-চাইর মাস অপেক্ষা করলাম। কিন্তু আপনেরাতো কোনো যোগাযোগ করলেন না। এইজন্য আমিই আইলাম।'

দেলোয়ার হোসেন এবং শাহিনা বেগম চুপচাপ বসে আছেন। আজাহার খন্দকার একবার তাদের মুখের দিকে তাকিয়ে প্রতিক্রিয়া বোঝার চেষ্টা করলেন। কিন্তু তারা নির্বিকার। আজাহার খন্দকার বললেন, 'পোলা গেছে আমার, আমি বুঝি, বাপের কী কষ্ট! এই কষ্ট আমি আপনেগো বুঝাইতো যাবো না। কারণ, যার সন্তান যায় নাই, সে কোনোদিন আমার কষ্ট বোঝবো না।'

তিনি একটু থেমে নিজেকে সামলানোর চেষ্টা করলেন। তারপর বললেন, 'আপনের মাইয়া আমার ঘরের বউ। তার প্রতি আমার একটা দায়িত্ব আছে। তার ওপরে তার গর্ভে আমার বংশের সন্তান। এহন এইটা ভুইলা গেলেতো চলবো না।'

দেলোয়ার হোসেন দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, 'চাইলেই কী সবকিছু ভুলে যাওয়া যায়, বলেন?'

'না, তা যাওন যায় না। তা গেলেতো মানুষ ভালোই থাকতো। কোনো কষ্ট থাকতো না মাইনষের। আল্লায় মাইনষের মনে মাইনষের লাইগ্যা মায়া দিছে, দয়া দিছে, আবার সেই মানুষ কাইড়া নিয়া কষ্ট দেওনের ব্যবস্থাও রাখছে। এ কেমন বিচার তার!'

দেলোয়ার হোসেন চুপ। চুপ শাহিনা বেগমও। আজাহার খন্দকার এবার আসল কথাটা বললেন, 'এতদিন হইলো আমার পোলাডা মরলো, কিন্তু বউডারে একবার তার কবরের সামনে দাঁড়া করাইতে পারলাম না। এহন তারে আমি নিয়া যাইতে চাই।'

দেলোয়ার হোসেন বললেন, 'কণার শরীরটা ভালো না। এই শরীরে সে কোথাও যাইতে পারবো না।'

'সবই আল্লাহপাকের হাতে বেয়াই। এতগুলা দিন গেলো, সে তার স্বামীর কবরডাও দেখতে গেলো না। মানুষ মইরা গেলেও তার আত্মা কিন্তু মরে না। তার আত্মা ঘুইরা-ফিরা সব দ্যাহে। তার জন্য দুইডা সুরা-কালাম পইড়া দোয়া করলেও সে খুশি হয়, শান্তি পায়। সবচাইতে বেশি শান্তি পায় তার আপন মানুষরা তার লাইগ্যা কানলে। দোয়া-দরুদ করলে। আমার পোলার আত্মাডা কত কষ্ট পাইতেছে, জানেন? এতদিনেও তার বউডা একবার তার কবরে গিয়া একটু সুরা-কালাম পড়লো না। আল্লাহর কাছে হাত দুইডা তুইলা একটু দোয়া-মোনাজাত করলো না!'

দেলোয়ার হোসেন বললেন, 'কণার ওপর দিয়ে এই কটা মাস কী গেছে, তা শুধু আমরা দুজন জানি। সে নিজেও জানে না। কারণ, এই কয়টা মাস তার

New Pdf download: www.PoragEducation.com + webtalkbd.com

পুরাপুরি হুঁশও ছিলো না। এই দিন কয়েক হলো একটু সুস্থ। এতদিন সে মানুষ দেখলেও চিনতে পারতো না।'

একটু থেমে দেলোয়ার হোসেন ভারী গলায় বললেন, 'আপনার ছেলে কী আমাদের ছেলে না ভাই? বরং আপনার ছেলে আমাদের কাছে ছেলের চাইতেও বেশি। কারণ তার সাথে আমাদের মেয়ের ভাগ্য, তার পরিচয় সব জড়িত। শুধুতো তার ভাগ্য-পরিচয়ই না, তার পেটের বাচ্চাটারও। আপনি ভাবছেন...।'

দেলোয়ার হোসেন তার কথা শেষ করতে পারলেন না। কান্নায় কথা জড়িয়ে এলো তার। শাহিনা বেগম এগিয়ে এসে দেলোয়ার হোসেনের কাঁধে হাত রাখলেন। দেলোয়ার হোসেনের চোখে পানি। তিনি হাতের উল্টো পিঠে সেই পানি মুছে বললেন, 'সন্তান হারানো বাবার কষ্ট যেমন সন্তান না হারানো বাবা পুরোপুরি বুঝবে না, তেমনি আজকে আমার জায়গায় থাকা বাবার কষ্টও আমার জায়গায় না থাকলে কেউ বুঝবো না। কত বয়স আমার মেয়েটার! এই সেইদিনও সে... ।'

তিনি এবার আর নিজেকে সামলাতো পারলেন না। হাউমাউ করে কাঁদতে লাগলেন। কাঁদতে লাগলেন শাহিনা বেগম আর আজাহার খন্দকারও।

দীর্ঘসময় পর দেলোয়ার হোসেন বললেন, 'এই মেয়েটার কথা চিন্তা করলে আমার দুনিয়া অন্ধকার হয়ে যায় ভাই। আমি আর কিছু চিন্তা করতে পারি না। একজন না হয় মরে গিয়ে আমাদের কষ্টে রেখে গেলো। কিন্তু এই মেয়েটার কথা একবার ভাবেন? এর সারাটা জীবন পড়ে আছে। এ কিসের মধ্যে পড়লো? এর অবস্থাতো মৃত্যুর চাইতেও খারাপ!'

দেলোয়ার হোসেনের কথা মিথ্যে নয়। আজাহার খন্দকার যে বিষয়টা বোঝেন না, তা না। কিন্তু কী করবেন তিনি! গত কিছুদিন ধরে মনে মনে একটা ভয়ও হচ্ছে তার, দেলোয়ার হোসেন যদি কণাকে আর না দেন! এই ভয় নিয়েই তিনি এতদিন অপেক্ষা করেছিলেন। শেষ পর্যন্ত আর থাকতে না পেরে চলে এসেছেন। কিন্তু আজাহার খন্দকার এও জানেন, কণাকে যদি দেলোয়ার হোসেন আর না দিতে চান, তাহলে কিছু করার থাকবে না তার। কোন অধিকারে তিনি কণাকে ধরে রাখতে চাইবেন? এইটুক বয়সের একটা মেয়েকে কিসের ভিত্তিতে আটকে রাখবেন তিনি? সারাটা জীবন সামনে পড়ে আছে তার!

আজাহার খন্দকার উঠে এসে দেলোয়ার হোসেনের পাশে বসলেন। তারপর বললেন, 'এগুলা নিয়া চিন্তা করনের অনেক সময় সামনে পইড়া আছে। আপনের মাইয়ারেতো আমি নিজের মাইয়া ছাড়া কিছু কোনোদিন ভাবি নাই। আপনেই বলেন ভাবছি?'

দেলোয়ার হোসেন চুপ করে রইলেন। জবাব দিলেন না। আজাহার খন্দকার বললেন, 'ভাবি নাই। তার ভালো-মন্দ দেহনের দায়িত্ব আপনের যতটুক, আমারও

কম না। সে আমার নিজের মাইয়ার চাইতে কম কিছু না। বিশ্বাস না হইলে তারে আপনে জিজ্ঞেস করতে পারেন।'

দেলোয়ার হোসেন মৃদু কণ্ঠে বললেন, 'আমি জানি ভাই সাহেব। সে আমাকে সবই বলেছে।'

এই কথায় আজাহার খন্দকার যেন একটু গলায় জোর পেলেন। তিনি গলায় খানিক উষ্ণতা মিশিয়ে বললেন, 'ভাইজান, তাইলে এই সময় মাইয়াডারে কয়ডা দিনের লাইগ্যা একটু আমারে দেন। সে তার স্বামীর কবরডা একটু দেইখ্যা আসুক। সে তো জানে, আমার মনসুর তারে কইলজার টুকরা কইরা রাখছিলো। তারে সে...।'

আজাহার খন্দকার আবারো কাঁদলেন। তারপর খানিক ধাতস্থ হয়ে বললেন, 'আমি জানি বেয়াই সাব, তার আত্মাটা সারাক্ষণ অপেক্ষা কইরা আছে, কহন কণা একটু গিয়া তার কবরের পাশে দাঁড়াইবো। কহন গিয়া একটু দোয়া-দরুদ পড়বো। আমি আপনেরে কথা দিতেছি, আমি নিজে সপ্তাহখানেকের মইধ্যে আবার তারে এইহানে দিয়া যাবো।'

দেলোয়ার হোসেন অবশ্য আপত্তি করলেন না। তিনি আজাহারের খন্দকারের সাথে কণাকে যেতে দিলেন। তবে কণাকে একা ছাড়লেন না তিনি। নিজেও তাদের সাথে নবীগঞ্জে গেলেন।

সবাই ভেবেছিলো কণা বুঝি খুব কান্নাকাটি, চিৎকার চেঁচামেচি করবে। পাগলামি করবে। কিন্তু সবাইকে অবাক করে দিয়ে কণা সেসবের কিছুই করলো না। সে খুব স্বাভাবিক ভঙ্গিতে মনসুরের কবরের কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। তারপর চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলো দীর্ঘসময়। কোনো কথা নেই, শব্দ নেই, কান্না নেই। চোখের পলক অবধি পড়লো না তার। সে ঠায় দাঁড়িয়ে রইলো ঘন্টার পর ঘণ্টা। মাগরিবের আজান পড়তে তাকে সেখান থেকে সরিয়ে নিয়ে গেলেন আজাহার খন্দকার। তারপরের কয়েকটা দিন আর কণাকে কোথাও দেখা গেলো না। সারাক্ষণ ঘরের ভেতর দরজা বন্ধ করে বসে রইলো সে। যেন একা এক বিচ্ছিন্ন নির্বাসিত মানুষ সে।

পরের সপ্তাহের শুরুতেই গোবিন্দপুর ফিরে যাবে কণা আর তার বাবা। আজাহার খন্দকারের অবশ্য খুব ইচ্ছে হচ্ছিলো, কণাকে আর কটা দিন রেখে দেয়ার। এই ঘর-বাড়ি, এই পথ-ঘাট-মাঠ, এই জীবন প্রতিমূহূর্তে অসহ্য এক যন্ত্রণার নাম হয়ে দাঁড়িয়েছে আজাহার খন্দকারের কাছে। কণার এই সামান্য উপস্থিতিটুকুও যেন সেখানে খানিকটা বিরাম চিহ্ন এঁকে দিয়েছিলো। কিন্তু অনেক ভেবে-চিন্তে নিজেকে সংযত করলেন তিনি। আসলে সাহস করে দেলোয়ার হোসেনকে কথাটা বলতে পারলেন না।

New Pdf download: www.PoragEducation.com + webtalkbd.com

পরদিন বিকেলে লঞ্চ। দীর্ঘ যাত্রার কথা ভেবে রাতে তাড়াতাড়িই শুয়ে পড়লো সবাই। কিন্তু মাঝরাতে ঘুম ভেঙে গেলো দেলোয়ার হোসেনের। সুনসান নিস্তব্ধতা ভেঙে কারো পাঁজর ভাঙা কান্নার তীব্র করুণ সুর ভেসে আসছে রাতের বাতাসে। তিনি আজাহার খন্দকারকে ডেকে তুললেন। তারপর দুজনই পাগলের মতো ছুটে গেলেন কণার ঘরে। কিন্তু কণার ঘরের দরজা তখন হাট করে খোলা। দৌড়ে বাড়ির উঠানে নেমে এলেন তারা। তারপর অন্ধকারে ছুটে গেলেন কান্নার শব্দ লক্ষ্য করে। মসজিদের পশ্চিম দিকের জানালা গলে আসা মৃদু আলোয় আজাহার খন্দকার দেখতে পেলেন, মনসুরের কবরটাকে দু হাতে বুকের সাথে আঁকড়ে ধরে চিৎকার করে কাঁদছে কণা। কান্নার সাথে সাথে থরথর করে কাঁপছে তার শরীরটাও। সে চেষ্টা করছে কান্নাটাকে চেপে রাখতে, কিন্তু পারছে না। যেন জগতের সকল ব্যথা পুঞ্জিভূত হয়ে আছে তার ওই ছোট্ট বুকের ভেতর। সে চেষ্টা করছে ব্যথাটাকে আটকে রাখতে, কিন্তু ওই সীমাহীন যন্ত্রণা আটকে রাখার সাধ্য তার নেই। কণা কাঁদছে। তার সেই কান্নায় ভেসে যাচ্ছে রাতের অন্ধকার, ভেসে যাচ্ছে নিঃসীম শূন্য চরাচর।

অন্ধকারের আড়াল থেকে তার সেই তীব্র কান্নার স্রোতে ভেসে যাচ্ছেন দুজন অসহায় বৃদ্ধ পিতাও।

হারাধন বসে আছে মইনুল হোসেনের সামনে। মইনুল হোসেন বললেন, 'কী অবস্থা? আছেন কেমন?'

'শইলখান বিশেষ ভালো না।'

'কেন কী হয়েছে?'

হারাধন খকখক শব্দ করে কাশলো, 'বারো মাইস্যা কাশির ব্যারাম। কাশতে কাশতে জান শ্যাষ।'

'আপনের অবস্থাতো দেখি খুবই খারাপ। এত কাশি হইলে বাঁচবেন ক্যামনে? ওষুধ পত্র কিছু খান না?'

হারাধন উঠে গিয়ে জানালা দিয়ে থুতু ফেললো। তারপর বললো, 'ওষুধ খাইতে খাইতে প্যাটের মধ্যে ফার্মেসি বানাই ফেলছি। এহন আর ওষুধে কাম হয় না।'

'এই কাশি কবে থেকে?'

হারাধনের মুখখানা যেন মলিন হয়ে গেলো। সে গম্ভীর গলায় বললো, 'জেলখাটা আসামি আমি। তাও মার্ডার কেসের। মিথ্যা মামলায় জেল খাটছি। সেই জেল খাটনের সময় থেইক্যাই এই অবস্থা। একবার রিমান্ডে নিয়া এমন মাইর মারলো, পরান যায় যায় অবস্থা। তহন শীতকালের দিন। মরার মতোন ফালাই রাখলো ঠাণ্ডা মাটিতে। সেই শুরু জ্বর, কাশি। জ্বর ভালো হইলো, কিন্তু সেই কাশি আর ভালো হইলো না।'

মইনুল হোসেন বললেন, 'কাশি ভালো হবার একটা ওষুধ কিন্তু আমার জানা আছে।'

New Pdf download: www.PoragEducation.com + webtalkbd.com

হারাধন মুখ তুলে তাকালো, 'কী ঔষধ?'

'আবার রিমান্ড।'

হারাধন ম্লান হাসলো, 'কী যে কন ছার?'

মইনুল হোসেন বললেন, 'কেন, শোনেন নাই, ব্যথায় ব্যথা নাশ? এক রিমান্ডে কাশি শুরু, আরেক রিমান্ডে শেষ। সহজ সমাধান।'

হারাধন আবারো হাসলো, 'আপনে ছার মানুষটা রসিক আছেন।'

মইনুল হোসেন এবার ঠাণ্ডা গলায় বললেন, 'আমি আপনরা সাথে রসিকতা করছি না। তবে আপনি রিমান্ডে যাবেন কী না সেটা আপনার সিদ্ধান্ত। কাশি চিরতরে বন্ধ হয়েও যেতে পারে।'

হারাধন নড়েচড়ে বসলো, 'কোনো সমস্যা ছার?'

'তোরাব আলী লস্করের সাথে আপনার কী সম্পর্ক?'

'তোরাব আলী লস্করের সাথে! কী কন ছার? তার লগে আমার কী সম্পর্ক থাকবো! তার নাম শুনলেইতো...।'

'কী? ভয়ে হাড়ে হাড়ে কাঁপন লাগে?' যেন হারাধনের শেষ না করা কথা নিজেই শেষ করে দিলেন মইনুল হোসেন।

'তারে দশ গ্রামের সকলেই ডরায় ছার।'

'কিন্তু আপনেতো ডরান না। আপনার অবশ্য ডরানোর কথাও না।'

হারাধন বিগলিত গলায় বললো, 'ডরাবো না ক্যান ছার? তারে আরো আমি বেশি ডরাই।'

মইনুল হোসেন হারাধনের চোখে চোখ রেখে বললেন, 'ক্যান? একসাথে জেল খাটছিলেন দেখে?'

এই প্রথম হারাধন সতর্ক হয়ে গেলো। সে বুঝতে পারছে, মইনুল হোসেন খোঁজখবর নিয়েই তাকে ডেকেছেন। নিশ্চয়ই গুরুতর কোনো ব্যাপার আছে। সে বললো, 'সেতো ছার ভয়ংকর মানুষ। তার আশেপাশে কেউ গেলে তার ভয় আরো বাইড়া যাইবো দশগুণ।'

'আর তাকে দেখলে?' মইনুল হোসেন চোখের ইশারায় পেছনের দরজার দিকে ইঙ্গিত করলেন। হারাধন চট করে পেছনে মাথা ঘুরিয়ে তাকালো।

মইনুল হোসেন বললেন, 'তাকে দেখলে ভয় কয়গুণ বাড়বে বলে মনে হয়?'

পেছনের দরজায় নুরুন্নবী তার বিভৎস চেহারা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। প্রথম দর্শনে হারাধনের মনে হলো সে চোখে ভুলভাল কিছু দেখছে। কিন্তু চিৎকার করতে গিয়েও নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করলো হারাধন। কারণ, নুরুন্নবীর পেছনেও একটা লোক দাঁড়িয়ে আছে। ওই লোকটাকে সে চেনে। চুন্নু মিয়া। চুন্নু মিয়া তার করাত কলের গাছকাটা শ্রমিক। সে অসহায় এবং ভীত চোখে তাকিয়ে আছে হারাধনের দিকে। তার চোখের নিচে কালশিটে দাগ পড়ে গেছে। ঠোঁটের কোণায় রক্ত।

মইনুল হোসেন বললেন, 'চুন্নু মিয়ারেতো আপনি চেনেনই। চেনেন না?'

'জে ছার।'

'সে আপনার স'মিলে কাজ করে?'

'জে ছার।'

'তোরাব আলী লস্করের লোকেরা যে দীঘানালার খাল থেকে আসামি ছিনিয়ে নিয়ে গেলো, আপনার মনে আছে?'

'জে ছার।'

'সেইদিন দীঘানালা খালের ওপর থেকে যে গাছের গুঁড়িগুলো তারা ফেলেছিলো, সেই গুঁড়িগুলোতো তারা আপনার স'মিল থেকেই নিয়েছিলো, নাকি?'

হারাধন থতমত খাওয়া গলায় বললো, 'আমি কী কইরা বলবো ছার? আমিতো আর চব্বিশ ঘণ্টা স'মিলে থাহি না। আর কহন কোন গাছ আহে, কে আনে, কোনদিকে যায়, সেইটাও আমি জানি না ছার।'

মইনুল হোসেনের ঠোঁটের ফাঁকে মৃদু হাসি। তিনি হাসিটুকু ঠোঁটে ঝুলিয়ে রেখেই বললেন, 'আপনি না জানলে কী হবে, চুন্নু মিয়াতো জানে। জানে না?' প্রশ্নটা ছুঁড়ে দিয়েই একটু থামলেন মইনুল হোসেন। তারপর গভীর দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করতে লাগলেন হারাধনকে। হারাধন অবশ্য তার প্রশ্নের উত্তর দিলো না। মইনুল হোসেনই আবার বললেন, 'চুন্নু মিয়াকে এইখানে দেখার পরও আপনি এইভাবে মিথ্যা কথা বলবেন, এইটা আমি আশা করি না হারাধন মল্লিক।'

হারাধন কাঁচুমাচু গলায় বললো, 'আমি মিথ্যা কেন বলবো ছার? আমি মিথ্যা বলতেছি না।'

মইনুল হোসেন কথা বললেন না। চুপ করে হারাধনের চোখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর সাপের মতো হিসহিসে গলায় বললেন, 'ওইদিন আপনার স'মিল থেকে যে ছয়খান গাছের গুঁড়ি নিয়ে যাওয়া হয়েছিলো দীঘানালায়, সেগুলো অতদূর কে নিয়ে গিয়েছিলো? হানিফ, জোহরা আর হামিদুলের পক্ষে কী সম্ভব ছিলো? ছিলো না। তারপরও ধরে নিলাম, ট্রলারের সাথে বেঁধে পানিতে ভাসিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিলো। কিন্তু খালের দুই ধারে অতো উঁচুতে সেইগুলো ওঠানো হলো কীভাবে?'

হারাধন এবার আর উত্তর দিলো না। মইনুল হোসেন বললেন, 'গাছের গুঁড়িগুলো ওখানে নেয়ার জন্য অন্তত একজন এক্সপার্ট লোক দরকার ছিলো তাদের। অনেকদিন থেকে গাছ কাটে, বিভিন্ন জায়গা থেকে বড় বড় গাছ আনা

New Pdf download: www.PoragEducation.com + webtalkbd.com

নেওয়া করে এমন কেউ একজন। আপনি তখন চুন্নুরে দিলেন তাদের সাহায্য করার জন্য, না?'

হারাধন চুপ করে রইলো। মইনুল হোসেন চোখের ইশারায় চুন্নুকে ঘরে ঢুকতে বললেন। তারপর বললেন, 'হারাধন মল্লিক, আপনি যেই অপরাধ করছেন, তার শাস্তি আপনি জানেন?'

হারাধান এবারও জবাব দিলো না। মইনুল হোসেন বললেন, 'চুন্নুর চেহারার দিকে তাকালেই আপনি বুঝবেন, আপনার আসল শাস্তির আগে সাধারণ শাস্তি কী হতে পারে। বলছিলাম না, আপনার কাশি চিরতরে বন্ধ হয়ে যাবে?'

হারাধন এবার বেপরোয়া ভঙ্গিতে নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করার চেষ্টা করলো। সে বললো, 'ছার, আপনারে এইসব কথা চুন্নু বলছে? আমার কত শত্রু, তাতো জানেনই। হাচা মিছা, কত কথা কতজন কয়। আমিতো এইসবের কিছুই জানি না।'

মইনুল হোসেন হাতের ইশারায় হারাধনকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, 'শোনেন, চুন্নু মিয়ার দোষ দিয়ে লাভ নেই। আপনাকে ধরে যদি আমি নুরুন্নবীর ওই চেহারার সামনে হামান দিস্তাসহ ছেড়ে দেই, তাহলে আপনি নিজেও কিছু লুকাই রাখতে পারবেন না। চুন্নুর দোষ দিয়ে লাভ নেই। সে আগের মতোই আপনার বিশ্বস্ত মানুষ। কিন্তু মাইরের সামনে বিশ্বস্ত থাকা সহজ কাজ না। ওইটা আপনিও পারবেন না। বুঝলেন?'

হারাধন চুপ করে রইলো। মইনুল হোসেন বললেন, 'এই বয়সে আমি আপনারে মারধরের পক্ষে না। এমনকি কোনো ঝামেলারও পক্ষে না। এমনিতেই আপনি অতোগুলো বছর শুধু শুধু জেল খাটছেন। তবে এই যে আমি আপনাকে কোনো ঝামেলায় ফেলবো না, এর বিনিময়ে আমার জন্য আপনাকে কিছু করতে হবে।'

অনেকক্ষণ পর কথা বললো হারাধন, 'কী?'

'আপনার সাথে তোরাব আলী লস্করের লোকেদের একটা নিয়মিত যোগাযোগ আছে। এই কথাতো সত্য?'

হারাধন আবারো চুপ। মইনুল হোসেন তার মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললেন, 'কী? কথা সত্য?'

হারাধন এবার প্রায় কাঁদো কাঁদো গলায় বললো, 'ছার, যা হইছে ভুল হইছে। আর হইবো না। আইজকার পর থেইকা আর কোনোদিন এমন কিছু হইবো না। কোন যোগাযোগ না, কোনো কাম কাইজ না, কিচ্ছু না।'

মইনুল হোসেন মৃদু হাসলেন। তারপর বললেন, 'উহু। যোগাযোগতো আপনাকে রাখতেই হবে।'

হারাধন অবাক গলায় বললো, 'জি ছার?'

'মানে এখন থেকে আরো বেশি বেশি যোগাযোগ রাখতে হবে। তারা যোগাযোগ কমিয়ে দিলে, আপনাকে নিজ থেকে যোগাযোগ বাড়ানোর উদ্যোগ নিতে হবে। যেভাবেই হোক, এটা আপনাকে করতেই হবে। আর যোগাযোগের ক্ষেত্রে আগের চেয়ে আরো বেশি রেগুলার হতে হবে। তবে শর্ত একটাই, সেটা হচ্ছে, এই সবকিছুর খবর কিন্তু সবার আগে আমার চাই।'

হারাধন এতক্ষণে ঘটনা বুঝতে পারলো। মইনুল হোসেন তার চেয়ার থেকে উঠে এসে হারাধনের পাশে এসে দাঁড়ালেন। তারপর হারাধনের কাঁধে তার হাত রেখে বললেন, 'এই বুড়ো বয়সে আপনার কোনো অসুবিধা হোক আমি চাই না। বরং আপনার যেকোনো অসুবিধায় আপনি আমাকে পাশে পাবেন। কিন্তু এই কাজটা আপনাকেই করতেই হবে।'

হারাধন শেষ চেষ্টাটা করলো, 'কিন্তু ছার, এই কাজ করতে গেলে যদি তারা আমার বড় কোনো ক্ষতি করে?'

মইনুল হোসেন হাসলেন। তবে তার সেই হাসি ভয়ংকর। তিনি তাকিয়ে আছেন সাপের মতো ঠাণ্ডা চোখে। তারপর বললেন, 'আর আপনি যদি এইটা না করেন, তাহলে তাদের চেয়ে আরো বড় ক্ষতি আমি আপনার করবো। এই বিষয়ে আপনি নিশ্চিত থাকেন। এখন সিদ্ধান্ত আপনার।'

New Pdf download: www.PoragEducation.com + webtalkbd.com

শীত শেষে বসন্তও যাই যাই করছে।

কণা পা ছড়িয়ে বসে আছে দোতলার বারান্দায়। মাস ছয়েকের গর্ভবতী সে। তার পেট আরো স্ফীত হয়েছে। আজকাল নড়তে-চড়তে কষ্ট হয় তার। শাহিনা বেগম খুব একটা দোতলায় আসতে দিতে চান না তাকে। কণা তাও আসে। বিকেলের দিকে একটা ভীষণ সুন্দর ফুরফুরে হাওয়া বয়ে যায় এখানে। তখন দোতলার কাঠের রেলিং এ হাত পা ছড়িয়ে বসে থাকতে খানিক ভালোই লাগে তার। সে এখন মোটামুটি সুস্থ। কিন্তু তারপরও এমন একলা থাকার সময়গুলোতেই আজকাল যেন খানিকটা ভালো লাগে কণার।

এই সময়টাতে মনসুরের সাথে কথা বলা যায়। সে যখন একা একা থাকে, তখন মনসুরের সাথে কথা বলে। বাইরের কেউ দেখলে ভাববে নির্ঘাত পাগল হয়ে গেছে সে। কিন্তু কণা জানে, কাজটা সে ইচ্ছে করেই করে। নিজের প্রতি পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ তার আছে। নিজের ওপর যতক্ষণ মানুষের নিয়ন্ত্রণ থাকে, ততক্ষণ সে পাগল হয় না। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে মানিয়ে নেয়া। মনসুর নেই এই বিষয়টির সাথে কণা মানিয়ে নিয়েছে। তবে এমন একা থাকার সময়টাতে মনসুরের সাথে কথা বলতে তার ভালো লাগে। এই বিষয়টির সাথেও সে মানিয়ে নিয়েছে। বিষয়টা এমন নয় যে সে রোজই কথা বলে। যখন তার খুব মন ভালো থাকে, কিংবা খুব বেশি খারাপ থাকে তখন সে মনসুরের সাথে কথা বলে। তবে সে চাইলে কথা না বলেও থাকতে পারে। এতে যে তার খুব একটা অসুবিধা হয়, তাও নয়।

যদিও শাহিনা বেগমের ধারণা কণা পাগল হয়ে যাচ্ছে। বিষয়টি নিয়ে দেলোয়ার হোসেনও অস্থির হয়ে আছেন। কিন্তু বাচ্চাটা হয়ে যাওয়ার আগে এই নিয়ে আপাতত কোনো কথা বলতে চান না তিনি।

মনসুরের সাথে কণার কথা বলার এই বিষয়টি শুরু হয়েছে মাস দুয়েক আগে সে নবীগঞ্জ থেকে ফেরার পর। পুরনো জামা-কাপড়ের ব্যাগ গোছাতে গিয়ে হঠাৎই খামটা পেলো কণা। সেবার চলে আসার আগের রাতে মনসুর তাকে দিয়েছিলো। তারপর নানা কারণে খামের কথা ভুলেই গিয়েছিলো সে। খামের ভেতর কতগুলো এক শ আর পাঁচ শ টাকার নোট। কিন্তু কণা জানতো, একটা চিঠিও রয়েছে। সে খুঁজছিলো সেই চিঠি।

কণা ভেবেছিলো মনসুর ছোটখাটো একটুকরো চিরকুট হয়তো দিয়েছে। কিন্তু দেখা গেলো আদতে মোটেই তা নয়। খামের ভেতর আরেক খাম। সেই খামের ভেতর যত্ন করে ভাঁজ করে রাখা বিশাল এক চিঠি। চিঠিতে মনসুর লিখেছে–

'এই যে কন্যা অভিমানী,

আমার আসতে যদি আরো কটা দিন দেরি হয়ে যায়, তাহলে কী খুব বেশি রাগ হবে তোমার? কী, সাথে সাথেই রাগ হয়ে গেলোতো? একদম প্রথম লাইন পড়েই? আচ্ছা শোনো, আমি চেষ্টা করছি যত তাড়াতাড়ি চলে আসা যায়। আসলে হয়েছে কি জানো, এত এত উটকো ঝামেলা এসে জুটে গেছে চারপাশে, চাইলেও সব ছাড়াতে পারি না। আর জানোইতো, আমি মানুষটা খুব একটা কাজের না!

আচ্ছা, আমাকে ছাড়া একা একা আর কটা দিন বেশি থাকতে কী খুব বেশি কষ্ট হবে তোমার? আমার না এটা খুব জানতে ইচ্ছে করে, ঠিক কতটা কষ্ট হবে? ঠিক কতদিন আমাকে ছাড়া একা একা থাকতে পারবে তুমি?

আচ্ছা, যদি এমন হয় যে আমি আর কখনোই না আসি! আমি মাঝে মাঝে এটা ভাবি জানো? এই যে আমরা দুটো মানুষ, এক মুহূর্তের জন্য পরস্পরকে ছেড়ে দূরে থাকতে পারি না, সেই মানুষ দুজন যদি হঠাৎ করে কখনো আলাদা হয়ে যাই? যদি কেউ কাউকে আর কখনোই দেখতে না পাই, তখন কেমন লাগবে?

আমার ওপর খুব রাগ হচ্ছে, তাই না? কী করবে বলো, আমিতো খানিক এমনই। অদ্ভুত, উদ্ভট! তুমি কী জানো, এসব ভেবে ভেবে আমি কবিতাও লিখে ফেলেছি?

'ঝরা পালকের মতো, ঝরে যদি যাই?
হলুদ পাতার মতো, মরে যদি যাই?
যদি শূন্য এ রাতের মতো হয়ে যাই চুপ?
যদি তোমাকে না ডাকি আর?
তুমি কি তখন এই আমার মতো,
খুঁজে পাবে কাউকে আবার?'

কন্যা অভিমানী, খুব খুব রাগ হচ্ছে? নাকি কান্না পাচ্ছে? শোনো, তোমাকে ছেড়ে কোথায় যাবো আমি? থাকতে পারবো এক মুহূর্ত? উহু, পারবো না। সেবার কী হয়েছে বলি, আমি কালীগঞ্জ গেলাম না? ঔষধ আর কিছু ডাক্তারি জিনিসপত্র

New Pdf download: www.PoragEducation.com + webtalkbd.com

আনতে? ওরা বললো, ওগুলো ফুরিয়ে গেছে, পেতে হলে পরদিন বিকেল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। রাতে আমি কোনো বোর্ডিং-এ থেকে গেলে পরদিন সবকিছু নিয়েই ফিরতে পারবো। কিন্তু হলো কী জানো? দুপুর গড়িয়ে বিকেল হচ্ছে, বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা। আর আমার বুকের ভেতর ছটফট করছে! ছটফটানি কাটাতে কত কী যে করেছি আমি! কিন্তু কিছুতেই কিছু হচ্ছে না। তারপর কী করলাম জানো? রাত দশটার দিকে বোর্ডিং ছেড়ে বেরিয়ে পড়লাম। অতো রাতেতো লঞ্চ-ট্রলার কিছু নেই। আমি তাই সারারাত পায়ে হেঁটে সকালে পৌঁছে গেলাম গোড়ানবাড়ি লঞ্চ ঘাট। সেখান থেকে দুপুর নাগাদ এলাম আলীপুর। আলীপুর থেকে রিজার্ভ ট্রলারে গভীর রাতে বাড়ি। তোমরা সবাইতো আমাকে দেখে অবাক। আমি খুব স্বাভাবিক ভঙ্গিতে বললাম, কাজ শেষ, তাই চলে এলাম। আসলেতো ঘটনা ছিলো অন্য। তোমাকে একটু দেখার জন্য কী যে ছটফট করছিলো বুকের ভেতর! সেদিনের এই কথাটাও তোমাকে কখনো বলা হয়নি। কেন বলা হয়নি জানো? কারণ আমার খুব লজ্জা লাগছিলো। আজ সুযোগ পেয়ে বলেই দিলাম। হা হা হা।

এবার আসল কথায় আসি, আমার ধারণা খুব বড় বড় কথা বলে তোমাকে লঞ্চঘাট থেকে বিদায় দেয়ার পরের মুহূর্ত থেকেই আমি তোমার জন্য অস্থির হয়ে যাবো। আমার চারপাশের সবকিছু বিস্বাদ লাগা শুরু করবে। তারপর সব ছেড়েছুড়ে পরের লঞ্চই আমি গোবিন্দপুর রওয়ানা হয়ে যাবো।

আচ্ছা, ধরো যদি সত্যি সত্যিই কখনো এমন হয় যে, তোমাকে ছাড়া আমার থাকতে হচ্ছে, তখন কী হবে আমার? এই কথাটা আমি অনেক ভেবেছি জানো? কিন্তু প্রতিবারই ভাবনাগুলো হঠাৎই কেমন এলোমেলো হয়ে যায়। আমার ধারণা আমি তখন পাগলই হয়ে যাবো। আচ্ছা, এমন কখনো হলে, কী করবে তুমি?

যে হয়েছিল ভোর, অথৈ আদর, নামহীন নদী,
একা লাগে যদি,
মনে রেখো তাকে।'

কণা, ভেবেছিলাম এই চিঠি পড়ে তোমার মন ভালো হয়ে যাবে। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে দীর্ঘ এই চিঠি ভর্তি অযথাই মন খারাপের কথাবার্তা লিখে দিয়েছি। তোমাকে ছাড়া সপ্তাহখানেক একা থাকতে হবে ভেবেই কেমন অসহায় লাগছে। হয়তো সে কারণেই কীসব আবোল তাবোল লিখে ফেললাম! কিন্তু এখন মনে হচ্ছে এই চিঠিটা কাটাকুটি করে নতুন আরেকটা চিঠি লিখি। সমস্যা হচ্ছে, এই চিঠির প্রতি একটা মায়া পড়ে গেছে। কষ্টের কথা হলেও এই চিঠিভর্তি মায়া। সেই মায়া আমি ছাড়াতে পারছি না। আমাদের এত এত মন ভালোর মুহূর্তে, থাকুক না একটা মন খারাপের চিঠি। আর মন খারাপই যদি না হলো, তাহলে মন ভালো হবে কী করে, বলো?

কন্যা অভিমানী,

এই যে আপনার মন খারাপ করে দিলাম, কেন জানেন? কারণ আমি আপনার জন্য পৃথিবীর সবটুকু মন ভালো নিয়ে আসছি। এই ধরেন কাল, কিংবা পরশু, কিংবা তার পরের দিন। আসছিতো।

কী, মন ভালো হবেতো? হবে না?

ইতি- মনসুর

চিঠিটা পড়ার আগে কণা যতটুকু সম্ভব নিজেকে প্রস্তুত করে রেখেছিলো। সে ভেবেছিলো, চিঠিতে যা-ই লেখা থাকুক না কেন, চিঠিটা সে খুব স্বাভাবিকভাবেই পড়বে। কোনো প্রতিক্রিয়া দেখাবে না। দেখায়ওনি সে। কিন্তু তারপরও চিঠিখানা কেমন যেন বৃষ্টি ভেজা মাটির মতোন নরম হয়ে রইলো। জলে ভেজা ঘরের মতোন স্যাঁতসেঁতে হয়ে রইলো। কফোটা চোখের জলে একটা চিঠি এমন ভিজে যেতে পারে কণা জানে না। সেই সারাটা দিন সে একা একা বসে রইলো দোতলার রেলিং এ। নরম রোদের ভেতর পা মেলে দিয়ে সে তাকিয়ে রইলো নির্নিমেষ। সন্ধ্যা অবধি। মা কতবার ডাকলেন, কতবার বাবা উঠে এলেন দোতলায়, কিন্তু কণা ফিরেও তাকালো না।

একটা খড়খড়ে শুকনো পাতা উড়ে এসে পড়লো কণার পায়ের কাছে। কণা পাতাটাকে হাতের মুঠোয় নিয়ে মৃদু চাপে ভেঙে গুঁড়োগুঁড়ো করে ফেললো। তারপর উড়িয়ে দিলো হাওয়ায়। হাওয়ায় ভেসে ভেসে দোতলার টিনের চাল, উঠানে মেলে দেয়া ভেজা কাপড়ের সারি, তার ওপারে বকুল ফুলের গাছ পেরিয়ে কোথায় হারিয়ে গেলো! সেদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে একটা বুক তোলপাড় করা দীর্ঘশ্বাস বের হয়ে এলো কণার। যদি এমন করে ভেঙে গুঁড়োগুঁড়ো করে বুকের ভেতরটাকে হাওয়ায় ভাসিয়ে দেয়া যেত!

সেই থেকে, কণা মনসুরের সাথে কথা বলে। কথা বলে তার মেয়ের সাথেও। কণা চুপিচুপি মেয়ের নাম রেখেছে মন। মনসুরের নাম থেকে মনটুকু অন্তত থাকুক! সে মনসুরকে বলে, 'এই যে মনসুর সাহেব, কতদিন হয় আমার সাথে কথা বলেন না?'

মনসুর বলে, 'তুমি না ডাকলেতো আমি কথা বলতে পারি না।'

'কেন? সবসময় কেবল আমাকেই ডাকতে হবে কেন? কখনো কখনো আপনিওতো ডাকতে পারেন?'

মনসুর এই প্রশ্নের জবাব দেয় না। কণা তখন বুঝতে পারে যে মনসুরের মন খারাপ হয়েছে। সে তখন হেসে বলে, 'আচ্ছা, আপনার মন খারাপ করতে হবে না। বাপ মেয়ের অবস্থা হয়েছে একদম এক।'

New Pdf download: www.PoragEducation.com + webtalkbd.com

'কেন? মন আবার কী করলো?'

'কী করলো মানে? কিচ্ছু কী বলা যায়? সাথে সাথে মন খারাপ করে গাল ফুলিয়ে বসে থাকবে। দুই মন নিয়ে আমার হয়েছে যন্ত্রণা।'

'দুই মন মানে?'

'এই যে, দুজনের নামের আগেই মন। কোন কুক্ষণে যে মনসুরের নাম থেকে চুরি করে মেয়েটার নাম মন রাখতে গেলাম!'

কণা ভেবেছিলো মনসুর রাগ করবে। কিন্তু সে রাগলো না। বরং হাসলো, 'তোমার মনে আছে?'

'কী?'

'তুমি যে আমাকে মনসুর না বলে মনচোর বলে খেপাতে?'

'থাকবে না আবার? আর আপনিও কী ছেলে মানুষটাই না ছিলেন! ঠিক ঠিক খেপে যেতেন! আচ্ছা, মনসুরকে মনচোর বললে কী এমন ক্ষতি হতো? আপনিতো মনচোরই!'

'চ্ছ্যাহ! কী বিশ্রি শোনায়।' মনসুর ঠোঁট উল্টে বলে, 'মন চোর, কী বিচ্ছিরি একটা শব্দ।'

কণা হাসে, 'তাহলে মেয়ের নামটাও কী বিচ্ছিরি হয়েছে?'

'উহু। মন, কী সুন্দর নাম!'

'আচ্ছা, মন কে আপনার দেখতে ইচ্ছে হয় না?'

'দেখিতো!'

'কী করে দেখেন?'

'তোমরা দুজন যখন রাতে ঘুমিয়ে থাকো, আমি তখন চুপিচুপি চলে আসি। তারপর সারারাত ভরে দেখি।'

'আপনার তখন আমাদের সাথে থাকতে ইচ্ছে হয় না? আমার আর মন-এর সাথে বসে গুটুর গুটুর গল্প করতে ইচ্ছে হয় না?'

মনসুর এই প্রশ্নের উত্তর দেয় না। কণা তাকে ডাকে। কিন্তু সে আর কোন প্রশ্নেরই উত্তর দেয় না। কণা জানে, মনসুর বলতে আলাদা কেউ নেই, কিছু নেই। সবই তার মনের কল্পনা। নিজের বানানো। কিন্তু তারপরও কখনো কখনো মনসুর যেন হয়ে ওঠে আলাদা, স্বাধীন। তখন সে কণার কথা শোনে না।

এই সময়টাতে কণার খানিক মন খারাপ হয়ে যায়। আজও যেমন হলো। সে অনেক চেষ্টা করেছে মনসুরের সাথে কথা বলার। কিন্তু কেন যেন পারলো না। মনসুর যেন আজ কিছুতেই তার কল্পনার জগতে ধরা দিতে চাইছে না। আচ্ছা, মনসুর কী তাহলে ধীরে ধীরে হারিয়ে যেতে থাকবে? দিন যত যেতে থাকবে, ততই কি তার উপস্থিতি ধূসর হতে থাকবে?

কণা জানে না, তবে তার ভয় হতে থাকে। এই যে মনসুর আছে, তা সে যেভাবেই হোক, এটি অন্তত কিছুটা সময়ের জন্য হলেও তাকে ভুলিয়ে রাখে যে মনসুর আসলে সত্যি সত্যিই নেই! কিন্তু একটা সময় যদি মনসুর একদমই আর না আসে? তখন কী করবে কণা?

কণা এই অবধি আর ভাবতে পারে না। সে তখন চিঠিটা বের করে পড়ে। একবার, দুইবার, তিনবার। তারপর আবার। তারপর বারবার। তারপর বিড়বিড় করে বলতে থাকে,

'যে হয়েছিলো ভোর,
অথৈ আদর,
নামহীন নদী-
একা লাগে যদি-
মনে রেখো তাকে!'

কণা হঠাৎ কাঁদে। হাউমাউ করে কাঁদে। সেই কান্নায় বুকের ভেতর উথলে উঠতে থাকে অভিমানের নদী। সে ফিসফিস করে মনসুরকে বলতে থাকে, আপনার কন্যা অভিমানী তো আপনাকে মনেই রেখেছে। আপনার সবটুকু মনে রেখেছে। এতটুকুও ভোলেনি, কিন্তু আপনি তাকে এমন করে ভুলে যাচ্ছেন কেন? কেন ভুলে যাচ্ছেন?

New Pdf download: www.PoragEducation.com + webtalkbd.com

মাস দুয়েক হলো মঞ্জুর ম্যাট্রিক পরীক্ষা শেষ হয়েছে। কিন্তু এর মধ্যেই সেই সদা অন্তর্মুখী, নির্লিপ্ত মঞ্জুকেও যেন বদলে যেতে বাধ্য করেছে পরিস্থিতি। আজাহার খন্দকার জমি-জমা বিক্রি করে কিছু টাকার ব্যবস্থা করেছেন। তার সাথে মনসুরের ফার্মেসীটাও বিক্রি করে দেয়া হয়েছে। সেই টাকায় আগের জায়গাতেই ছোটখাটো একটা ধান-চালের আড়ত করা হয়েছে। আড়তের পুরো দায়িত্ব এখন পড়েছে মঞ্জুর ঘাড়ে।

খুব প্রয়োজন না পড়লে আজাহার খন্দকার কোথাও যান না। সারাক্ষণ বাড়ির সামনে মসজিদেই সময় কাটে তার। মনসুরের জন্য দোয়া-দরুদ পড়েন। বাঁধানো পুকুর ঘাটে শূন্য চোখে বসে থাকেন। মনসুরের কবরের ফলকে তিনি নিজ হাতে যত্নকরে– মনসুরের নাম লিখে দিয়েছেন। নামের আগে দোয়াও লিখে দিয়েছেন, "আসসালামু আলাইকুম ইয়া আহলাল কুবুর।' আরবি হরফের সাথে বাংলা তর্জমাও তিনি লিখে দিয়েছেন, 'হে কবরবাসী তোমার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক।'

কিন্তু কোন কিছুতেই যেন শান্তি পান না আজাহার খন্দকার নিজের জীবনের কোনো হিসেবই মেলাতে পারেন না আজাহার খন্দকার। মনসুরের মৃত্যুর জন্যও নিজেকেই দোষী মনে হয়। না হলে অমন জোর করে ওভাবে ঢাকা থেকে বাড়িতে নিয়ে আসবেন কেন!

নতুন আড়তে মঞ্জুর সাথে সার্বক্ষণিক দেখা শোনার দায়িত্বে আছে মতি মিয়া। মতি মিয়া সেদিন মঞ্জুকে বললো, 'ঘটনা শুনছো?'

'কী ঘটনা?'

'থানার ওসি সাব আইছিলো।'

'কই?'

'এই বাজারে।'

'কখন?'

'আইছিলো গতকাইল অনেক রাইতে।'

'কী কারণে?'

'সেইটাতো বলে নাই। তয় হুনলাম এহন থেইকা নাকি আমাগো বাজারে রেগুলার পুলিশ থাকবো।'

'কই, দেখলাম নাতো!'

'আরে বোঝো নাই? পুলিশের পোশাকে থাকবো না। থাকবো সাদা পোশাকে। যাতে তাগো কেউ না চেনে।'

'ক্যান?'

'পুলিশ মনে করতেছে তোরাব আলী লস্কর আবার আমাগো আড়তে আইবো।'

মঞ্জু ক্যাশ বাক্সের ভেতর থেকে হিসেবের খাতাটা বের করতে করতে বললো, 'আর কী বাকি আছে? যা ক্ষতি করনের সবতো করছেই। তার লোক ধরাই দেয়ার প্রতিশোধতো সে কম নেয় নাই। এর চাইতে বেশি আর সে কী নিতে পারবো?'

'সেইটাই। কিন্তু পুলিশের ধারণা, আবারো যেহেতু আমাগো আড়ত দাঁড়াইছে। আর আগেতো আছিলো খালি পাটের আড়ত। কিন্তু এহনতো আমাগো গুদামে চাউল ডাইল ভর্তি। তাগো পাট লাগে না, এইজন্য পোড়াই দিছে। কিন্তু চাউল ডাইলতো লাগে। তো এই খবর পাইলে আরেকটা সুযোগতো নিতেও পারে। তারাতো জানেই এহন আর আজাহার খোনকারের আগের সেই শক্তি-সাহস নাই, মন মানসিকতাও নাই। পোলাডারেও তারা মারলো। এহন আইসা টলার ভইরা চাউল ডাইল নিয়া গেলেও কেউ তাগো বাধা দিবো না।'

কথাটা ভেবে দেখলো মঞ্জু। মতি মিয়া মিথ্যা বলেনি। কিন্তু এই বিষয় নিয়ে বাবার সাথে আর কথা বলতে চায় না সে। কিছু একটা সতর্কতা অবশ্য অবলম্বন করাই উচিত। কিন্তু কি করবে তাও ভেবে পেলো না মঞ্জু। মাত্র ক'টা মাস, এর মধ্যেই এই সংসারের সকল দায়িত্ব তার কাঁধে এসে বর্তাবে, এটা সে ঘুণাক্ষরেও ভাবতে পারেনি। মঞ্জুর সমস্যা হচ্ছে খুব। কিন্তু মানিয়ে নেয়ার চেষ্টাও সে করছে। অনেক ভেবে-চিন্তে অবশেষে ওসি মইনুল হোসেনের সাথে দেখা করার সিদ্ধান্ত নিলো সে।

ওসি মইনুল হোসেন কোনো একটা বিষয় নিয়ে চিন্তিত। তাকে যখন খবর দেয়া হলো যে আজাহার খন্দকারের ছোট ছেলে মঞ্জু এসেছে দেখা করতে। তিনি

New Pdf download: www.PoragEducation.com + webtalkbd.com

একটু অবাকই হলেন। ছেলেটাকে আগে কোথাও দেখলেও সেভাবে খেয়াল করেন নি মইনুল হোসেন। সদ্য কৈশোর পেড়ানো মঞ্জু দেখতে শুনতে ভালো। ছিপছিপে গড়নের লম্বা ছেলেটার নাকের নিচে গোঁফের আভাস। তবে চেহারা থেকে কৈশোরের সারল্য এখনো মুছে যায়নি। একটু দ্বিধাগ্রস্ত ভাব মুখজুড়ে। চোখগুলো অস্বাভাবিক রকমের নির্লিপ্ত।

মইনুল হোসেন হেসেই বললেন, 'আসো আসো মঞ্জু। কেমন আছো?'

মঞ্জু হাসার চেষ্টা করলো। কিন্তু হাসিটা ঠিকঠাক মতো হলো না। সে বললো, 'জি আছি ভালো। আপনি কেমন আছেন?'

'আমাদের আর থাকা। দিনরাত চোর-ডাকাত নিয়ে যাদের কারবার, তাদের আবার ভালো-মন্দ কী?'

মঞ্জুর সরাসরি আলাপে চলে গেলো, 'আমাদের অবস্থাতো আপনি জানেনই। আব্বা থাইকাও নাই। আর ভাইয়াতো...।'

মঞ্জু একটু থামলো। মইনুল হোসেনও তাকে সামলে নিতে সময় দিলেন। মঞ্জু বললো, 'আমি এখনো কোনকিছুই ঠিক মতো বুঝি না। তারপরও চেষ্টা করতেছি যতটুকু যা করা সম্ভব। শুনছি, আমাগো নতুন আড়ত নিয়াও ঝামেলা হইতে পারে?'

মইনুল হোসেন গম্ভীর ভঙ্গিতে বললেন, 'নিশ্চিত করেতো কিছুই বলা যায় না। আমরা আসলে সাবধান থাকার চেষ্টা করছি।'

মঞ্জু কথা বললো না। মইনুল হোসেনই বললেন, 'আসলে তোরাব আলীর লোকজন যেইবার তোমাদের আড়তে ডাকাতি করতে এসে ধরা পড়লো, সেই বার লোকমান নামে একজন ডাকাতও মারা গেছিলো। তো খুব স্বাভাবিক, তার একটা জেদ ছিলো তোমার বাবার ওপর। তার শোধও সে নিয়েছে। নিয়েছে মানে এর চেয়ে খারাপ ভাবেতো আর নেয়া যেতো না। একজনের খুনের বদলে খুনও করলো সে।'

'সে কী জানতো যে ওই দিন ওই লঞ্চে ভাইয়া থাকবে?' মঞ্জু মাঝখানে কথা বললো।

'তা বলতে পারবো না। তবে না জানলে লঞ্চের ঘটনায় শুধু ডাকাতি করেই চলে যেতে পারতো। এমন খুন-খারাবি ঘটাতো না। আমার ধারণা, মনসুরকে সে চিনতে পেরেছিলো বা আগেভাগেই তারা জানতো যে ওই লঞ্চে মনসুর যাবে।'

'কিন্তু তারা জানলো কী করে?'

মইনুল হোসেন বললেন, 'পুলিশের যেমন বিভিন্ন জায়গায় ছড়ানো ছিটানো সোর্স থাকে। তাদেরও হয়তো থাকে।'

'তাহলে তাদের আপনেরা ধরছেন না কেন?'

'আমরাতো চেষ্টা করেই যাচ্ছি।' মইনুল হোসেন হারাধনের বিষয়ে মঞ্জুকে কিছু জানালেন না। যদিও মনসুরের ঘটনা নিয়ে তিনি হারাধনকেও জিজ্ঞাসাবাদ করেছেন, কিন্তু হারাধন বলেছে সে এই বিষয়ে কিছুই জানতো না। মইনুল হোসেনেরও মনে হয়েছে, হারাধন সত্য কথাই বলেছে।

মঞ্জু হতাশ গলায় বললো, 'জানি না আমাদের ভাগ্যে কী আছে। কিন্তু আপনার কী সত্যি সত্যিই মনে হয়, এই আড়তেও কিছু ঘটবে?'

'তাতো বলতে পারবো না। তবে সাবধানের মার নেই। পেছনে আমাদের অনেক ভুল ছিলো। অনেক ক্ষেত্রে আমাদের আরো সাবধান হওয়া উচিত ছিলো। ছোটখাটো অনেক বিষয়ে গুরুত্ব না দেওয়ার কারণে অনেক বড় বড় দুর্ঘটনাও ঘটেছে। এবার আর আমরা চাই না সামনেও তেমন কিছু ঘটুক।'

'আমরা তাহলে কী করবো?'

'তোমাদের কিছু করতে হবে না। আপাতত কাজ-কর্ম যেমন ছিলো, তেমনই চলতে থাকুক। আমরা একটু নজর রাখছি। দেখা যাক কী হয়!'

মঞ্জু চলে যেতে মইনুল হোসেন হারাধনকে খবর দিয়ে আনালেন। তারপর বললেন, 'বহুদিনতো হয়ে গেলো হারাধন সাব। কই, কোন খোঁজ খবরতো আমাদের দিতে পারলেন না'?

হারাধন বিমর্ষ মুখে বললো, 'আপনে ছার বিশ্বাস করবেন না জানি, কিন্তু সেই ঘটনার পর তারা কেউ আর আমার লগে কোনো যোগাযোগ করে নাই।'

'কেন? তারা কী জেনে গেছে নাকি যে আপনে পুলিশের সাথে যোগ দিছেন?'

'না, তা জানবো কেন?'

'না জানলে হঠাৎ করেই সবাই হাওয়ায় মিলিয়ে গেলো যে! ঘটনা কী? খুলে বলেন।'

হারাধন অসহায় ভঙ্গিতে বললো, 'কসম ছার। এরপর আর তারা আহে নাই। কোনো ধরনের যোগাযোগও করে নাই।'

'তারা না করলে আপনি করেন। যোগাযোগের ব্যবস্থা করেন।'

'কেমনে করবো ছার? সেইখানে যাওনেরও তো কোনো ব্যবস্থা নাই।'

'কেন? এতদিন তাদের এত সেবা করলেন। তারা একদিন দাওয়াত দিয়ে আপনাকে খাওয়াতেও নিয়ে যায় নাই?' মইনুল হোসেন শ্লেষাত্মক ভঙ্গিতে কথাটা বললেন। হারাধন অবশ্য জবাব দিলো না। সে চুপ করে রইলো। মইনুল হোসেন বললেন, 'আমি অনেক ধৈর্য ধরেছি। আর না। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তাদের সাথে

New Pdf download: www.PoragEducation.com + webtalkbd.com

যোগাযোগের ব্যবস্থা করেন। না হলে আপনার লাশ ভাসবে সুবর্ণপুর নদীতে। সেই লাশের খোঁজ নিতে হলেওতো তারা কেউ না কেউ আসবে। তাদের বন্ধু মানুষ আপনি। কী মনে হয়, আসবে না?'

হারাধন কিছু বলতে গিয়েও বললো না। সে চুপচাপ বসে রইলো। মইনুল হোসেন অবশ্য জানেন, মনসুরের খুনের ঘটনার পর সত্যি সত্যিই তোরাব আলী লস্করের কোনো লোক হারাধনের কাছে আসেনি। তিনি আড়ালে আবডালে হারাধনের ওপরেও নজরদারির ব্যবস্থা করেছেন। কিন্তু তার চিন্তার বিষয় হলো মনসুরের ঘটনার পর সাত আট মাস চলে গেলেও তোরাব আলী লস্কর বা জোহরার পক্ষ থেকে আর কোনো সাড়া-শব্দ নেই কেন!

সাড়া-শব্দ পাওয়া গেলো এর দিন কয়েক পরে। মইনুল হোসেন এসআই একরামুল হকের সাথে বসে আছেন। এই মুহূর্তে মাঝি মনু মিয়া এসে মইনুল হোসেনকে খবরটা দিলো, 'ছার।'

'বল।'

'হারাধনের স'মিলে আইজ নতুন এক লোক দেখছি।'

'নতুন লোক মানে কী?'

'এর আগে এরে কোনোদিন দেহি নাই।'

'তুই কী এই অঞ্চলের সব মানুষ চিনিস? আর স'মিলে নানান জায়গা থেকে লোকজন আসে।'

'কিন্তু ছার, এই লোক আইছে গাছ চেরাইয়ের ভান ধইরা। ছোট ছোট দুইখান রেন্ট্রি গাছ খালে ভাসাই নিয়াইছে। কিন্তু অতো ছোট গাছ কেউ স'মিলে আনে? ওই কচি রেন্ট্রি দিয়া না হইবো খাট-পালঙ্ক, না হইবো আলমারি। চুলার লাকড়ি হইতে পারে বড়জোর। এইগুলাতে বাড়িতো বইসা কুড়াল দিয়াই কাটতে পারে। সেই কাঠ সে আনলো স'মিলে। তারপর সেই যে স'মিলের ভিতরে ঢুকলো, আর বাইর হইলো না।'

'ঘটনা কোন সময়ের?'

'এই সন্ধ্যাবেলার। কেউ কাঠ চেরাই করতে আইলে গাছ রাইখ্যা চইল্যা যাইবো, পরে সময় মতন আইস্যা চেরাই কাঠ নিয়া যাইবো। স'মিলে ঢুইক্যা আর বাইর হইবো না কেন?'

মনু মাঝির কথায় যুক্তি আছে। এখন দেখার বিষয় হচ্ছে এই বিষয়ে হারাধন তাকে কোনো খবর দেয় কিনা! মইনুল হোসেন মনু মাঝিকে আরো নজর রাখতে

বলে বিদায় দিলেন। কিন্তু তিনি অপেক্ষায় রইলেন হারাধনের। হারাধন এলো তার ঘণ্টাখানেক পর। মইনুল হোসেন কিছু না জানার ভান করে বললেন, 'কী খবর হারাধন? এত রাতে?'

হারাধন কাশতে কাশতে বললো, 'খবর আছে ছার।'

মইনুল হোসেন চোখে মুখে আগ্রহ ফুটিয়ে তুলে বললেন, 'কী খবর?'

'লস্করগো লোক আসছে।'

'কী বলেন? কয় জন?'

'তিন জন আইছে। তয় আমার কাছে আইছে একজন।'

'বাকিরা কই?'

'বাকিরা চেনা পরিচিত মুখ দেইখ্যা আসে নাই। তারা সুবর্ণপুর নদীতে।'

'যে আসছে তার নাম কী?'

'জব্বার। সে অল্প পরিচিত। এইজন্য তারে পাঠাইছে। খুব একটা চেনা মুখ না সে। এর আগে দুয়েকবার আইছিলো।'

'কী কারণে আইছে সে?'

'কী কী সব জিনিস পাতি নিতে আইছে। বেশির ভাগই বাচ্চাকাচ্চাগো জিনিস।'

মইনুল হোসেন কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, 'তা এই জিনিসপত্রতো দোকান থেইকা তোমার কিন্যা দেওন লাগবো, নাকি?'

'জে ছার। মানে আপনে যদি কন। আর যদি কন ধরাইয়া দিতে, তাইলে ধরাইয়া দিবো। কিন্তু ছার...।'

'কিন্তু কি?'

'এহন যদি আমি ধরাইয়া দেই, তাইলে একখান অসুবিধা আছে।'

'কী অসুবিধা?'

'তাইলেতো তারা বুইঝাই গেলো যে আমি ধরাই দিছি। তহন আর কেউ কোনোদিন আমার কাছে আইবো? আইবো না। বাকি সবাই সাবধানই হইয়া যাইবো।'

মইনুল হোসেন চিন্তিত ভঙ্গিতে বললেন, 'তাওতো একটা কথা। মুশকিল। মশা মেরে হাত নষ্ট করেতো লাভ নাই। নাকি?'

'সেইটাই ছার। তার চাইতে তাগো এইবার যাইতে দেই? অনেকদিন পর তারা এইবার যোগাযোগ করলো। নতুন কইরা একটা সুযোগ তৈরি হইলো আরো যোগাযোগের। এহন এদের মাধ্যমে তোরাব আলী লস্করের কাছে যদি বড়সড়

New Pdf download: www.PoragEducation.com + webtalkbd.com

কোনো কাজ-কামের লোভ টোভ দেখাইয়া পাঠাই, তাইলে কিন্তু একটা বড় সুযোগ তৈরি হইলো। দেখা গেলো তহন তারা পরের বার দলবল নিয়া আসলো। আর আপনেরাও বড় ফোর্স নিয়া রেডি থাকলেন!'

মইনুল হোসেন গম্ভীর গলায় বললেন, 'আপনার বুদ্ধিতো ভালো। ভালো কথা বলছেন। তা কী লোভ দেখাইবেন?'

'এইটা একটু ভাবতে হইবো ছার।'

মইনুল হোসেন বললেন, 'আচ্ছা।'

হারাধন বেরিয়ে যেতেই একরামুল হক উদ্বিগ্ন গলায় বললেন, 'আপনে তারে বিশ্বাস করেন স্যার?'

'কেন? বিশ্বাস করবো না কেন?'

'এমনওতো হইতে পারে যে এতদিন লস্করের লোকজন জানতো না যে হারাধনরে আমরা সন্দেহ করি। বা সে আমাদের ইনফরমার। কিন্তু হারাধন যদি এই সুযোগে তাগো সতর্ক কইরা দেয় যে তারা যেন এরপর থেইকা আর তার কাছে না আসে! তাইলে?'

'হুম।' মইনুল হোসেন গম্ভীর ভঙ্গিতে বললেন, 'হারাধনরে এখনো আপনি সন্দেহ করেন?'

'করি স্যার। পুলিশের ওপরে তার পুরানা রাগ। আর তাছাড়া তোরাব আলী লস্করের লগে তার এতদিনের বন্ধুত্ব!'

'তাহলে এদের আসার খবর সে আমাদের দিতে এলো কেন?'

'এইটাতো সহজ হিসাব স্যার। হারাধন খুব ভালো কইরাই জানে, তার ওপর আমরা নজর রাখতেছি। সে যদি এই খবর আমাদের না দেয়, তাইলে আরো বড় বিপদে পড়বে সে। তার চাইতে সে এহন যেইটা করলো, তাতে সাপও মরলো, লাঠিও ভাঙলো না।'

'তা কেমন?'

'সে আমাগো খবরও দিলো, এতে সে সেইফ রইলো। কারণ আমরা জানলাম যে সে আমাগো পক্ষেই কাজ করতেছে। আবার আপনেরে এইটা সেইটা বুঝাইয়া দিলো যে পরের বার লস্করগো বড় দলটল নিয়া আসনের ব্যবস্থা করবে। এই টোপ ঝুলায়াই এই কয়জনের নিরাপদে ফিরা যাওনের ব্যবস্থাও করলো। কিন্তু ধরেন, যদি ঘটনা উল্টা হয়?'

'উল্টা কী হবে?'

'ধরেন এরা ফিরা গিয়া লস্করগো আরো সাবধান কইরা দিলো যে হারাধনের সাথে এহন থেইকা আর কোনো ধরনের যোগাযোগ করা যাইবো না। তহন কী হইবো? আমগো যে একটু সুযোগ আছিলো, সেইটুকও শেষ হইলো!'

মইনুল হোসেন কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর হাসিমুখে বললেন, 'আপনার যে এত বুদ্ধি, তাতো আগে বুঝি নাই। যাক, ভাল্লাগলো যে আপনি এতদূর চিন্তা ভাবনা করছেন। বিষয়টা আমিও যে ভাবিনি, তা না। কিন্তু একটা ব্যাপার, এই পুরো বিষয়টাই কিন্তু আমাদের ধারণা। আমরা এখনো জানি না, হারাধন সত্যি সত্যিই কোন পক্ষে! তো সে যেই পক্ষেই হোক, তাকে গোল দেয়ার পুরো সুযোগ দেয়া যাবে না! আবার তাকে পুরোপুরি আটকে ফেলাও যাবে না।'

'সেটা কীভাবে?'

'আমরা ওদের একজন আটকে রেখে দেবো। ধরেন জব্বার, জব্বারকে আমরা রেখে দেবো। তাকে আর তার সঙ্গিদের কাছ পর্যন্তও যেতে দেবো না। আর তার সঙ্গী যে দুজন সুবর্ণপুর নদীতে তার জন্য অপেক্ষা করছে, তারা কিন্তু হারাধনের সাথে কথা বলার সুযোগ পায়নি। এতে যেটা হবে, তার সঙ্গী দুজন লস্করদের কাছে এই খবর পৌছাবে যে আমাদের কাছে জব্বার ধরা পড়ে গেছে। এতে হারাধনের ওপর তাদের সন্দেহ হওয়ার কোনো সুযোগই নেই। কারণ জব্বার যেকোনোভাবেই ধরা পড়তে পারে। কিন্তু তারা তখন জব্বারকে ছাড়িয়ে নেয়ার জন্য চিন্তা-ভাবনা শুরু করবে। পরবর্তী পদক্ষেপ কী হবে! যেহেতু হারাধন চাইলেও কোনোভাবে তাদের সতর্কও করতে পারবে না। সেহেতু তারা জানলোও না যে হারাধন আমাদের নজরে। ফলে, জব্বারকে ছাড়িয়ে নেয়ার বিষয়ে পরামর্শের জন্য হলেও তাদের আবারো হারাধনের কাছেই আসতে হবে। আর আমার ধারণা, তখন বড় কেউই আসবে। হয় জোহরা অথবা তোরাব আলী নিজেই। আর তখন খুব একটা প্রস্তুতি নিয়ে আসার কথা না। ফলে বড় কাউকে ধরার সম্ভাবনা আমাদের বেশি থাকছে। আর এর মধ্যে আমাদের সবচেয়ে বড় কাজ হচ্ছে হারাধনের ওপর নজর রাখা।'

মইনুল হোসেনের কথায় একরামুল হক যারপরনাই মুগ্ধ হলো। সে উচ্ছ্বসিত গলায় বললো, 'এইটা একটা ফার্স্ট ক্লাস বুদ্ধির কথা কইছেন স্যার। আর জব্বারের কাছ থেইকা আরো একখান বিষয় কনফার্ম হওন যাইবো।'

'হুম। নুরুন্নবীর কাছে তাকে দুই দিন ছেড়ে দিলেই সে বাপ বাপ করে বলে দিবে, হারাধন তাকে আমাদের বিষয়ে আসলেই কিছু বলছে কিনা!'

'একদম স্যার।' একরামুল হক হাসলো। যেন এতদিন পর একটা কাজের কাজ হতে যাচ্ছে। গভীর অন্ধকারে সামান্য হলেও আলোর রেখা দেখা যাচ্ছে।

New Pdf download: www.PoragEducation.com + webtalkbd.com

কণার ছেলে হয়েছে মাস তিনেক হলো। ছেলে হবার খবর শুনে তাকে দেখতে এসেছিলেন আজাহার খন্দকার। নাতির মুখ দেখে তিনি কাঁদলেন। সেই কান্নায় দুঃখ যেমন ছিলো, ছিলো আনন্দও। সেই আনন্দ সব হারিয়ে অনেকখানি ফিরে পাওয়ার। আর সেই দুঃখ সব পেয়েও সব হারিয়ে ফেলার। কণা অবশ্য স্বাভাবিকই। সে ভেবেছিলো তার মেয়ে হবে। ছেলে হয়েছে বলে দুম করে মানিয়ে নিতে একটু কষ্ট হয়েছিলো। দিনের পর দিন কল্পনায় মেয়েটির সাথে কত কথাই না সে বলেছে! সেই মেয়েটি হঠাৎ হারিয়ে যাওয়ায় কেমন একটা শূন্যতা তৈরি হয়েছিলো। কিন্তু সে মানিয়ে নিয়েছে। এখন সে রোজ তার ছেলের সাথে কথা বলে। সে ছেলের নামও রেখেছে কল্পনার মেয়েটির নামেই– মন। এই নাম নিয়ে কত শত কথা, কত শত টিপ্পনী। মন কারো নাম হয়? কণা কিছু বলেনি। সে আজকাল কাউকে কিছু বলে না।

তবে একটা বিষয় নিয়ে কণা চিন্তিত। সেটি হচ্ছে মনসুর আর আগের মতো তার সাথে কথা বলে না। সে কথা বলার চেষ্টা করলেও সাড়া দেয় না। কণা নিজে নিজে জোর করে যখন সাড়া পাওয়ার চেষ্টা করে, তখন মনে হয় সে নিজেকেই নিজে প্রশ্ন করছে, আবার নিজেই নিজের উত্তর দিচ্ছে। বিষয়টা তখন আর তাকে টানে না। আগের সেই স্বতঃস্ফূর্ততাটাও নেই। তবে হ্যাঁ, দেরি করে হলেও মাঝে মধ্যে মনসুরকে পায় সে। আগের মতোই। তখন তার অভিমানের কথা সে বলে, 'আপনি কী আমায় ভুলে যাচ্ছেন?'

'উহু।'

'তাহলে?'

'তুমি আমায় ভুলে যাচ্ছো।'

'আমি!'

'হুম।'

'কী বলছেন আপনি? আপনাকেইতো ডাকলে আর পাওয়া যায় না!'

মনসুর এ সময় গম্ভীর হয়ে যায়, 'আমিতো সবসময়ই থাকি।'

'তাহলে ডাকলে আসেন না যে!'

'হয়তো আসি।'

'তাহলে আমি পাই না কেন?'

'তুমি পাওনা কারণ যেভাবে ডাকলে তোমার নিজের কল্পনাকে তোমার সত্যি মনে হতে পারতো, হয়তো সেভাবে আর ডাকো না।'

'কেন সেভাবে ডাকবো না?'

মনসুর এবার হাসে, 'কারণ সময়। সময় মানুষকে ক্রমশই মুছে দেয়।'

'সময় আপনাকে আমার কাছ থেকে মুছে দেবে?'

'দেবে না, দিচ্ছে।'

কণা অস্থির হয়ে যায়, 'আপনি বুঝতে পারছেন, আপনি কী বলছেন?'

'হ্যাঁ, বুঝতে পারছি। আমিতো তোমার মনেরই তৈরি, আর আমি বুঝবো না, তোমার মনে কী চলছে!'

'আমার মনে এই চলছে যে আমি আপনাকে ভুলে যাচ্ছি?'

'তুমি রেগে যাচ্ছো কেন? এটাতো অস্বাভাবিক কিছু না।'

'কী অস্বাভাবিক কিছু না?'

'মৃত মানুষকে ভুলে যাওয়া। এটা পৃথিবীর সবচেয়ে স্বাভাবিক ঘটনার একটা। প্রকৃতি মানুষকে এই ক্ষমতাটা দিয়েছে, মৃত মানুষকে দ্রুত ভুলে যাওয়ার ক্ষমতা। মানুষ যদি মৃত মানুষকে ভুলে যেতে না পারতো, তাহলে সে বেঁচে থাকতে পারতো না।'

'আমি আপনাকে একটুও ভুলিনি।'

মনসুর হাসলো, 'রোজ একটু একটু করে ভুললে, টের পাওয়া যায় না।'

কণার ভারি মন খারাপ হলো। সে সারাটাক্ষণ এই মানুষটার কথা ভাবে। সারাটাক্ষণ। প্রায় বছর হতে চললো, অথচ মুহূর্তের জন্য সে মানুষটাকে ভুলতে পারেনি। অথচ এসব কী বলছে মানুষটা! সে মন খারাপ করে চুপচাপ বসে রইলো। মনসুর বললো, 'কী মন খারাপ হয়ে গেলো?'

কণা কথা বললো না। মনসুর বললো, 'আরো কিছুদিন পর মন খারাপটাও কমতে থাকবে।'

'আপনি আমার সাথে কথা বলবেন না।'

'বলিনাতো! আজকাল কত কম কথা বলি, দেখো না?'

'কেন কম কথা বলেন? কেন আর আগের মতো আসেন না। সাড়া দেন না।'

New Pdf download: www.PoragEducation.com + webtalkbd.com

মনসুর আবারো হাসে, 'ওই যে বললাম, আগের মতো অমন গভীর করে, অমন তীব্র করে তুমি আর আমাকে ভাবো না। ভাবলে আমি রোজ আসতাম। ঠিক আগের মতো করেই কথা বলতাম। আমিতো আলাদা কেউ নই। আমি তোমার অনুভূতি। তোমার কল্পনা। আমারতো আলাদা করে আসা– না আসার ক্ষমতা নেই।'

এই কথায় কণার খুব মন খারাপ হয়ে যায়। আসলেই কী মনসুরকে আর আগের মতো অনুভব করে না সে? অনেক ভেবেও এর জবাব পায় না কণা। হ্যাঁ, ছেলেটা হওয়ার পর থেকে অনেক ব্যস্ত হতে হয়েছে তাকে। আজকাল সময়ও দিতে হয় খুব। কিন্তু এই পুরোটা সময় মুহূর্তের জন্যও মনসুরকে ভুলে থাকতে পারে না সে। তাহলে? তাহলে সে কী আসলেই বদলে যাচ্ছে? এই প্রশ্নের উত্তর কণার জানা নেই। সে নিজেকে মানাতে পারে না। সে জানে, মনসুরকে ছাড়া একটা মুহূর্তও কিছু ভাবতে পারে না সে।

কিন্তু কণাকে ভাবতে হয়। দিন যত যায়, নতুন নতুন নানান বাস্তবতার মুখোমুখি হতে হয় কণাকে। সে টের পেতে থাকে অনেক কিছুই। তাকে নিয়ে চারপাশে আড়ালে আবডালে নানান ফিসফাস। তার মা কিংবা বাবা সেই ফিসফিসানি তার কান অবধি আসতে দেন না। কিন্তু কণা জানে, এই ফিসফিসানি তাদের মধ্যেও রয়েছে। তারা কেবল সাহস করে বলতে পারেন না। কিংবা অপেক্ষায় আছেন। কণাকে আরো খানিকটা সময় দিতে চান। সামলে নেয়ার সময়। মানসিক স্থিতির সময়। মন বড় হয়ে উঠবার সময়। কিন্তু ফিসফিসানিগুলো বড্ড কাঁটা হয়ে বেঁধে তার কানে, তার মনে।

কণার বয়স কম। এই বয়সে সে বিধবা হয়েছে। একটা সন্তানও রয়েছে। অথচ পুরোটা জীবন তার পড়ে আছে সামনে। সেই জীবনটা তাকে কাটাতে হবে। কিন্তু এমন একা একটা মেয়ে কী করে সেই সুদীর্ঘ জীবনটা কাটাবে! তাকে একজন পুরুষের পরিচয়ে, আশ্রয়ে থাকতে হবে। কিন্তু কে হবে সেই পুরুষ? যে একজন বিধবা, এক সন্তানের জননীকে জীবনসঙ্গী করবে!

এই চিন্তা চারপাশে ভেসে বেড়ায়। কণা টের পায়। কিন্তু সে কিছু বলে না। আজকাল আর কাঁদতেও ইচ্ছে হয় না তার। সে কেবল শোনে। যে যা বলে। তার আজকাল ভাগ্যকে খুব বিশ্বাস হয়। ভাগ্যে যা আছে তা-ই হবে। তবে বাবার প্রতি এইটুকু বিশ্বাস তার আছে, সে না বললে জোর করে বাবা তার ওপর কিছু চাপিয়ে দিবে না। কিন্তু আশেপাশের মানুষ? সমাজ? প্রথা? এগুলোকে সে কী করে আটকাবে? মাত্র এই কটা দিন, এর মধ্যেই বাস্তবতার কঠিন এই নির্যাসটুকু কণা ঠিকঠাক উপলব্ধি করতে পেরেছে। এবং সে এও জানে, তার জন্য সামনে অপেক্ষা করছে ভয়াবহ এক দুর্বিষহ সময়।

আজাহার খন্দকার বলে গেছেন, তিনি দিন কয়েক পরে আবার আসবেন। কণাকে হাত খরচের জন্য টাকা-পয়সা দিয়ে গেছেন তিনি। নাতির জন্য

প্রয়োজনীয় সকল জিনিসপত্র কিনে দিয়ে গেছেন। তিনি মনে মনে অপেক্ষায় আছেন, ছেলেটা একটু বড় হলেই কণাকে নবীগঞ্জ নিয়ে যাওয়ার কথা বলবেন।

কিন্তু কণা কী চায়? সে জানে, তার চাওয়া-পাওয়ার কোনো গুরুত্ব এখানে নেই। তার সামনে বিপদসংকুল এক সমুদ্র। এই সমুদ্রে তাকে কেবল ভেসে থাকতে হবে। এখানে তার কোনো গন্তব্য নেই। কোনো ঠিকানা নেই। কোনো আশ্রয় নেই।

মাসখানেক আগে পাশের বাড়ির দুঃসম্পর্কের এক চাচি এলেন। বয়সে কণার মায়ের চেয়ে বড়। তিনি এসে কণার ছেলেকে দেখে নানান আদুরে কথাবার্তা বললেন। এটা সেটা জিজ্ঞেস করলেন। তারপর কণার মাকে আড়ালে নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, ' পোলার শইল-স্বাস্থ্য তো দেহি মাশাল্লাহ ভালো।'

শাহিনা বেগম মৃদু কণ্ঠে বললেন, 'জে।'

তিনি বললেন, 'তা চিন্তা-ভাবনা কিছু করছেন নি?'

'কী চিন্তা?'

'আরে ভাউজ, চিন্তা ভাবনা যা করনের এহনই করতে হইবো। খবরদার, মাইয়া কিন্তু আর শ্বশুরবাড়ি দিয়েন না।'

'কেন? শ্বশুরবাড়ি দেবো না কেন?'

'আরে বেক্কল মহিলা। শ্বশুরবাড়ি দিলে যদি আর শ্বশুরে না দেয়? সে যদি আটকাই রাখতে চায়? মাইয়া আপনের আবার বিয়া দেওন লাগবো না?'

শাহিনা বেগম কথা বললেন না। এই বিষয়ক আলোচনা তিনি এখনই করতে চান না। কণার চাচি বললেন, 'শোনেন কথা মন দিয়া। আমার খালাতো বইনের মাইয়ার অবস্থা এই একই। মাইয়ার জামাই মরছে, তাও শ্বশুরবাড়িরতন শ্বশুড়ে আইসা আদর যত্ন কইরা নিছে, এই ঘটনায় বাপ মায়তো খুশি। কিন্তু তারপর হইলো কী? শ্বশুরবাড়ি যাইয়া সে হইলো কামের মানুষ। তার দেওর ভাসুরগো বউগো ঘরের কামের মানুষ হইলো সে। তারা দিন রাইত কামের মানুষের মতন খাটাইতে শুরু করলো। শ্বশুর থাকতে তাও যা একটু আদর যত্ন আছিলো, শ্বশুর মরনের পর পুরাই কামের ছেমড়ি। আহারে, চেহারা যদি দেখতেন, রাজরাণির মতন চেহারা লইয়া গেছিলো, বছর দুই পর আইলো চাকরাণির মতন চেহারা লইয়া। তহন তারে আর কেউ বিয়া করবো? এমনেই বিধবা, তার ওপর এক পোলার মা। আর চেহারা শরীল গ্যাছে ভাইঙ্গা, বিয়া করবো কেডা? তারপর এমন অবস্থা অইলো, বোঝেনইতো, মাইয়ার বয়সওতো কম, বোঝেন নাই ঘটনা? তারও তো শইলে, মনে একটু রং ঢং আছে। অল্প বয়সী মাইয়া, এর লগে ওর লগে ফূর্তি করতে গিয়া খাইলো ধরা। বাঝলো পেট। সেই পেট ছাড়াইতে কী যে মছিবতগো আল্লাহ!'

শাহিনা বেগম এই কথা আর শুনতে পারছিলেন না। তার গা গোলাচ্ছিলো। তিনি বললেন, 'আপনের সাথে পরে কথা বলবনে ভাবি। আইজ যান।'

New Pdf download: www.PoragEducation.com + webtalkbd.com

যেতে যেতেও তিনি বললেন, 'আরেকখান কথা। পোলাডা কিন্তু এইহানে রাখবেন না। পোলা একটু বড় হইলেই দাদার লগে দিয়া দিবেন। দাদার সম্পত্তির ভাগ পাইবো না সে? ভাগ যেন কড়ায়-গণ্ডায় বুঝাইয়া দিয়া যায়। লেইখ্যা দিতে কইবেন। নাইলে দেখবেন বুড়া দাদায় মরলে তহন আরেক ঝামেলা। ছোট চাচায় কিন্তু ভাগ দিবো না। এই বুদ্ধি আপনেরে আর কেউ দিবো না। আমি আপনেগো আপনা লোক বইলা দিয়া গেলাম। মাথায় রাইখেন কইলাম।'

শাহিনা বেগম ভেবেছিলেন কথাগুলো কণা শোনেনি। কিন্তু অস্পষ্ট হলেও কণা প্রায় পুরোটাই শুনেছে। তার হঠাৎ খুব বমি পাচ্ছিলো। কিন্তু অনেক কষ্টে সে তার বমি আটকালো। কাঁদবে না কাঁদবে না করেও সেই রাতে সে খুব কাঁদলো। এই জীবনতো সে চায়নি! স্বপ্নের চেয়েও সুন্দর সেই জীবনটা আল্লাহ তার কাছ থেকে কেন কেড়ে নিলেন! কোনো অন্যায়তো সে করেনি।

সারাটা রাত ঘুমাতে পারলো না কণা। ডুকরে ডুকরে কাঁদলো। সে চায়নি তার এই কান্নার শব্দ কেউ শুনুক। কিন্তু টিনের ঘরের বেড়ার ওপার থেকে রাতের নিঃশব্দতা ভেদ করে সেই কান্না ছুরির ফলার মতো এফোঁড়-ওফোঁড় করে দিতে লাগলো আরো দুজন মানুষকে। গভীর ঘুমে ডুবে থাকা মানুষের ভান করে তার কেবল ভিজে যেতে থাকলেন নিঃশব্দ কান্নায়।

আজাহার খন্দকার কণাকে নিতে এলেন আরো মাস তিনেক পর। শাহিনা বেগম বললেন, 'এহনইতো কণারে দেওন যাইবো না বেয়াই। পোলাডা অতদূর যাওনের মতন শক্তপোক্ত এহনও হয় নাই।'

আজাহার খন্দকার হাসলেন, 'কী যে কন বেয়াইন! কোন বংশের পোলা জানেন আপনে? নবীগঞ্জের খোনকার বংশের পোলা। এরা মাটিতে পড়তেই লোহা। তার দাদার কথা শোনলে এহনও দশগ্রামের লোক কাঁপে।'

'সেইটা ঠিক আছে। কিন্তু ওইটুক বাচ্চারে আমি এহনই দিবো না বেয়াই। তার ওপর কণার শইল স্বাস্থ্যও ভালো না। এই শইলে আপনাগো বাড়িতে তার দেখাশোনা কে করবো? আমাগো এইহানে তবু আমি আছি। তার বাপে আছে।'

আজাহার খন্দকার বললেন, 'এইসব নিয়া আপনে একটুও চিন্তা করবেন না। একবার কইছিনা, মাইয়া আমার? আজাহার খোনকারের এক জবান। আমার বাড়িতে আপনের মাইয়ার কোনো অযত্ন হইবো না। আমি নিজে তার সেবা-যত্ন করবো। ক্যান, আমার নিজের মাইয়া হইলে করতাম না? সে তো আমার নিজের মাইয়াই নাকি! আর আমার বাড়িতে কাম-কাইজের মাইনষেরও অভাব নাই। সে রাজরাণির মতন থাকবো।'

এই রাজরানী শব্দটা শাহিনা বেগমের মাথায় ঢুকে গেছে। পাশের বাড়ির বয়স্ক ভাবির কথাগুলো তিনি তখন গ্রাহ্য করেননি। কিন্তু তারপর সময় যত গিয়েছে, ততই তার মনে হয়েছে, কথাগুলো মিথ্যা নয়। বরং সত্য, বাস্তব ও যুক্তিসংগত। তারপর থেকে কথাগুলো আরো বেশি মাথার মধ্যে গেঁথে গেছে।

New Pdf download: www.PoragEducation.com + webtalkbd.com

আজাহার খন্দকার আরো অনেক কিছুই বললেন, কিন্তু শাহিনা বেগম কণাকে দিতে রাজি হলেন না। তিনিও তার পক্ষ থেকে নানান যুক্তি দেখালেন। দেলোয়ার হোসেন বললেন, আরো কিছু সময় যাক, তারপর না হয় কণা গিয়ে একবার ঘুরে আসবে।

অবস্থা বুঝে আজাহার খন্দকারও আর খুব একটা জোর করলেন না। তার ভেতরে ভেতরে একটা ভয়, যদি কণাকে তারা আর না দেন, তাহলে তিনি কী করবেন? আসলেইতো তার আর কিছু করার নেই। কিন্তু নাতিটাকে দেখার জন্য সারাটাক্ষণ তার বুক ছটফট করে। মনে হয়, ওইটুক মুখজুড়ে পুরোটাই মনসুর। গায়ের গন্ধে মনসুর। চোখের তাকানোয় মনসুর। আজাহার খন্দকারের বুক ভেঙে উথাল-পাথাল কান্না চলে আসে, আহারে, আহারে! সেই পাড় ভাঙা বুক জোড়া লাগে যখন ছোট্ট ওই শরীরটাকে বুকের ভেতর নিয়ে জড়িয়ে ধরতে পারেন।

মাঝে মাঝে অবাকও লাগে আজাহার খন্দকারের, পৃথিবীতে এই যে এত সম্পর্ক, এত মায়া, প্রেম, ভালোবাসা, স্নেহ, মমতা তার সবই কেমন করে রক্তের সাথে মিশে থাকে! এই যে ছোট্ট একটা শিশু, তার পুরো শরীরজুড়ে তিনি রক্তের ঘ্রাণ পান, নিজের রক্তের। এই রক্তের ঘ্রাণে মিশে আছে জগতের সবটুকু মমতা। এই মমতার ঘ্রাণ ছেড়ে তিনি থাকবেন কী করে?

থাকতে পারেনও না। প্রতিটি দিন কাটে তারে ব্যাকুল অপেক্ষায়। ক্যালেন্ডারের পাতা দেখে দেখে। কতটুকু বড় হলো মন? নাতির নামটা তারও পছন্দ হয়নি, কিন্তু কণা যখন বললো, মনসুরের নামের প্রথম অংশ থেকে সে নামটা রেখেছে, তখন বরং খুশিই হয়েছেন আজাহার খন্দকার। কণা যে এখনো মনসুরকে এতটা গভীরভাবে ধারণ করে আছে, এই বিষয়টা তাকে আনন্দিত করেছে। মাঝে মাঝে একটা দুঃসাহসী স্বপ্নও তিনি দেখেন, কণা যদি বাকিটা জীবন এই খন্দকার বাড়িতেই কাটিয়ে দিতো! যদি আর কাউকে বিয়ে না করতো! একটা ছেলেতো রয়েছেই, ওই ছেলেটার মুখ চেয়ে সে কী তার জীবনের বাকি সময়টা কাটিয়ে দিতে পারবে না? কেন পারবে না? পৃথিবীর কত কত মা তার সন্তানের জন্য এর চেয়ে কত বড় বড় আত্মত্যাগই না করেছে! তাহলে কণা কেন পারবে না?

এইটুকু ভেবেই আবার মনে হয়, এই ভাবনাটুকু বড় বেশি অন্যায় হয়ে যায় কণার প্রতি। ওইটুকু এক মেয়ে! কতই বা আর বয়স হবে, উনিশ কিংবা কুড়ি। পুরোটা জীবন তার রয়ে গেছে। সেই জীবনটা সে কি নিয়ে কাটাবে? এই সমাজ, সংসার, সংস্কার বড় কঠিন। এখানে চাইলেই একজন মানুষ স্রোতের বিপরীতে একা দাঁড়াতে পারে না। সেখানে সেই স্রোতের বিপরীতে এগিয়ে যাওয়া বরং আরো অনেক বেশি কঠিন।

এই অবধি ভাবলে বড় অসহায় লাগে আজাহার খন্দকারের। রাতভর জেগে থাকেন তিনি। ঘুম হয় না। তার খুব ইচ্ছে হয় বিষয়টি নিয়ে কণার সাথে কথা বলতে, কিন্তু সাহস হয় না। কীভাবে এই কথাগুলো তিনি কণার সামনে তুলবেন!

দিন কাটতে চায়না আজাহার খন্দকারের। মনে হয়, নবীগঞ্জ না ফিরে যদি গোবিন্দপুরেই কণাদের সাথে থেকে যেতে পারতেন। অন্তত নাতিটা-কে তো রোজ একটু করে দেখতে পারতেন, ছুঁতে পারতেন, বুকের ভেতর জড়িয়ে ধরে গায়ের ঘ্রাণ নিতে পারতেন! কিন্তু তা হয় না। দেলোয়ার হোসেন বা শাহিনা বেগম মুখে কিছু না বললেও তার ঘনঘন উপস্থিতি যে তারা খুব একটা পছন্দ করেন না, আজাহার খন্দকার তা বোঝেন। গোবিন্দপুর গিয়ে তাই দু-চার দিনের বেশি থাকতে খুব বাঁধে আজাহার খন্দকারের। কিন্তু ওই যে একটু রক্তের ঘ্রাণ, একটু মমতা, স্নেহ, ভালোবাসার স্পর্শের জন্য বুকের ভেতরটা সারাক্ষণ হুহু করে, ওইটুকুর জন্য তিনি ভিখিরির মতোন গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন। কারো কিছু ভাবায়, বলায় কিছু যায় আসে না তার। ওইটুকু পাওয়ার জন্য সবকিছু মেনে নিতে পারেন তিনি।

মাস কয়েক পরে আবারও গোবিন্দপুর গেলেন আজাহার খন্দকার। কণা তখন উঠানে রোদের মধ্যে বসে ছেলেকে গোসল করাচ্ছে। শ্বশুরকে দেখে সে শাড়ির আঁচল মাথায় তুলে দিলো। আজাহার খন্দকার তাকিয়ে দেখলেন আশেপাশে কেউ নেই। তিনি গিয়ে টুপ করে কণার পায়ের কাছে বসে পড়লেন। তারপর হাত দুখানা জড় করে বললেন, 'মাগো, এই দুনিয়ায় আমার চাইতে দুঃখী, আমার চাইতে হতভাগা আর কেউ নাই। আমি বুড়া মানুষ। আর কয়টা দিন বাঁচবো জানি না। তোমার এই বুড়া বাপের জন্য তুমি অনেক কিছু করছো মা। তোমার কাছে আমার শেষ একখান অনুরোধ।'

আজাহার খন্দকার যেভাবে বসেছেন, কণা তাতে বিব্রতবোধ করছে কিন্তু কিছু বলতেও পারছে না। সে অসহায় ভঙ্গিতে তাকিয়ে রইলো আজাহার খন্দকারের দিকে। তারপর বললো, 'কী হয়েছে বাবা? আপনি ঘরে চলেন।'

'না মা। আমি ঘরে যাবো না। আমি এইহানেই বইসা থাকমু। তুমি যদি আমার লগে নবীগঞ্জ না যাও, আমি এইহানেই বইসা থাকমু মা। মাগো তুমি আমার এই কথাটা রাখো গো মা। এই বাচ্চাটা তার বাপ-দাদার ভিটা দেখবো না? বাপের কবর দেখবো না? আর মনসুরের জইন্য তোমার মনটা কী একটুও কান্দে না মা?'

এই কথার উত্তর কী দিবে কণা? সে কোনো উত্তর দিলো না। ছেলেকে কোলে করে ঘরে চলে এলো। আজাহার খন্দকার তার পিছে পিছে ঘরে এলেন। কণা বললো, 'আপনি কান্নাকাটি করবেন না বাবা। আমি নিজ থেকেই নবীগঞ্জ যাবো। আমার ছেলের আসল পরিচয় নবীগঞ্জ খন্দকার বাড়ি। এই বাড়ি তার কিছু না। সে তার আসল পরিচয়েই বড় হবে। ছেলে সন্তানের আসল পরিচয় তার বাপ-দাদার পরিচয়।'

কণার কথা শুনে আজাহার খন্দকার দীর্ঘসময় কিছু বলতে পারলেন না। তার মনে হলো তিনি আনন্দে অজ্ঞান হয়ে যাবেন। বহুদিন তিনি এত আনন্দ অনুভব করেননি। প্রবল দহনে পুড়তে থাকা তার বুকের ভেতরটা যেন মুহূর্তেই শীতল হয়ে গেলো। তিনি আচমকা হাউমাউ করে কেঁদে ফেললেন। কাঁদতে কাঁদতেই তিনি

New Pdf download: www.PoragEducation.com + webtalkbd.com

ওজু করে জায়নামাজ বিছিয়ে নামাজে বসে গেলেন। কণা বললো, 'বাবা এখন আপনি কোন ওয়াক্তের নামাজ পড়ছেন?'

আজাহার খন্দকার কণার প্রশ্নের উত্তর দিলেন না। তিনি নামাজ শেষে দীর্ঘ মোনাজাত করলেন। মোনাজাত থেকে উঠে তিনি তার ব্যাগ থেকে কিছু কাগজপত্র বের করলেন। কণা বললো, 'এইগুলা কী বাবা?'

আজাহার খন্দকার বললেন, 'এইগুলা হইলো আমার বাড়ির দলিল।'

'বাড়ির দলিল এখানে কেন নিয়ে আসছেন?'

'নিয়া আইছি কারণ হায়াত মউতের ঠিক নাই। আমি যেকোনো সময় মইরা যাইতে পারি। কহন কী হয়, তার ঠিক-ঠাকানা নাই। এইজন্য আমি আমার বাড়ি দলিল কইরা দিয়া গেছি আমার নাতিরে। আর তোমার নামেও দিয়া গেলাম দশ বিঘা ধানি জমি। কেউ যেন কোনোদিন তোমারে আর আমার নাতিরে উল্টাপাল্টা কিছু কইতে না পারে। তোমার পোলা হইবো খন্দকার বাড়ির রাজপুত্র। তোমার স্বামী নাই, তারপরও তুমি থাকবা রাজরানি।'

কণা কী বলবে ভেবে পেলো না। আজাহার খন্দকার বললো, 'আইজ তুমি যেই কথাখান কইছো, সেই কথাখান শুইন্যা আমার পরাণডা জুড়াইয়া গ্যাছেগো মা। তুমি আমার কাছে আইজ যা চাইবা, তাই পাইবা। বলো কী চাও?'

কণার হঠাৎ কী হলো, সে আজাহার খন্দকারের পায়ের কাছে বসে পড়লো। তারপর জড়ানো গলায় বললো, 'এসব আমার কিছু লাগবে না বাবা। এসব কিছু আমার লাগবে না। যার মাথার ওপর এইরকম একজন বাবা থাকেন, পৃথিবীতে তার আর কিছু লাগে না। বাবার এই ছায়াটাই তার সারা জীবনের প্রাপ্তি।'

আজাহার খন্দকার কণার মাথায় আলতো করে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললেন, 'মাগো, তুমি যে আমার কাছে কী, সেইটা আমি আমার কইলজা খুইলা না দেখাইতে পারলে কাউরে বুঝাইতে পারবো না। কিন্তু মাগো, আমি আইজ আছি, কাইল নাই। তহন আমার ছায়া তোমার মাথার ওপরে থাকবো না। টাকা-পয়সা, জমি-জিরাত অবজ্ঞা করনের জিনিস না। আরো বড় হও, তহন বুঝবা। ভালোবাসা, মায়া-মহব্বত এইসব বদলাইতে পারে। কিন্তু ট্যাকা পয়সা যতক্ষণ তোমার হাতে থাকবো, ততক্ষণ তোমার কথাই কইবো। এহন বুঝতেছো না। তোমার সামনে কঠিন সময়। ওই কঠিন সময় আমি তোমার শক্তি থাকবো না, তোমার মা বাপও চিরদিন বাঁইচা থাকবো না। তহন এইগুলা হইবো তোমার আসল শক্তি। আমাগোতো বয়স হইছে, আমরা বুঝি।'

কণা এরপর আর কথা বললো না। সে জানে, এই মানুষটা তার হৃদয়ের সবটুকু দিয়ে তাকে ভালোবাসে। আজাহার খন্দকার বললেন, 'এই যে আমি তোমাগো বাড়ি আসি, আমার ভালো লাগে না মা। আমি আজাহার খন্দকার, আমার নাতি হওনের সংবাদে আমি আশেপাশের কয়েক গ্রামের মানুষ দাওয়াত

দিয়া খাওয়াইছি। আমি হইলাম খোনকার বংশের পোলা। হাতি বাঁচলেও লাখ টাকা, মরলেও লাখ টাকা। এহন আমার অবস্থা খারাপ, কিন্তু আমার কইলজাখান আসমানের সমান বড়। সেই আসমান সমান কইলজাখান এই এটুক হাতের তালুর মতন হইয়া যায়, যহন আমি তোমাগো এই বাড়িতে আসি। মনে হয়, কেডা না জানি কী ভাবে, দূরে বইসা ফিসফিস কইরা কী কয়, তোমার মা-বাপে কিনা কী কয়! তারপরও আসি। কেন আসি জানোগো মা? তোমারে এক চোউখ দেহনের লাইগ্যা আসি। নাতিডারে একটু বুকে জড়াই ধরনের লাইগ্যা আসি। এ যে কী মায়া মাগো! যার নাই, সে বোঝবো না। আমার পোলাডাতো মা মইরা গেলো। আমারেও খুন কইরা থুইয়া গেলো। একেবারে নিঃস্ব, শূন্য। কিন্তু তোমাগোতো আমারে দিয়াও গেছে। তোমাগো ছাড়া আমি কেমনে থাকবো মা?'

আজাহার খন্দকারের দু চোখ গড়িয়ে পানি পড়ছে। তিনি ঝরঝর করে কাঁদছেন। কাঁদছে কণাও। কতদিন এই মানুষটার সাথে এভাবে কথা বলতে চেয়েছে সে! কিন্তু বাবা-মা কেন যেন চাইতেন না, আজাহার খন্দকারের সাথে খুব একটা কথা বলুক কণা। বরং তিনি আসলে কণাকে তারা যেন খানিকটা দূরে দূরেই সরিয়ে রাখতেন। কিন্তু আজ বাবা-মার অগোচরে যেন বুকের ভেতর বন্ধ হয়ে থাকা সবকটা জানালা তারা পরস্পরের জন্য খুলে দিলো। সেই খোলা জানালায় হু-হু করে ঢুকে পড়লো ভোরের নরম আলো-হাওয়া।

পরদিন কণা নিজ থেকেই তার মাকে বললো, 'মা একটা কথা।'

'তুই নবীগঞ্জ যাইতে চাস?'

'হ্যাঁ, মা।'

'তারপর তোরে যদি আর আইতে না দেয়?'

'আসতে দিবে না কেন?'

'এতসব তুই বুঝবি না। তহন এইগুলা নিয়া ঝামেলা করবে কে? এমনিতেই তোর চিন্তায় চিন্তায় তোর বাবার শইল স্বাস্থ্যের অবস্থা দেখছোস?'

কথা সত্য। মনসুরের ঘটনার পর থেকে দেলোয়ার হোসেন যেন পুরোপুরি ভেঙে পড়েছেন। একদম চুপচাপ হয়ে গেছেন। মাত্র বছর দেড়-দুই সময়েই শুকিয়ে রীতিমতো অর্ধেক হয়ে গেছেন। মাথায় টাক পড়ে গেছে। সদা ঝলমলে, হাস্যোজ্জ্বল মানুষটা মাত্র এ কটা দিনেই কেমন বুড়িয়ে গেছেন।

কণা বললো, 'কী বুঝবো না?'

'এই যে তারা তোকে কেন আইতে দিবে না।'

'না আসতে দিলে আসবো না। বিয়ের পর মেয়েরাতো শ্বশুরবাড়িতেই থাকে মা।'

কণার এই কথায় শাহিনা বেগমের অবস্থা হলো তড়িতাহতের মতো। তিনি বললেন, 'মাথায় জ্ঞান-বুদ্ধি কিছু আছে?'

New Pdf download: www.PoragEducation.com + webtalkbd.com

'আমি ভুলটা কী বললাম, বলোতো মা?'

'যার জামাই ই নাই, তার আবার শ্বশুর বাড়ি কিসের?'

'মা? জামাই নাই মানে কী?'

'জামাই নাই মানে কী তুই বুঝোস না?'

'না বুঝি না। বুঝিয়ে বলো।'

শাহিনা বেগম বুঝতে পারলেন, বহুদিন পর কণা যেন তার হারানো আত্মবিশ্বাস খুঁজে পেয়েছে। এই সময়ে মেয়েকে রাগানো যাবে না। তার সাথে কথা বলতে হবে কৌশলে। তিনি নরম গলায় বললো, 'মা রে, তুইতো এহন বড় হইছোস, সবইতো বুঝোস, তোরে আর আমি কী বুঝাইয়া বলবো?'

'না, মা। যা বলার স্পষ্ট করেই বলো।'

শাহিনা বেগম কণার কাছে খানিক ঘনিষ্ঠ হয়ে বললেন, 'তারা যদি তোরে আর না দেয়, তহন আমরা কী করবো?'

'তারা কেন দিবে না মা? আমাকে আটকে রেখে তাদের লাভ কী? আর কেনইবা আটকে রাখবে?'

'কারণ, এইহানে আইতে দিলে আমরা যদি আবার তোর বিয়া দেই!'

'তোমরা আমাকে আবার বিয়ে দিবে কেন?'

শাহিনা বেগম কণার কাঁধ ছুঁয়ে বললেন, 'বিয়াতো দিতেই হইবো মা। এই জীবনডা বড় কঠিন। বড় কঠিন।'

কথাটা কণা মার মুখ থেকে শুনবে বলে আশা করেনি। সে ঝট করে শাহিনা বেগমের মুখের দিকে তাকিয়ে বললো, 'মা!'

শাহিনা বেগম কণার দিকে তাকিয়ে আছেন। কিন্তু তার ডাকে সাড়া দিলেন না। কণা বললো, 'তোমরা আমাকে আবার বিয়ে দেবে? তুমি ঠিক আছো তো মা?'

শাহিনা বেগম এবার আর ভড়কে গেলেন না। তিনি শক্ত গলায় বললেন, 'হ্যাঁ, দিবো। তোমারে এইভাবে রাইখ্যাতো আমরা মরতে পারবো না। তোমার একটা জীবন আছে, ভবিষ্যৎ আছে। তোমার ছেলেটা একটু বড় হোক, সে একটু বড় হইলেই একটা ব্যবস্থা করবো।'

রাগে, দুঃখে, লজ্জায় কণার হাত পা কাঁপছে। রাগটা সে নিয়ন্ত্রণও করতে পারছে না। শাহিনা বেগম শান্ত গলায় বললেন, 'রাগারাগি করে লাভ নাই। নিজের মেয়ে এইরকম পরিস্থিতিতে পড়লে তহন বুঝতি, মা-বাপের কেমন লাগে।'

কণা আর কথা বললো না। সে শাহিনা বেগমের সামনে থেকে চলে গেলো। পরের শুক্রবার বাবা মা কাউকে কিছু জিজ্ঞেস না করেই সে আজাহার খন্দকারের সাথে নবীগঞ্জ যাত্রা করলো।

ভয়াল দর্শন চেহারা নিয়েও চলনে বলনে অদ্ভুত এক নির্লিপ্ততা ধরে রেখেছে নুরুন্নবী। যেন জগতে কারো প্রতিই তার কোন রাগ নেই, ক্ষোভ নেই, ক্রোধ নেই। কিন্তু তার সেই নির্লিপ্ততা খসে পড়লো জব্বারকে কাছে পেয়ে। থানার পেছনে বড় একখানা রান্নাঘর। রান্নাঘরের এক দিকে রান্নার সরঞ্জামাদি, কাঠ রাখার জায়গা ও চুলা। অন্য দিকে একখানা চৌকি। এই চৌকিতেই ঘুমায় নুরুন্নবী। ঘরের মাঝখানে কাপড়-চোপড় রাখার ছোট একখানা আলনা। এই আলনাখানাই রান্নাঘর আর নুরুন্নবীর ঘুমানোর জায়গার মধ্যে কোনোরকমে একটা বিভাজক দেয়ালের কাজ করছে। জব্বার বসে আছে সেই চৌকিতে। তার সামনে নুরুন্নবী দাঁড়ানো। নুরুন্নবীর মুখখানা কালো চাদরে ঢাকা। সে সেই কালো চাদরের আড়াল থেকে নরম গলায় বললো, 'জোহরা কেমন আছে?'

জব্বার জবাব দিলো না। তার হাতে হাতকড়া পরানো বলে নড়তে কষ্ট হচ্ছে। নুরুন্নবী বললো, 'তার চেহারা আমি দেখতে পারি নাই, আন্ধার আছিলো। চেহারা নাকি সোন্দর?'

জব্বার এবারও জবাব দিলো না। নুরুন্নবী বললো, 'আমার ঠোঁট কাটা। কথা কইতে কষ্ট হয়। কিন্তু তোর লগেতো কামের চাইতে ঘাম বেশি যাইতেছে। কথা কস না কেন?'

জব্বার এবারো চুপ করে রইলো। নুরুন্নবী খুব স্বাভাবিক ভঙ্গিতে হেঁটে পেছনে চুলার কাছে গেলো। তারপর চুলা থেকে একখানা জ্বলন্ত কাঠ নিয়ে ফিরে এলো। কাঠের মাথায় গনগনে আগুন। সে জব্বারের মুখের একদম কাছে নিয়ে গেলো গনগনে আগুনের অংশটুকু, কিন্তু ছোঁয়ালো না। তারপর নিজের মুখের ওপর থেকে চাদরটা সরিয়ে দিয়ে বললো, 'এই দিকে তাকা।'

New Pdf download: www.PoragEducation.com + webtalkbd.com

জব্বার তাকালো। সাথে সাথে তীব্র আতঙ্কে ফ্যাকাশে হয়ে গেলো তার চোখ। এমন ভয়াবহ মুখ সে দুঃস্বপ্নেও কখনো দেখেনি। নুরুন্নবী ঠাণ্ডা গলায় বললো, 'কারো সোন্দর চোহারা দেখলেই আমার ইচ্ছা হয়, তার চেহারাখানও আমি আমার চেহারার মতোন বানাই ফালাই। তোর চেহারা কিন্তু সোন্দর আছে।'

পরের সময়টুকুতে জব্বারকে এক কথা আর দুবার জিজ্ঞেস করতে হলো না। তার শরীরে কোনো আঘাতও করতে হলো না। যা যা জিজ্ঞেস করা হলো, সে সব গড়গড় করে বলে দিতে থাকলো।

সে জানালো, হারাধন পুলিশকে যে কথা দিয়েছিলো, তা রাখেনি। শুধু যে রাখেনি তা-ও না, বরং এরপরও ডাকাতদের হয়ে কাজ করেছে হারাধন। এই কাজ করতে গিয়ে নতুন করে পুলিশের সাথে মিথ্যেও বলেছে সে। যার একটি ছিলো জব্বার ও তার সঙ্গীদের নিরাপদে ফেরত পাঠানো নিয়ে। সে বলেছিলো, জব্বারদের নিরাপদে ফিরে যেতে দিলে, পরবর্তীতে ডাকাতদের আরো বড়সড় একটা দলকে সে ধরিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করবে। সেদিন জব্বার তার করাতকলে ঢোকামাত্রই পুলিশের বিষয়টিও সে আগেভাগেই জানিয়ে দিয়েছিলো। যাতে পরিস্থিতি সম্পর্কে সতর্ক হয়ে যায় জব্বার। এবং তারপর জব্বারের সাথে পরামর্শ করেই সে মইনুল হোসেনের কাছে গিয়েছিলো।

ঘটনা শুনে মইনুল হোসেনের ক্ষিপ্ত হবার কথা ছিলো। কিন্তু কোনো এক রহস্যময় কারণে খুব একটা ক্ষিপ্ত হলেন না তিনি। বরং হারাধনকে খবর দিয়ে এনে জব্বারের মুখোমুখি বসিয়ে দিলেন। হারাধন বললো, 'জব্বারের কথা ঠিক না ছার। ও মিথ্যা বলতেছে। এইসব কিছুই আমি করি নাই। এইসব কিছুই আমি জানি না।'

হারাধন বয়স্ক মানুষ। তারপরও মইনুল হোসেন কষে একটা চড় লাগালেন হারাধনের গালে। শীর্ণ শরীরের হারাধন ছিটকে পড়লো মেঝেতে। তারপর আবার নিজে নিজেই উঠে এসে বসলো। তবে সেইদিন এরচেয়ে আর বেশি কিছু বলা হলো না হারাধনকে। মইনুল হোসেন অবশ্য অপেক্ষায় ছিলেন, বাকি দু'জন ফিরে যাওয়ার পরের ঘটনার জন্য। তিনি নিশ্চিত ছিলেন তারা ফিরে গিয়ে জব্বারের আটক হওয়ার খবর দিলে লস্কররা কোনো না কোনো পদক্ষেপ নিবেই। কিন্তু তাকে অবাক করে দিয়ে এরপর আর কিছুই ঘটলো না। যেন পুরোপুরি উধাও হয়ে গেলো লস্কররা। কোনো প্রতিক্রিয়াতো দূরে থাক, কোথাও কোনো সাড়াশব্দ অবধি পাওয়া গেলো না তাদের। মাসের পর মাস অপেক্ষায়, চূড়ান্ত সতর্কতায় প্রতিটি মুহূর্ত কাটিয়ে দিতে লাগলেন মইনুল হোসেন। কিন্তু কোনো লাভ হলো না। যেন দুম করেই হাওয়ায় মিলিয়ে গেলো তারা।

এই ঘটনায় যারপরনাই হতাশ বোধ করতে লাগলেন মইনুল হোসেন। তার মনে হতে লাগলো, বারবার তিনি ব্যর্থ হচ্ছেন। এবং এই ব্যর্থতার কোনো যৌক্তিক কারণ তার কাছে নেই। অন্তত এবার তিনি সর্বোচ্চ সতর্কাবস্থায়ই ছিলেন। নাকি এমন কেউ আছে, যে তার ভাবনা বা পরিকল্পনা আগেভাগেই জেনে ফেলে। আর সে সব জানিয়ে দেয় লস্করদের?

এইটুকু ভেবে অবশ্য থমকে গেলেন মইনুল হোসেন। চাইলেই কারো পক্ষে যখন-তখন নবীগঞ্জ থেকে লস্করের চরে যাওয়া সম্ভব নয়। নিজেদের নিরাপত্তার স্বার্থেই বছরের পর বছর নিজেদের প্রায় দুর্গম্য করে রেখেছে লস্কররা। পুরোপুরি যে পেরেছে, তা নয়। তবে এক ধরনের রহস্যময়তা তারা তৈরি করতে পেরেছে। তাদের নিয়ে মানুষের ভেতর দ্বিধা আর আতঙ্ক ছড়িয়ে একটা অস্পষ্টতাও তৈরি করে রেখেছে। সেসব দ্বিধা, সংশয় ঝেড়ে ফেলে যে দুয়েকবার পুলিশ সেখানে অভিযান চালাতে চেয়েছিলো, তাও সেভাবে সফল হয়নি। ফলে, সেই রহস্যময়তা, ভয়, অস্পষ্টতা দিনে দিনে আরো বেড়েছে। লস্করের চর ক্রমশই হয়ে উঠেছে আরো অগম্য, অজেয়।

মইনুল হোসেনের সন্দেহের তীর শেষ অবধি গেলো ওই একজনের দিকেই, সে হলো হারাধন। তার ধারণা, সেইরাতে সুবর্ণপুর নদীতে অপেক্ষায় থাকা বাকি দুজনকে কোনো না কোনোভাবে সাবধান করে দিয়েছিলো হারাধনই। জব্বারকে আটক করার সাথে সাথেই সে সম্ভবত পুলিশের পরিকল্পনা বাকিদের জানিয়ে দিতে পেরেছিলো। আর সেটাই যদি হয়, তাহলে জব্বারকে ছাড়ানোর জন্য লস্করের চর থেকে আপাতত কারো আসার কথাও নয়।

মইনুল হোসেন আবারো ডাকলেন হারাধনকে। হারাধন কসম করে বললো যে সে এসবের কিছুই জানে না। ক্ষিপ্ত মইনুল হোসেন এবার হারাধনের দায়িত্ব দিয়ে দিলেন নুরুন্নবীকে। কিন্তু বয়সের ভারে ন্যুব্জ, অসুস্থ হারাধন সেসব সহ্য করতে পারলো না। তাকে মৃতপ্রায় উদ্ধার করা হলো নুরুন্নবীর ঘর থেকে। হারাধনের অবস্থা দেখে মইনুল হোসেন একটু ঘাবড়েই গেলেন। তিনি যে প্রক্রিয়ায় নবীগঞ্জ থানায় আসামি গ্রেপ্তার করে দিনের পর দিন রেখে দিচ্ছেন, জিজ্ঞাসাবাদ করছেন তা অনেকক্ষেত্রেই প্রচলিত আইনের মধ্যে পড়ে না। কিন্তু তার কাছে এ ছাড়া আর কোনো উপায়ও নেই। তিনি জানেন, যেকোনো উপায়েই হোক, এই ভয়াবহ ঘটনার শেষ তিনি দেখে নিতে চান। আর এজন্যই বছরের পর বছর প্রায় মাটি কামড়ে তিনি পড়ে রয়েছেন এই নবীগঞ্জে।

ওপর মহল থেকে নানান ঝামেলাও তাকে পোহাতে হয়েছে। কিন্তু তিনি হাল ছাড়েননি। এখন এই অবস্থায় হারাধনের যদি কিছু হয়ে যায়, তাহলে বড় ধরনের বিপদে পড়ে যাবেন তিনি। ফলে হারাধনকে আর নুরুন্নবীর কাছে পাঠালেন না মইনুল হোসেন। বরং কীসব ভেবে তাকে একপ্রকার মুক্তিই দিয়ে দিলেন।

সময় চলে যাচ্ছে। কিন্তু লস্করদের তরফ থেকে আর কোনো সাড়া-শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। বিষয়টা এখন কেমন যেন রহস্যময় আর অদ্ভুত লাগছে মইনুল হোসেনের কাছে। লস্কররা যতই আগেভাগে খবর পেয়ে থাকুক, যতই সতর্ক হয়ে থাকুক, তারপরও জোহরার অন্তত এতটাদিন এভাবে চুপচাপ থাকার কথা নয়। জোহরা সম্পর্কে তিনি যতটুকু শুনেছেন, দেখেছেন, জেনেছেন, তাতে বিষয়টা

New Pdf download: www.PoragEducation.com + webtalkbd.com

খুবই অদ্ভুত ঠেকছে মইনুল হোসেনের কাছে। অপেক্ষা করতে করতে ক্লান্ত, বিরক্ত, হতাশ মইনুল হোসেন একদিন একরামুল হককে ডাকলেন। তারপর বললেন, 'কখনো দাবা খেলেছেন একরাম সাব?'

'না স্যার। কঠিন খেলা। অত বুদ্ধি আমার মাথায় নাই।'

'দাবা খেলায় দুই পক্ষই যদি রক্ষণাত্মক খেলা শুরু করে, তাহলে সেই খেলা জীবনেও শেষ হবে না। কাউকে না কাউকে আক্রমণে যেতেই হবে।'

একরামুল হক গাল চুলকাতে চুলকাতে বললো, 'আমরা কী তাইলে আক্রমণে যাবো নাকি স্যার?'

'আর কী করবো? এইভাবে আর কতদিন বসে থাকবো?'

'কিন্তু স্যার, তেমন লোকবল কী আমাগো আছে?'

'বহুদিন আগে জেলা পুলিশ সুপার আমাকে আশ্বাস দিয়েছিলেন যে, তেমন দরকার হলে তারা আমাদের লোকবল দিতে প্রস্তুত আছেন। কিন্তু তার আগে আমাদের নিশ্চিত হতে হবে যে ব্যর্থ হওয়ার সুযোগ আমাদের নাই। আর লস্করদের ওপর ভালো হোমওয়ার্ক করে যেতে হবে। মানে ধরেন, তাদের শক্তি-সার্মথ্য, প্রতিরোধ ব্যবস্থা, অস্ত্র-শস্ত্র কী আছে, আর অবস্থানটা ঠিক কোন জায়গাটাতে, এইসব বিষয়ে একটা স্পষ্ট ধারণা থাকতে হবে।'

'সেই ধারণা কী আমাগো আছে স্যার?'

'আমরা সেই ধারণা নেয়ারই চেষ্টা করবো। এখনই কোনো এটাকে যাচ্ছি না আমরা। কিন্তু এভাবে হাত-পা গুটিয়ে আর কতদিন বসে থাকবো? তার চেয়ে কিছু একটাতো অন্তত করতে পারতাম, তাই না? এখনতো আমাদের কাছে জব্বার আছে। তাকেতো আমরা কাজে লাগাতে পারতাম। কী পারতাম না? চরের বিষয়ে খোঁজখবর নিতে সে আমাদের হেল্প করতে পারতো, চরের অবস্থান কোথায়, কীভাবে যেতে হয়, এইসব...।'

একরামুল হক যেন খানিক ভড়কে গেলো। সে বললো, 'আমরা কী স্যার একদম চরে চইলা যাবো?'

মইনুল হোসেন ভ্রু নাচিয়ে বললেন, 'কে জানে, যেতেও তো পারি।'

পরের সপ্তাহে তারা রওয়ানা হলেন সুবর্ণপুর বিলের উদ্দেশ্যে। বর্ষা এখনো শুরু না হলেও জ্যৈষ্ঠের মাঝামাঝিতেই বিল থৈথৈ করছে পানিতে। যতদূর চোখ যায় শুধু পানি আর পানি। যেন অকূল পাথার। ট্রলারখানাকে মনে হচ্ছে ডিঙি নৌকার চেয়েও ক্ষুদ্র। মইনুল হোসেনের এই প্রথম সত্যি সত্যি ভয় লাগতে লাগলো। এই বিলে কোনোভাবে যদি ট্রলারখানা ডুবে যায়, তাহলে কারো পক্ষেই বেঁচে ফেরা সম্ভব না। এতদিনে তিনি উপলব্ধি করতে পারলেন, কেন ওই দুর্গম চরে অভিযান চালাতে পুলিশের এত অনীহা। শুধু যে ট্রলার ডুবে গেলেই তারা বিপদে পড়বেন, তাও না। হঠাৎ তেল ফুরিয়ে গেলে, বা কোনো কারণে মাঝি পথ

ভুল করলে, কিংবা ট্রলারে যান্ত্রিক কোনো ত্রুটি ধরা পড়লেও ভয়াবহ বিপদে পড়বেন তাঁরা।

আশেপাশে কোথাও কোনো মনুষ্য বসতি চোখে পড়ে না। সামান্য বাতাস হলেই ডিঙি নৌকার মতো থরথর করে কাঁপে ট্রলারখানা। ভেতরে ভেতরে ভড়কে গেলেও বাইরে প্রকাশ করলেন না মইনুল হোসেন। নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে বসে রইলেন ট্রলারের সামনে। তাঁর পাশে একরামুল হক। নিচেই বসেছে জব্বার। তার হাত বাঁধা। জব্বারের পেছনে বসে আছে নুরুন্নবী। এ ছাড়া আরো সাত-আটজন পুলিশ কনস্টেবল রয়েছে। মাঝি হিসেবে আছে মনু মিয়া।

চিন্তার বিষয় হলো ট্রলারখানা সুবর্ণপুর নদী পেরিয়ে বিলে পড়তেই জব্বারের ভাবভঙ্গী পাল্টে গেছে। খানিক আগের সেই ভীত, জড়সড় ভাবটা আর নেই। তার পেছনে নুরুন্নবী আছে জেনেও সে নির্বিকার। সেদিনের পর এই এতদিনে একবারের জন্যও নিজ থেকে কোনো কথা বলেনি জব্বার। কিন্তু আজ বললো, 'ছার?'

মইনুল হোসেন পেছন ফিরে জব্বারকে দেখলেন। তবে জবাব দিলেন না। জব্বার বললো, 'দরিয়া দেখছেন? এর নাম দরিয়া। কোনো কূল-কিনারা নাই।'

'এটাকে দরিয়া বলে না। এটা হলো বিল। দরিয়া মানে নদী।'

'হে হে হে। না ছার। এইডাই দরিয়া। দরিয়া হইলো নদীর মা। এই দরিয়ার প্যাটের মইধ্যের তন নদী বাইর হয়। বুঝছেন?'

একরামুল হক বললো, 'বুঝছি। তুই এইবার ক, তোর চর আর কতদূর?'

জব্বার হাসলো, 'ডর লাগতেছে, না ছার?'

'কেন? ডর লাগবো কেন? আমি নদী অঞ্চলের পোলা। পানির মইধ্যে ছাইড়া দিলে মাছের লাহান ভাইস্যা থাকতে পারি। ডরের কী আছে?'

'হা হা হা।' জব্বার এবার শব্দ করেই হাসলো, 'এই দরিয়াতে সাঁতারের বড়াই দেহাইয়েন না ছার। ছোডবেলায় শুনছি, এই দরিয়া বড়াই পছন্দ করে না। সে পছন্দ করে ডর। তারে যে যত ডরায়, সে তার ওপর তত খুশি। সাঁতারের বড়াই দেহাইলে সে কিন্তু সাঁতারের পরীক্ষা নিবো। দিবেন নি পরীক্ষা? হা হা হা।'

একরামুল হক এমনিতেই ভয়ে কাতর হয়ে আছেন। তার ওপর জব্বারের কথা শুনে তার আরো অস্বস্তি হচ্ছে। তিনি আবারো বললেন, 'তুই আগে ক, আর কতক্ষণ লাগবো?'

'আমাগো চরে যাইবেন ছার?'

এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে একরামুল হক থমকে গেলেন। সামনে থেকে মইনুল হোসেন বললেন, 'কোথায় যাবো, কতটুকু যাবো সেটা পরের হিসেব। তুই আগে তোদের চরে যাওয়ার পথেই নিয়ে যা।'

জব্বার হাসলো, 'সময় লাগবো ছার। আইজ সারাদিন লাগবো। সারারাইত লাগবো। কাইল সকাল সকাল যাওন যাইতে পারে। তয় আমিওতো ভালো চিনি

New Pdf download: www.PoragEducation.com + webtalkbd.com

না। আমাগো সবাই কী এই কূল-কিনারা নাই দরিয়ায় দিক চিন্যা আইতে পারে? পারে না। যারা টলার চালায় তারা চেনে। তার পরও আমি পারবো। একটু দেরি হইবো। কাইলকের দিন দুপারও লাইগ্যা যাইতে পারে।'

মইনুল হোসেন কথা বললেন না। একটানা ট্রলারের ইঞ্জিনের শব্দে তার মাথা ধরে গেছে। ট্রলারে বড় দুই ড্রামে করে অতিরিক্ত তেল নেয়া হয়েছে। কিন্তু এখন তার মনে হচ্ছে, এই পাগলামি করার কোনো মানেই হয় না। এই যাত্রায় কোনো কিছু প্রাপ্তির সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। তার চেয়েও বড় কথা জব্বার তাদের ঠিক পথে নিচ্ছে, না ভুল পথে নিচ্ছে তাই বা তারা বুঝবেন কী করে?

বিকেল নাগাদ ট্রলারের সকলেই প্রায় ক্লান্ত হয়ে পড়লো। ইঞ্জিনের একঘেয়ে ক্লান্তিকর শব্দে সকলেই ঢুলছে। আর খানিকবাদেই সন্ধ্যা নেমে আসবে। ঠিক সেই মুহূর্তে মইনুল হোসেনের আচমকা মনে হলো, বোকার মতো সেধে সেধে একটা বড়সড় বিপদে পড়তে যাচ্ছেন তিনি। এবং সেই বিপদ থেকে মুক্তির আর কোনো আশা থাকবে না তাদের। জব্বার চাইলেই তাদের বিভ্রান্ত করে এমন কোথাও নিয়ে যেতে পারে, যেখান থেকে জব্বারের সাহায্য ছাড়া তারা আর ফিরতে পারবেন না। কিংবা রাতের অন্ধকারে জব্বার তাদেরকে লস্করের চরে নিয়ে গেলেও তাদের কিছু করার থাকবে না। সেখান থেকে ফেরার আর কোনো উপায়ও জানা নেই তাদের। জব্বার যতই বলুক লস্করের চর এখনো এক-দেড় দিনের পথ, কিন্তু এই ট্রলারে সে ছাড়া আর কেউই জানেনা, সে সত্যি বলছে না মিথ্যে বলছে। আর ঘুটঘুটে রাতের অন্ধকারে কী ঘটবে তাও কেউ জানে না।

মইনুল হোসেন আচমকা মনু মাঝিকে ট্রলার থামাতে বললেন, 'আমরা আর সামনে যাবো না মনু, ট্রলার নবীগঞ্জের দিকে ফিরিয়ে নে।'

মইনুল হোসেনের কথা শুনে মনু মাঝি খুবই অবাক হলো। অবাক হলো বাদবাকি সকলেই। তবে কেউ কিছু বললো না। কারণ সকলের মনের মধ্যেই একটা চাপা উৎকণ্ঠা, একটা অজানা আশঙ্কা কাজ করছিলো। মইনুল হোসেনের এই কথায় তারা যেন একটু হলেও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো। কিন্তু যন্ত্রণা শুরু করলো জব্বার, 'কেন ছার? ফিরা যাইবেন কেন?'

মইনুল হোসেন বললেন, 'নবীগঞ্জে জরুরি কাজ রয়ে গেছে। সেগুলো শেষ করে আরেকদিন আসবো।'

জব্বার প্রায় অনুরোধের ভঙ্গিতে বললো, 'আরতো বেশি নাই ছার, অল্পখানি পথ। তারপরই দূর থেইকা আমাগো চর দ্যেহা যাইবো।'

মইনুল হোসেন একই ভঙ্গিতে বললেন, 'আজ আর না।'

জব্বার বললো, 'এতদূর আইস্যা না দেইখা চইলা যাওন কী ঠিক হইবো ছার?'

মইনুল হোসেন জব্বারের কথার আর জবাব দিলেন না। জব্বার অনেক অনুনয়, বিনয়, আকুতি মিনতি করলো। কিন্তু তাতেও যখন সে মইনুল হোসেনের

মন গলাতে পারলো না, তখন একের পর এক বিদ্রুপাত্মক কথা বলতে শুরু করলো, 'হা হা হা। ডর লাগতেছে না? ডর? এই কইলজা লইয়ানি আপনেরা লস্করগো লগে টক্কর দেবেন? হা হা হা। লস্করগো চরে হামলা করবেন? হা হা হা। লস্করগো চেনেন আপনেরা? চেনেন না? তাগো খোদায় মাটি দিয়া বানায় নাই, তাগো বানাইছে লোহা দিয়া। আর তাগো ধরবেন আপনেরা? তাও লস্করগো চরে যাইয়া? হা হা হা।'

নুরুন্নবী হঠাৎ বিরাশি সিক্কা ওজনের এক চড় বসিয়ে দিলো জব্বারের গালে। আচমকা তাল সামলাতে না পেরে ট্রলারের ডান দিকের কাঠের কাঠামোর ওপর মুখ থুবড়ে পড়ে গেলো সে। তার ঠোঁট ফেটে গলগল করে রক্ত বের হলো। জব্বার অবশ্য থামলো না। সে হাসতেই থাকলো। তার ফাটা ঠোঁটের ফাঁক গলে বের হয়ে আসছে অদ্ভুত এক গা হিম করা হাসির শব্দ।

সেই হাসি শুনতে শুনতে মইনুল হোসেনের হঠাৎ মনে হলো, একদম সেধে সেধে জীবনের সবচেয়ে ভয়ংকর বিপদটাতে পড়তে গিয়েও শেষ পর্যন্ত রক্ষা পেলেন তারা। সন্ধ্যার ম্লান আলোতে বিশাল জলরাশির বুকে ভাসমান ছোট্ট ট্রলারখানা ততক্ষণে আবার ছুটতে শুরু করেছে নবীগঞ্জের পথে।

New Pdf download: www.PoragEducation.com + webtalkbd.com

মাস দুয়েক হয়ে গেছে কণা নবীগঞ্জে এসেছে। ছেলেটা যেন বড় হয়ে উঠছে দ্রুতই। সেদিনের সেই তুলতুলে পাখির বাচ্চার মতো ছেলেটার বয়স বছর ঘনিয়ে এলো। নবীগঞ্জে কণার দিন কাটে আলস্যে, আহ্লাদে। আজাহার খন্দকার তাকে সত্যি সত্যি রাজরাণি করেই রেখেছেন। সে ডানে তাকালে মানুষ, বাঁয়ে তাকালে মানুষ। কিছু বলার আগেই সব হাজির হয়ে যায়। তবে এও এক ধরনের যন্ত্রণা। কণা বোঝে, আজাহার খন্দকার তাকে হারানোর ভয় পান। বস্তুগত নানান বিষয়াদিতে কণাকে আটকে রাখার চেষ্টা তার ভাবনার স্বাভাবিক আটপৌড়ে দিক হলেও, তিনি আসলে কণাকে আটকে রাখতে চান গভীর মমতা আর স্নেহেও। আর এসব বোঝে বলেই কোনোকিছু নিয়েই কখনো উচ্চবাচ্য করে না কণা। বরং এই স্নেহ, মমতা, ভালোবাসার অত্যাচারটুকু সয়ে যায়। ওইটুকু ছোট্ট মন সেও তার দাদার খুব ভক্ত হয়েছে। আজকাল মাকে ছাড়াও চলে তার। সারাক্ষণ দাদার লম্বা দাড়ি ধরে টানে। আর ফোকলা দাঁতে ফিক করে হেসে দেয়। আজাহার খন্দকারও যেন জীবন্ত একটা খেলনা পেয়েছেন, আর নিজে হয়ে গেছেন পাঁচ বছরের শিশু। সেই খেলনা নিয়েই দিনভর ব্যস্ততা তার। কোনোক্রমেই মুহূর্তের জন্যও হাতছাড়া করতে চান না। এমনকি কণা যখন মন-কে গোসল করাতে কিংবা দুধ খাওয়াতে নিতে চায়, সেই সময়টুকুতেও ছটফট করেন তিনি।

বিষয়টা কণার যে সবসময় ভালো লাগে এমন নয়। তবে কতকিছুইতো মানিয়ে নিতে হয়েছে তাকে। জীবনটা যে মানিয়ে নেয়ারই অন্য নাম, এতদিনে কণা তা বুঝে গেছে। সে তাই সবকিছুর সাথেই মানিয়ে নেয়ার চেষ্টা করে। মনসুরতো আর নেই যে সে আলাদা করে নিজের অনুভূতি, স্পর্শের কথা ভাববে!

এই একটামাত্র জায়গা, যেখানে এসে কণার সব অভিমান, সব ভালোবাসা, সব কষ্ট একাকার হয়ে যায়। মনসুর কতদিন আসে না! সে ভেবেছিলো নবীগঞ্জ এলে মনসুর আবার আগের মতো করে তার কল্পনায় ধরা দেবে। আরো গভীর, আরো তীব্রভাবে। এখানে ওই কবরটাতেইতো শুয়ে আছে সে। মনসুর কী দেখতে পায় না, কণা কেবল তার কাছাকাছি থাকার জন্য অতদূর থেকে চলে এসেছে! খুব ভোরে ফজরের নামাজ পড়েই মনসুরের কবরটার পাশে গিয়ে দাঁড়ায় কণা। কখনো কখনো গভীর রাতেও। লোকে কবর কেন ভয় পায় কণা জানে না। তার বরং মনসুরের কবরের পাশে গিয়ে দাঁড়াতে ভালো লাগে। কিন্তু এতকিছুর পরও মনসুর কেন আসে না? কিসের এত অভিমান তার? আজকাল কণারও এক ধরনের অবুঝ অভিমান হয়। মানুষটাকে এত ভালোবাসে সে! সারাটাক্ষণ বুকের ভেতর তিরতির করে কাঁপে। চিনচিনে একটা ব্যথা অবিরাম যন্ত্রণা হয়ে বেঁধে। অথচ তারপরও মানুষটা স্বপ্নেও একবার আসে না। এমন কেন হয়? কণা চোখ বন্ধ করে মনসুরের চেহারা মনে করার চেষ্টা করে। একটা ঝলমলে হাসিখুশি মুখ। কণার মনে হয় এই বুঝি তাকে ডাকলো, 'কী কন্যা অভিমানী, খুব অভিমান হচ্ছে?'

কিন্তু এইটুকু আর বলে না মনসুর। তার আগেই কোথায় মিলিয়ে যায়! শান্ত জলের বুকে হঠাৎ ঢেউ পড়লে যেমন সব প্রতিবিম্ব মিলিয়ে যায়, ঠিক তেমন। কী যে কষ্ট হয় কণার, কী যে কষ্ট! এই কষ্টের আর কোনো সীমা-পরিসীমা নেই। গভীর রাতে তার নিঃসঙ্গ কান্নার সাক্ষী হয়ে থাকে ভেজা বালিশ। রাতের আকাশ থেকে টুপটাপ ঝরে পড়ে শিশির, আর কণার চোখ থেকে ঝরে পড়তে থাকে অশ্রু। কিন্তু রাত জেগে সেই শিশিরের শব্দ শুনতে থাকা নিঃসঙ্গ মানুষটার কান্না শুনবার মতো কেউ যেন আর এ জগতে নেই।

কণার সাথে এই বাড়িতে কথা বলার মানুষ বলতে এখন কেবল মঞ্জু। আজাহার খন্দকার সারাক্ষণ ব্যস্ত থাকেন নাতিকে নিয়ে। মঞ্জুও ব্যস্ত হয়ে পড়েছে খুব। নতুন আড়তটাকে অল্প কদিনেই দাঁড় করিয়ে ফেলেছে সে। দিনরাত অমানুষিক পরিশ্রম করে। তার ফাঁকে ফাঁকেই যতটুকু কথা হয়, তা ওই মঞ্জুর সাথেই। মঞ্জুর অর্ন্তমুখী ভাবটা যে খুব একটা কেটেছে, তা নয়। কিন্তু তারপরও সময় এবং বয়স বদলে দিয়েছে তাকেও খানিকটা। মঞ্জুর পড়াশোনাটা আর হলো না। এই নিয়ে অবশ্য আক্ষেপও নেই তার।

সেদিন ভর সন্ধ্যাবেলা কণা বসেছিলো উঠানের দক্ষিণ দিকের শেষ প্রান্তের বাঁশের মাচার মতো জায়াগাটিতে। দিনের আলো নিভে আসছে। সামনে বিস্তৃত বিল। বিলের পানিতে একটা মৃদু ঢেউ। ফুরফুরে একটা হাওয়াও আছে। তবে সব মিলিয়ে একটা মন কেমন করা সন্ধ্যা। সেই সন্ধ্যাটা বিষণ্ন কণাকে যেন আরো বিষণ্ন করে দিলো। মঞ্জু হঠাৎ ডাকলো তাকে, 'ভাবি!'

কণা কিছুক্ষণ চুপ করে রইলো, মঞ্জু কী এর আগে কখনো তাকে ভাবি বলে ডেকেছে? অনেক চিন্তা করেও কণা মনে করতে পারলো না। তবে অদ্ভুত বিষয়

New Pdf download: www.PoragEducation.com + webtalkbd.com

হচ্ছে, আজ মঞ্জুর এই ডাকটুকু যে কী অসম্ভব ভালো লাগলো তার। মনে হলো এই ডাকটুকুর পুরোটা জুড়ে মনসুর মিশে আছে। এই শব্দটা তার সাথে জুড়ে গেছে কেবল মনসুরের জন্যই। যে ডাকটি কখনো শুনেছে কিনা, তা-ই মনে করতে পারছিলো না কণা, সেই ছোট্ট শব্দটার কারণে তার মন ভালো হয়ে গেলো! কী গভীর সংবেদনশীলতায় অমন অবচেতন ভাবনায়ও সে মনসুরকে এমন গভীরভাবে ধারণ করে রাখে। কণা ইচ্ছে করেই মঞ্জুর ডাকে সাড়া দিলো না। মঞ্জু যদি আবার ডাকে!

তবে মঞ্জু আর ডাকলো না। সে এসে কণার পাশে দাঁড়ালো। তারপর বললো, 'আপনি এইখানে বসে আছেন কেন?'

'কেন? এখানে বসা নিষেধ?'

কণার পাল্টা প্রশ্নে খানিক বিব্রত হয়ে গেলো মঞ্জু। সে যেন কিছু একটা বলতে চাইছিলো, কিন্তু এখন আর বলতে পারছে না। কথাটা যেন ঠিকঠাক গুছিয়ে আনতে পারছে না। কণা বললো, 'কিছু বলবে মঞ্জু?'

মঞ্জু ইতস্তত ভঙ্গিতে বললো, 'না মানে... এখন ভর সন্ধ্যাতো। আব্বা বলছিলো আপনাকে একটু ঘরে গিয়া বসতে। মসজিদে মাগরিবের আজান হচ্ছে।'

কণার একদম খেয়াল ছিলো না। সে তড়িৎ উঠে দাঁড়ালো। আজাহার খন্দকার মসজিদে যাচ্ছেন নামাজ পড়তে। তিনি নিজে বলতে পারছিলেন না দেখে মঞ্জুকে দিয়ে বলালেন, বিষয়টি ভাবতেই কেমন লজ্জা লাগছিলো কণার। সেও ঘরে গিয়ে ওজু করে নামাজ পড়তে গেলো।

রাতে ঘুমাতে যাওয়ার আগে হঠাৎ মঞ্জু এলো। সে তাকিয়ে আছে মাটির দিকে। কণা বললো, 'কিছু বলবে মঞ্জু?'

'জি।'

'হ্যাঁ, বলো?'

'সন্ধ্যার ঘটনার জন্য দুঃখিত।'

'কেন!' কণা ভারি অবাক হলো!

মঞ্জু বললো, 'আসলে আমি চাইছিলাম আপনি ওইখানেই থাকেন। মানে ওইখানেতো আপনার ভালো লাগছিলো। কিন্তু আব্বা এত করে বললেন যে আর না বলে পারি নাই।'

'আরে বোকা! তাতে কী হয়েছে?'

'না মানে...।' মঞ্জু আবারো ইতস্তত করছে।

কণা হেসে বললো, 'কী হলো, বলো?'

মঞ্জু একটু সময় নিয়ে বললো, 'এর চেয়ে খারাপ সময়তো আর মানুষের জীবনে আসতে পারে না। আমি জানি না, কেমনে বলতে হয়, বা বোঝাইতে হয়। কিন্তু আমি ভাবছিলাম, আপনার যখন যা করতে ইচ্ছে হবে, ভালো লাগবে, আপনি

সেইটাই করবেন। কেউ যেন আপনাকে কখনো কিছু না বলে। কাজের লোকগুলারেও আমি তাই বলে দিয়েছিলাম। অথচ কিনা আমি নিজেই গিয়া সন্ধ্যাবেলা...।'

মঞ্জু যা বলতে চাইছে, তা সে ঠিকটাক গুছিয়ে না বলতে পারলেও কণা বুঝলো। মঞ্জু আসলে কণার মানসিক অবস্থা নিয়ে চিন্তিত, এ কারণেই সে চাইছে যেভাবেই হোক, কণার যাতে একটু ভালো লাগে। কিন্তু মনসুর মারা যাওয়ার এই এত এত দিনে কণার একবারও মনে হয়নি, মঞ্জু এসব নিয়ে কখনোই কিছু ভাবে বা তার সত্যি সত্যিই কিছু যায় আসে! আজকে মঞ্জুর এইটুকু কথায় তার কী যে ভালো লাগলো!

সেই থেকে মঞ্জুর সাথে একটু-আধটু কথা হয় কণার। গত বৃহস্পতিবার দুপুর বেলা আড়ত থেকে খেতে এলো মঞ্জু। কণা কী মনে করে মঞ্জুর পাশে গিয়ে দাঁড়ালো। মঞ্জু চুপচাপ খাওয়া শেষে উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বললো, 'কাল কিন্তু জুম্মার দিন।'

কণা বললো, 'মনে আছে।'

'আব্বা বলছিলো মিলাদে কিছু ফকিরও খাওয়াইতে।'

'কিন্তু বাজারতো তেমন কিছু নেই।'

মঞ্জু পকেট থেকে টাকা বের করে টেবিলে রাখলো, 'আপনি একটু মতি চাচাকে দিয়া বাজারটা করিয়ে নিতে পারবেন? আমি আজ আড়ত থেকে একদম বের হইতে পারবো না।'

কণা হাসলো, 'এই ক'দিনেই তুমি কত বড় হয়ে গেলে মঞ্জু! এই সেদিনের ছোট্ট মুখচোরা ছেলেটা।'

মঞ্জু কথা বলে না। সে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ায়। কণা বলে, 'আচ্ছা মঞ্জু, জীবনটা কী তোমার কাছে কখনো অর্থহীন মনে হয় না?'

মঞ্জু নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে বলে, 'আমি অত ভাবি না।'

'না ভাবাই ভালো। না ভাবতে পারলে শান্তিতে থাকা যায়। আমিও যদি তোমার মতো না ভেবে থাকতে পারতাম!'

মঞ্জু বলে, 'ভেবে কী হয়? কিছুই কী বদলায়?'

'তা বদলায় না। তবুওতো আমরা ভাবি। ভাবনা কী যুক্তি মেনে চলে?'

'আমারতো মনে হয় কোনো কিছুই যুক্তি মেনে চলে না। সবকিছুই পূর্ব নির্ধারিত।'

এই কথাটা কণার পছন্দ হয়। আসলেইতো, যুক্তি মেনে চললে তার জীবনটাতো এমন হওয়ার কথা না। কোথায় ছিলো সে? কোথায় এলো? মাত্র ক'টা বছর, জীবনটা কেমন হয়ে গেলো। আসলেই কী কেউ একজন সব কিছু নির্ধারিত করেই রেখেছেন? তারপর কী তিনি চুপচাপ বসে বসে দেখতে থাকেন, মানুষ কী করে সেই পূর্ব নির্ধারিত ভাগ্যটাকে বদলে দেয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করে? এটা কী তার এক ধরনের খেলা? কিন্তু এই খেলা খেলে তিনি কী আনন্দ পান?

New Pdf download: www.PoragEducation.com + Webtalkbd.com

আবার এর উল্টোটাও মনে হয় কণার। মনে হয়, মনসুরতো সেবার তার সাথে গেলেই পারতো। কিংবা সেতো বলেইছিলো যে আরো কটা দিন পরে গোবিন্দপুর যাবে সে। তাহলে? তাহলেতো এমন হওয়ার কথা ছিলো না। এই এলোমেলো ভাবনায়ও কণা স্থিরই ছিলো। কিন্তু অস্থির হয়ে গেলো সেদিন রান্নাঘরে ঢুকতে গিয়ে। রান্নাঘরে কাজ করছিলো রাবুর মা আর ফরিদা বানু। তারা কথা বলছিলো চাপা গলায়। ফরিদা বললো, 'ঘটনা কিছু বুঝতেছেন নি চাচি আম্মা?'

রাবুর মা বয়সে ফরিদার চেয়ে বেশ বড়। সে বললো, 'কোন ঘটনারে ফরিদা?'

'চোউক্ষে কিছুই বাজে নাই আপনের? বুড়া হইছেন কী বাতাসে?'

'ঢং না কইর‍্যা যা কওনের খুইল্যা ক।'

ফরিদা এদিক-সেদিক তাকিয়ে বললো, 'জামাই মরছে, কিন্তু মাইয়ার ভাব দেখছেননি? রংচঙা শাড়ি পইরা, চুলে তেল দিয়া, ফুলবানু সাইজ্যা ঘুইরা বেড়ায়। তারে দেইখ্যা কে কইবো, এইডা তার স্বামী মরা শ্বশুরবাড়ি? দেহেন না কিছু?'

'দেহিতো। তয় আমরা হইলাম কামের মানুষ। আমাগো অত দেহনের কাম কী?'

'আছে, আছে। কাম আছে। চৌক্ষের সামনে বেহায়া-বেলাজ জিনিসপাতি দেখলে সহ্য করতে পারি না। দেওরের লগে বেশরমের মতন কী রংঢঙ করে, বোঝেন কিছু?'

রাবুর মা জবাব দেয় না। সে একমনে তরকারি কুটতে থাকে। ফরিদা বলে, 'এই বয়সের পোলাপান, কাঁচা বয়স। এই বয়সটাই খারাপ। এই বয়সে পুরুষ পোলার নানান দোষ থাহে। তার সামনে যদি ওইরম ফুলপরী সাইজ্যা জুয়ান বিধবা ভাবি ঘুরঘুর করে, তাইলে সে কতক্ষণ নিজেরে সামলাই রাখবো?'

রাবুর মা এবার যেন ফোঁড়ন কাটে, 'সামলাই রাহনের লাইগ্যা কী আর ঘুরঘুর করে? তারও কাঁচা বয়স। বাঘে একবার মাংসের স্বাদ পাইলে, মাংস ছাড়া কী আর থাকতে পারে?'

ফরিদা যেন খানিক আসকারা পায়। সে বলে, 'হেইডাই দেখতেছি কয়দিন ধইরা। তাও ভালো, ঘরের পোলার লগে করবো যা করার। বাড়ির বাইরেতো আর যায় নাই।'

রাবুর মা একটু যেন অসতর্কই হয়ে যায়। দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে খানিক গলা উঁচিয়েই বলে, 'সবই কপাল। ওইরকম একখান শ্বশুর পাইছে। আমার সোয়ামি মরছে ষোল বছর বয়সে। তারপর শ্বশুর বাড়িতো দূরের কথা, শ্বশুর শাশুড়ির মুখই দেহি নাই। আর তারেতো রাজরাণি বানাই রাখছে।'

রাবুর মায়ের দীর্ঘশ্বাস যেন সংক্রমিত হয় ফরিদার মধ্যেও। সেও দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, 'হ, কপালই। তয় কী জানেন চাচি আম্মা। মাইয়ার বাপ মায়েরও কিছু বুঝি না। এইরম কচি বয়সের মাইয়া রাঁড়ী হইছে। তারা কোন আক্কেলে তারে একলা একলা শ্বশুরবাড়ি পাঠায়? তার ওপর শ্বশুরবাড়িতে ওইরম একটা অল্পবয়সী

আবিয়াইত্যা জুয়ান দেওর আছে! কী বিবেচনা তাগো কে জানে? একটা দুর্ঘটনা ঘটলে তহন দোষ হইবো সব ওই ছ্যামড়ার।'

কণার আর শোনার ধৈর্য্য হলো না। তার মনে হলো দুকান দিয়ে গলগল করে আগুন গরম ধোঁয়া বের হচ্ছে। সে দৌড়ে ঘরে চলে গেলো। সেই সারাটা বিকেল সন্ধ্যা সে একা একা কাঁদলো। রাতে এসে মঞ্জু তাকে ডাকলো। আজাহার খন্দকার ডাকলেন। কিন্তু সে সাড়া দিলো না। মাঝখানে একবার কেবল ছেলেকে নিয়ে গিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দিলো। আর নিজে জেগে রইলো সারারাত। কী করবে সে? এই প্রথম কণার মনে হলো, একটা একা মেয়ের জন্য জীবনটা কত কঠিন, কত দুর্বিষহ! তার চারপাশে ভালোবাসার কমতি নেই। কমতি নেই আদর, যত্ন কিংবা অর্থেরও। তারপরও জীবনটা কেমন করে কোন ফাঁকে এমন ঠুনকো হয়ে গেলো? এই এতদিনে তার মার কথা মনে পড়লো। এ কারণেই মা-বাবা তার সামনের দিনগুলো নিয়ে এত উৎকণ্ঠিত। না হলে মনসুর মারা যাওয়ার বছর ঘুরতে না ঘুরতেই বাবা-মা দুজনই কেন তার বিয়ে জন্য এমন উদ্বিগ্ন হয়ে উঠবেন! বিষয়টা নিয়ে বাবা-মায়ের ওপর কী রাগ, অভিমান, কষ্টই না সে পুষে রেখেছিলো। কিন্তু ধীরে ধীরে রোজকার জীবন যেন তাকে শেখাচ্ছে, জীবনে অভিজ্ঞতার চেয়ে বড় কিছু নেই। একটা বয়স মানুষের কেটে যায় আবেগের আতিশয্যে, আরেকটা বয়স কাটে সেই আবেগের মূল্য চুকাতে। কারণ তখন সে জানে, জীবনের আসল নাম আবেগ নয়, অভিজ্ঞতা। সে সেই অভিজ্ঞতা থেকে তার সন্তানের আবেগময় জীবনটাকে নিয়ন্ত্রণ করতে চায়। কিন্তু পারে না। কারণ বয়স তাদের ডুবিয়ে রাখে সীমাহীন আবেগের সমুদ্রে।

মা-বাবার ওপর করা রাগটা হঠাৎই যেন উধাও হয়ে যায় কণার। সেখানে জেগে উঠতে থাকে অনুশোচনা। এইটুকু জীবনে তাদের কী দিয়েছে সে? কিচ্ছু না। বরং নিংড়ে নিয়েছে যতটুকু সম্ভব। অথচ তার মঙ্গল ছাড়াতো আর কিছুই চাননি তারা। কিন্তু তারপরও একের পর এক তাদের ভুল বুঝে গেছে সে। বঞ্চিত করে গেছে। সেই রাতের নিঃশব্দ অন্ধকারে বাবার জন্য হঠাৎ মন কেমন করতে লাগলো কণার। মনে হলো ঠিক এই মুহূর্তে যদি বাবার বুকের ভেতর গিয়ে গুটিসুটি মেরে সেই ছোট্ট কণার মতো ঘুমিয়ে থাকতে পারতো সে। তাহলে হয়তো এই অব্যক্ত যন্ত্রণার দহন থেকে মুক্তি পেতে পারতো।

পরের দুটো দিনও থম মেরে রইলো কণা। কারো সাথে কথা বললো না। মঞ্জু বার কয়েক কথা বলতে এসেও থমকে গেছে। কণা যেন এড়িয়ে চলতে চাইছে তাকে। বিষয়টা পুরোপুরি না বুঝলেও খানিক গুটিয়ে গেলো মঞ্জুও। কারো সাথে যদি কথা বলতে ভালো না লাগে, তাহলে নাহয় কয়েকটা দিন একা একাই থাকুক সে। মঞ্জুও সরে রইলো একটু দূরে দূরেই। কিন্তু বিষয়টি নিয়ে বিচলিত হয়ে গেলেন আজাহার খন্দকার। তিনি একদিন মঞ্জুকে ডেকে বললেন, 'বউর হইছেটা কী?'

'কী জানি আব্বা! আমারেতো কিছু বলে নাই।'

New Pdf download: www.PoragEducation.com + webtalkbd.com

'তুই জিগাইবি না? এই বাড়িতে তার বয়সের আছোস একমাত্র তুই। তুইই তো তার ভালোমন্দ খোঁজ-খবর নিবি।'

'আমিতো চেষ্টা করছি আব্বা। কিন্তু কথাইতো বলে না। আরো এড়াই চলে।'

'সে এড়াই চললেই তুই তারে এড়াইতে দিবি কেন? তোরই তো এহন দায়িত্ব তার মন মেজাজ ভালো রাহনের।'

মঞ্জু যে তা বোঝে না, তা নয়। সে চেষ্টাও করে। কিন্তু কতটুকু কী করবে, কীভাবে করবে, তা সে বুঝতে পারে না। সে মন খারাপ করে বলে, 'আমি আর কী করবো আব্বা? সারাদিন রাইত ওই এক আড়তের চিন্তায়ই বাঁচি না। তারপর বাড়ি আসার পর যদি আবার দেখি সব এমন, তখন আমার আর ভালো লাগে না।'

আজাহার খন্দকার মঞ্জুর অবস্থাটা বোঝেন। তিনি ছেলেকে পাশে বসিয়ে বললেন, 'এহন কী করবো ক? আল্লায় আমাগো ফালাইছে এক কঠিন পরিস্থিতিতে। এই পরিস্থিতি থেইকা আমাগোইতো যটুক সম্ভব উঠতে হইবো। হইবো না?'

মঞ্জু জবাব দেয় না। আজাহার খন্দকার তার কাঁধে হাত রেখে বলেন, 'বউ তো বয়সে তোর চাইতে খুব বেশি বড় না, এহন আমি কী ওই বয়সের পোলা মাইয়াগো মন মেজাজ বুঝতে পারি? আমার বয়স হইছে না? এইটা বুঝবি তুই। কী করলে সে একটু ভালো থাকবে, একটু আনন্দে থাকবে। ওইটুক এক মাইয়া, কিন্তু জীবনের ওপর দিয়া কী ঝড়টাই না গেলো! এহন তার পাশে যদি তারে বোঝনের মতন কেউ না থাহে, তাইলে তার অবস্থাটা কী হইবো ক' তো?'

মঞ্জু কথা বলে না। আজাহার খন্দকারই তাকে শিখিয়ে দেন, 'কাইল নবীগঞ্জ বড় বাজার যা। পোলাডার লাইগ্যা কিছু নতুন জামা কাপড় কিন্যা আন। আর বউর লাইগ্যাও ভালো দেইখ্যা কয়েকখান শাড়ি কাপুড় কিন্যা আন। খেয়াল কইর‍্যা দেখ, সে কী ধরনের শাড়ি কাপুড় পরতে পছন্দ করে!'

মঞ্জু কিছু বললো না। তবে পরদিন সে কণার জন্য দুখানা শাড়ি কিনে আনলো। মনে-র জন্য কিছু কেনাকাটা করে আনলো। কণা বসেছিলো বারান্দায়। সে রাজ্যের সঙ্কোচ নিয়ে গিয়ে কণার পাশে বসলো। তারপর হাত থেকে কাপড়ের প্যাকেটটা তার সামনে রাখতে রাখতে বললো, 'আমার পছন্দ দুনিয়ার সবচেয়ে খারাপ হবে, এইটা আমি জানি।'

কণা কপাল কুঁচকে তাকালো, 'কী পছন্দ?'

মঞ্জু হাসার চেষ্টা করলো, 'এই যে, আপনার জন্য শাড়ি কিনে আনছি।'

কণা যুগপৎ অবাক এবং বিরক্ত হলো। বারান্দার সাথেই রান্নাঘর। সে নিশ্চিত ফরিদা বানু বা রাবুর মা এখন রান্নাঘরের বেড়ার ফাঁক দিয়ে এদিকেই তাকিয়ে আছে। এবং তারা এখন তিলকে তাল বানিয়ে রাজ্যের রসালো, গা ঘিনঘিনে গল্প ফাঁদতে শুরু করেছে। সে বললো, 'তোমাকে শাড়ি আনতে কে বলেছে?'

মঞ্জু খানিক সপ্রতিভ হওয়ার চেষ্টা করলো, 'কে আবার? আমি নিজেই।'

'এটা ঠিক হয়নি মঞ্জু।'

কণার গলার স্বর শুনে মঞ্জু দমে গেলো। কণা বললো, 'আমার এখন নতুন শাড়ি পরে সেজেগুজে ঘুরে বেড়ানোর জীবন না মঞ্জু। আমি বিধবা মেয়ে মানুষ। আমার এখন সাদা থান কাপড় পরে স্বামীর জন্য নামাজ-রোজা করার জীবন।'

মঞ্জু কিছু বলতে গিয়েও বলতে পারলো না। কণা শাড়ির প্যাকেটটা রেখে উঠে চলে গেলো। মঞ্জু হতভম্ব হয়ে কণার দিকে তাকিয়ে রইলো। সে এর আগে মুহূর্তের জন্যও কখনো কণার এমন রূপ দেখেনি। কী হয়েছে কণার? সে কী বড়সড় কোনো ভুল করেছে!

সারাটা দিন এই ভাবনায় কাটলো মঞ্জুর। কণার সাথে আগেও তার খুব একটা কথাবার্তা হয়নি। সে মানুষটাই এমন। কিন্তু মনসুরের বিয়ের পর কণা যখন তাদের বাড়িতে এলো, সেই থেকে মঞ্জুর অস্পৃশ্য জীবনটাও যেন খানিক স্পর্শময় হয়ে উঠেছিলো। কী যে এক অদ্ভুত মায়ায়, স্নেহে কণা তাকে আগলে রেখেছিলো মঞ্জু তা জানে। সে হয়তো কণাকে কখনো কিছু বলে উঠতে পারেনি, কিন্তু ভেতরে ভেতরে এই মানুষটার প্রতি সীমাহীন শ্রদ্ধায়, কৃতজ্ঞতায় ডুবেছিলো সে। কিন্তু আজ হঠাৎ এমন কী হলো!

পরের কটা দিন মঞ্জুও আর কণার আশেপাশে গেলো না। থাকুক সে, তার যেমন ভালো লাগে তেমনই। আবারও সেই নিস্পন্দন জীবন। তবে সেখানে চাপা একটা অস্বস্তি হয়ে বিঁধে রইলো সেইদিনের ঘটনা। মঞ্জু অবশ্য কণাকে কারণ জিজ্ঞেস করতেও গেলো না। তবে আড়ালে-আবডালে খানিকটা নজর সে রাখলো। কণা যেন সদা ভীত সন্ত্রস্ত এক হরিণী। কোন এক অজানা কারণে সারাটাক্ষণ সে আড়ষ্ট হয়ে থাকে। বিষয়টা লক্ষ করলেও নিজ থেকে আর কিছু বলতে গেলো না মঞ্জু। তবে কণার সাথে তার কথা হলো দিন কয়েক পরে। মঞ্জু ভাত খাচ্ছিলো, কণা তার কাছে এসে বসলো। তারপর বললো, 'তুমি কী আমার একটা কাজ করে দিতে পারবে মঞ্জু?'

'কী কাজ?'

'বাবাকে একটা খবর পাঠাতে পারবে?'

'কী খবর?'

'বাবা যেন আমাকে একটু নিতে আসে।'

'কেন?'

'আমার মনটা খুব একটা ভালো নেই। বাবাকে নিয়ে রাতে কীসব আজেবাজে স্বপ্ন দেখেছি।'

মঞ্জু বললো, 'তাহলে কাউকে খবর দিতে হবে কেন? আমিই নিয়ে যাই?'

কণা বললো, 'না, সেটা ঠিক হবে না। তুমি একটা কাজ করো, কাউকে দিয়ে বাবাকে একটু খবর পাঠানোর ব্যবস্থা করো।'

মঞ্জু বললো, 'কিন্তু এখান থেকে হুট করেই কিন্তু খবর পাঠানো যাবে না! কবে গোবিন্দপুরের কাউকে পাওয়া যাবে কে জানে!'

New Pdf download: www.PoragEducation.com + webtalkbd.com

মঞ্জুর অবশ্য খবর পাঠাতে হলো না। পরের সপ্তাহে দেলোয়ার হোসেন নিজেই এসে হাজির হলেন। মঞ্জু যখন ভেতর বাড়িতে খবর পাঠালো, কণার তখনো বিশ্বাস হয়নি। সে চোখের পলকে ছুটে এলো বসার ঘরে। দেলোয়ার হোসেন কণার দিকে পেছন ফিরে বসেছিলেন। দরজা দিয়ে ঢুকতে গিয়ে আচমকা থমকে গেলো কণা। ওটা বাবা! এই এতদিনকার চেনা মানুষটাকে পেছন থেকে দেখবে বলে সে চিনতে পারবে না? তার সংশয় হবে? তা কী করে হয়? এটা মোটেই তার বাবা নয়। তার বাবার পিঠ কম করে হলেও এই মানুষটার চেয়ে দ্বিগুণ চওড়া। কিন্তু মানুষটা ঘুরে তাকাতে কণার সংশয় দূর হলো। মানুষটা তার বাবাই। যদিও এই বাবাকে সে আগে কখনো দেখেনি। শুকিয়ে অর্ধেক হয়ে যাওয়া মানুষটার চোখ ভেতরে ঢুকে গেছে। মুখের চামড়া ঝুলে গেছে। ঠোঁটগুলো ফ্যাকাশে। কণা ডাকলো, 'বাবা!'

দেলোয়ার হোসেন কোনোমতে উঠে দাঁড়ালেন। কণা ছুটে গিয়ে বাবাকে জড়িয়ে ধরলো। তারপর কাঁদলো। দীর্ঘসময় সে বাবার বুকের ভেতর থেকে বের হলো না। তবে বাবার এই বুকটা কেমন জীর্ণ, শীর্ণ, কেমন দুর্বল, ভঙ্গুর এক মানুষের প্রতিচ্ছবি যেন। কণা বললো, 'এ তোমার কী হয়েছে বাবা?'

দেলোয়ার হোসেন হাসার চেষ্টা করলেন, 'এই যে তোকে দেখলাম, এখন সব ঠিক হয়ে যাবে।'

'তাই বলে এমন! তোমার কী হয়েছে বাবা?'

'আমার কিচ্ছু হয়নি। তোকে খুব দেখতে ইচ্ছে করছিলো মা।'

কণা বাবাকে আরো কত কী বললো, কিন্তু বাবা যেন সেসবের কিছুই শুনলেন না। তিনি হয়ে রইলেন খানিক অন্যমনস্ক, খানিক বেখেয়ালি, খানিক চুপচাপ। রাতে কণা বাবাকে বললো, 'বাবা?'

'হুম।'

'তুমি আমায় নিয়ে খুব দুশ্চিন্তা করছো তাই না?'

'নাতো! তোকে নিয়ে কী দুশ্চিন্তা?'

'এই যে আমি এখন একা একা কী করে থাকবো। কী হবে না হবে!'

দেলোয়ার হোসেন ম্লান হাসলেন, 'বাবাতো, একটু চিন্তাতো হয়ই।'

'কিন্তু তোমাকে দেখেতো মনে হচ্ছে না, তুমি একটু চিন্তা করছো। মনে হচ্ছে চিন্তায় চিন্তায় তুমি পাগল হয়ে যাচ্ছো।'

দেলোয়ার হোসেন গম্ভীর হয়ে গেলেন খানিক। তারপর হঠাৎ ভাঙা গলায় বললেন, 'মা- রে, বাবা-মা হওয়া খুব কষ্ট রে মা। এই কষ্ট বাবা হওয়ার আগে বোঝা যায় না। সন্তান যদি ঘরের বাইরে যায়, বাবা-মায়ের চোখ, কান, মন সারাটাক্ষণ অস্থির হয়ে থাকে, কখন সন্তান বাড়ি ফিরবে! কখন? তখন যদি সে শোনে, বাইরে একটু জোরে শব্দ হয়েছে, একটা গাছের ডাল ভেঙে পড়েছে, আকাশে মেঘের গর্জন হয়েছে, বিদ্যুৎ চমকেছে বা ধর একটু জোরে হাওয়া দিয়েছে, ওতেই তার বুক ধড়ফড় করে ওঠে। আহারে আমার বাছা, আহারে। সে এখন কই, কীভাবে আছে! আর সেই বাবা-মা যদি তাদের মেয়েরে এই অবস্থায় এত দূরে রাখে, তখন তাদের কেমন লাগে, বলতো?'

বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে আর কোনো জবাব দেয় না কণা। সে আসলে কোন কথা খুঁজে পায় না। দেলোয়ার হোসেন ঘুমিয়ে পড়লেও অনেক রাত অবধি তার পাশে বসে থাকে কণা। দেলোয়ার হোসেন নিঃশ্বাস নিচ্ছেন জোরে জোরে। তার নিঃশ্বাসের সাথে সাথে প্রতিবার হাঁপরের মতন ওঠানামা করছে বুক। ঘুমন্ত দেলোয়ার হোসেনের চিন্তক্লিষ্ট মুখের দিকে তাকিয়ে কণার হঠাৎ ভয় হতে থাকে। তার মনে হতে থাকে, বাবার খুব কঠিন কোনো অসুখ করেছে। আর এই অসুখের জন্য দায়ী সে নিজে। সেই ভয় থেকেই কিনা, কণা মুহূর্তেই সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে, বাবার সাথে গিয়ে এবার দীর্ঘদিন গোবিন্দপুর থাকবে সে। যে করেই হোক বাবাকে সুস্থ করে তুলতে হবে। আবার সেই আগের বাবাকে চাই তার।

পরদিন আজাহার খন্দকারকে বলা হলো। খানিক মন খারাপ করলেও বাধা দিলেন না তিনি। তবে হাসিমুখে দেলোয়ার হোসেনকে বললেন, 'আমি কিন্তু আপনাগো খুব যন্ত্রণা দিবো বেয়াই সাব। কয়েকদিন পরপরই গিয়া হাজির হবো। কী করবো বলেন, এই মায়ার পোটলাটাকে ছাড়াতো আর বাঁচতে পারবো না।' তার কোলের মধ্যে তখন গড়াগড়ি খাচ্ছে মন। তিনি মনকে দেখিয়ে আবার বললেন, 'এ-ই এহন আমার অক্সিজেন বুঝলেন? আমার প্রেসার, ডায়াবেটিসের ওষুধ। এরে না দেখলে দম বন্ধ হইয়া যায়। কয়টা দিনই আর বাঁচবো বলেন!'

দেলোয়ার হোসেন হাসেন, 'সমস্যা নাই। আপনার যখন খুশি চলে আসবেন।'

কণা গেলো তার পরদিনই।

New Pdf download: www.PoragEducation.com + webtalkbd.com

আজাহার খন্দকার ভেবেছিলেন আরো মাসখানেক পরে তিনি গোবিন্দপুর যাবেন। কিন্তু দিন পনেরোর মাথায় নিজেকে আর সামলে রাখতে পারলেন না। সপ্তাহের প্রথম লঞ্চ ধরেই তিনি গিয়ে হাজির হলেন গোবিন্দপুর। কিন্তু এবারের গোবিন্দপুর না আসাটাই বোধহয় ভালো ছিলো তার জন্য। গিয়ে দেখেন দেলোয়ার হোসেন ভয়াবহ অসুস্থ। তিনি বিছানা থেকে উঠতে পারছেন না। এই নিয়ে বাড়িতে একটা থমথমে অবস্থা। উপজেলা শহর থেকে একজন ডাক্তার এসে তাকে নিয়মিত দেখে যাচ্ছেন। কিন্তু দেলোয়ার হোসেনের বিশেষ কোনো রোগ আছে বলে তিনি বলতে পারলেন না। বারবার সেই একই কথা তার, অতিরিক্ত দুশ্চিন্তা আর মানসিক চাপের কারণেই এই অবস্থা দেলোয়ার হোসেনের। এখন প্রচুর ঘুম আর দুশ্চিন্তাহীন জীবন দরকার তার। কিন্তু সেই জীবন দেলোয়ার হোসেন আর কই পাবেন! সারারাত এক ফোটা ঘুম হয় না তার। কখনো খানিক্ষণের জন্য চোখে তন্দ্রা লেগে এলেও মুহূর্তেই আবার দুঃস্বপ্ন দেখে জেগে ওঠেন।

তবে এর বাইরেও ঘটনা আছে। দেলোয়ার হোসেন কণার জন্য ছেলে দেখেছেন। ছেলের নাম শফিউল। শফিউল তার স্কুলেরই জুনিয়র সহকর্মী। কথায় কথায় শফিউলের ব্যাপারটা বার কয়েক কণার কানে দেয়ার চেষ্টা করেছিলেন শাহিনা বেগম। কণা অবশ্য বিষয়টিকে পাত্তা দেয়নি। নবীগঞ্জ আসার পর থেকে সে ব্যস্ত ছিলো দেলোয়ার হোসেনের শরীর-স্বাস্থ্য নিয়ে। বাবাকে নিয়ে সে যারপরনাই চিন্তিত।

শফিউলের বয়স চল্লিশের কাছাকাছি। আগে একবার বিয়ে করেছিলেন। সেই ঘরে একটা মেয়েও আছে। দ্বিতীয় সন্তান জন্ম দিতে গিয়ে তার স্ত্রী মারা গেছেন। এখন বিয়ের জন্য পাত্রী খুঁজছেন।

খবর শুনে দেলোয়ার হোসেন নিজ থেকেই আগ্রহী হয়ে উঠলেন। শফিউলকে তিনি যতটুকু দেখেছেন, ছেলে হিসেবে ভালো। আচার ব্যবহারে নম্র ভদ্র। তা ছাড়া এতদিনে দেলোয়ার হোসেন একটা বাস্তবতা বুঝে গেছেন, কণার জন্য এর চেয়ে ভালো আর কোনো ছেলে পাওয়া সম্ভব না। তিনি যে একদম চেষ্টা করেননি, তা নয়। কিন্তু সেই চেষ্টা থেকে পাওয়া অভিজ্ঞতাই তাকে শঙ্কিত করেছে। শফিউল ছাড়া আর যত সম্ভাব্য পাত্র তিনি দেখেছেন, তাদের সবারই বয়স চল্লিশের ওপরে। বিবাহিত। সন্তান রয়েছে। তার ওপর নানান চাহিদাতো রয়েছেই।

এই নিয়ে দেলোয়ার হোসেনের মন খারাপও হলো খুব। কিন্তু দিন যত গেছে, ততই তিনি বুঝতে পেরেছেন, বাস্তবতা আসলে এটাই। কণা তার অতি আদরের একমাত্র কন্যা হতে পারে, কিন্তু বাইরের জগতে তার পরিচয় এখন বিধবা এক সন্তানের জননী। এমন একটি মেয়ের বিয়ে দেয়া সহজ কথা নয়। সেখানে পাত্র হিসেবে শফিউলতো খুবই ভালো। সে সজ্জন মানুষ। সব শুনে বলেছে, 'আপনি ও নিয়ে ভাববেন না। আমারওতো একটা মেয়ে আছে। কণার ছেলেকে নিয়েও আমার সমস্যা নেই। সে আমার ছেলের মতই থাকবে।'

কথাটা খুব সাহস জুগিয়েছিলো দেলোয়ার হোসেনকে। এমন করে আর কেউ বলেনি। অন্যদের বরং নানান বাহানা ছিলো। শফিউল সেখানে রীতিমতো আশীর্বাদ হয়েই এলো।

তবে দেলোয়ার হোসেন চেয়েছিলেন বিয়েটা অন্তত আরো বছর দুয়েক পরে হোক। ততদিনে কণার ছেলেটাও আরেকটু বড় হয়ে উঠবে। কিন্তু বছর দুই পরে গিয়ে যদি আর শফিউলের মতো কাউকে না পাওয়া যায়? তখন কী হবে? এই চিন্তায় তিনি কথাটা শফিউলকে বলেওছিলেন, আর কিছুটা সময় অপেক্ষা করতে। শফিউলের তাতে আপত্তি না থাকলেও, সে বলছিলো কণার ছেলেকে নিয়েতো তার কোন আপত্তি নেই। তাহলে শুধু শুধু বিয়েটা আর ঝুলিয়ে রাখা কেন! আর ছেলেটা যত ছোট থাকতে বিয়ে হয়ে যাবে, ততই ভালো। তার স্মৃতিতে এই বিষয়টি আর থাকবে না। শফিউলের যুক্তিও ফেলে দিতে পারেননি দেলোয়ার হোসেন। কিন্তু কথাটা কণার কাছে কীভাবে তুলবেন, তা নিয়ে খুব দুশ্চিন্তায় ছিলেন তিনি আর শাহিনা বেগম। তো শাহিনা বেগম বার দুই যা কথাটা তুললেনও, তাতে কণা খুব একটা পাত্তা দিলো না।

এই ফাঁকে দেলোয়ার হোসেন চাইছিলেন শফিউলের সাথে কণার একটা পরিচয় করিয়ে দিতে। তাতে যদি তাদের দুজনের মধ্যে কোনো একটা বোঝপড়া গড়ে ওঠে মন্দ কী!

কিন্তু ঘটনাটা এমন বিশ্রি দিকে মোড় নিবে দেলোয়ার হোসেন তা বুঝতে পারেননি। সকালে খেতে বসেছিলো কণা। এই সময়ে তিনি শফিউলকে নিয়ে এলেন বাড়িতে। কণা অবশ্য তাকে দেখেনি। সে জানতোও না কিছু। শাহিনা বেগম খাবার টেবিলের কাছে এসে কণাকে বললেন, 'অনেক দিনতো হয়, চুলে একটু তেলও দেস না, আয় একটু তেল দিয়া দেই।'

New Pdf download: www.PoragEducation.com + webtalkbd.com

কণা আলস্য ভরা গলায় বললো, 'এখন তেল দিতে হবে না মা।'

'এহন দিবি না, দিবি কহন? চুলের অবস্থা দেখছোস? আর মুখেওতো মনে একটু ক্রিম মাখস না কতদিন। নে, এই ক্রিমটা মুখে দে।'

শাহিনা বেগমের হাতে নতুন ক্রিম দেখে কণা অবাক হলো, 'এই ক্রিম তুমি কই পেলা?'

'তোর বাবা এনে রেখেছিলো।'

'কবে?'

'কাল।'

কণার মন ভালো হয়ে গিয়েছিলো সাথে সাথেই। বাবা এখনো তার জন্য কত ভাবে! সে যখন স্কুল বা কলেজে পড়তো, তখনো বাবা ঠিক এমন করেই তার জন্য এটা সেটা নিয়ে আসতেন। কিন্তু কণাকে সরাসরি দিতে লজ্জাও পেতেন। ফলে মাকে দিয়েই দেওয়াতো। বহুদিন পর আজ যেন আবার সেই অনুভূতি ফিরে এলো কণার। কিন্তু কণা তখনো জানে না, তার বাবা এখন আর সেই বাবা নেই। তিনি এখন এক সন্তানের জননী বিধবা এক কন্যার বাবা। যিনি কন্যার ভবিষ্যৎ চিন্তায় সদা সন্ত্রস্ত এক মানুষ। প্রতিটি মুহূর্ত যার কাটে অদ্ভুত হীনমন্যতা আর অনিশ্চয়তায়। একজন পুরুষ তাকে দেখতে আসবে বলেই আজ তিনি কন্যার জন্য এত এত প্রসাধনী কিনে এনেছেন, যদি কণাকে দেখে তার পছন্দ না হয়!

কণা খুব আগ্রহ নিয়ে বাকি প্রসাধনীগুলো দেখতে চাইলো। কিন্তু তার আগেই শাহিনা বেগম বললেন, 'শফিউল সাব আসছে অনেক্ষণ হয়। বাইরের ঘরে বইসা আছে সেই তখন থেইকা। তুই খাওয়াটা শেষ কইরা নিজেরে একটু গোছগাছ কইরা তার সাথে গিয়া একটু কথা বল।'

কণা প্রথমে বুঝতে পারলো না কোন শফিউল। যখন বুঝলো, তখন হঠাৎ কী যে হলো তার! সে তার সামনে রাখা আধখাওয়া ভাতের প্লেটটা আচমকা ছুড়ে মারলো। তারপর গ্লাস, জগ, পিরিচ। তরকারী মাখা ভাত, গ্লাসের জল, ভাঙা পিরিচের টুকরো ছিটকে গেলো চারদিকে। শফিউল বসে ছিলেন বারান্দায়। ভাঙা কাঁচের একটা টুকরো, খানিক ছিটকে যাওয়া জল তার পায়ের কাছে গিয়েও পড়লো। তিনি অবশ্য এতে কিছু মনে করলেন না। দেলোয়ার হোসেন বিব্রত ও লজ্জিত ভঙ্গিতে তার দিকে তাকালেন। শফিউল বিষয়টি বুঝতে পেরে বললেন, 'ও কিছু না, ঠিক হয়ে যাবে। একটু সময়তো দিতে হবে, তাই না? আমি বরং আরেকদিন আসি?'

দেলোয়ার হোসেন কিছু বলতে যাচ্ছিলেন। তার আগেই বাইরের দরজায় কাউকে দেখা গেলো। দেলোয়ার হোসেন ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাতেই দেখেন আজাহার খন্দকার। কী এক অজানা আশঙ্কায় তার বুকটা কেঁপে উঠলো। আজাহার খন্দকার অবশ্য হাসিমুখে সালাম দিলেন দুজনকেই। শফিউলও হাসিমুখেই সালাম নিলেন অচেনা আগন্তুকের। তবে দেলোয়ার হোসেনের প্রতিক্রিয়াটা হলো খুব করুণ। যেন বড় কোন চুরি করতে গিয়ে হাতেনাতে ধরা পড়ে গেছেন, এমন ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়ালেন তিনি। তারপর ঘরে আমন্ত্রণ জানালেন বেয়াইকে। আজাহার খন্দকার ঘরে ঢুকে শফিউলের দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, 'আপনাকেতো চিনলাম না? আমি কণার শ্বশুর।'

শফিউল বুদ্ধিমান মানুষ। তিনি পরিস্থিতি সামলে নিলেন। কিন্তু ঘরের ভেতর থেকে ভেসে আসা কণা আর তার মায়ের উত্তপ্ত বাক্য বিনিময়ের অংশবিশেষ শুনে আজাহার খন্দকার হতভম্ব হয়ে গেলেন! এই আশঙ্কাটাই তার ছিলো, কিন্তু তাই বলে এত তাড়াতাড়িই এমন ঘটনা ঘটবে সেটি তিনি আশা করেননি।

দীর্ঘসময় চুপচাপ বসে রইলেন আজাহার খন্দকার। নিজেকে যতটা সম্ভব সামলে নেওয়ার চেষ্টাও করলেন। কিন্তু পারলেন না। নিজের যতটুকু সামর্থ্য ছিলো, তার সবটুকু দিয়েই চেষ্টা করেছিলেন তিনি। কিন্তু বাস্তবতাতো ভিন্ন। তাহলে কী মেনে নেবেন বিষয়টা? এটুকু ভাবলেই আবার বুকের ভেতর একটা উথাল-পাথাল নদী যেন পাড় ভেঙে দেয়। সেটাও সহ্য করতে পারেন না।

শফিউলকে তড়িঘড়ি বিদায় জানালেন দেলোয়ার হোসেন। কিন্তু সে চলে যাওয়ার পর বাড়ির পরিস্থিতি হয়ে উঠলো আরো বেশি থমথমে, গম্ভীর। আজাহার খন্দকার নাতিকে কোলে নিয়ে কিছুক্ষণ আদর করার চেষ্টাও করলেন। কিন্তু তাতে তার মনের অস্থিরতাটা এক মুহূর্তের জন্যও দূর হলো না। রাস্তার ধারে একা একা বসে রইলেন কিছুক্ষণ। সম্ভাব্য সকল উপায়ে, সকল যুক্তিতে তিনি নিজেকে বোঝানোর চেষ্টা করলেন, কিন্তু যেই মুহূর্তে ভাবেন, কণা অন্য কারো বউ হয়ে যাবে, অন্য কোনো বাড়িতে রয়ে যাবে বাকিটা জীবন, ঠিক সেই মুহূর্তে আর কিছুতেই মানাতে পারেন না নিজেকে। একবার ভাবলেন কণার সাথে কথা বলবেন। কিন্তু শাহিনা বেগমের সাথে তার উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় থেকেইতো স্পষ্ট যে এই বিয়েতে কণার মত নেই। বাবা-মা একরকম তাকে জোর করেই বাধ্য করছেন। সেখানে কণার সাথে কথা বলেতো আর লাভ নেই! কথা যদি বলতেই হয়, তবে তা বলতে হবে দেলোয়ার হোসেনের সাথে।

দেলোয়ার হোসেনকে অবশ্য আগ বাড়িয়ে কিছু বলতে হলো না। সন্ধ্যার পর তিনি নিজ থেকেই বললেন, 'আপনার সাথে কথা বলতে খুব লজ্জা লাগছে ভাইসাহেব। কিন্তু কী করবো বলেন, মেয়েটার ভবিষ্যৎতো এমন অন্ধকারে রেখে আমি মরে যেতে পারি না!'

'আপনি মরে যাইবেন কেন?' আজাহার খন্দকার শান্ত কণ্ঠে বললেন।

দেলোয়ার হোসেন হাসলেন, 'মানুষ মৃত্যুর আগে টের পায় বুঝলেন?'

'মানুষ যদি আগে থেকে মৃত্যু টের পাইতো, তাইলে আমার মনসুর সেইদিন লঞ্চেই উঠতো না। আর আইজকের এই পরিস্থিতিও আমার দেখন লাগতো না।'

দেলোয়ার হোসেন খানিক চুপ করে থেকে বললেন, 'আমার এই একটাই মেয়ে। আর কোন ছেলে মেয়ে নেই। এমনও না যে আমার অনেক ধন সম্পদ,

New Pdf download: www.PoragEducation.com + webtalkbd.com

টাকা-পয়সাও আছে। যা রোজগার করেছি, সাথে সাথে খরচ করেছি। এখন এই অবস্থায় আমার যদি কিছু হয়ে যায়, তাহলে এই মেয়েটার অবস্থা কী হবে একবার ভাবেন তো?'

আজাহার খন্দকার জবাব দিলেন না। দেলোয়ার হোসেন অবশ্য তার উত্তরের অপেক্ষাও করলেন না। তিনি বললেন, 'মেয়েটার বয়স কত জানেন? উনিশ কী কুড়ি। এই বয়সে সে স্বামীহারা হলো। এখন এর বাকি জীবনের কথা চিন্তা করলে কোনো বাপ-মা কী আর সুস্থ থাকতে পারে, বলেন? পারে না। সত্যি কথা, আমিও সুস্থ নাই। বাইরে থেকে আমার চেহারা ছবি দেখে যতটা অসুস্থ মনে হয়, ভেতরে ভেতরে আমি তার চেয়ে হাজারগুণ বেশি অসুস্থ।' দেলোয়ার হোসেন দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'মেয়েটারে নিয়ে আমার খুব ভয় হয় বেয়াইসাব। খুব ভয় হয়।'

দেলোয়ার হোসেন কণা আর শফিউলকে নিয়ে তার বাকি ভাবনা বিস্তারিত আজাহার খন্দকারকে খুলে বললেন। তারপর হঠাৎ হাতজোড় করে বললেন, 'আপনি কোনো আপত্তি করবেন না বেয়াই সাব। আমি দুই হাত জোড় করে আপনার কাছে আমার মেয়েরে ভিক্ষা চাচ্ছি। ক্ষমাও চাচ্ছি ভাই। আমার মেয়েটা বড় দুঃখী। এই সেইদিনের বাচ্চা মেয়েটা। আল্লাহ তারে কোন পরীক্ষায় ফেললো আমি জানি না।'

দেলোয়ার হোসেন ঝরঝর করে কাঁদলেন। তার সেই কান্নার সামনে নিজেকে ভীষণ অসহায় মনে হলো আজাহার খন্দকারের। পরের দুটো দিন কারো সাথেই কথা বললেন না তিনি। শুধু যে তিনিই বললেন না, তাও না। ওই ঘরের চারটি প্রাণীর কেউ যেন আর কাউকে চেনে না। সকলেই যেন একেকটা বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতো। একা, নিঃসঙ্গ, অসহায়। তৃতীয় দিনে এসে দেলোয়ার হোসেন ভয়াবহ অসুস্থ হয়ে গেলেন। ভোর রাত থেকে তীব্র খিঁচুনি, সাথে বমি। দুপুর নাগাদ একটু সুস্থ হলেও কারো সাথেই কথা বলতে পারলেন না। কথা বললেন পরদিন সকালে। তাকে দেখতে এসেছেন শফিউল। তিনি শফিউলকে আলাদা ডেকে নিয়ে কীসব কথা বললেন। তারপর ডাকলেন আজাহার খন্দকারকে। আজাহার খন্দকারের সেই প্রথম মনে হলো, দেলোয়ার হোসেনের হাতে সময় বেশি নেই। তিনি তার পাশে ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে বললেন, 'আপনার সাথে আমার একখান কথা আছে বেয়াই সাহেব।'

দেলোয়ার হোসেন কণা আর শফিউলের বিয়ের বিষয়ে কিছু বলতে চাইছিলেন। তার আগেই তাকে থামিয়ে দিলেন আজাহার খন্দকার। তিনি বললেন, 'আপনেতো এই শফিউলের কাছেই আপনের মাইয়া বিয়া দিবেন?'

দেলোয়ার হোসেন কোনক্রমে মাথা নাড়ালেন, 'হুম।'

'এর চাইতে ভালো ছেলেতো আপনে আর পান নাই?'

'অনেক খুঁজছি আমি ভাই। আপনি চিন্তা করবেন না, মন-কে সে নিজের ছেলের মতো করে রাখবে। আপনি যখন ইচ্ছা তখন তাকে দেখতে যেতে

পারবেন। তাকে আমি বলেছি, প্রয়োজনে সে কণাকেও আপনার বাড়ি যেতে দিবে। আপনি কণাকে কত ভালোবাসেন, আমি তাকে বলেছি।'

আজাহার খন্দকার গম্ভীর গলায় বললেন, 'এই ছেলে আগে বিয়া করছে না?'

'জি।'

'সেই ঘরেতো এর বাচ্চাও আছে?'

'জি। একটা মেয়ে। তবে মেয়ের ঝামেলা নেই। সে বড় হয়ে গেছে।'

'ছেলের বয়সওতো কণার ডাবল, না?'

দেলোয়ার হোসেন এবার অসহায়ের ভঙ্গিতে বললেন, 'আমি এসবই জানি ভাই। কিন্তু কী করবো? আরতো কোনো উপায় ছিলো না। আমারতো এটাও বুঝতে হবে যে আমার মেয়েটা বিধবা, এক বাচ্চার মা। আমিতো চাইলেই অবিবাহিত কম বয়সী কোনো ছেলে তার জন্য পাবো না। পাবো? আপনিই বলেন?'

আজাহার খন্দকার সাথে সাথেই জবাব দিলেন না। দীর্ঘসময় চুপ করে রইলেন। তারপর আচমকা শক্ত কিন্তু ঠাণ্ডা গলায় বললেন, 'যদি পান?'

দেলোয়ার হোসেন বললেন, 'আমি কী কম খুঁজছি ভাই? কিন্তু বাস্তবতাতো আমাদের স্বীকার করতেই হবে। তাই না?'

'হুম। সেই বাস্তবতার হিসাবেই আমি কইতেছি, এই বিয়া হইবো না। আমি আপনেরে এক সপ্তাহের মধ্যে কম বয়সী, আবিয়াইত্যা, ভালো পোলা আইন্যা দিবো। কিন্তু আপনের মাইয়ারে রাজি করানোর দায়িত্ব আপনের।'

দেলোয়ার হোসেন আরো কিছু বলতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু তাকে আর কোনো কথা বলার সুযোগ দিলেন না আজাহার খন্দকার। তিনি তার ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। বেরিয়ে আসার আগে কঠিন গলায় বললেন, 'আমি যেন ওই শফিউল না মফিউলরে আর এই বাড়িতে না দেহি। আমি কাইলকার লঞ্চেই নবীগঞ্জ যাইতেছি। পরের সপ্তায়ই ফিরা আসবো। আমারে এই একটা সপ্তাহ সময় দিতে হইবো। আপনে জানেন, খোনকার বাড়ির আজাহার খোনকারের এক কথা। কথা যহন আমি দিছি, কথা আমি রাখবো।'

দেলোয়ার হোসেন বোকার মতো তাকিয়ে রইলেন আজাহার খন্দকারের গমন পথের দিকে। কতকিছু বলবেন ভেবেও কিছুই বলতে পারলেন না। নতুন করে আবার কী সমস্যা তৈরি হয় কে জানে! এই নিয়ে আবার দুশ্চিন্তা তৈরি হলো দেলোয়ার হোসেনের। তবে আজাহার খন্দকার পরের সপ্তাহেই ঠিক ঠিক গোবিন্দপুর এসে হাজির হলেন।

দেলোয়ার হোসেনের শরীর তখনো পুরোপুরি সুস্থ হয়ে ওঠেনি। তিনি ভোরের নরম আলোয় বসেছিলেন উঠোনে। আজাহার খন্দকার সরাসরি তার সামনে এসে দাঁড়ালেন। তারপর বললেন, 'বয়সে বড় পোলার লগে যদি মাইয়ার বিয়া হইতে পারে, তাইলে বয়সে ছোট পোলার লগেও পারবো। আমাদের নবীজীর প্রথম স্ত্রী বিবি খাদিজা ছিলেন নবীজীর চাইতে পনেরো বছরের বড়।'

New Pdf download: www.PoragEducation.com + webtalkbd.com

দেলোয়ার হোসেন বিভ্রান্ত ভঙ্গিতে বললেন, 'আপনি কী বলছেন আমি কিছুইতো বুঝতে পারছি না।'

'আমার ছোট ছেলে মঞ্জুর সাথে কণার বিয়া হইবো। আমার ছেলেরে রাজি করানোর দায়িত্ব আমার। আপনার মাইয়ারে রাজি করানোর দায়িত্ব আপনার। দুইটার কোনোটাই সহজ হইবো না। কঠিন কাজ। কিন্তু একটা কথা মনে রাইখেন, এই সমস্যার এর চাইতে ভালো সমাধান আর নাই। আমাগো ধর্মমতে এই বিয়ায় কোনো বাধা নাই। মঞ্জু বয়সে বছর দুই তিনের ছোট হইতে পারে। এইটা কোনো সমস্যা না। আমার ঘরের বউ ঘরেই থাকলো। আমার নাতিরে নিয়াও আমার আর কোন চিন্তা থাকলো না। আর মঞ্জু আমার ছেলে। আমি তারে চিনি। আপনি পুরা দুনিয়া ঘুইরা এর চাইতে ভালো আর কোন উপায় পাইবেন না। কসম আল্লাহর।'

কথাটা প্রথমে শুনতে খুবই আপত্তিকর মনে হলো দেলোয়ার হোসেনের। খুব অশালীনও মনে হলো। কিন্তু তারপর সময় যত গড়ালো, ততই দেলোয়ার হোসেনের মনে হলো, বোকার মতো কী কাণ্ডটাই না তিনি করতে যাচ্ছিলেন! সবদিক বিবেচনায় এর চেয়ে ভালো আর কিছু হতে পারে না! তিনি মনে মনে আজাহার খন্দকারের কাছে কৃতজ্ঞ বোধ করতে লাগলেন। শুধু যে কৃতজ্ঞ বোধই করতে লাগলেন তা-ই না, বরং এই এতদিন নানান সময়ে তার সাথে যে নানারকম অবহেলা-উপেক্ষা দেখানো হয়েছে, সেজন্য যারপরনাই লজ্জিতও বোধ করতে লাগলেন।

কথাটা তিনি তখনো পর্যন্ত কণার কানে না তুললেও ধীরে ধীরে যেন সুস্থ হয়ে উঠতে থাকলেন। যেন এতদিন তার মন ও মগজে চেপে থাকা ঘুণপোকাগুলো হাওয়ায় মিলিয়ে যেতে থাকলো। বহুদিন পর তিনি যেন আবার বুক ভরে নিঃশ্বাস নিতে পারলেন।

এখন তার একটাই দুশ্চিন্তা, কণাকে রাজি করানো। কারণ তিনি জানেন, আজাহার খন্দকার যেহেতু কথা দিয়েছেন, সেহেতু যেকোনোভাবেই হোক তিনি মঞ্জুকে রাজি করাবেনই। এই নিয়ে দেলোয়ার হোসেনের মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

দূর থেকে মানুষটার চেহারা দেখা যাচ্ছে না।

তাকে দেখতে লাগছে একটা ছায়ামূর্তির মতোন। সে দাঁড়িয়ে আছে ছনের ছাউনি দেয়া একটা ঘরের বারান্দায়। বর্ষা শুরু হয়েছে। তুমুল বৃষ্টিতে ভেসে যাচ্ছে মাঠ, ঘাট, বিল। ভেসে যাচ্ছে লস্করের চরও। টানা বৃষ্টির তৃতীয় দিন বিকেল যেন সেখানে আগেভাগেই সন্ধ্যা নামিয়ে এনেছে। সেই সন্ধ্যায় ছনের ছাউনি দেয়া বিচ্ছিন্ন এক ঘরের বারান্দায় মানুষটার ছায়া দেখা যাচ্ছে। মানুষটা দাঁড়িয়ে আছে বারান্দার বাঁশের খুঁটিতে হেলান দিয়ে। তার সামনে বিস্তৃত জলরাশি। এই জলের যেন কোনো শেষ নেই। সে সেই জলের দিকে তাকিয়ে পাথরের মূর্তির মতন স্থির দাঁড়িয়ে আছে। গত প্রায় দুটো বছর রোজ এভাবে তাকিয়ে থাকে সে। তার সকাল, দুপুর, সন্ধ্যা, রাত্রি কেটে যায় ভয়ংকর এক যন্ত্রণা নিয়ে। সে জানে না এই যন্ত্রণার সাথে এই পৃথিবীর আর কারো কোন পরিচয় আছে কিনা!

একটা রক্ত মাংসের জীবন্ত মানুষ পচা গলা লাশের স্মৃতি হয়ে গেছে পুরো পৃথিবীর কাছে। তার স্ত্রী, সন্তান, বাবা, ভাই সবার কাছেই। যে অনাগত সন্তানের স্বপ্ন বুকে পুষে রেখেছিলো, সেই সন্তানের মুখও সে দেখতে পারেনি। সেই সন্তান পৃথিবীর আলো দেখেছে এক পিতৃহীন এতিম শিশু হিসেবে। অথচ শিশুটি জানে না, তার বাবা বেঁচে আছে। হয়তো কখনো জানবেও না। মরে যাওয়া মানুষের স্মৃতি কষ্টকর, কিন্তু বেঁচে থাকা মানুষের স্মৃতি তার চেয়েও বেশি কষ্টকর। সেই অসহ্য যন্ত্রণা নিয়ে সে বেঁচে আছে প্রায় দুটি বছর। হয়তো বেঁচে থাকতে হবে বাকিটা জীবনও। মৃত্যুর চেয়েও ভয়ংকর সেই বেঁচে থাকা।

New Pdf download: www.PoragEducation.com + webtalkbd.com

মনসুর মাথা তুলে তাকালো। তার মুখ ভর্তি বড় বড় দাড়ি। সে সেই দাড়ির ভেতর আঙুল ঢুকিয়ে গাল চুলকালো। সূর্য ডুবে গেছে মেঘের আড়ালে। খানিক বাদেই নেমে আসবে গভীর অন্ধকার। তার আগেই তোরাব আলী লস্করের সাথে দেখা করতে হবে তাকে। তারপর রোগী দেখতে বসতে হবে। কাকে যেন বিচ্ছিরি গাল বকে বাইরে কাদার ভেতর একদলা থুতু ফেললো সে। তোরাব আলী লস্কর নিশ্চয়ই অপেক্ষা করছেন। সে বৃষ্টির মধ্যেই পা বাড়ালো বাইরে। তবে আজ কোনোভাবেই জোহরার সাথে দেখা করতে চায় না সে। মেয়েটার যন্ত্রণায় জীবন অতিষ্ট হয়ে উঠেছে তার!

তোরাব আলী লস্কর বসে আছেন উঁচু চেয়ারে। লম্বা খোলা বারান্দার মতো ঘরটাতে মনসুর ঢুকতেই তিনি একগাল হেসে বললেন, 'আসেন ডাক্তার সাব। আসেন। শইল ভালোনি?'

মনসুর গম্ভীর মুখে জবাব দিলো, 'জি ভালো।'

তোরাব আলী লস্কর বললেন, 'একটা মানুষ যদি দিন রাইত সবসময় খালি মুখ আন্ধার কইরা রাহে, তাইলে হইবো? তার রুগীরাতো তহন ভাববো ডাক্তার সাহেবেরই শইল ভালা নাই।'

তিনি হাসলেন। মনসুর অবশ্য জবাব দিলো না। সে তার জন্য রাখা নির্ধারিত চেয়ারে বসে পড়লো। সামনে রোগীরা বসে আছে। এ এক আজব জায়গা। অসুখ-বিসুখ না থাকলেও প্রতিদিন লোকজন এসে অকারণে বসে থাকবে। মনসুর একজনকে ডাকলো, 'আসেন, সমস্যা কী বলেন?'

লোকটার বয়স ষাটের কাছাকাছি। তবে বয়সের তুলনায় শরীর একটু বেশিই ভঙ্গুর। সে আহ্লাদি গলায় বললো, 'সমেস্যা বিরাট কিছু না। সমেস্যা ছোট। রাইতে ঘুম হয় না।'

'ঘুম হয় না কেন?'

'ক্যান ঘুম হয় না, সেইটা আমি জানলে আর আপনের কাছে ক্যান আইলাম?'

মনসুর কিছু বলার আগেই পাশ থেকে তোরাব আলী লস্কর বললেন, 'এইডা একটা কথার কথা কইছো মফিজুলের বাপ। ডাক্তারের কাছে আইস্যা যদি রুগীর কইতে হয় রোগের কারণ, তাইলে আর ডাক্তারের কাম কী!'

তোরাব আলীর ওপর খুবই বিরক্ত মনসুর। প্রত্যেকটা দিন সে এখানে বসে থাকবে। রোগী দেখার সময় খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করবে, মনসুর কী বুঝলো, কীভাবে বুঝলো, কী ওষুধ দিলো, কেন দিলো, সেই ওষুধ কীভাবে কাজ করবে। কিন্তু কিছু করার নেই মনসুরের। এই চরে যে সে এখনো বেঁচে আছে, এটা তার ভাগ্য। নাহলে বছর দুই আগে গোবিন্দপুর লঞ্চ ডাকাতির সময় তার বেঁচে থাকার

কথা না। অন্যদের সাথে তার লাশও ভেসে যাওয়ার কথা ছিলো সুবর্ণপুর নদীতে। একমাত্র এই তোরাব আলী লস্করের কারণেই সে এখনো বেঁচে আছে। যদিও আজকাল তার মনে হয়, এই বাঁচার চেয়ে মৃত্যুই বরং ভালো ছিলো। প্রতিটি মুহূর্তের সীমাহীন এই নরকযন্ত্রণা আর সহ্য করতে পারছে না সে।

মনসুর বললো, 'অনেক কারণেই ঘুম না হতে পারে। ধরেন আপনার কাশি আছে, সারারাত খুকখুক করে কাশেন। এই কারণেও আপনার ঘুমে সমস্যা হতে পারে। কোষ্ঠকাঠিন্যের কারণে হতে পারে। দিনে বেশি ঘুমানোর কারণে হতে পারে। এমন নানান বিষয় থাকতে পারে। এখন আমাকেতো কিছু একটা বলতে হবে?'

মফিজুলের বাপ কিছুক্ষণ ভাবলেন। তারপর বললেন, 'খোয়াব দেহি।'

মনসুর বিরক্ত গলায় জিজ্ঞেস করলো, 'খোয়াব কী জেগে জেগে দেখেন?'

'দুইভাবেই দেহি। জাগনা অবস্থায়ও দেহি, ঘুম অবস্থায়ও দেহি।'

'ঘুম অবস্থায় কখন দেখেন?'

'এইটাতো ডাক্তার সাব কইতে পারবো না। রাইতে জাগনা থাকতে থাকতে মনে হয় ঘুমাই গেছি। আবার ঘুমাইতে ঘুমাইতে মনে হয় জাইগা আছি। মানে আলাদা করতে পারি না।'

'এটা কেমন কথা হলো?'

'ধরেন, আন্ধারে কোনো দিকে চাইয়া আছি। চাইয়া থাকতে থাকতে আচুক্কা মনে হয় আন্ধারের মধ্যে কাউরে হাইট্টা আসতে দেখতেছি। তারপর দেখি, সে ওইহানে নাই। আছে কোনো একটা গাঁও গেরামের রাস্তায়। রাস্তার দুই ধারে বাঁশঝাড়। সে সেই বাঁশঝাড়ের মইধ্যে হারাই গেলো। আমিও তহন তার পিছে পিছে বাঁশঝাড়ের মইধ্যে ঢুকলাম। খোঁজতেছি, খোঁজতেছি। কিন্তু কোথাও সে নাই। তারপর দেহি সেই জঙ্গলের মইধ্যে ছোট্ট একখান ঘর। ঘরখান দেখতে আমার ঘরের মতন। সেই ঘরে সে ঢোকছে। আমিও তার পিছে পিছে ঢুকলাম। ঢুইকা দেহি সেই ঘরের বিছনায় আমি শোয়া। তারপর দেহি হাচাই আমি শুইয়া আছি। এতক্ষণ যা দেখছি সেইটা কী বাস্তবে দেখছি না খোয়াবে দেখছি এইটা আর বুঝি না। এরপর সারা রাইত কাইট্টা যায় সেই চিন্তায় চিন্তায়। আর ঘুম আসে না।'

মফিজুলের বাপের এই সমস্যার কথা শুনে মনসুর চুপ করে রইলো। এই রোগের কী চিকিৎসা দিবে সে? মফিজুলের বাপ বললো, 'এহন আপনেই কনতো, এইডা কী ঘুম, না খোয়াব?'

মনসুর বললো, 'আপনার চিন্তার কোন কারণ নেই। ওইটা ঘুমই। দিনের বেলা ঘুমাবেন না। আর এখন ঘুমের ওষুধ আমার কাছে নাই। পরে এরা ঘুমের ওষুধ আনতে পারলে আমি আপনাকে দিয়ে দিবো।'

New Pdf download: www.PoragEducation.com + webtalkbd.com

'পরে আবার ভুইল্যা যাইবেন ডাক্তার সাব। আপনেরতো কিছুই মনে থাহে না। এহনই খাতায় লেইখ্যা রাহেন। হানিফরা যহন আবার গঞ্জে যাইবো, তহন আমার ওষুধের নামটা দিয়া দিয়েন।'

মনসুর লিখে রাখলো। সে জানে লিখে রেখেও লাভ নেই। কেউ মরে গেলেও হানিফ এই চর থেকে আপাতত বাইরে যাবে না। হানিফের সাথে জোহরার বড় ধরনের ঝামেলা চলছে। তাদের দুজনের বিয়ের কথা পাকা হয়েছিলো। কিন্তু শেষ মুহূর্তে এসে হানিফকে বিয়ে করতে গড়িমসি করছে জোহরা। এই নিয়ে ভেতরে ভেতরে পুরো চরজুড়েই একটা অসন্তোষ। হানিফ অবশ্য এখনো জোরালোভাবে সরাসরি কিছু বলেনি। কিন্তু মনসুরের ধারণা এই নিয়ে গুরুতর ঝামেলা হবে। এবং সেই ঝামেলায় শেষ অবধি জড়িয়ে পড়বে সেও। হানিফ আজকাল সারাক্ষণ জোহরাকে নজরবন্দি করে রাখে। মুহূর্তের জন্যও চোখের আড়াল করতে দেয় না। ওদিকে পুলিশ সতর্ক হয়ে আছে সবখানেই, ফলে জীবন মরণ সমস্যা না হলে কাউকে চরের বাইরেও পাঠানো হচ্ছে না। এই বিষয়ে নবীগঞ্জের হারাধন তাদের বারবার সতর্ক করে দিয়েছিলো। তারপরও আশেপাশের তুলনামূলক নিরাপদ অঞ্চলগুলোতে মাঝেমাঝে তারা যায়। তখন অন্যান্য জিনিসের সাথে কিছু ওষুধপাতিও নিয়ে আসে। কিন্তু সেইসব ওষুধপাতির মধ্যে বেশিরভাগ সময়ই প্রয়োজনীয় ওষুধগুলো থাকে না।

রোগী দেখা শেষ করে বাইরে পা বাড়ালো মনসুর। অন্ধকারে প্যাঁচপ্যাঁচে কাদার মধ্যে পা পড়তেই মেজাজটা বিগড়ে গেলো তার। কিন্তু কিছু করার নেই। এখানে তার কোনো কিছু নিয়েই কিছু করার নেই। এ এক ভয়ংকর নির্বাসিত জীবন। বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতেই ঘরে ফিরলো মনসুর। তার ঘরখানা চরের মূল বসতি থেকে সামান্য দূরে। ছোট্ট একখানা ছনের বেড়ার ঘর। ওপরে টিনের চাল। সামনে এক চিলতে বারান্দাও রয়েছে। মনসুর ঘরে ঢুকতেই হঠাৎ থমকে গেলো। ঘরজুড়ে একটা ঘ্রাণ ভেসে বেড়াচ্ছে। এই ঘ্রাণ সে চেনে। আর চেনে বলেই আলো জ্বালালো না সে। অন্ধকারেই মাথার ওপরের বাঁশের আড়া থেকে গামছাখানা টেনে নিলো। তারপর মাথা মুছতে মুছতেই মৃদু গলায় বললো, 'আমার আর বেঁচে থাকতে ভালো লাগে না জোহরা। আমার মনে হয় আমি মরে যাই।'

অন্ধকারে জোহরা খিলখিল করে হাসলো, 'ইচ্ছা হইলে যেমন বাঁচন যায় না, তেমনে ইচ্ছা হইলেই মরণ যায় না।'

'বাঁচা না গেলেও ইচ্ছে হলেই মরা যায়।'

'না, যায় না। চেষ্টা করন যায়। জন্ম, মৃত্যু, বিয়া, এই তিন আল্লাহর হাতে।'

'আর মরার মতন বেঁচে থাকা?'

'জানি না। আপনের কথায় ভাব বেশি। ভাবঅলা কথা আমি কম বুঝি।'

মনসুর আর কথা বললো না। জোহরা ফস করে দিয়াশলাইয়ের কাঠি জ্বালালো। মনসুর চমকে উঠে বললো, 'তুমি কী পাগল? হানিফ বা কেউ দেখলে আমাকে এখন জবাই করে ফেলবে।'

জোহরা আবারো হাসলো, 'মরণরে এত ডর? একটু আগেই না কইলেন, আর বাঁইচ্যা থাকতে ইচ্ছা করে না!'

'সত্যিই করে না। তবে মানুষ বাঁচে কেন জানো? আশায়। মনে হয় কাল কী হবে, কাল কী হবে? এই কালকের দিনটা দেখার খুব ইচ্ছা মানুষের। মনে হয়, কাল হয়তো তার জন্য ভালো কিছু অপেক্ষা করছে।'

'অতোকিছু বোঝনের কাম নাই আমার। কী বৃষ্টি দেখছেন? রাইত দিন খালি বৃষ্টি। এই বৃষ্টিতে আমার শীত শীত লাগে।'

জোহরার কথায় মনসুর মুহূর্তেই সতর্ক হয়ে গেলো। এই মেয়েকে সে গত প্রায় দুটো বছর থেকে চেনে। তার সারা জীবনে এমন ভয়ংকর, এমন বেপরোয়া, এমন খেয়ালি মেয়ে আর সে দেখেনি। মনসুর ঘর থেকে বাইরে এসে দাঁড়ালো। সে ভেবেছিলো জোহরা ঘর থেকে বের হবে না। কিন্তু তাকে ভুল প্রমাণিত করে জোহরা ঘর থেকে বের হয়ে এলো। তারপর অন্ধকারে মনসুরকে টেনে নিয়ে গেলো ঘরের ভেতর। তারপর বললো, 'কথা বলবেন না। কথা বললেই কিন্তু জোরে চিক্কুর দিবো। আর চিক্কুর দিলে কী হইবো তাতো জানেনই! জানেন না?'

মনসুর জানে। আর জানে বলেই সম্ভবত পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি ভয় সে এই মেয়েটাকে পায়। সেই প্রথম দিনই সে বুঝে গিয়েছিলো, জীবনের বাকিটা সময় নরক বানিয়ে ছাড়বে জোহরা। জোহরা তার বুকের কাছে ঘনিষ্ঠ হয়ে এসে বললো, 'আমার চেহারা খারাপ?'

মনসুর মৃদু কণ্ঠে বললো, 'আমি কখনো বলেছি?'

'তাইলে? শইল ভালো না? শইলে মাংস কম?'

মনসুর এবার আর কথা বললো না। জোহরা বললো, 'ভাবছিলাম এইজন্য আপনে আমারে পছন্দ করেন না। এইজন্য ভাত খাওন বাড়াইয়া দিছি। শুনছি ভাত বেশি খাইলে গায় মাংস হয়। হি হি হি।'

ফণা তোলা গোখরার ছোবলের সামনে তীব্র আতঙ্কে জড়সড় মানুষের মতো দাঁড়িয়ে রইলো মনসুর। জোহরা প্রায় সাপের মতোই মনসুরের গলার কাছে তার মুখ নিয়ে এলো, তারপর হিসহিস শব্দে বললো, 'কামড় দিয়া দেই? আমি একখান দিবো, আপনে একখান দিবেন, তারপর কাইল সবাই দেখবো। হানিফ ভাইও দেখবো, তারপর কী খেলটাই না জমবো। হা হা হা।'

জোহরা হাসছে। মাথার ওপরে টিনের চাল। সেই টিনের চালে বৃষ্টির শব্দের সাথে মিশে যাচ্ছে জোহরার হাসিও। জোহরা জানে না, সেই হাসির সাথে সাথেই সে যদি আঙুলের ডগায় ছুঁয়ে দিতো মনসুরের গাল, তাহলে দেখতে পেতো উষ্ণ

New Pdf download: www.PoragEducation.com + webtalkbd.com

জলের একটা প্রস্রবণ বয়ে যাচ্ছে তার গাল বেয়ে। কিন্তু সেই গভীর অন্ধকারে সে মনসুরের চোখের জল কিংবা মনের কান্না কোনোটাই ছুঁয়ে দেখতে চায়নি। সে দেখতে চেয়েছিলো তার শরীর। কিন্তু জোহরা কী জানে, যে শরীরে মন নেই, সে শরীর মৃত। সেখানে উত্তাপ নেই, আছে মৃত লাশের মতন হিম শীতল নীরবতা!

জোহরা অবশ্য বেশিক্ষণ থাকলো না। সে চলে গেলেও মনসুর অন্ধকারে দাঁড়িয়েই রইলো। নড়লো না, শব্দ করলো না। স্থির, অবিচল সুদীর্ঘ সময়। নিজেকে আজকাল সত্যি সত্যিই মৃত মানুষ বলে মনে হয় তার। মনে হয় পচা গলা মৃত এক লাশ। আসলেইতো তা-ই সে। পুরো পৃথিবীর কাছেইতো এক পচা গলা লাশের স্মৃতি সে।

রোজ সেই বিভীষিকাময় রাতের কথা মনে পড়ে মনসুরের। কী অবিশ্বাস্য দ্রুততায়ই না ঘটে গেলো সবকিছু। আগের রাতে বাবাকে বলেই রেখেছিলো সে, পরদিন নবীগঞ্জ বড় বাজারে কাজ শেষে গোবিন্দপুরের লঞ্চ ধরবে। ধরেও ছিলো। লঞ্চ চলে যাওয়ার আগে একদম শেষ মুহূর্তে লঞ্চ ধরতে পেরেছিলো সে। তারা প্রায় সাত আটজন দেরি করে পৌঁছেছিলো লঞ্চঘাটে। লঞ্চ তখন ঘাট থেকে ছেড়েও গেছে খানেকটা দূর। কিন্তু সাত আটজনের ছোট্ট দলটার চিৎকার চেঁচামেচিতে নদীর মাঝখানে গিয়ে লঞ্চ থামালো সারেং।

ছোট একখানা নৌকায় লঞ্চঘাট থেকে নদীর মাঝ অবধি গেলো তারা। কিন্তু তাড়াহুড়ো করে সবাই একসাথে লঞ্চে উঠতে গিয়ে বাঁধলো বিপত্তিটা। একপাশে কাঁত হয়ে গেলো নৌকা। মনসুরসহ বেশ কয়েকজন শেষ মুহূর্তে কোনোমতে লাফিয়ে উঠে গেলো লঞ্চে। কিন্তু তাল সামলাতে না পেরে একজন পড়ে গেলো জলের মধ্যে। তাকে টেনে ওঠালো মনসুর। কিন্তু লোকটা ততক্ষণে জলে ভিজে জবজবে হয়ে গেছে। লঞ্চে ছোলা, চানাচুর, বাদাম বিক্রি করে সে। সেই ছোলা, বাদামসহই তার হাতের ঝুড়িখানাও ভেসে গেলো নদীতে। তীব্র ঠাণ্ডায় থরথর করে কাঁপছিলো সে। লঞ্চ ততক্ষণে ছেড়ে দিয়েছে। লোকটাকে দেখে মায়াই হলো মনসুরের। মনসুর ব্যাগ খুলে একটা গামছা এগিয়ে দিলো তাকে। লোকটা মাথা মুছে জড়সড় হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো মনসুরের পাশেই। তার জামা কাপড় ভিজে গেছে। কিছুক্ষণ দেখলো মনসুর। তারপর ব্যাগ খুলে একটা প্যান্ট আর শার্ট বের করে লোকটাকে দিলো সে।

লোকটার চোখে স্পষ্ট কৃতজ্ঞতা। তবুও বার কয়েক না না করলো সে। কিন্তু শেষ অবধি নিতে বাধ্যই হলো। শীতের সন্ধ্যায় ওই ভেজা কাপড়ে কতক্ষণ আর টেকা যায়!

লঞ্চের ডেকে মনসুরের পাশেই বসে পড়লো সে। রাত তখন ক'টা মনসুর জানে না। হঠাৎই চারপাশে চিৎকার, চেঁচামেচি। প্রথমে অনেকটা সময় বুঝতেই

পারেনি সে। যতক্ষণে বুঝতে পেরেছে, ততক্ষণে চার পাঁচজন ডাকাতের একটা দল তার সামনেই মাঝ বয়সী এক ভদ্রমহিলার গলা থেকে টান মেরে তার সোনার হাড়খানা ছিনিয়ে নিলো। একজন তার মেয়ের কান থেকে দুল ছিড়ে নিলো। মেয়েটার কান থেকে দরদর করে রক্ত বের হচ্ছে। দৃশ্যটা দেখে নিজেকে সামলাতে পারলো না মনসুর। কিছু বলার জন্য উঠে দাঁড়াচ্ছিলো সে। কিন্তু তার আগেই মনসুরের সাথের লোকটা তাকে হাত টেনে ধরে বসিয়ে দিলো।

তবে যাত্রীরা স্থির থাকতে পারলো না পরের ঘটনায়। মেয়ের চিৎকার শুনে ভদ্রমহিলার স্বামী বিশ্রি ভাষায় গালাগালি শুরু করলেন। তিনি তখনো বুঝে উঠতে পারেন নি যে এরা তোরাব আলী লস্করের ডাকাত দল। ডাকাতদের একজন হাতের লাঠিখানা দিয়ে লোকটার মুখে সজোরে আঘাত হানলো। লোকটা হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলো মেঝেতে। তার নাক, মুখ ফেটে রক্ত বের হচ্ছে তখন। আর ঠিক সেই মুহূর্তে লঞ্চের পেছন দিক থেকে একদল যাত্রী হৈহৈ শব্দে তেড়ে এলো। তারাও তখনো বুঝতে পারেনি যে এটা তোরাব আলী লস্করের ভয়ংকর ডাকাতদল!

তারপরের সময়টুকু রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের সময়। একজন ডাকাতকে গুরুতর আহত করতেও সক্ষম হলো যাত্রীরা। কিন্তু ততক্ষণে লঞ্চের নিচ থেকে দেশীয় ধারালো অস্ত্রশস্ত্রসহ উঠে এসেছেন তোরাব আলী লস্কর, হানিফ, বাহাদুরসহ অন্যান্যরা। বহুকাল পর সেদিনই প্রথম আবার ডাকাতিতে গিয়েছিলেন তোরাব আলী লস্কর। হানিফের হাতে চকচকে রাম দা। ভিড়ের মধ্যে তীব্র চিৎকারে একটা লাশ ফেলে দিলো সে। এমন ভয়াবহ দৃশ্য মনসুর আগে কখনো দেখেনি। সে তখন থরথর করে কাঁপছে।

মনসুর হঠাৎ আবিষ্কার করলো তার পাশে বসে থাকা লোকটা নেই। ভিড়ের মধ্যে অন্য যাত্রীদের সাথে মিলে সেও হামলে পড়েছে ডাকাতদের ওপর। কিন্তু হানিফের পরের আঘাতে লোকটার পেট বরাবর বিশাল একটা ফাঁকা হয়ে গেলো। সেই ফাঁকা থেকে গলগল করে রক্ত বের হতে লাগলো। লোকটা কাটা গাছের মতো পড়ে গেলো মেঝেতে। হানিফ তার ওপরই আবারো ছুরি চালালো। তার চোখে তখন খুনের নেশা। মনসুর আর নিজেকে সামলাতে পারলো না। সে আচমকা হানিফের পা জড়িয়ে ধরলো। তারপর কাঁদো কাঁদো গলায় বললো, 'মানুষটা মরে যাবে ভাই, আপনার পায়ে পড়ি, আর মারবেন না তাকে।'

মনসুরের ঠিক পেছনেই দাঁড়িয়ে আছেন দীর্ঘদেহী তোরাব আলী লস্কর। তার গম্ভীর কণ্ঠ শুনে মনসুর ফিরে তাকালো। তোরাব আলী লস্কর বললেন, 'তারে আর মারলেই কী, না মারলেই কী, প্যাটের সব জিনিসপত্রতো বাইরই হইয়া গেছে। ওইখানে ওইরম এক কোপের বেশি লাগে?'

মনসুর আকুতিভরা গলায় বললো, 'রক্তটা আটকাতে পারলে এখনো বাঁচার সুযোগ আছে। একটা সুযোগ তাকে দেন।'

New Pdf download: www.PoragEducation.com + webtalkbd.com

তোরাব আলী লস্কর কথা বললেন না। তবে মনসুর ততক্ষণে বুঝে গেছে এই লোকটিই তাদের প্রধান। সে এবার তোরাব আলী লস্করের পায়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। তারপর বললো, 'আমারে রক্তটা বন্ধ করার একটা সুযোগ শুধু দেন। একটামাত্র সুযোগ, প্লিজ।'

তোরাব আলী কৌতূহলী গলায় বললেন, 'রক্ত বন্ধ হইবো কীভাবে?'

মনসুর বললো, 'আমার কাছে ব্যান্ডেজ আছে। আমি ব্যান্ডেজ করে দিলেই হবে।' একটু থেমে সে তোরাব আলী লস্করের মুখভঙ্গি বোঝার চেষ্টা করলো। কিন্তু তার মুখ দেখে কিছুই বোঝার উপায় নেই। শেষ চেষ্টা হিসেবে বেপরোয়া মনসুর বললো, 'আমি ডাক্তার। এই সুযোগটা আমাকে দেন। আপনাদের মধ্যে একজনতো আঘাত পেয়েছে, আমি তার জন্যও চেষ্টা করবো। আমি এই হাত জোর করে অনুরোধ করছি। আমাকে এই সুযোগটা দেন। লঞ্চে যার কাছে যা আছে, আপনারা নিয়ে যান। কিন্তু আর কাউকে আঘাত করতে দেবেন না। প্লিজ।'

মনসুরের কথা শুনে তোরাব আলী লস্কর আচমকা থমকে গেলেন। মনসুরের কথা বলার ভঙ্গি, শব্দ, চেহারা সবই তার কাছে হঠাৎ কৌতুহলোদ্দীপক মনে হতে লাগলো। তিনি ঠাণ্ডা গলায় বললেন, 'আপনে ডাক্তার?'

মনসুর বললো, 'জি।'

নবীগঞ্জ বাজার থেকে কেনা কিছু ডাক্তারি সরঞ্জাম, ওষুধপত্র মনসুরের ব্যাগেই ছিলো। কিছু নিয়েছিলো কণার জন্যও। সে সেগুলো তোরাব আলী লস্করকে দেখালো। তোরাব আলীর নিস্পৃহ চোখজোড়া যেন হঠাৎই জ্বলজ্বল করে উঠলো। তিনি হাত বাড়িয়ে হানিফকে ডাকলেন। তারপর বললেন, 'রাইসুলরে এইহানে লইয়ায়তো দেহি।'

রাইসুল আহত ডাকাতের নাম। তিনি রাইসুলকে দেখিয়ে বললেন, 'আগে এর রক্ত বন্ধ করেন। এরটা পারলে পরে অন্যগো টা।'

মনসুর আর কথা বলে সময় নষ্ট করতে চাইলো না। সে যত দ্রুতসম্ভব রাইসুলের ক্ষতস্থানে ব্যান্ডেজ করে দিতে লাগলো। কিন্তু তাতেও বেশ খানিকটা সময় লেগে গেলো তার। সাথের লোকটার অবস্থা ততক্ষণে শোচনীয়। সে বেঁচে আছে কিনা মনসুর জানে না। ওরকম আঘাতের পরও বেঁচে থাকা অলৌকিক ব্যাপার। সে তেমন কিছুই আশা করছিলো। তাই তড়িঘড়ি করে উঠে লোকটার কাছে যেতে চাইছিলো। কিন্তু তোরাব আলী লস্কর সেই সুযোগটা দিলেন না। তিনি আচমকা মনসুরের হাত চেপে ধরলেন। তারপর বললেন, 'জীবনে মরণতো আর কম দেহি নাই। লাভ নাই। ঘটনা যা ঘটার, ঘইটা গেছে। আপনে এক কাম করেন।'

মনসুর ভয়ার্ত গলায় বললো, 'কী কাজ?'

'আপনের ওষুধপত্রের ব্যাগ আর সাজ সরঞ্জামাদিসহ আমার লগে নিচে আহেন।'

মনসুর বললো, 'নিচে কোথায়?'

তোরাব আলী লস্কর আচমকা গর্জে উঠলেন, 'এক কোপে কল্লা আলাদা কইরা ফেলবো। হাতে সময় নাই। তাড়াতাড়ি।'

মনসুরকে অবশ্য কিছুই বইতে হলো না। বরং তার দু'পাশ থেকে দুজন তাকে ধরে নামিয়ে নিয়ে এলো নিচতলায়। তারপর টেনেহিঁচড়ে তুলে ফেললো লঞ্চের সাথে বাঁধা ট্রলারে। মনসুর তখনো জানে না, কী ভয়াবহ জীবন অপেক্ষা করছে তার জন্য। লঞ্চের লাশগুলো ছুড়ে ফেলা হলো নদীতে। ঘুটঘুটে অন্ধকারে ডাকাতদের ট্রলারখানা তখন দ্রুত বেগে ছুটে চলেছে গন্তব্যে। সেই গন্তব্য মনসুরের জন্য হয়ে রইলো বিভীষিকাময় এক জীবনের নাম।

মনসুর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বারান্দায় এসে দাঁড়ালো। রোজ রাতে দুঃস্বপ্নের সেই রাতটা তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে। তার প্রায়ই মনে হয়, সে দম নিতে পারছে না। কত কত বছর সে ডুবে আছে জলের তলায়। তার শ্বাস বন্ধ হয়ে আছে। সামান্য একটু বাতাসের জন্য হাঁসফাঁস করছে বুক, কিন্তু সেই বাতাসটুকু সে পাচ্ছে না। আজও তেমন লাগছে তার। সামনের ওই ঘুটঘুটে অন্ধকার বিলের জলে কতবার ডুবে মরতে চেয়েছে সে, কিন্তু পারে নি। প্রতি মুহূর্তে তার মনে হয়েছে, যদি কখনো কোনোদিন সুযোগ আসে। যদি সে আবার দেখতে পায় কণাকে! যদি সে দেখতে পায় তার ফুটফুটে মেয়েটাকে! আচ্ছা, কী হয়েছে তার? ছেলে, না মেয়ে? দেখতে কেমন হয়েছে সে? এতদিনেতো বছরও পূর্ণ হয়ে গেছে তার। আচ্ছা, সে কী তার বাবাকে চিনতে পারবে? যদি কখনো মনসুর তার সামনে গিয়ে দাঁড়াতে পারে? চিনতে পারবে সে? আর কণা? কণা কী করছে এখন? সে কী তার বাকিটা জীবন মনসুরের অপেক্ষায় কাটিয়ে দেবে? নাকি...?

মনসুর এর পরের অংশটুকু আর ভাবতে পারে না। তার বুকের ভেতরটা ছটফট করে। তৃষ্ণায় ফেটে যায়। মনে হয়, জলের তেষ্টায় একদিন মরে যাবে সে।

New Pdf download: www.PoragEducation.com + webtalkbd.com

খুব অস্থির হয়ে আছে হানিফ। তার হাতে একখানা ধারালো চাকু। সে চাকু দিয়ে আমগাছের গায়ে গভীর করে দাগ কাটছে। তার পাশে বসে আছে বাহাদুর। বাহাদুর বললো, 'আমার কথায় কী কাম হইবো?'

'হইবো। আপনে দাদাজানরে কইবেন, জোহরা ডাক্তারের লগে যা করতেছে, এইডা চরের লাইগ্যা ভালো না।'

'কিন্তু তারে কইলেইতো হইবো না। আগে প্রমাণতো দেহাইতে হইবো।'

'কী প্রমাণ দেহাইতে হইবো?'

'সেইটা তোরই বাইর করতে হইবো। আর জোহরা যদি এহন আইস্যা বিগড়াইয়া যায়, কিচ্ছু করনের আছে? ও কী তেমন মাইয়ানি যে ভয় ডর কিছু আছে!'

হানিফ হঠাৎ শক্ত হয়ে যায়, 'হানিফও তেমন পোলা না। তারে আমি পছন্দ করি দেইখ্যা সে আমারে দ্যাহে তুলতুইল্যা নরম। কিন্তু আমি নরম না। পাথরের লাহান শক্ত। এইটা তার বোঝনের বাকি আছে।'

বাহাদুর হাসলো, 'ওইটা খালি দূরে বইস্যাই। কাছে গেলেইতো বিলাইর লাহান মিউমিউ করো। হা হা হা। নাইলে এতদিনে তুই নিজেই গিয়া দাদাজানের ধারে কইতি। আমারে পাঠাইতি না। জোহরা না হইয়া অন্য কেউ হইলে, এতদিনে তুই দুনিয়া উল্টাই ফালাইতি।'

বাহাদুরের কথা সত্য। হানিফ দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে, 'দুনিয়াডা এমন ক্যান বাহাদুর ভাই? এই একটা জায়গায় আইলেই আমার সব শক্তি, সাহস, বুদ্ধি

ওলটপালট হইয়া যায়। মনে হয়, ও যদি কষ্ট পায়? যদি আমারে খারাপ জানে? যদি আমার ওপরতন মন উইঠ্যা যায়।'

'মন কী এহনো উঠা বাকি আছে মনে হয়? ওই ডাক্তার আসনের পর থেইক্যাইতো তার মন হুক্কা হুয়া ডাকতেছে। হা হা হা।'

হানিফের হাতের চাকুটা যেন আচমকা থেমে যায়। সে গায়ের সর্বশক্তিতে চাকুর ফলাটা আম গাছের শরীরের ঢুকিয়ে দেয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু কিছুটা ঢুকে চাকুটা থমকে যায়, আর ঢোকে না। হানিফ ক্রোধোন্মত্ত গলায় বললো, 'আমি একদিন ওরে খুন কইরা ফালামু বাহাদুর ভাই। আল্লাহর কসম।'

বাহাদুর হানিফের কাঁধে হাত রাখে। তারপর সান্ত্বনার ভঙ্গিতে বলে, 'এত উত্তেজিত হইস না। আর ডাক্তার লোক ভালো। তার কোন দোষ আমি দেহি না। তার জায়গায় আমি থাকলে কবে কী হইয়া যাইতো! হা হা হা।'

হানিফ এক ঝটকায় তার কাঁধ থেকে বাহাদুরের হাতটা সরিয়ে ফেলে। তারপর কঠিন গলায় বলে, 'আর কোনোদিন জোহরারে নিয়া এইরম কথা কইয়েন না বাহাদুর ভাই।'

হানিফের সেই কণ্ঠ শুনে বাহাদুর চুপ হয়ে যায়। তারপর ঠোঁটের কোনায় হাসি ঝুলিয়ে বলে, 'তুই অযথাই আমার ওপরে খেপলি। আমার কথা তুই বোঝস নাই। জোহরা আমার মায়ের পেটের বইনের লাহান। আর সে আমার মায়ারে যেমনে পালতেছে, এমনে কেউ নিজের মাইয়াও পালে না।'

বাহাদুরের কথা সত্য। জোহরা মায়াকে যেন নিজের মেয়ের মতো করেই বড় করছে। মায়া এখন কী সুন্দর করে কথা বলে। জোহরা বলে, 'মায়া?'

মায়া বলে, 'কী মা?'

জোহরা আবার ডাকে, 'মায়া?'

মায়া আবার বলে, 'কী মা?'

জোহরা আবার বলে, 'মায়া?'

মায়া এবার অনেক্ষণ চুপ করে থাকে। তারপর এক দৌড়ে জোহরার কাছে ছুটে গিয়ে পেছন দিক থেকে তার গলা জড়িয়ে ধরে। তারপর জোহরার কানের কাছে মুখ নিয়ে একটানা বলতে থাকে, 'কী মা, কী মা, কী মা...!'

ওই মুহূর্তটুকু জোহরার কাছে জগতের সবচেয়ে আরাধ্য মুহূর্ত মনে হয়। ওইটুকু এক বাচ্চা, অথচ কী গভীর, কী স্পষ্ট করেই না তাকে বুঝতে পারে। পৃথিবীতে কী আর কেউ আছে, যে তাকে মায়ার মতো অমন করে বোঝে?

এখানে এসে জোহরা চুপ করে ভাবে। সেতো কাউকে তার অতটা কাছে আসতেও দেয়নি, যে তাকে অতটা বুঝবে। আর দেবেই বা কী করে! তার চারপাশে কী অমন মানুষ কেউ আছে? যাকে সে তার অতটা কাছে আসতে দেবে, বুঝতে দেবে!

New Pdf download: www.PoragEducation.com + webtalkbd.com

এই অবধি ভাবলেই জোহরার মন খারাপ হয়ে যায়। তীব্র অভিমান জমে মনসুরের ওপর। রাগও হয়। কিন্তু মানুষটার ওপর রাগ পুষে রাখতে পারে না সে। অভিমানও না। আচ্ছা মন এমন কেন? কী অদ্ভুত, কী খামখেয়ালি, কী যুক্তিহীন। অথচ তার পিছেই ছুটতে ইচ্ছে হয় আমাদের। একদম সেই প্রথম দিন থেকেই। সেদিন লঞ্চ ডাকাতিতে জোর করে সেও গিয়েছিলো। তবে ট্রলার থেকে নামেনি। অন্ধকারে যখন কেউ একজনকে ট্রলারে ওঠানো হলো, জোহরা ভীষণ অবাকই হয়েছিলো। ডাকাতিতে এর আগে কখনো এমন হয়নি। অন্ধকারে কেউ কারো মুখ দেখেনি। শুধু ট্রলারে উঠে তোরাব আলী লস্কর বলছিলেন, 'তারে আমরা চরে নিয়া যাইতেছি। তার লগে কেউ কখনো খারাপ ব্যবহার করবা না। এইটা আমার আদেশ। এই আদেশ সবাইরে মনে করাই দিবা।'

জোহরা জিজ্ঞেস করছিলো, 'কেন? তার এত আদর কীসের?'

তোরাব আলী লস্কর বলেছিলেন, 'আদর কিসের, সেইটা এহন না বুঝলেও চলবে। খালি যেইটা বলছি, সেইটা সবাই মনে রাখলেই হইবো।'

জোহরা আর কোনো কথা বলেনি। কথা বলেনি অন্য কেউই। তবে সবাইই ভীষণ অবাক হয়েছিলো। তোরাব আলী ঘটনা খোলসা করলেন চরে পৌঁছানোর পরদিন। তিনি মফিজুলের বাপ মনা মিয়াকে ডেকে বললেন, 'শোন মনা, তোর পোলা আইজ বাঁইচ্যা আছে, সুস্থ আছে তার জন্য। তার নাম মনসুর। সে বড় ডাক্তার। এহন হইতে সে এইহানেই থাকবো। তার লাইগ্যা চরের দক্ষিণ দিকে বিলের পাড় একখান ঘর উঠা।'

মনা মিয়া অবাক গলায় বললো, 'এইহানেই থাকবো? বাইরের মানুষ?'

তোরাব আলী লস্কর বললেন, 'হ, থাকবো। এহন হইতে সে আর বাইরের কেউ না। আমাগো মানুষই।'

'সে কী রাজি হইছে?'

'রাজি হওন লাগবো ক্যান? তার রাজি হওনের কিছু নাই। আর তার দিকে নজর রাখতে হইবো, যাতে কোনো অঘটন ঘটাইতে না পারে। শিক্ষিত মানুষের বইয়ের বাইরের জ্ঞান কম হয়। দেহা গেলো রাইতের আন্ধারে সুযোগ পাইয়া একলা একলা নাও-ট্রলার লইয়া পলানোর চেষ্টা করছে। এইসবে সাবধান। তারে বুঝাই কইতে হইবো, এইহানে যদি সে ভালোয় ভালোয় থাহে, আমাগো মধ্যে যাগো অসুখ-বিসুখ হয়, তাগো দেহাশোনা করে, তাইলে তার আদর-যত্নের কোনো শেষ নাই। কিন্তু পলানোর চেষ্টা করলে মাইর ধইরেরও ব্যবস্থা আছে। বুঝলি।'

মনা মিয়া বুঝলেও মনসুর সত্যি সত্যিই বোঝেনি। প্রথম প্রথম সে বার কয়েক পালানোর চেষ্টাও করেছিলো। প্রতিবারই তাকে ধরে এনেছে হানিফ। তবে তোরাব আলী তাকে মারধোর করতে দেননি। বরং সসম্মানে বুঝিয়েই বলেছেন যে এই চর থেকে যাওয়ার কোনো উপায় আসলে তার নেই। এমন কী তাকে একা ছেড়ে দিলেও সে যেতে পারবে না।

মনসুরের সাথে জোহরার যে প্রথম দিকে খুব একটা কথা হতো, তা না। বরং দুজনের মধ্যে অবচেতনেই যেন একটা শীতল দ্বন্দ্ব তৈরি হয়ে গেলো। এই দ্বন্দ্বের কারণ তাদের দুজনের কারোই জানা নেই। কিন্তু মনসুরকে দেখলে পাত্তা না দেয়ার চেষ্টা করতো জোহরা। আর মনসুরতো এমনিতেই সারাটাক্ষণ চুপচাপ বসে থাকতো। খেতে দিলে খেতো না, রাতভর ঘুমাতো না। কারো সাথে কথা বলতে চাইতো না। প্রথম দিন কয়েকের মধ্যে না খেতে খেতে রীতিমতো অসুস্থ হয়ে পড়লো সে। তোরাব আলী লস্কর থেকে শুরু করে একে একে প্রায় সকলই তাকে খাওয়ানোর চেষ্টা করলো। কিন্তু লাভ হলো না তাতে। তবে তারপরও কেউ রাগলো না বা বিরক্ত হলো না। কারণ, ততদিনে চরের মানুষ বুঝে গেছে, তোরাব আলী লস্কর এতদিনে একটা বুদ্ধিমানের মতো কাজ করেছেন। এই চরে সবসময়ের জন্য একজন ডাক্তার পাওয়ার চেয়ে ভালো ঘটনা আর কিছু হতে পারে না। কিন্তু মনসুরের অমন অসহযোগিতায় তারা ভীষণ চিন্তিত হয়ে পড়লো। শেষ পর্যন্ত জোহরার দ্বারস্থ হলেন তোরাব আলী লস্কর। তিনি বললেন, 'তুই একটু চেষ্টা কইরা দেখবি নাকি?'

জোহরা রাজ্যের বিরক্তি নিয়ে বললো, 'এই লোকরে নিয়া তোমাগো ঢং দেখতে দেখতে আমি বিরক্ত দাদাজান। আমার মাথাটা আর গরম কইরো না, আল্লাহর দোহাই।'

তোরাব আলী লস্কর বললেন, 'তুই না এই চরের সবাইর কথা খুব ভাবোস? সবাইর ভালো-মন্দ খুব ভাবোস? তাইলে এই লোকটার ভালো-মন্দ, বাঁচন-মরণ তোর ভাবা দরকার না?'

'কেন?'

'কারণ এই লোকটার বাঁচন-মরণের ওপর এই চরের অনেকের বাঁচন মরণ নির্ভর করে। সামনে কারো কোনো অসুখ হইলে এ হইলো গিয়া আমগো ভরসা। সেইবার মায়ারে নিয়া কী হইছিলো, মনে নাই? ওই অবস্থা আর হইবো না। আমাগো নিজেগো একজন ডাক্তার আছে।'

জোহরা যে বিষয়টা বোঝে না, তা না। তবে তারপরও কেন যেন মনসুরকে তার সহ্য হচ্ছিলো না। সে বিকেলের দিকে মনসুরের ঘরে গেলো। মনসুর তখন মৃত মানুষের মতো পড়ে আছে বিছানায়। জোহরা তাকে ডাকলো। কিন্তু সাড়া দিলো না মনসুর। বার কয়েক ডাকার পরে জোহরা একটু চিন্তিত হয়ে পড়লো। খানিকটা বিরক্তি নিয়েই মনসুরের ঘরে ঢুকলো সে। কিন্তু অনেক ডেকেও যখন মনসুরের কোনো সাড়া-শব্দ পেলো না, তখন তার শরীরে হাত দিলো সে। আর হাত দিয়েই চমকে উঠলো। গা পুড়ে যাচ্ছে জ্বরে। পরের দুটো দিন বলতে গেলে মনসুরের ঘরেই পড়ে রইলো জোহরা। নিয়ম করে প্রতিবেলা তার মাথায় পানি ঢালতে হলো। প্রায় অচেতন মনসুরকে ডাবের পানি বা ভাতের জাউ খাওয়ানোর

New Pdf download: www.PoragEducation.com + webtalkbd.com

চেষ্টাও করলো সে। দিন তিনেকের মাথায় খানিক সুস্থ হলেও আবারো আগের মতো খাওয়া-দাওয়া বন্ধ করে দিলো মনসুর। এমনি একদিনে জোহরা তার ঘরে গিয়ে খুব শান্ত ভঙ্গিতে বসলো। তারপর নরম গলায় বললো, 'আপনে ক্যান খাইতেছেন না?'

মনসুর কথা বললো না। সে তাকিয়ে আছে জানালার বাইরে। সেখানে বিস্তৃত জলের বুকে খেলা করছে বিকেলের সোনারোদ। কিন্তু তার চোখের দৃষ্টি শূন্য। সে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলেও আসলে দেখছে না কিছুই। জোহরা আচমকা কথাটা বললো, 'আপনের বাড়ি ফির‍্যা যাইতে ইচ্ছা করতেছে না?'

মনসুরের চোখের পাতাটা যেন নড়লো। কিন্তু কথা বললো না সে। তবে মুখ ঘুরিয়ে জোহরার দিকে তাকালো। জোহরা মিষ্টি করে হাসলো। তারপর গোপন কোনো কথা বলছে এমন ভঙ্গিতে গলার স্বর নিচু করে বললো, 'যাইতে চাইলে আপনের যাওনের ব্যবস্থা হইবো।'

মনসুরের নিঃসাড় শরীরে যেন মুহূর্তেই প্রাণ ফিরে এলো। সে নড়েচড়ে বসার চেষ্টা করলো। কিন্তু পারলো না। জোহরা তার কাছে গিয়ে শক্ত করে ধরে তাকে আধশোয়া করে দিলো। তারপর বললো, 'কিন্তু এই কথা গোপন থাকবো। কাউরে বলন যাইবো না।'

মনসুরের জগৎ সংসার তখন শূন্য। সে তখন পানি থেকে তুলে ফেলা এক মাছ। একটু জলের স্পর্শের জন্য তার বুকের ভেতরটা সারাটাক্ষণ তড়পাচ্ছে। সে জোহরাকে পুরোপুরি বিশ্বাস করতে না পারলেও অবিশ্বাসও করতে পারছে না। কোথায় যেন এক অনিশ্চিত কিন্তু অতি সূক্ষ্ম আশার আলো সে দেখতে পাচ্ছে। সেই আলোর আভাস ভেসে উঠছে তার চোখে। সে দ্বিধাগ্রস্ত গলায় বললো, 'আমি কাউকে বলবো না।'

জোহরা বললো, 'এইটা নিয়া পরিকল্পনা করতে হইবো। এইখান থেইক্কা যাওনতো আর মুখের কথা না। চাইলেই যে কেউ ইচ্ছা মতন যাইতে আইতে পারে না। এইটুকতো বোঝেন?'

মনসুর মাথা নাড়লো। জোহরা বললো, 'এহন এইটার জইন্য সময় লাগবো। এমনিতেও এই চর থেইক্যা খুব দরকার না হইলে আমরা নিজেরাও কোথাও যাই না। আর সেইহানে আপনের যাওন নিয়া যদি কোনো ব্যবস্থা করি, তাইলে সময় লাগবো না?'

মনসুর আবারো ওপর-নিচ মাথা নাড়লো। জোহরা বললো, 'এহন এই সময়ের মইধ্যে কিন্তু আপনের শরীল-স্বাস্থ্য ঠিক রাখতে হইবো। কারণ কহন কোন সুযোগ মিল্যা যায়, সেইটা কিন্তু আমরা কেউই জানি না। কিন্তু আপনে যদি না খাইয়া, না ঘুমাইয়া এমনে নিজেরে নিজে মাইরা ফেলান, তাইলে যাইবেন কেমনে? আর এই যাওন কিন্তু সহজ কথা না। সুস্থ মানুষ অসুস্থ হইয়া যায় অতো সময় টলারে থাকতে থাকতে। বুঝলেন?'

মনসুর বুঝলো। সে এও বুঝলো জোহরাকে বিশ্বাস করার কোনো কারণই হয়তো নেই, কিন্তু তারপরও জোহরার কথাতো সত্য! তাকেতো সুস্থ থাকতে হবে। যদি সে ফিরে যাওয়ার সামান্যতম আশাও রাখে, তাহলেও তাকে সবার আগে নিজেকে সুস্থ রাখতে হবে। সেই শুরু। জোহরা আর মনসুরের এক অদ্ভুত রহস্যময় উপাখ্যানের। সেই উপাখ্যানে কতটুকু প্রেম, কতটুকু ঘৃণা, কতটুকু জিঘাংসা আছে, তা জানে না এই পুরোপুরি বিপরীতধর্মী মানুষ দুজনও।

তাদের কথা হতে থাকে রোজ। দেখা হতে থাকে রোজ। জোহরা বলে, 'ডাক্তারি পড়ালেহা খুব কঠিন নি?'

মনসুর এসব আলাপে খুব একটা আগ্রহ দেখায় না। সে আগ্রহ দেখায় তার ফিরে যাওয়ার আলোচনায়। কিন্তু সেই আলোচনা সবসময়, সবখানে করা যায় না। মনসুর গম্ভীর গলায় বলে, 'হুম।'

'আমি পারবো? কী মনে হয় আপনের? এই যে এই কয়দিন আমার লগে কথা কইলেন, আপনের কী মনে হয় আমার মাথায় বুদ্ধি-শুদ্ধি কিছু আছে? আমি যদি সুযোগ পাইতাম, তাইলে কী ডাক্তার হইতে পারতাম?'

উত্তর দিতে গিয়ে মনসুর থমকে যায়। এই মেয়েটাকে একদম বুঝতে পারে না সে। এই মনে হয় সহজ-সরল শিশুর মতো এক মানুষ, আবার পরক্ষণেই মনে হয় ভয়াবহ কুটিল কিংবা তুখোড় বুদ্ধিমতী এক নারী। এই মনে হয় প্রগাঢ় ভালোবাসা বুকে পুষে রাখা মায়াবতী এক তরুণী, আবার পরক্ষণেই মনে হয় ভয়ংকর নৃশংস এক অমানুষ! জোহরা তাকে আকর্ষণ করে। তার আকর্ষণ তীব্র। এই আকর্ষণ এড়ানো কোনো পুরুষের পক্ষেই সহজ নয়। এ এক সর্বপ্লাবী বানের জলের মতো। কিন্তু তারপরও জোহরার আকর্ষণ থেকে মনসুর দূরে থাকতে পারে। তার এই দূরে থাকতে পারার কারণ কণা। একটা মুহূর্তের জন্যও সে কণাকে তার চোখের আড়াল করতে পারে না। সে জেগে থাকলে মনে হয় কণা তার বুকের ভেতর ভাসে। ঘুমিয়ে থাকলে মনে হয় চোখের ভেতর ভাসে। এই কণাকে সে উপেক্ষা করতে পারে না। মুহূর্তের জন্যও না। মনসুর মাঝে মাঝে দ্বিধান্বিত হয়ে যায়, কণার কাল্পনিক এই অস্তিত্ব কী জোহরার সর্বপ্লাবী বর্তমান অস্তিত্বের চেয়েও তীব্র? নাকি কণার অস্তিত্বের চেয়েও কণাকে যে সে ভালোবাসে, সেই ভালোবাসা বেশি তীব্র! সেই ভালোবাসার দেয়াল ডিঙিয়ে জোহরার ঢেউ উপচে উঠতে পারে না, ভাঙতেও পারে না।

জোহরার বেশির ভাগ প্রশ্নের উত্তর মনসুর দেয়ও না। জোহরা অবশ্য তাতে কিছু মনে করে বলেও মনে হয় না। সে হাসে। তার সেই হাসি গায়ে কাঁটা দেয়ার মতো। জোহরার এই হাসি নিয়ে মনসুর মনে মনে একটা খেলার মতো খেলে। তার কোন হাসির কী অর্থ হলো! কোন হাসির কী ব্যাখ্যা? কিন্তু যখনই তার মনে হয়,

New Pdf download: www.PoragEducation.com + webtalkbd.com

সে মোটামুটি ধরে ফেলতে পেরেছে, ঠিক সেই মুহূর্তেই এমন একটা কিছু ঘটে যে তার আগের সব ভাবনা এলোমেলো হয়ে যায়।

এখানে আসার মাস তিনেকের মাথায় জোহরা একদিন তাকে হুট করেই বললো, 'আপনে আমার শইলে হাত দিলেন কেন?'

মনসুর যেন আকাশ থেকে পড়লো। কী বলছে এই মেয়ে? সে বললো, 'কী বলছেন আপনি?'

জোহরা বললো, 'আইজ থেইকা আপনে আমারে তুমি কইরা বলবেন। আর আপনে আপনে না। যদি তুমি কইরা না বলেন, তাইলে আমি দাদাজানের কাছে গিয়া বলবো, আপনে আমার শইলে হাত দিছেন। বুঝলেন? হি হি হি।'

জোহরা হাসছে, তার সেই হাসির অর্থ মনসুর কিছুতেই বুঝতে পারছে না। সে কী সত্যি সত্যি এই কাণ্ড ঘটাবে, নাকি জোহরা তাকে ভয় দেখাচ্ছে, তা নিশ্চিত হতে পারছে না মনসুর। তবে ভয়ে ভয়ে সে সেদিন থেকেই জোহরাকে তুমি করে বলা শুরু করে দিলো। কারণ এতদিনে মনসুর বুঝে ফেলেছে, জোহরাকে বিশ্বাস করা যেমন অন্যায়, তেমনি অবিশ্বাস করাও অন্যায়। এমনকি জোহরা যে তাকে এখান থেকে ফিরে যেতে সাহায্য করবে, সেটি সত্যি না মিথ্যা তাও মনসুর জানে না। কিন্তু এতদিন হয়ে যাওয়ার পরেও বিষয়টিকে পুরোপুরি ফেলে দিতে পারছে না সে। আবার বিশ্বাসও করতে পারছে না। গত তিন মাসে ওই বিষয়ে জোহরার সাথে তার খুব একটা কথাও হয়নি। এমনকি মনসুর কিছু বলতে গেলেও নানা ছুঁতোয় এড়িয়ে গেছে সে।

তবে মনসুর জোহরাকে সমীহ করেই চলে। তার কেন যেন মনে হয়, তার সত্যি সত্যি কোনো বিপদ হলে, কেউ যদি তাকে এতটুকু সাহায্য করতেও আসে, তা এই জোহরাই। জোহরা প্রায়ই তার কাছে মায়াকে নিয়ে আসে। তারপর হাসতে হাসতে বলে, 'দেখছেন নি এরে?'

মনসুর তাকায়, কথা বলে না। জোহরা বলে, 'এ হইলো আমার মাইয়া। নকল মাইয়া না, আসল মাইয়া। এর নাম মায়া। কী, মায়াভর্তি চেহারা না?'

'হুম।'

'শোনেন ডাক্তার সাব, আপনের সবকিছু আমি মাইন্যা নিছি, কিন্তু আমার মাইয়ার বিষয়ে হুম-হাম করলে কিন্তু আমি মানবো না। আমার মাইয়ার বিষয়ে কথা বলতে হইবো গুরুত্ব সহকারে, আদর কইরা। নেন আদর কইরা দেন।'

জোহরা মায়াকে ঠেলে দেয় মনসুরের দিকে। মনসুর অবশ্য আগ্রহ নিয়েই মায়াকে কাছে টেনে নেয়। ওই সময়টায় তার খুব কষ্ট হয়। মনে হয় বুকের ভেতরটা ভেঙে চুরমার হয়ে যাচ্ছে। তার মেয়েটাওতো একদিন এমন হবে। ঠিক এমন। জোহরা বলে, 'আপনে একখান আজব মানুষ।'

মনসুর তাকালো। সে কেন আজব মানুষ তা বুঝলো না। জোহরা বললো, 'আমার এত বড় একটা মাইয়া, কিন্তু মাইয়ার বাপ কই, এইটা জিজ্ঞেস করবেন না আপনে?'

মনসুর এই কথারও জবাব দিলো না। জোহরা বললো, 'এইটা হইলো বাপছাড়া মাইয়া।' বলেই আচমকা লজ্জায় জিভ কাটলো সে। তারপর আরক্ত ভঙ্গিতে বললো, 'আমি খুব বেহায়া বেলাজ একখান মাইয়া, তাই না? লাজ শরমের কোনো বালাই নাই।'

বলেই আবার হি হি হি করে হাসলো সে। তারপর মায়ার ঘটনা খুলে বললো মনসুরকে। শুনে ভারি অবাক হলো মনসুর। কী অসাধারণ এক মানুষ এই মেয়েটা। এই সভ্যতার আলোহীন, স্পর্শহীন, বিচ্ছিন্ন এক চরে, একদল নৃশংস, অসভ্য মানুষের সাথে তার বেড়ে ওঠা, অথচ তারপরও কোথায় যেন সে হয়ে উঠেছে পুরোপুরি অন্য এক মানুষ। সেই মানুষের গভীরতা মাপার সাধ্য তার নেই।

জোহরা আচমকা বললো, 'তয়, বাপওয়ালা মাইয়াও আমার একখান লাগবো, বুঝলেন ডাক্তার সাব?'

জোহরা কী বোঝাতে চাইলো কে জানে! তবে মনসুর ভয় পেয়ে গেলো। এই মেয়েকে দিয়ে কিছুই অবিশ্বাস নেই। তার ওপর জোহরার সাথে তার এই সখ্যতা নিয়ে চরে নানান গুঞ্জনও ছড়িয়ে পড়েছে। তাকে একদিন ডেকে নিলো হানিফ। তারপর নরম গলায় বললো, 'ভালো আছেননি ডাক্তার সাব?'

মনসুর মাথা নাড়লো, 'জি ভালো।'

হানিফ বললো, 'আপনে না শিক্ষিত মানুষ? তয় আদব কায়দাতো কিছুই শেখেন নাই। কেউ ভালো আছে কি না জিগাইলে, তারেও জিজ্ঞাস করন উচিত, সে কেমন আছে!'

মনসুর বললো, 'আপনি কেমন আছেন?'

হানিফ বললো, 'আপনে আসনের আগে ভালোই আছিলাম। কিন্তু আপনে এইহানে আসনের পরেরতন আর ভালো নাই।'

মনসুর এই কথার পিঠে কোনো কথা বললো না। হানিফই বললো, 'শোনেন ডাক্তার সাব। এই যে আপনে আমারে আপনে আপনে কইরা ডাকেন, শোনতে কত ভালো শুনায় না? কী কন?'

'জি।'

'কিন্তু কাউরে যহন তুমি কইরা কন, তহন কিন্তু শুনতে ভালো শোনা যায় না। তারওপরে পরপুরুষের উচিত না, জুয়ান মাইয়া মানুষরে তুমি কইয়া ডাকন। বুঝলেন নি?'

মনসুর ঘটনা বুঝেছে। হানিফ বললো, 'আরেকখান কথা, আপনেরে আমার ভালো লাগে না কেন, বুঝতেছেনতো? জোহরা কিন্তু আমার বউ। খালি বিয়া

New Pdf download: www.PoragEducation.com + webtalkbd.com

করনডাই বাকি। আর সব ঠিক। কিন্তু আপনে তার লগে যেমনে হাসি তামাশা করতেছেন, তাতে আমার উচিত আপনের প্যাটের মইধ্যে এই ছুরিখান ঢুকাই দেওয়া। কিন্তু ক্যান দিতাছি না জানেন? এই চরের বহুত মাইনষের উপকার হয় আপনেরে দিয়া। তার ওপরে ধরেন আমার আর জোহরার বিয়া হইলো, তারপরতো বাচ্চাকাচ্চা হইবো, হইবো না? সেই বাচ্চারওতো ডাক্তার লাগবো। লাগবো কিনা কন? আপনেরে এহন খুন কইরা ফালাইলে, সেই বাচ্চার অসুখ-বিসুখ হইলে কই যাবো? এইটা হইলো সব কারণের আসল কারণ। বুঝছেননি?'

'জি।'

'আপনেরে যেন জোহরার আশেপাশে আর না দেহি। ঠিক আছে?'

মনসুর মাথা নাড়ালো। জোহরা পরদিন আসতেই জড়সড় হয়ে রইলো মনসুর। কিন্তু তার জেরার মুখে হানিফের ঘটনা খুলে বলতে হলো তাকে। মজার ব্যাপার হচ্ছে, এর পরদিনই হানিফ তাকে আবার ডাকলো। এবার কথা বললো খুবই আদবের সাথে। তারপর নরম গলায় বললো, 'সমস্যা নাই। জোহরাতো বয়সে আপনের ছোট, আপন বইনের মতোন। আপনে তারেতো তুমি কইরাই ডাকবেন। নিজের ছোট বইনেরে কী মাইনষে আপনে বইলা ডাকে নাকি! আপনি তারে তুমি বইলাই ডাইকেন!'

মনসুর অবাক হলো খুব। তবে ঘটনা বুঝলো আরো পরে। দিন কয়েক পরে জোহরা তাকে বললো, 'হানিফ ভাই আবার কিছু বলছে আপনেরে?'

মনসুর মাথা নাড়লো, 'হ্যাঁ।'

'এইবার ঠিক আছেতো?'

'হ্যাঁ।'

'এরপর আবার কিছু বললে আমারে জানাইবেন। ঠিক আছে।'

'জি।'

'আপনে কী মাইয়া মানুষনি? এমনে মাইয়া মানুষের মতো মিনমিন করেন কেন? এইজন্য আপনেরে আমার সহ্য হয় না। অসহ্য এক মানুষ আপনে!'

জোহরা একপ্রকার মুখ ঝামটা মেরেই চলে যায়। তবে সমস্যা হলো ঘটনা তোরাব আলী লস্করের কান পর্যন্ত পৌঁছে গেলো। তিনিও বিষয়টা নিয়ে মনসুরের সাথে কথা বললেন। কথা বললেন জোহরার সাথেও।

জোহরা বললো, 'আমারতো তার লগে কথা কইতে ভাল্লাগে দাদাজান।'

তোরাব আলী লস্কর বললেন, 'অতো বেশি ভালো লাগন ভালো না। যহন যেইটা ভাল্লাগবো, তহনই সেইটা করতে হইবো, এমন হইলে দুনিয়া চলে না।'

'দুনিয়া চালানোর দায়িত্ব কী আমার নি দাদাজান? সেইজন্য আল্লাহ আছেন।'

তোরাব আলী বললেন, 'সব সময় ফাইজলামি ঠিক না। তোর বিয়া ঠিক হইয়া আছে হানিফের লগে। তোর ইচ্ছা মতোই সব ঠিক। এহন আয়নাল হক যদি

আইসা আমারে এইসব লইয়া কথা শুনাই যায়, তাইলে আমার জায়গাটা আর থাহে কই, চিন্তা কইরা দেখছোস?'

জোহরা বললো, 'কথা তোমারে শুনাইবো কেন? যার যা কওনের দরকার, আমারে যেন কইয়া যায়। তার লগে কথা কই আমি, তুমিতো আর কও না। কও?'

'সবকিছুরে পাত্তা না দেওন ভালো না জোহরা।'

জোহরা উঠে যেতে যেতে বলেছে, 'তুমি ডরাইও না, সে আমারে পাত্তা দেয় না। তার বউ আছে, বাচ্চা হইবো। সেই বউরে সে তোমার রূপবানের মতন ভালোবাসে। আমার আর পাত্তা নাই। আমি একটু বেশরম মাইয়া দেইখ্যা ঘুরঘুর করি। কী করবো কও, এইহানে ঘুরঘুর করনের মতোতো কেউ নাই। এহন তুমি খাল খাইট্টা কুমির আনছো। সেই কুমির যদি তোমার নাতিনরে খায়, দোষতো তোমারই, তোমার নাতিনের না। হা হা হা।'

জোহরা হাসছে, সেই হাসি। তোরাব আলী লস্কর অসহায়ের মতো সেই হাসির দিকে তাকিয়ে থাকলেন। তবে একটা অদ্ভুত ব্যাপার হলো, জোহরা যখন মনসুরের সাথে কথা বলে, তখন অবচেতনে হলেও তোরাব আলী যেন অখুশি হন না। নিজেরে ভেতরে কোথায় যেন একটা সূক্ষ্ম ভালো লাগা কাজ করে। কেন যেন তার মনে হয়, জোহরাকে নিয়ে যে স্বপ্নটা তিনি দেখেছিলেন, তা হয়তো কোনো না কোনোভাবে পূরণ হতেও পারে। হোকনা মনসুর এই চরের বাইরের মানুষ। কিন্তু কী ভালো বংশ, কত বড় ঘরের ছেলে সে। তার ওপর শিক্ষিত, ডাক্তার। এই ভাগ্য কী তার ছিলো? জোহরার ভাগ্যে কী সত্যি সত্যিই এমন লেখা ছিলো! তোরাব আলীর কেন যেন মনে হয়, সেদিন মনসুরকে এভাবে নিয়ে আসা সাধারণ কোনো ঘটনা নয়। এখানে কোনো একটা দৈব ব্যাপার-স্যাপারও নিশ্চয়ই রয়েছে।

মনসুরের বাবার নাম আজাহার খন্দকার, এই কথা শোনার পর পুরনো প্রতিশোধস্পৃহাটা আবার জেগে উঠেছিলো তার। পরক্ষণেই আবার মনে হলো এই যে মনসুর কোথাও নেই, অথচ আছে, এর চেয়ে বড় প্রতিশোধ আর কী হতে পারে! তবে হানিফকে নিয়ে বড়ই চিন্তিত তোরাব আলী লস্কর। এই ছেলেটার বুদ্ধি কম হলেও সে বেপরোয়া, দুঃসাহসী। আর নির্বোধ দুঃসাহসীরা সবসময়ই ক্ষতিকর ও ভয়ংকর হয়। এইজন্য তিনি জোহরাকে একটু সামলে রাখতে চান। মনসুরকেও। কখন কী হয়ে যায় বলা যায় না। তা ছাড়া চরেরও একটা নিয়ম-কানুন আছে। তিনি চাইলেই ইচ্ছে মতো সব কিছু করতে পারেন না।

New Pdf download: www.PoragEducation.com + webtalkbd.com

লস্কর চরের আবহাওয়া থমথমে। একটা চাপা উত্তেজনা যেন সবার মধ্যে। তবে বাইরে থেকে তা বোঝা যাচ্ছে না। তোরাব আলীর ধারণা যেকোনো সময় একটা বড় ধরনের ঝড় হবে। এই ঝড়টাকে তিনি ভয় পান। আজ থেকে বহু বহু বছর আগে একবার এমন হয়েছিলো। লস্কররা নিজেদের মধ্যেই ভয়ংকর এক রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েছিলো। তার পেছনে অবশ্য কারণও ছিলো। ডাকাতির মালামাল ভাগাভাগি, অদক্ষ নেতৃত্ব, সিদ্ধান্ত গ্রহণে অদূরদর্শিতা, পারস্পরিক ন্যায্যতায় ঘাটতি, এমন নানান বিষয়। লস্কর চরের সেই দুঃসময়ে ত্রাতা হয়ে এগিয়ে এসেছিলেন তোরাব আলী লস্কর। তারপর সুদীর্ঘ সময়, বিচ্ছিন্ন এই ছোট্ট জনপদটির হাল ধরে রেখেছেন তিনি শক্ত হাতে। কিন্তু শেষ কয়েকবছর ধরেই ভেতরে ভেতরে যে একটা অস্থিরতা ক্রমশই দানা বেঁধে উঠছে, তা তিনি স্পষ্টই টের পাচ্ছিলেন।

আপাতদৃষ্টিতে সবকিছু ঠিকঠাক। কিন্তু তোরাব আলী লস্কর জানেন প্রবল ঝড়ের আগে প্রকৃতি যেমন থমথমে হয়ে ওঠে, এখন ঠিক তাই। বিষয়টি নিয়ে তিনি উদ্বিগ্ন হলেও বাইরে কাউকে কিছু বলেননি। বরং নানাভাবে পরিস্থিতি শান্ত করার চেষ্টা করেছিলেন। এমনকি মনসুরকে যে তিনি চরে নিয়ে এসেছিলেন, সেটাও তার এই চেষ্টারই একটি অংশ। বছর কয়েক আগে কলেরায় একের পর এক লোক মারা গেলো। কিন্তু কেউ কিছু করতে পারলো না। করার ছিলোও না আসলে। চাইলেই বন্দরে, গঞ্জে ছুটে যাওয়া যায় না। দূরত্ব যেমন একটা সমস্যা, তেমনি সমস্যা পুলিশ। বিষয়টি স্বাভাবিকই। কিন্তু সমস্যা বাড়ছিলো নিজেদের মধ্যেই।

তোরাব আলী যেন খানিক উদাসীন হয়ে গিয়েছিলেন চরের নানা বিষয়ে। বিশেষ করে ডাকাতি করতে গিয়ে বিভিন্ন জায়গায় যারা ধরা পড়েছে, তাদের ছাড়িয়ে আনার ব্যাপারে খুব একটা উদ্যোগী হতে দেখা যায়নি তাকে। বরং এক ধরনের অনীহা বা নির্লিপ্ততাই লক্ষ করা গেছে। তোরাব আলী লস্করের মেজো ছেলেকে ফয়জুলকে হারানোর পর থেকেই বিষয়টির শুরু। অনেক চেষ্টা করেও যখন জোহরার বাবা ফয়জুলের কোনো হদিস মিললো না, তখন তীব্র হতাশা আর মানসিক যন্ত্রণার কারণে ক্রমেই ভেতরে ভেতরে ভেঙে পড়েছিলেন তোরাব আলী। যার প্রভাব পড়েছিলো তার কর্মকাণ্ডেও।

সমস্যা হচ্ছে চরের সবকিছুই মূলত এই একজন মাত্র মানুষের সিদ্ধান্তের ওপর নির্ভরশীল। ফলে সেই মানুষটা যখন এমন আত্মকেন্দ্রিক হয়ে যান, তখন তার প্রভাব পড়তে থাকে বাকি সবকিছুর ওপরেই। এই নিয়ে ভেতরে ভেতরে একটা অসন্তোষের শুরু। সেই অসন্তোষ দিনে দিনে আরো বাড়তে থাকে। কারণ বিভিন্ন সময়ে ডাকাতিতে ধরা পড়া লোকজনকে ছাড়িয়ে আনার বিষয়ে তোরাব আলী লস্কর একভাবে উদাসীন হয়েই রইলেন।

বিষয়টি নিয়ে প্রকাশ্যে কথা বললেন কেবল বৃদ্ধ জালালুদ্দিন। তার ধারণা, নিজের ছেলের ব্যাপারে তোরাব আলী লস্করের যে ভূমিকা ছিলো, তা অন্যদের বেলায় ছিলো না। এই ভাবনাটা যে জালালুদ্দিনের একার, তাও না। বরং সামনাসামনি আর কেউ বলতে না পারলেও আড়ালে আবডালে একটা ফিসফিসানি চলছিলোই। একটা অসন্তোষ যেন দানা বেঁধে উঠছিলো। সাথে হতাশাও। আর ঠিক সেই মুহূর্তে জোহরার আবির্ভাব। তার দুর্দান্ত কিছু সিদ্ধান্ত ও কর্মকাণ্ডে স্বাভাবিকভাবেই তোরাব আলী লস্করের প্রতি অন্যদের আস্থার জায়গাটা আরো কমে এসেছিলো। কিন্তু নতুন সমস্যা হয়েছে মনসুর আসার পরে। জোহরার সাথে মনসুরের সম্পর্ক নিয়ে এখন জোহরার প্রতিও এক ধরনের বিরূপ মনোভাব তৈরি হচ্ছে সবার। বিষয়টা জোহরা তেমন না বুঝলেও তোরাব আলী লস্কর ঠিকই টের পাচ্ছেন। শুধু তা-ই না, জব্বার ধরা পড়েছে বছর পেরিয়ে গেলো। এই দীর্ঘ সময় ধরে সে আছে নবীগঞ্জ থানাতেই, অথচ তারপরও তার জন্য এখনো তেমন কিছুই করা গেলো না।

ব্যাপারটা নিয়ে হানিফ অবশ্য খুব সরব হয়েছিলো। জোহরার সাথে বারকয়েক কথাও বলেছিলো, কিন্তু কোনো এক অদ্ভুত কারণে জোহরা এবার আর তেমন আগ্রহ দেখালো না। বরং একটা গা ছাড়া ভাব নিয়ে সে বললো, 'আপনে দাদাজানের লগে কথা কন হানিফ ভাই।'

হানিফ বললো, 'দাদাজানের লগে কথা বলতে পারবো না আমি। তুই বল। দাদাজান আমার কথা শোনে না। তা ছাড়া ছালাম আর ইউনুছ সেইদিন ফির‍্যা আইসা কী কইলো শুনোস নাই?'

New Pdf download: www.PoragEducation.com + webtalkbd.com

'কী কইছে?'

'কইছে, হারাধন নাকি তাগো জানাই দিছে, পুলিশ এইবার আটঘাট বাইন্ধাই থাকবো। পুলিশের উদ্দেশ্য হইছে, আমরা এইবার কিছু করতে গেলেই তারা আমাগো ধরবো। দলবলসহ। জব্বার হইলো তাগো বরশির টোপ।'

জোহরা নির্বিকার ভঙ্গিতে বললো, 'তাইলেতো বিপদ হানিফ ভাই। এই অবস্থায়তো কিছু করন যাইতো না।'

হানিফের বিশ্বাসই হচ্ছিলো না যে জোহরা এ কথা বলছে। জোহরা মজা করছে ভেবে সে হাসিমুখে বললো, 'আমি ভালো কইরাই জানি, একটা বুদ্ধি বাইর করন তোর জন্য কোনো ব্যাপারই না। তুই একটা বুদ্ধি বাইর কর। তারপর তুই আমি আর লগে আরো যাগো যাগো লাগবে, তাগো লইয়া যাই। দাদাজানরে কিছু জানানই লাগবো না। আগেরবারের মতোন। জব্বাররে ছাড়াই আননের পর হইলো দাদাজানে দেখবো। হা হা হা।'

হানিফ খুব উচ্ছ্বসিত। আরেকবার জোহরার সাথে এমন একটা অভিযানে যেতে পারবে ভেবেই সে উত্তেজিত বোধ করছে। জোহরা বললো, 'বিষয়টা অতো সহজ না হানিফ ভাই। আগেরবারতো পুলিশ চিন্তাও করতে পারে নাই। সতর্কও ছিলো না। কিন্তু এইবার তারা আগেভাগেই সতর্ক। তা ছাড়া হারাধন দাদুর লগেও কোনো যোগাযোগ করনের উপায় নাই। এই অবস্থায় যদি আমরা কিছু করি। বলন যায় না, কি হয়? আমরাতো আর জানি না, পুলিশ কী ফাঁদ পাইতা রাখছে!'

জোহরার মুখে এই ধরনের কথা শুনে হানিফ যারপরনাই হতাশ হয়ে গেলো। কথাগুলো জোহরার সাথে যেন যায় না। হানিফের চোখে জোহরা এক দুরন্ত, দুঃসাহসী মানুষ। সেদিন আর কিছু না বললেও এরপর প্রায় রোজই জোহরাকে খোঁচাতে লাগলো সে। কিন্তু জোহরার কাছ থেকে কোনো সাড়া-শব্দ পেলো না। শেষমেশ বাহাদুরকে নিয়ে এসে বলাল। কিন্তু বাহাদুরকে অবাক করে দিয়ে এবার যেন খেপেই গেলো জোহরা। সে বললো, 'সমস্যা কী আপনেগো বাহাদুর ভাই? আপনেরা এত বড় পুরুষ পোলা থাকতে আমার মতন একটা মাইয়া মাইনষের পিছে পিছে ঘুরেতছেন কেন? এগুলান লইয়া আমার লগে সারাক্ষণ ঘ্যানঘ্যান করতেছেন, আপনেগো শরম করতেছে না?'

বাহাদুর হাসতে হাসতে বললো, 'তোর লগে আর শরম কী? তুইতো আমাগো মানুষ। একটা বুদ্ধি বাইর কর।'

জোহরা শেষ অবধি একটা বুদ্ধি বের করেও দিয়েছিলো। সে বললো, 'এক কাম করেন। ছয়-সাতজন মিল্যা যান। তয় সরাসরি ট্রলারে গিয়া নবীগঞ্জে নাইমেন না, দিনে রাইতে যহনই যান, আমার ধারণা নজরে পইড়া যাইবেন। এইহান থেইকা আপনেরা যাইবেন গোবিন্দপুর। সেইখান থেইকা কোনো একটা তাবলিগ জামাতের দলের লগে ভিড়বেন। একবার দাদাজানে কইছিলো, তারা একবার কই

জানি ডাকাতি করতে গিয়া এমন করছিলো। কেউ সন্দেহই করতে পারে নাই। সেই তাবলিগ জামাতের লগে গোবিন্দপুর থেইকা চইলা যাইবেন নবীগঞ্জ। আপনেরা পাঁচ-ছয় জন চেষ্টা করবেন থানার আশেপাশে কোনো মসজিদে থাকনের। কেউ চিন্তাও করতে পারবো না যে আপনেরা লস্করের চর থেইকা গেছেন, আপনেগো উদ্দেশ্য কী!'

পরিকল্পনা শুনে হানিফের মন খারাপ হয়ে গেলো। কারণ এই পরিকল্পনায় জোহরা তাদের সাথে যেতে পারবে না। তবে জোহরার বুদ্ধিতে সে রীতোমতো হা হয়ে গেলো। এত সহজ, সাধারণ, কার্যকর একটা বুদ্ধি, অথচ তাদের আর কারো মাথায়ই এলো না! জোহরা হাসতে হাসতে বললো, 'তার আগে দাড়ি-টাড়ি রাখতে হইবো আপনেগো। বড় জুব্বা, মাথার রুমাল কিনতে হইবো। চোহে সুরমা দিতে হইবো। হা হা হা।'

বাহাদুর বললো, 'লাগলে করবো। বুদ্ধি পছন্দ হইছে। কিন্তু সমস্যা একখানই।'

'কী সমস্যা?'

'না হয় রাইতের আন্ধারে কোনোভাবে জব্বাররে আমরা থানা থেইকা ছুটাইয়াও নিয়া আইলাম। কিন্তু তারপর? আমাগো লগেতো কোনো টলার থাকবো না। তহন আমরা করবো কী?'

জোহরা চিন্তিত গলায় বললো, 'এইটা একখান চিন্তারই কথা। এইটার একটা ব্যবস্থা করতে হইবো। ভাইবা দেহেন কী ব্যবস্থা করন যায়!'

বাহাদুর আর হানিফ ভাবলোও। কিন্তু কোনো উপায় বের করতে পারলো না। তবে তারা গোবিন্দপুর গেলো। গিয়ে দিন কয়েক থেকেও এলো। সমস্যা হচ্ছে ওই সময়ে গোবিন্দপুর থেকে কোনো তাবলিগ জামাতের দলই নবীগঞ্জে যাচ্ছে না। আবার তারা একা একাও যেতে সাহস করলো না। ফলে আবার ফিরে আসতে হলো লস্করের চরেই।

সমস্যাটা হলো এর পরপরই। চরে আসার পর হানিফের হঠাৎই উপলব্ধি হলো, জোহরা কেন এতদিনেও জব্বারের বিষয়ে কোন আগ্রহ দেখায়নি! কিংবা সে কেন তাদের সাথে যেতে চাইছিলো না। এমনকি যে পরিকল্পনাটা সে তাদের দিলো, সেই পরিকল্পনার ধরনটাও এমন ছিলো যে জোহরা তাদের সাথে যেতে পারবে না। এই সবকিছুর মূল কারণ হলো মনসুর। জোহরা আসলে কৌশলে চর থেকে হানিফদের বিদায় দিয়ে মনসুরের সাথে সময় কাটানোর সুযোগ খুঁজছিলো। এবং এই প্রথম হানিফ রীতিমতো দিশেহারা বোধ করতে লাগলো। তাদের বিয়ের বিষয়টি নিয়ে সে তার বাবা আয়নাল হকের সাথে এবার নিজেই কথা বললো। কিন্তু আয়নাল হক বললেন আরো খানিকটা সময় নিতে। কিন্তু হানিফ তখন ভেতরে ভেতরে যেন হয়ে উঠেছিলো আহত, খ্যাপা এক পশু। শুধু জোহরার প্রতি তার অপরিসীম ভালোবাসার কারণেই সেই পশুটাকে সে মুক্ত করতে পারছিলো না।

New Pdf download: www.PoragEducation.com + webtalkbd.com

মনসুর সংক্রান্ত জোহরা এই বিষয়টি বুঝতে পেরেছিলেন তোরাব আলী লস্করও। কিন্তু সবকিছু বুঝেও তার পক্ষে চুপ করে থাকা ছাড়া আর কোনো উপায় ছিলো না। এর কারণ- প্রথমত, জোহরাকে সামলে রাখার ক্ষমতা তার নেই। দ্বিতীয়ত, তোরাব আলী লস্কর নিজেও রয়েছেন একটা বড়সড় দ্বিধার মধ্যে। তার অবচেতন মন চায় মনসুরের সাথে জোহরার কিছু একটা হোক। কিন্তু তার সচেতন মন চায়, এটি না হোক। তিনি স্পষ্ট বুঝতে পারছিলেন, দিনে দিনে লস্করের চরে যে অসন্তোষ আর ক্ষোভ জমে উঠেছে, তা বিস্ফারিত হতে পারে এমন যেকোনো ঘটনায়। কিন্তু কী করবেন তিনি? জোহরাকে সামলানোর ক্ষমতা যেমন তার নেই, তেমনি এতসব শঙ্কার কথা জেনেও তিনি চান জোহরার সাথে মনসুরের কিছু একটা হোক।

তবে এর মধ্যেও জোহরার সাথে একদিন কথা বললেন, ' জোহরা।'

'হুম।' জোহরা তখন মায়াকে নিয়ে খেলছিলো।

'তোরে একখান কথা বলতে চাই।'

'ডাক্তার সাবরে লইয়া?'

'হুম।'

'কও।'

'এইডা কী ঠিক হইতেছে?'

'কোনডা?'

'এই যে ডাক্তারের লগে তুই যা করতেছোস?'

জোহরা হাসলো, 'কই? কিছুতো করি নাই দাদাজান। মায়া আরেকটু বড় হোউক, তারপর করবো। এহন করলে দুইজন সামলাবো কেমনে?'

তোরাব আলী লস্কর আজকাল আর কিছুতেই অবাক হন না। জোহরার এমন সব কথায় তিনি অভ্যস্ত হয়ে গেছেন। তিনি বললেন, 'এইটা লইয়া চরে ঝামেলা হইতে পারে।'

'ক্যান? তুমিইতো এইহানে আমারে বিয়া দিতে চাও নাই? কোনহানে কোন ভালো ব্যাডার লগে না বিয়া দিতে চাইছিলা? তা ডাক্তার সাব কী খারাপনি? চেহারা ভালো, কথা কয় ভালো, বড় বংশ। আবারো শিক্ষিতও। এত ভালো পোলা আর কই পাইবা?'

তোরাব আলী দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলেন, 'তহনতো আর তোর লগে হানিফের বিয়ার কথা হয় নাই। তার ওপরে এই চরে বইসাতো এইগুলান করন যাইবো না। আর সবাই কী ভাববো সেইটা বুঝস না?'

'কী ভাববো? শোনো, একখান বুদ্ধি বাইর করি। ডাক্তারের লগে বিয়া হওনের পর প্রতি বছর বছর বাচ্চা হওয়াবো, বুঝলা? তাইলে ধরো দশ বছরে দশ বাচ্চা। এহন ডাক্তার কী আর চাইবো, তার বাচ্চারা ডাকাইত হোউক? অশিক্ষিত হোউক

চাইবো না। সে তহন কী করবো? সে করবো কী, তার বাচ্চাগো পড়ালেহা শিখাইবো। আদব-কায়দা শিখাইবো। এই ঘটনা করতে গেলে দেখবা, অন্যগো বাচ্চারাও তাগো মতন হওন শুরু করবো। বুঝলা না ব্যাপারটা? বুঝবা কেমনে? তুমিতো স্বার্থপর। খালি নিজের নাতনির কথা ভাবো। পুরা চরের কথাতো আর ভাবো না। হা হা হা। বুদ্ধি কেমন হইছে, কওতো?'

জোহরা হাসছে। তার সেই হাসি। এই হাসির অর্থ তোরাব আলী লস্কর জানেন না। তিনি বিড়বিড় করে বললেন, 'তোর কিছু আমি বুঝি না, তয় এইটা বুঝি সামনে এক মহা বিপদ আইতেছে জোহরা। আর এই বিপদ নিয়া আইবি তুই।'

জোহরা হাসতে হাসতেই বললো, 'ক্যান? তুমিই না কইতা, যত মুশকিল তত আছান? হা হা হা। মনে নাই?'

তোরাব আলী আর কথা বললেন না। তবে এই এত এত বছরের অভিজ্ঞতা থেকে তিনি বুঝতে পারছেন, মনসুরের প্রতি জোহরার এই অনুভূতি আর সব অনুভূতির মতো খেলো নয়, অপাঙক্তেয় নয়, খেয়ালি নয়। বরং হঠাৎ করেই যেন জোহরার সদা অস্থির, সদা রহস্যময় চোখজোড়ায় এক ধরনের স্থৈর্য ভর করেছে। তিনি চান মেয়েটা তার ওই ভয়ংকর দুরন্তপনা, দুঃসাহসী, বেপরোয়া চরিত্র থেকে বের হয়ে এসে মেয়েলি হয়ে উঠুক।

তা জোহরা হয়ে উঠেছেও। বহুকাল পর সে সেদিন অর্ধেক বেলা খাটিয়ে রান্না করলো। মনসুরের জ্বর হয়েছিলো। সেই জ্বর থেকে কেবল সেড়ে উঠেছে সে। দুপুর বেলা আঁচলের তলায় করে সেই খাবার নিয়ে সে মনসুরের কাছে গেলো জোহরা। তারপর বললো, 'খিদা লাগছেনি ডাক্তার সাব?'

মনসুর ম্লান গলায় বললো, 'উহু।'

জোহরা বললো, 'তাইলে এহন খাইবেন না?'

'উহু।'

'ক্যান?'

'ক্ষিধে নেই।'

'খিদা না লাগলেও খাওন লাগবো। এইটারে কয় গুরু মারা বিদ্যা। দাদাজান শিখাইছে। গুরু যা শিখায়, সেই জিনিস দিয়াই গুরুরে মারতে হয়। আপনেইতো শিখাইছেন, জ্বর হইলে খাইতে হইবো। নাইলে শইল দুর্বল। কী, শিখান নাই?'

মনসুর কথা বললো না। সে জোহরার দিকে কাতর চোখে তাকিয়ে রইলো। জোহরা মনসুরের সামনে ভাতের প্লেট, তরকারির বাটি রাখলো। তারপর কঠিন গলায় বললো, 'খাওন শুরু করেন। এই আমি দুয়ার ধারে বইলাম। আপনে না খাওন পর্যন্ত যাইতেছি না। সেইদিন ভাত না খাইয়া জানলা দিয়া বাইরে ফালাই ছেন, যাতে আমি না দেহি। হা হা হা। খুবই অন্যায়। কিন্তু আমি খুশি হইছি। কারণ আপনে আমারে ডর পান, এইটাতে আমি খুশি। এই ডর আসল ডর না। এই ডর হইল অন্য ডর। কী অন্য ডর বুঝছেন?'

New Pdf download: www.PoragEducation.com + webtalkbd.com

মনসুর মাথা নাড়ালো। সে বোঝেনি। জোহরার মুখ যেন খানিক আরক্ত হয়ে উঠলো। সে বললো, 'এই ডরের নাম হইলো ভাবের ডর। ভাব-ভালোবাসার ডর। আপনেতো শেষ ডাক্তার সাব।'

মনসুর কথা বললো না। এই মেয়েকে সে আসলেই ভয় পায়। সেই ভয়ে ভালোবাসা নেই। যা আছে, তার নাম ঝামেলামুক্তি। এ এক নাছোড়বান্দা মেয়ে। সে যা বলবে তা-ই করবে। ফলে তার সাথে মুখোমুখি অবস্থানে না গিয়ে আলগোছে পাশ কাটিয়ে যেতে চায় সে। মনসুরের খাবার দেখেই গা গুলিয়ে আসছে। তারপরও সে প্লেটে ভাত নিলো। জোহরা পাবদা মাছের তরকারি রেঁধেছে। তরকারি দেখে মনে হচ্ছে সুস্বাদু হয়েছে। কিন্তু মনসুর জানে, এই মুখে পৃথিবীর সবচেয়ে সুস্বাদু খাবারও সে খেতে পারবে না। সে একটু ভাত মেখে মুখে দিলো। প্রথমে যেন মনে হলো খেতে পারবে। কিন্তু তারপরই পেট উল্টে বমি চলে এলো তার। জোহরা উঠে এসে মনসুরের সামনে বসলো। তারপর বললো, 'আল্লায় ব্যাডা মানুষ বানাইছে আকামে। এগোর কোনো দরকার আছিলো না দুনিয়াতে। খালি পোলাপান জন্ম দেওনের লাইগ্যা যেই কাম লাগে, ওই এক কাম ছাড়া আর কোন কাম এরা পারে বইলাতো আমার মনে হয় না। আপনে অবশ্য সেইটাও ভালো পারেন কিনা, জানি না। তয় একবার পরীক্ষা কইরা দেখতে হইবো। কী কন ডাক্তার সাব? হা হা হা।'

জোহরা কী অবলীলায় এমন ভয়াবহ সব কথা বলে যায়, মনসুর জানে না। সে মাথা নিচু করে বসে থাকে। জোহরা হাত ধুয়ে এসে ভাতের প্লেটে আরো তরকারি নেয়। মনসুর ঝাল খেতে পারে না, কিন্তু জোহরা ভাতের ভেতর দুখানা আস্ত কাঁচা মরিচ ডলে দেয়। তারপর নলা পাকিয়ে মনসুরের মুখের কাছে ধরে বলে, 'নেন, ঢং বাদ দিয়া হা করেন।'

মনসুর জানে প্রতিবাদ করে লাভ নেই। সে অসহায় দৃষ্টিতে তাকিয়ে হা করে। জোহরা তাকে ভাত খাওয়াতে থাকে। মনসুর খায়। সে জানে না কেন, তার খেতে ভালো লাগে। পলকে জোহরাকেও দেখে নেয় মনসুর। মুহূর্তের জন্য তার মনে হয়, এই মেয়েটাকে সে আগে কোথাও দেখেছে। বহু আগে কোথাও। এখানে আসারও অনেক অনেক আগে। কিন্তু কোথায়? সে জানে না। মনসুরের মাথা কাজ করে না। এই ভাবনায় সে ডুবে থাকে। জোহরার নাকে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে। এলোমেলো চুল। প্রসাধনীবিহীন মুখ। সেই মুখজুড়ে এত মায়া! মনসুরের অকস্মাৎ মনে হয়, ঠিক বহু বহু বছর আগে, সে যখন চার-পাঁচ বছরের এক শিশু, ঠিক তখন এমনই মায়াময় এক মুখ, এমনি আদুরে অভিব্যক্তিতে তাকে মুখে তুলে ভাত খাইয়ে দিতো! মনসুরের খুব অবাক লাগে, তার মার কথা মনে পড়তে থাকে। কত বছর

পর তার মার কথা মনে পড়ে গেলো? কত বছর? মনসুর মনে করতে পারে না। কিন্তু তার বুকের ভেতরটা কেমন হু-হু করে ওঠে। এই চূড়ান্ত বেপরোয়া, নিষ্ঠুর, খামখেয়ালি, পুরুষালি স্বভাবের বুনো মেয়েটার ভেতর এই ছবিটা কী করে দেখলো সে! কী আশ্চর্য!

ভাত খাওয়া শেষে প্রচণ্ড ঝালে মনসুরের দু চোখ বেয়ে দরদর করে পানি পড়তে থাকে। সেই পানি দেখে জোহরা হাসে, 'হা হা হা। আপনের ডাক্তারি বিদ্যা ফেল, দেখলেন? এই ঝালের কারণে ভাত কয়ডা খাইতে পারলেন। নাইলে খাইতে পারতেন না। এইডা হইলো আমগো বিদ্যা। বুঝলেন নি?'

মনসুরের তখন বোঝার অবস্থা নেই। তার তখন ঝালে পাগলপ্রায় অবস্থা। জোহরা অবশ্য তাকে পানি খেতে দিলো। কিন্তু দিশেহারা মনসুর সেই পানি যতটা না খেতে পারলো, তার চেয়ে বেশি সে ফেলে দিলো তার গালে, গলায়, শরীরে। জোহরা কাছে এগিয়ে এলো। তারপর বললো, 'আপনেরতো এহনও মায়'র কোলে থাহন উচিত আছিলো। আপনের ভাব-ভঙ্গিতো দুই বছরের বাচ্চার লাহান। আবার নাকি বিয়াও করছেন। পোলাপানও হইবো। কইছি না, পুরুষ পোলা আর কিছু পারুক আর না পারুক, ওই এক কাম পারবোই। আহেন এই দিকে আহেন।'

জোহরা তার শাড়ির আঁচলে মনসুরের গলা, ঘাড়, মুখ মুছে দিতে থাকলো। মনসুরের নাক বন্ধ হয়ে আছে ঠাণ্ডা জ্বরে। কিন্তু তারপরও তার মনে হলো কী একটা অদ্ভুত মায়াময় সুবাস ক্রমশই তার বুকের ভেতর শিরশির করে ঢুকে যাচ্ছে। তার হঠাৎ মনে হলো জোহরাকে তার কণার মতো লাগছে। যেন অবিকল কণা প্রবল ভালোবাসায় তাকে ছুঁয়ে দিচ্ছে। প্রবল মায়া মাখিয়ে দিচ্ছে তার শরীরে। এখানে তার জন্য রাখা আছে জগতের সকল নির্ভরতা, সকল ভালোবাসা, সবটুকু স্পর্শের আনন্দ। এর তুল্য আর কিছু পৃথিবীতে নেই। সে আচমকা জোহরার হাতখান ধরে ফেললো। তার হাত কাঁপছে। জোহরা মুহূর্তে থমকে গেলো। তারপর মনসুরের চোখে চোখ তুলে তাকালো।

আর সেই প্রথম মনসুরের মনে হলো জোহরার চোখজোড়া কাঁপছে। সেই কম্পমান চোখের ভাষা পড়তে না পারার মানুষ সে নয়। তার আচমকা খুব ভয় হতে লাগলো। মনে হতে লাগলো ওই চোখ আর সে দেখতে চায় না। একবার ওই চোখের মায়ায় আটকে গেলে, সেই মায়া থেকে সে আর কখনোই বের হতে পারবে না। মায়া বড় ভয়ানক এক জাল। এই জালে একবার কেউ আটকে গেলে তার পুরোটা জীবন কেটে যায় সেই জাল ছিন্ন করতে করতে। কিন্তু দিন শেষে দেখা যায়, সেই জালে মানুষ আবার জড়িয়েই পড়েছে। আর কখনোই বের হতে পারে না সে। কিংবা বের হতে চাওয়ার ভান করলেও ভেতরে ভেতরে সে হয়তো আর বের হতে চায়ও না। মনসুর আচমকা জোহরার হাতখানা ছেড়ে দিলো।

New Pdf download: www.PoragEducation.com + webtalkbd.com

মনসুর ভেবেছিলো জোহরা তাকে খুব কটু কিছু বলবে। কিন্তু তাকে অবাক করে দিয়ে জোহরা কোনো কথাই বললো না। বরং চলে গেলো। কিন্তু মনসুর জানলো না, সেই সারাটা দিন নিজের ঘর বন্ধ করে শুয়ে রইলো জোহরা। এমনকি মায়াকেও কাছে আসতে দিলো না। শেষ বিকেলের দিকে বৃষ্টি শুরু হলো, জোহরা বিকেলের সেই চুরি যাওয়া ম্লান আলোয় গিয়ে বসে রইলো বিলের পাশে। তার সামনে বিস্তৃত জলরাশি। সেই জলের বুকে টুপটাপ ঝরে পড়ছে বৃষ্টির ফোটা। তারপর বুদবুদের মতো কিছুক্ষণ ভেসে থেকে আবার মিলিয়ে যাচ্ছে। মিলিয়ে যাওয়া বুদবুদগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে জোহরার নিজেকে হঠাৎ খুব একা লাগতে লাগলো। এই এত এত বছরের জীবনে এই অনুভূতিটা যেন আর কখনোই হয়নি তার। বুকের ভেতর কেমন একটা ব্যথা। সেই ব্যথা খুব আলগোছে কুয়াশার মতো তার সবটা বুক গ্রাস করে নিতে লাগলো। জোহরার মনে হচ্ছে, সেই ব্যথায় তার দম নিতে কষ্ট হচ্ছে। তার হঠাৎ খুব কান্না পেয়ে গেলো। সেই তুমুল বৃষ্টির সন্ধ্যায়, একটা অন্ধকারের মতোন আলোয়, এক চির অচেনা, চির একা, চির অস্পষ্ট এক মেয়ে হঠাৎ কাঁদলো। তার সেই কান্না মিশে যেতে লাগলো বৃষ্টির জলে। সে তার ডান হাতখানা বাড়িয়ে গাল বেয়ে নামতে থাকা অশ্রুর উষ্ণ প্রস্রবণটুকু ছুঁয়ে দিতে চাইলো। আর ঠিক সেই মুহূর্তে তার মনে হলো এই যে হাত, এই হাতে মনসুর নামের মানুষটার স্পর্শ লেগে আছে। ওই স্পর্শটুকু তার এই জীবনে পাওয়া সবচেয়ে ভালোবাসাময়, সবচেয়ে গভীর, সবচেয়ে আরাধ্যতম স্পর্শ। সে সেই স্পর্শটুকু তার গালে, ঠোঁটে, চোখে, মুখে বৃষ্টি আর কান্নার জলের সাথে মেখে নিতে লাগলো।

দেলোয়ার হোসেন খুবই অসহায় বোধ করছেন। বার কয়েক চেষ্টায়ও তিনি কণাকে কিছু বলতে পারেননি। প্রতিবারই শেষ মুহূর্তে গিয়ে তার মনে হয়েছে এই কথা বলা মাত্রই তুলকালাম কাণ্ড ঘটে যাবে। সেই কাণ্ড সামলানো তার পক্ষে সম্ভব নয়। তিনি কণাকে ডেকে বলেছিলেন, 'এতদিন যে নবীগঞ্জ ছিলি, কী করেছিস সারাদিন?'

কণা বললো, 'কী আর করবো? কোন কাজতো নেই। মন-কেও তো কাছে পেতাম না ওখানে। সারাক্ষণ তার দাদার কাছে থাকতো। আর আমি বসে থাকতাম একা একা।'

'কেন? কথা বলার মতো আর কেউ নেই ও বাড়িতে?'

'আর কে থাকবে? কাজের মহিলাগুলো আছে। কিন্তু তাদের সাথে কথা বলতে গেলে তুমি পাগল হয়ে যাবে বাবা।'

'কেন? মঞ্জু ছিলো না?'

'মঞ্জু? আরে, ও তো ব্যস্ত। অল্প ক'দিনেই অনেক বড় হয়ে গেছে।'

'বড় হয়ে গেছে?'

'হুম। সেই ছোট মঞ্জু আর নেই। সারাক্ষণ দোকান, ব্যবসা, কী যে সব করে! অবশ্য ভালোই হয়েছে, এই দায়িত্ব নেয়াটা ওকে শিখতেও হতো। পরিস্থিতি না বদলালে হয়তো আগের মতোই থেকে যেতো। এখন তাও দায়িত্বটা নিতে শিখছে।'

'শিখেছে তাহলে?'

New Pdf download: www.PoragEducation.com + webtalkbd.com

'হ্যাঁ, তাইতো দেখলাম।'

'তাহলেতো ভালোই। বড় হয়েছে, এখনো যদি দায়িত্ব-টায়িত্ব না নিতে পারে তাহলেতো বিপদ। সামনেতো আরো বড় দায়িত্ব নিতে হবে।'

কণা আচমকা বললো, 'কেন, বলোতো বাবা?'

দেলোয়ার হোসেন হাসলেন, 'না এমনিই। মেয়ে বড় হলে যেমন বাপ-মায়ের চিন্তা হয়। তেমনি ছেলে বড় হলেও হয়।'

'মেয়েদেরতো বিয়ে নিয়ে চিন্তা হয়। ছেলেদের কী নিয়ে চিন্তা? দায়িত্ব নেয়া নিয়ে?'

দেলোয়ার হোসেন যেন আলোচনা শুরু করার একটা সুযোগ পেয়ে গেলেন। তিনি বললেন, 'বিয়েওতো দায়িত্বই। ছেলে বড় হলে বিয়ে করাতে হয়। বউ, বাচ্চা, সংসারতো কম দায়িত্ব নয়!'

কণা সহাস্যে বললো, 'কী যে বলো না বাবা? মঞ্জু করবে বিয়ে? ও সেদিনের বাচ্চা ছেলে। আমি ওকে এইটুক দেখেছি!'

দেলোয়ার হোসেন বললেন, 'কী যে বলিস না? এই তখনই না তুই বললি মঞ্জু বড় হয়ে গেছে। অনেক দায়িত্ব নিতে শিখে গেছে।'

কণা শ্রাগ করলো, 'আরে ধুর। তাই বলে বিয়ে! ওইটুকু বাচ্চা একটা ছেলে!'

দেলোয়ার হোসেন বললেন, 'বাচ্চা কীরে! ও তোর চেয়ে আর কবছরের ছোট? এই ধর বছর খানেকের?'

'কী বলছো বাবা!' কণা আঁতকে ওঠা গলায় বললো, 'এক বছরের কেন হবে? কম করে হলেও তিন বছরের ছোট ও। আর তুমিতো দেখি বোকার মতো কথা বলছো, একটা ছেলে আর একটা মেয়ের বয়স সমান হলো?'

'তা হলো না। কিন্তু দায়িত্ব মানুষকে বড়-ছোট করে দেয় বুঝলি? বছরখানেক আগে তুই মঞ্জুর চেয়ে যতটা বড় ছিলি, এখন মঞ্জু তোর চেয়ে ঠিক ততটাই বড় হয়ে গেছে। তুই এখন মঞ্জুর দায়িত্ব নিতে না পারলেও মঞ্জু এখন তোর দায়িত্ব নিতে পারবো।'

কথাটা কেমন কানে লাগলো কণার, 'মঞ্জু কেন আমার দায়িত্ব নিতে যাবে?'

'এটাইতো স্বাভাবিক তাই না? তুই আর মন যদি ও বাড়িতে থাকিস। তোদের দায়-দায়িত্ব তখন কার কাঁধে বর্তাবে? সে তো ওই মঞ্জুর কাঁধেই, তাই না? এমনকি একভাবে মনের বাবার দায়িত্বওতো ওকেই পালন করতে হবে। নিজের ছেলে-মতো মানুষ করতে হবে। ও ছাড়াতো মনের আর কেউ নেই। বেয়াই সাহেব আর কয়দিন? তারপর ভেবে দেখেছিস?'

কণা একটু থমকালো। বাবার কথার মধ্যে কেমন একটা সন্ধির আভাস। যেই বাবা এই দিন কয়েক আগেই তাকে শফিউলের সাথে বিয়ে দেয়ার জন্য পাগল হয়ে উঠেছিলেন, সেই বাবা এখন এসব কী বলছেন! কেমন একটা অজানা অস্বস্তি হচ্ছে

তার। মনে হচ্ছে বাবা কিছু একটা বলতে চাইছেন, কিন্তু সাহস করে বলতে পারছে না। কণা বললো, 'তা মঞ্জুকে কী বিয়ে টিয়ে করাচ্ছো নাকি তোমরা দুজন মিলে?'

দেলোয়ার হোসেন বললেন, 'বেয়াই সাহেব তো তেমনই ইঙ্গিত দিলেন।'

কণা একটু অবাকই হলো, 'সেকথা আমাকে না বলে বাবা তোমাকে বললেন কেন? কী এমন ঘটলো যে তোমাদের দুজনের মধ্যে হঠাৎ আবার এমন খাতির হয়ে গেলো?'

'এটা কী ধরনের কথা হলো?' দেলোয়ার হোসেন যেন একটু রুষ্টই হলেন, 'ওনার সাথে আমার সম্পর্ক, বোঝাপড়া সবসময়ই ভালো ছিলো।'

'এটা বলোনা বাবা', কণা একটু কঠিন গলায়ই বললো, 'তুমি আর মা, নানান সময় ওনার মতো মানুষের সাথে যা করেছো, তা আমার সাথে কেউ করলে, আমি আর কোনোদিন এই বাড়িতে আসতাম না। উনি নেহায়েত ভালো মানুষ আর আমার প্রতি একটা টান আছে বলেই সব সহ্য করেছেন।'

'তা তুইওতো ওনাকে কম ভালোবাসিস না। নাহলে অন্য কোনো মেয়ে যদি হতো, সে এই অবস্থায় শ্বশুর, শ্বশুরবাড়ির প্রতি এমন টান দেখাতো?'

কণা এই প্রশ্নের উত্তর দিলো না। এ কথা সত্যি ওই বাড়িটার প্রতি একটা অদ্ভুত টান তার রয়েছে। সেটার কারণ আজাহার খন্দকারও কম না। সে খুব ভালো করেই জানে, কোনো মেয়ের জন্য এটা সত্যিকার অর্থেই বিশেষ ভাগ্যের ব্যাপার যে অমন একজন শ্বশুর সে পেয়েছে।

দেলোয়ার হোসেন বললেন, 'ও বাড়িতেতো তোর সমবয়সী ওই এক মঞ্জুই। তা মঞ্জুর সাথেতো টুকটাক কথা তোর হতো। কেমন মনে হয়েছে ওকে?'

কণা এবার যেন খানিক বিরক্তই হলো। সে বললো, 'এক কথা বারবার জিজ্ঞেস করছো কেন বাবা? ওর সাথে আমার আলাদা করে কী কথা হবে?'

'না মানে হয় না এমন যে এক বাড়িতে থাকলে একটা বোঝাপড়া তো হয়ই?'

'ওরা মানুষ হিসেবে সবাই-ই ভালো বাবা। মঞ্জুও ভালো ছেলে। আর ওকেতো সেই বাচ্চা থেকে দেখছি...।'

'তুই বারবার সেই একই বাচ্চা বাচ্চা বলছিস! ওর বয়সে কতজন বাবা অবধি হয়ে যায়!'

কণা হঠাৎ হাসলো, 'আমারতো ভাবতেই হাসি পাচ্ছে বাবা, যে মঞ্জু বিয়ে করে বউ নিয়ে ঘুরছে, আবার তার একটা বাচ্চাও আছে। সেই বাচ্চা ওকে আব্বা আব্বা বলে ডাকছে!'

দেলোয়ার হোসেন সেদিন আর কথা বাড়ালেন না। কারণ তিনি বুঝতে পারছেন এই বিষয়টা কণার কাছে উপস্থাপন করাই কঠিন এক কাজ হবে। আর বিয়েতো সেখানে আরো অনেক পরের ব্যাপার। তবে কণার মনের মধ্যে হঠাৎই কেমন একটা তীব্র অস্বস্তিকর অনুভূতি কাজ করা শুরু করলো। বাবার শেষের

New Pdf download: www.PoragEducation.com + webtalkbd.com

দিকের কথাগুলো কেমন যেন ঠেকলো তার কাছে। কেন যেন মনে হলো, বাবা মঞ্জুর বিষয়ে তাকে কিছু ইঙ্গিত করতে চেয়েছেন। আসলেই কী তাই? নাকি সেদিন ওই বাড়িতে কাজের মহিলা দুজনের কথা শোনার পর থেকে সে অবচেতনেই মঞ্জুকে নিয়ে অতিরিক্ত সতর্ক থাকার চেষ্টা করে! সেদিন ঘেন্নায়, লজ্জায়, অপমানে তার সারা শরীর রিরি করে উঠেছিলো। বিষয়টি সে মাথা থেকে তাড়িয়ে দেয়ার চেষ্টা করলেও পুরোপুরি কখনোই পারেনি।

কণা এরপর সারাক্ষণ এই বিষয়টি নিয়েই ভাবলো। দেলোয়ার হোসেন আজকাল মাঝেমধ্যেই মঞ্জুর বিষয়ে কারণে-অকারণে নানান কথা বলার চেষ্টা করেন। এটিও কণা নিতে পারছে না। এ নিয়ে রীতিমতো ত্যক্ত-বিরক্ত সে। কিন্তু বাবাকে কিছু বলতেও পারছে না। আবার এটাও তার বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে যে তার বাবা দেলোয়ার হোসেনের মতো কেউ একজন এমন অশালীন, অশোভন কথা ভাবতে বা বলতে পারেন। মঞ্জুকে সে প্রথম দিন থেকেই ছোট ভাইয়ের মতোই দেখেছে। এবং একটি মেয়ে হিসেবে সে এতটুকু অন্তত বুঝতে পেরেছে যে মঞ্জু তাকে যে সমীহটুকু করে তা পুরোপুরি নিখাদ, নির্ভেজাল। কণার প্রতি তার যা রয়েছে তা অসাধারণ শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার অনুভূতি, স্নেহ ও মমতার সম্পর্ক। হয়তো মঞ্জু নিজেকে খুব একটা প্রকাশ করতে পারে না বলেই কণাকে সে কতটুকু শ্রদ্ধা করে, সম্মান করে তা কখনো বোঝাতে পারেনি।

কণার কথা সত্য। মঞ্জু মানুষ হিসেবে খুব একা। তবে এই একাকীত্ব নিয়ে তার কোন আক্ষেপ নেই। বরং সে বেড়ে উঠেছে এই একাকীত্বে অভ্যস্ত হয়েই। তার শৈশব-কৈশোর কেটেছে মায়ের মমতাহীন এক নিরেট সময়ে। এখানে বাবার স্নেহ হয়তো ছিলো, কিন্তু সেই স্নেহ তার বুকের ভেতরে জলজ স্পর্শ হতে পারেনি। বাবার প্রতিরক্ষামূলক ছায়া হয়তো ছিলো, কিন্তু সেই ছায়া মায়াময় বৃক্ষ হতে পারেনি। সেই মায়াহীন ছায়া আর নিরেট সময় তাকে ক্রমশই অন্তর্মুখী করে তুলেছে। শিখিয়েছে নিজের অনুভূতিগুলোকে কীভাবে বুকের ভেতর চেপে রাখা যায়।

কণা সেখানে খটখটে শুকনো জমিতে হঠাৎই যেন এক পশলা বৃষ্টির মতো। কিন্তু সেই বৃষ্টিটুকু দেখা যায় না, কারণ দীর্ঘ তেষ্টায় তৃষ্ণার্ত মাটি সেই জলটুকু শুষে নেয় হাভাতের মতোন। কণার সহজাত স্নেহ, যত্ন কিংবা মায়াটুকুও মঞ্জু হয়তো তেমন করেই শুষে নিয়েছিলো কিন্তু তা কেউ কখনো খেয়ালই করেনি। মঞ্জুও কাউকে বোঝাতে বা বলতে যায়নি। ফলে কণার কাছে সে কতটা কেমন, তাও জানা হয়নি কারো। এমনকি কণারও না। তবে কণা এটুকু বোঝে, এই ঘরের মানুষগুলো আর দশটা মানুষের চেয়ে আলাদা। তারা বুকের ভেতর একটা নিখাদ ভালোবাসার নদী পুষে রাখে অবচেতনেই। মঞ্জুও তার ব্যতিক্রম নয়।

মঞ্জুকে আজাহার খন্দকার কথাটা বলেছেন এভাবে, 'হ্যাঁ রে মঞ্জু, একখান কথা?'

'জি আব্বা।'

'তোর কাজ কাম কেমন চলে?'

'এইতো ভালোই।'

'কী মনে হয়? সামনে কেমন হইবো?'

'দেখা যাক।'

'তুই একটু বউরে আনতে গেলে পারতি না? এতদিন হইলো গেলো!'

'আপনেতো গেছিলেনই। তা ছাড়া এইহানে এত ঝামেলা!'

'ঝামেলা আজীবনই থাকবো, তারপরও গুরুত্ব বিবেচনা করতে হয়।'

মঞ্জু কথা বললো না। আজাহার খন্দকার বললেন, 'তুই এক কাম কর বউরে গিয়া লইয়ায়।'

মঞ্জু খানিক চুপ করে থেকে বললো, 'আপনেই যান আব্বা।'

'ক্যান তুই গেলে সমস্যা কী? আর আমার এই শইল লইয়া আমি আর কত দৌড়াবো?'

মঞ্জু বললো, 'আমি গেলে ভাবি মনে হয় আইবো না।'

'ক্যান? আইবো না ক্যান? তোর লগে কিছু হইছেনি?' আজাহার খন্দকার যেন হঠাৎ কৌতূহলী হয়ে উঠলেন।

'না কী হইবো?'

আজাহার খন্দকার মঞ্জুকে ছাড়লেন না। তিনি বুঝতে পারছেন, কোনো একটা সমস্যা আছে। এতে অবশ্য তিনি মনে মনে খুশি। কিছু না থাকার চেয়ে কিছু একটা থাকা ভালো। তা যা-ই হোক। তিনি বললেন, 'কী হইছে, আমারে খুইল্যা ক' তো? বউটার মন মেজাজ খারাপ, কহন কী কইরা বসে কওনতো যায় না। এই বাড়িতে তার আর আছে কেডা ক? আমি আর কী? থাকনের মধ্যে আছোস তুই একলা। তার ভালো-মন্দতো সে তোর ধারেই কইবো। তোরও তারে বুঝতে হইবো। বুঝলি? এহন ক, কী হইছে?'

মঞ্জু ইতস্তত করে বললো, 'আপনে যে সেইদিন শাড়ি আনতে বলছিলেন, আমি আনছিলাম। কিন্তু সে শাড়ি নেয় নাই।'

'নেয় নাই!' আজাহার খন্দকার খুবই অবাক হলেন। এতদিনেও মঞ্জু তাকে এই কথা বলেনি। তিনি বললো, 'নেয় নাই ক্যান?'

'সেইটা আমি কেমনে বলবো? আমরেতো কয় নাই। খালি শাড়ি দেওয়ার পর বললো, এখন আমার শাড়ি পরে সেঁজেগুঁজে বেড়ানোর সময় না মঞ্জু! এখন আমার সাদা থান কাপড় পরে স্বামীর জন্য নামাজ রোজা করনের সময়।'

কথা শুনে দুম করে মন খারাপ হয়ে গেলো আজাহার খন্দকারের। মেয়েটা এখনো তার স্বামীকে কী গভীরভাবেই না মনে রেখেছে, ভালোবাসে। কিন্তু ভাগ্য

New Pdf download: www.PoragEducation.com + webtalkbd.com

কেন সহ্য করতে পারলো না? মনসুরের জন্য আজাহার খন্দকারেরও কেমন যেন মন ছটফট করতে লাগলো সেই রাতে! তারপরের কয়েকটা দিন আবার চুপ করে রইলেন আজাহার খন্দকার। মনসুরের কবরের কাছে গিয়ে বসে থাকলেন। দিনরাত কান্নাকাটি করলেন আবার। হয়তো ক্ষমাও চাইলেন। একটা দ্বিধা, দ্বন্দ্ব নিজের মনের ভেতর। সেই দ্বিধা, দ্বন্দ্ব তিনি কাটিয়ে উঠতে পারছিলেন না। তারপর আবার সবকিছু নতুন করে ভাবলেন। কিন্তু ভেবেও এর চেয়ে ভালো আর কোনো উপায় তার মাথায় এলো না। সেদিন মঞ্জুকে ডেকে বললেন, 'কণার লাইগ্যাতো তার বাপে সম্বন্ধ দেখতেছে।'

'সম্বন্ধ দেখতেছে মানে?'

'তারে বিয়া দেওন লাগবো না?'

মঞ্জু যেন আকাশ থেকে পড়লো, 'বিয়া দেওন লাগবে মানে? তারতো বিয়া হইছেই!'

মঞ্জুর এমন সরল ভাবনা দেখে আজাহার খন্দকার ম্লান হাসলেন, 'স্বামী মইরা যাওনের পরতো আর তার বিয়া নাই। সে এহন চাইলেই অন্য কাউরেই বিয়া করতে পারে!'

বাবার কথা মঞ্জুর বিশ্বাস হচ্ছে না। সে আর্তনাদের মতো গলায় বললো, 'আপনে কী বলতেছেন আব্বা। ভাবি করবেন আবার বিয়া? মাথা খারাপ হইছে আপনার? তারে আমি চিনি না?'

আজাহার খন্দকার বললেন, 'সে তো আর করতে চায় না, কিন্তু তার বাপ-মা'রতো মাইয়া লইয়া চিন্তা। এত কম বয়সী এক মাইয়া। তার সামনে পুরা জীবন পইড়া রইছে। তারা বুড়া মানুষ, তাগো কিছু হইলে মাইয়াডা তহন যাইবো কই?'

'যাইবো কই মানে? আমাগো বাড়ি থাকবো। কী কথা কইতেছেন আপনে? এইটাতো এহন তারও বাড়ি।'

আজাহার খন্দকার মঞ্জুর সরলতায় মুগ্ধ হলেও খানিক হতাশও হলেন। ছেলেটা এতদিনেও জীবনের জটিল হিসেব নিকেশগুলো বুঝতে পারেনি। তিনি বললেন, 'জীবন এত সহজ না রে বাজান! জীবন খুব কঠিন। এই বাড়ি আইসা যদি সে থাহে, মাইনষে পাঁচ কথা কইবো। তুই জুয়ান দেওর এই বাড়িতে থাহস। সেও কম বয়সি মাইয়া। মাইনষের কথাবার্তারতো কোনো ঠিক-ঠিকানা নাই। তা ছাড়া, তার বয়স কতো? তার নিজেরওতো একটা জীবন আছে!'

এই কথায় মঞ্জু চুপ করে গেলো। এসবতো সে ভাবেনি! কিন্তু কণার অন্য কোথাও বিয়ে হয়ে যাবে, এই বিষয়টা সে মেনে নিতে পারছে না। মঞ্জু অসহায় গলায় বললো, 'কিন্তু তাই বইলা ভাবির অন্য কোথাও বিয়া হইয়া যাইবো! কী বলেন আব্বা। তাইলে মনের কী হইবো? সে থাকবো কই?'

'এইটাইতো একটা সমস্যা। ওইটুক বাচ্চা, তারেতো মা ছাড়া রাহন যাইবো না।'

মঞ্জু অনেক ভেবে চিন্তে যেন খানিকটা আত্মবিশ্বাস ফিরে পেলো। সে বললো, 'তার বাপ-মা যতই বিয়া দিতে চাক, আমার মনে হয় না কোনভাবেই ভাবিরে রাজি করান যাইবো। তারেতো আমি একটু হইলেও চিনি।'

আজাহার খন্দকার দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'নারে বাজান। অতো সহজ না। সবকিছু চিন্তা কইরা দেখ, আমিও চিন্তা কইরা দেখছি। আমার নিজের মাইয়ার এই দশা হইলে আমি কী করতাম? আমিওতো চাইতাম যে তার ভবিষ্যৎ নিশ্চিন্ত থাকুক, তাই না?'

মঞ্জু এই কথায় চুপ করে গেলো। আজাহার খন্দকার বললো, 'আমি কী কম চেষ্টা করছি, তারে এই বাড়িতে রাহনের? কিন্তু আমি চাইলেইতো হইবো না। বাস্তবতাও দেখতে হইবো।'

'আর কোনো উপায় নাই আব্বা?' মঞ্জু যেন অসহায়, বেপরোয়া ভঙ্গিতে কথাটা বললো।

আজাহার খন্দকার সুযোগটা হাতছাড়া করলেন না। তিনি বললেন, 'সেইটাই ভাবতেছি, আর কোনো উপায় আছে কিনা! তার ভবিষ্যৎও নিশ্চিন্ত হইলো আবার এই বাড়িতেও থাকতে পারলো, ছেলেটারও কোনো অযত্ন হইলো না।'

মঞ্জু অনেক ভাবলো, কিন্তু কোনো পরিপূর্ণ সমাধানে আসতে পারলো না। শেষমেশ সে বাবাকে বললো, 'কিছুইতো মাথা আসতেছে না আব্বা?'

আজাহার খন্দকার খানিক চুপ থেকে বললেন, 'আমার মাথায় একটা বুদ্ধি আছে, কিন্তু সেইটাতে সে রাজি হইবো কিনা আমি জানি না। মনে হয় না রাজি হইবো।'

'কী বুদ্ধি?'

আজাহার খন্দকার চট করে কথাটা বলে ফেললেন, 'ধর, সে এই বাড়ির বউ হইয়াই থাকলো?'

মঞ্জু চিন্তিত ভঙ্গিতে বললো, 'সেতো এই বাড়ির বউই!'

'না, মানে ধর, নতুন কইরা সে এই বাড়ির বউ হইয়া আইলো?'

মঞ্জু কিছু বলতে গিয়ে আচমকা চুপ করে গেলো। তার ধারণা এতক্ষণে সে ঘটনা বুঝতে পেরেছে। বাবা কী তার সাথে কণার বিয়ে দেয়ার কথা ভাবছে? কথাটা ভাবতেই মঞ্জুর কেমন গা গুলিয়ে উঠলো। এমন বিশ্রি চিন্তা যে কেউ করতে পারে, তা সে ঘুণাক্ষরেও ভাবতে পারেনি। এবং তাও তার বাবা! আজাহার খন্দকার সম্পর্কে তার সবসময়ই খুব উচ্চ ধারণা। তার ধারণা, এমন সংবেদনশীল মানুষ খুব কম হয়। কিন্তু তিনি যদি সত্যি সত্যিই এমন কিছু ইঙ্গিত করে থাকেন, তবে তা নিঃসন্দেহ জঘন্য একটা ভাবনা। বিষয়টা সারারাত ঘুমাতে দিলো না মঞ্জুকে। একটা কাঁটা যেন বিঁধে রইলো কোথাও। পরের কয়েকটা দিন আর সব কাজের মধ্যেও এই বিষয়টা অনবরত খুঁচিয়ে চললো তাকে। মঞ্জু বিষয়টিকে মাথা

New Pdf download: www.PoragEducation.com + webtalkbd.com

থেকে বের করে দেয়ার চেষ্টা করেও পারলো না। বরং সে এই সমস্যার বিকল্প অসংখ্য সমাধান খোঁজারও চেষ্টা করলো। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, এই বিকল্প সমাধান খুঁজতে গিয়েই মঞ্জু নিশ্চিত হয়ে গেলো যে তার বাবা তাকে এই ইঙ্গিতই করেছেন। কারণ, এতদিন ভেবে-চিন্তে তার এটাই মনে হয়েছে যে, এই সমস্যার এর চেয়ে শ্রেয়তর আর কোনো সমাধান আসলে নেই। সবদিক বিবেচনা করলে এই সমস্যা থেকে মুক্তির সবচেয়ে নিরাপদ উপায় হচ্ছে এটাই। কিন্তু কথাটি ভাবতেই তীব্র লজ্জায়, সঙ্কোচে, আড়ষ্টতায় মাটির ভেতর ঢুকে যেতে ইচ্ছে করছে মঞ্জুর। তার ধারণা, এই যে ভাবনাটা তার মাথায় এসেছে, শুধু এ কারণেই এরপর আর কোনোদিন সে কণার সামনেই যেতে পারবে না। চোখ তুলে তাকাতেই পারবে না কণার দিকে।

তার স্পষ্ট মনে আছে, কণা যখন এ বাড়িতে এলো, প্রায়ই মাঝরাতে তার ঘরে যেতো। সে আলো জ্বালিয়ে ঘুমিয়ে পড়তো বলে কণা গিয়ে আলো নিভিয়ে দিয়ে আসতো। গায়ের কাঁথা ঠিক করে দিতো। বইয়ের টেবিল গুছিয়ে ঠিকঠাক করে রাখতো। তার অগোছালো আধোয়া কাপড়গুলো হিসেব করে নিজ থেকেই কেচে দেয়ার ব্যবস্থা করতো। একবার তার জ্বর হলো, কণা সেদিন সারারাত জেগে রইলো তার পাশে। মাথায় জলপট্টি দিলো। জ্বরের মধ্যে বারবার তার গা মুছে দিলো। মুখে ভাত তুলে খাইয়ে দিলো। তার সেই স্পর্শে, সেই যত্নে যে কী অপার ভালোবাসা, স্নেহ, মমতা মিলেমিশে একাকার হয়েছিলো, মঞ্জু তা জানে। সে টের পেতো। হয়তো কখনো কাউকে বোঝাতে সে পারেনি। কিন্তু ওই যত্নটুকু সে ঠিকঠিক টের পেতো। তারপর থেকে তার যা কিছু লাগতো, সে ভাবির ঘরের দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতো। কণা যেন তাকে দেখলেই বুঝতো, কী দরকার মঞ্জুর। সে হাসিমুখে জিজ্ঞেস করতো, 'কী খবর মঞ্জু সাহেবের? পকেট ফাঁকা? টাকা লাগবে?'

মঞ্জু কথা বলতো না। গম্ভীর হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতো। কণা তার ব্যাগ খুলে মঞ্জুকে টাকা দিতো। টাকা পেয়েই ছুট লাগাতো মঞ্জু। কণা হঠাৎ তার শার্টের কলার টেনে ধরে বলতো, 'বাহ, এই হইলো আদব-কায়দার ছিরি? কেউ কিছু দিলে অন্তত কৃতজ্ঞতাতো দেখাতে হয়?'

মঞ্জু কিছু বলতো না। মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকতো। কণা টেবিলের ওপর থেকে চিরুনীটা নিয়ে এসে মঞ্জুর মাথা আঁচড়ে দিতে দিতে তাকে বলতো, 'চুলতো পাখির বাসা হয়ে গেছে মঞ্জু সাহেব। বাবুই পাখির বাসা। বাবুই পাখির বাসার কথা মনে আছে? ওই যে কবিতা আছে না, বাবুই পাখিরে ডাকি বলিছে চড়াই, কুঁড়েঘরে থেকে করো শিল্পের বড়াই? ওই বাবুই পাখির বাসা।'

মঞ্জু কথা বলে না। কিন্তু তার কী যে ভালো লাগে! কণা বলতো, 'এখন ভাব নিয়ে চুল বড় রাখলে চুলের যত্ন করতে জানতে হবে, বুঝলেন স্যার? আর যত্ন করতে না জানলে ঘ্যাচাং। এই যে দেখেন, আমার কাঁচি। ঠিক আছে?'

মঞ্জু ডান দিকে মাথা কাঁত করতো। কণা বলতো, 'স্কুল থেকে তাড়াতাড়ি বাড়ি চলে আসবে। তোমাকে পড়াতে বসাবো।'

কণা বসাতোও। তার প্রতিটি কথায়, আচরণে কেমন এক মমতা মিশে থাকতো। নিখাদ, নির্ভেজাল এক স্নেহ। এই অনুভূতি, এই স্পর্শটুকুর জন্যই সে কারণে-অকারণে নানান অজুহাতে কণার কাছে যেতো।

মঞ্জু আর ভাবতে পারে না। তার সারা শরীর যেন অবশ হয়ে যেতে চায়। কিন্তু তাহলে কী হবে কণার? তার বিয়ে হয়ে যাবে অন্য কারো সাথে। আর তারপর আর সে এই বাড়ির কেউ রইবে না? আর মন? মনের কী হবে? কণার নিশ্চয়ই সেই অন্য ঘরেও ছেলে মেয়ে হবে! মঞ্জুর মাথা আর কাজ করে না। সে কোনভাবেই এই বিষয়টা নিতে পারছে না। কণা অন্য কোন বাড়ির বউ হবে, অন্য কেউ তার স্বামী হবে, সেখানেও তার ছেলে মেয়ে হবে! বিষয়টা ভাবতেই দিশেহারা লাগে তার। রাতের পর রাত সে জেগে থাকে। ঘুমাতে পারে না। ঘুমালেই দুঃস্বপ্ন দেখে। মনসুরের কথা মনে পড়ে। খুব অভিমান হতে থাকে তার মনসুরের ওপর, ভাইয়া এমন করে কেন চলে গেলো? সে কখনো কোনোদিন মনসুরকে বলতে পারেনি। সে তাকে কতটা ভালোবাসে। রোজ রাতে সে ভাইয়ার জন্য কাঁদে। মাঝরাতে উঠে চুপিচুপি একা একা নামাজে দাঁড়ায়। তারপর দু হাতে মোনাজাত তুলে আল্লাহর কাছে কাঁদে, অভিযোগ জানায়। কিন্তু সে চায় না, তার এই কান্না, এই প্রার্থনার কথা কেউ জানুক। কারণ, সে জানে, মানুষের গভীরতম কান্না আর গভীরতম প্রার্থনা হয় একা, নিঃশব্দে, গোপনে। মঞ্জু ঘুমালো ভোরের দিকে। পরদিন দুপুর বেলা আজাহার খন্দকার তাকে ডেকে সরাসরিই বললেন কথাটা। মঞ্জু দাঁড়িয়ে রইলো চুপচাপ। আজাহার খন্দকার তার কাছে কোনো উত্তর চাননি। তিনি একভাবে সিদ্ধান্তই চাপিয়ে দিয়েছেন। বলেছেন, এ ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। তিনি জানেন, আপাতদৃষ্টিতে এটি হয়তো গ্রহণযোগ্য নয়, বরং আপত্তিকর, অশোভন। কিন্তু বাস্তবতা বিবেচনায় এর চেয়ে ভালো কোনো পথও আর খোলা নেই। এখন মঞ্জুই কেবল পারে, এই কঠিন সমস্যা থেকে সবাইকে উদ্ধার করতে। তিনি চান, নিজের পরিবার, সংসার, এতগুলো মানুষের জীবন ও সম্পর্ক রক্ষার জন্য মঞ্জু এই কঠিন কাজটি করবে।

মঞ্জু দাঁড়িয়েই আছে। তার কানের পাশ দিয়ে নেমে আসছে উষ্ণ ঘামের এক সরু প্রস্রবণ!

New Pdf download: www.PoragEducation.com + webtalkbd.com

রাত গভীর। মনসুর বসে আছে অন্ধকারে। বাইরে বৃষ্টি হচ্ছে। সাথে ঝোড়ো হাওয়া। এই ঝড়বৃষ্টির রাতে তার কাঁথা মুড়ি দিয়ে ঘুমিয়ে থাকার কথা ছিলো। কিন্তু সে বসে আছে বাঁশের খুঁটিতে হেলান দিয়ে। খানিক আগে দিয়াশলাইয়ের কাঠি দিয়ে হারিকেন জ্বালানোর চেষ্টা করেছে। কিন্তু লাভ হয়নি। ছনের বেড়ার ফাঁকফোঁকর দিয়ে আসা হাওয়ার ঝাপটায় কাঠি বারবার নিভে গেছে। মনসুরের হাতে একটা বাঁধাই করা মোটা খাতা। সে রোজই এই খাতায় কিছু না কিছু লিখে রাখে। চিঠির মতোন, কবিতার মতোন, একা একা কথা বলার মতোন। কিন্তু আজ কী করে লিখবে? সে হঠাৎ অন্ধকারেই কলমখানা হাতে নিলো। তারপর খাতা খুলে লিখতে শুরু করলো।

'আচ্ছা অন্ধকার কী? মানুষ অন্ধকারকে ভয় পায় কেন? কারণ সে তখন কাউকে দেখতে পায় না, কিচ্ছু দেখতে পায় না। তার মানে মানুষ সব কিছু দেখতে চায়। যত কুৎসিতই হোক, কদাকারই হোক, মানুষ দেখতে চায়। পৃথিবীতে দেখার ইচ্ছের চেয়ে বেশি তীব্র আরো কোনো ইচ্ছে কী মানুষের রয়েছে?'

এই পর্যন্ত লিখে মনসুর থামলো। দীর্ঘ সময় ধরে উত্তরটাও ভাবলো। তারপর আবার লিখলো, *'মানুষ মৃত্যুকে ভয় পায়, কারণ মানুষের ধারণা মৃত্যু মানেই শুরু হবে এক অন্ধকারের জগত। যদি মৃত্যুর পরের জগৎ আলো ঝলমলে হতো, মানুষ দেখতে পেতো, তাহলে মানুষ সম্ভবত এত ভয় পেতো না। তবে মানুষ তার চিন্তাশক্তি দিয়েও কিছুটা অন্ধকার দূরে সরিয়ে রাখতে পারে। আর এইজন্যই সে শৈশবে অন্ধকারকে যতটা ভয় পায়, পূর্ণবয়স্ক অবস্থায় ততটা ভয় পায় না। কারণ পূর্ণবয়স্ক অবস্থায় সে অন্ধকারের আড়ালে কী আছে তা কল্পনায় দৃশ্যমান করে রাখতে পারে। সে জানে এই অন্ধকারের কোথায় কী আছে! কিন্তু শৈশবে তা পারে না। তখন চারপাশের জগতটাকে যতটুকু দেখে নেওয়া সম্ভব হলে তার বাস্তবিক কল্পনাশক্তি গড়ে উঠতে পারতো, ঠিক ততটুকু দেখাদেখি তার পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠে না।'*

মনসুর আবার থামলো। সে জানে না, এই অন্ধকারে সে ঠিকঠাক লিখতে পারছে কিনা! তবে একটা জিনিস সে আবিষ্কার করলো, তার অন্ধকারে থাকতে ভালো লাগছে। শুধু যে আজ ভালো লাগছে তা-ই না। তার প্রায়ই অন্ধকারে থাকতে ভালো লাগে। তখন তার মনে হয়, অন্ধকারে সে যেভাবে কণার সাথে কথা বলতে পারে, কণার কথা ভাবতে পারে, তা সে আলোতে পারে না। আলো যেন তার কল্পনার শক্তিটাকে শুষে নিয়ে যায়। সে অন্ধকারের মধ্যেই চোখ বন্ধ করে ফেললো। যেন কণাকে ভাবতে হলে তার আরো বেশি অন্ধকার দরকার। আর সেই মুহূর্তে তার মনে হলো, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সবচেয়ে গভীরতম সত্য হলো অন্ধকার। এমনকি আলোর চেয়েও গভীর সত্য অন্ধকার। অন্ধকার সদা বিরাজমান। আর আলোকে আনতে হয় অন্ধকার তাড়ানোর জন্য। অথচ গভীরতম অন্ধকার মানুষকে যতটা ডুবিয়ে রাখতে পারে, আলো তা পারে না। অন্ধকার গভীরতম প্রার্থনার সময়। অন্ধকার তীব্র আরাধনার সময়। কান্না সমর্পণের সময়। মনসুর কণাকে দেখতে পাচ্ছে। সে পরে আছে হালকা সবুজ রঙের শাড়ি। তার কোলে একটা শিশু। শিশুটি ছেলে না মেয়ে তা বোঝা যাচ্ছে না। কণা বলছে, 'তোর বাবা নেই বলে আজ আমার এই অবস্থা।'

শিশুটি আধো আধো বোলে বললো, 'কী অবস্থা মা?'

'এই যে এখন তোর জন্য পুকুর পাড়ে বেড়া দিতে হচ্ছে।'

'বেড়া কেন দিতে হচ্ছে?'

'কারণ, এখন তুই হাঁটতে শিখেছিস। কখন একা একা হাঁটতে হাঁটতে এই পুকুরের ভেতর লাফিয়ে পড়বি কে জানে!'

'বাবাভো বলেছিলো আমাকে সাঁতার শিখিয়ে দেবে। সাঁতার শিখিয়ে দিলেতো আর সমস্যা হবে না মা।'

'কখন সাঁতার শেখাবে? সেই সময় তার আছে? একবার বাড়ির বাইরে গেলে আর ফিরে আসার কোনো নাম আছে? সারাদিন কই টইটই করে ঘুরে বেড়ায় কে জানে! আজ বাড়ি আসুক। ছেলে কী আমার একার নাকি, হ্যাঁ? আমি ৯ মাস পেটে ধরে কষ্ট করবো। বড় করবো। খেতে পারবো না, ঘুমাতে পারবো না। আর দিন শেষে বাড়ি এসে সে গাল টিপে দুটা চুমা খেয়ে আদর করে দিবে। ব্যাস, তার দায়িত্ব শেষ, না? আর তুইও গিয়ে লাফিয়ে তার কোলে উঠে যাবি? যেন আমাকে আর চিনিসই না। এ কেমন কথা হলো? হ্যাঁ?'

New Pdf download: www.PoragEducation.com + webtalkbd.com

শিশুটি হাসছে। কণা তাকে ধমক দিয়ে তার হাসি থামানোর চেষ্টা করছে। কিন্তু পারছে না। সে আচমকা পিছে তাকিয়ে দেখলো মনসুর দাঁড়িয়ে আছে। কণা ভারি বিব্রত হলো। এতক্ষণ মনসুর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব কথা শুনেছে! কিন্তু মনসুরকে অবাক করে দিয়ে কণা হঠাৎ বললো, 'কে আপনি? অনুমতি ছাড়া বাড়িতে ঢুকে পড়েছেন!'

মনসুর ভারি অবাক হয়ে গেলো। সে বললো, 'কণা, আমি। আমি মনসুর!'

'আপনি মনসুর হলে আমি কী করবো?'

'তুমি আমাকে চিনতে পারছো না? আমি মনসুর।'

'কোন মনসুর?' কণা হঠাৎ মনসুরের পেছনে দাঁড়ানো কাউকে উদ্দেশ্য করে বললো, 'এই দেখোতো, এই লোক সেই তখন থেকে কী সব বলছে!'

মনসুর পেছন ফিরে তাকালো। অন্ধকারে ঠিক মতো দেখা যাচ্ছে না, তবে মাঝবয়সি এক ভদ্রলোক বাজারের ব্যাগ হাতে এসে দাঁড়িয়েছেন। মনসুর মানুষটাকে চিনতে না পারলেও সে বুঝতে পারছে, এই মানুষটা কণার স্বামী। মনসুরের হঠাৎ মনে হলো তীব্র কনকনে এক হাওয়া এসে তার শরীর কাঁপিয়ে দিচ্ছে। সারা শরীরজুড়ে অবিশ্বাস্য এক হাড় কাঁপানো অনুভূতি। সেই অনুভূতি তাকে স্থির থাকতে দিচ্ছে না। বৃষ্টি শুরু হয়েছে। কনকনে ঠাণ্ডা বৃষ্টির জলে সে ভিজে যাচ্ছে। ঝোড়ো হাওয়ার ঝাপটা এসে লাগছে তার মুখে। প্রচণ্ড শব্দে বাজ পড়লো কোথাও। সেই বাজের শব্দে ঘুম ভেঙে গেলো মনসুরের। তাকিয়ে দেখে পাশের জানালাটা খুলে গেছে। খোলা জানালা পথে হু-হু করে হাওয়া আসছে। হাওয়ার সাথে বৃষ্টির জল। মনসুর অবশ্য নড়লো না। বৃষ্টিতে ভিজতেই থাকলো। তার হাতের খাতাটা উড়ে গিয়ে পড়েছে মেঝেতে। ক্ষণে ক্ষণে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। সেই বিদ্যুতের আলোয় খাতাটা দেখা যাচ্ছে। সে এবার উঠে গিয়ে মেঝেতে বসে পড়লো। এখানে খানিক আড়াল আছে। হারিকেনটা ধরালো সে। তারপর কম্পমান হারিকেনের আলোয় সে লিখলো,

'মনে রেখো, ছিলো কেউ কাছে,
দূরের তারার মতো, আরও দূরে গিয়ে,
এখনো সে আছে।
মনে রেখো, ছিল কেউ পাশে,
কাছের মায়ার মতো, মেঘ হয়ে, দূরের আকাশে।
মনে রেখো, দহনের দিনেও যে ছায়া হয়ে থাকে,
ছুঁয়ে দিও তাকে।
যে হয়েছিল ভোর, অথৈ আদর, নামহীন নদী,
একা লাগে যদি,
মনে রেখো তাকে।'

মনসুরের আচমকা খুব কান্না পেতে লাগলো। আচ্ছা, কণা কী সত্যি সত্যিই কাউকে বিয়ে করে ফেলবে! সে যদি আর কখনো ফিরে যেতে না পারে? যদি তার ফিরে যেতে দেরি হয়ে যায়? তাহলে কী সে গিয়ে দেখবে, কণার অন্য কাউকে বিয়ে করে ফেলেছে! রাতের এই গাঢ় অন্ধকার কাঁপিয়ে দিয়ে মনসুরের হঠাৎ চিৎকার করে উঠতে ইচ্ছে করলো। সে এক ঝটকায় উঠে দাঁড়ালো। তারপর ছুটে গেলো বাইরে। তার পায়ের নিচে প্যাঁচপ্যাঁচে কাদা। মাথার ওপরে অবিশ্রান্ত বর্ষণ। সেই কাদা জলের ভেতর হাঁটু গেড়ে বসে হাউমাউ করে কাঁদতে লাগলো মনসুর। দু হাতে খামচে ধরে মুঠি মুঠি কাদা জল ছুড়ে ফেলতে লাগলো দিকবিদিক। তার কান্নার তীব্র চিৎকার মিশে যেতে লাগলো রাতের গভীর অন্ধকারে, বৃষ্টি আর বজ্রপাতের শব্দের সাথে। মন আর শরীরে জমে থাকা সব ব্যর্থ আক্রোশ, ক্রোধ, ক্ষোভ, কষ্ট সে যেন মিটিয়ে দেয়ার চেষ্টা করলো ওই জল আর কাদায়। যেন এক উন্মত্ত বুনো ছায়া। এক ক্রোধোন্মত্ত হিংস্র প্রাণী। যেন এই জগৎ, এই রাতের অন্ধকার, এই বৃষ্টির জল, এই সৃষ্টি ও সংসার সে এক লহমায় ধ্বংস করে দিতে চায়।

মনসুর সেই কাদা জলের মধ্যেই শুয়ে রইলো দীর্ঘসময়। রাত তখন কত মনসুর জানে না, জলের ভেতর কারো পায়ের শব্দে যেন জেগে উঠলো সে। এমনিতে তার শরীর দুর্বল। উঠে বসতে গিয়ে মাথাটা চক্কর দিয়ে উঠলো। আর সেই মুহূর্তে কথা বলে উঠলো হানিফ, 'ডাক্তার সাব, কই আপনে?'

অন্ধকারে একটা ছায়ামূর্তির মতোন এগিয়ে এলো মনসুরের দিকে। মনসুর ঠাহর করতে পারলো না লোকটা কে! তবে চাপা হলেও পরিষ্কার হানিফের কণ্ঠস্বর শুনতে পেলো সে। বারান্দায় দাঁড়িয়ে সে বললো, 'ঘর থুইয়া এই বৃষ্টি বাদলার মইধ্যে বাইরে ঘুমান কেন ডাক্তার সাব?'

মনসুর কোন জবাব দিলো না। সে ঘটনা বুঝতে সময় নিচ্ছে। খলিল নামের ছেলেটি ফিসফিস করে বললো, 'তাড়াতাড়ি করেন ডাক্তার সাব। আপনেরে দিয়াসি, চলেন।'

মনসুর কিছুই বুঝলো না। সে বললো, 'কই দিয়াসবেন?'

খলিল এই প্রশ্নের জবাব দিলো না। সে মনসুরকে আলতো ধরে দাঁড় করালো। তারপর হানিফকে বললে, 'হানিফ ভাই, আহেন।'

হানিফ বারান্দা থেকে নেমে এলো। তারা দুজন মনসুরকে ঠেলে নিয়ে গেলো বিলের দিকে। সেখানে একখানা ছোট ট্রলার। ট্রলারের গায়ে ছোট একটা নৌকা বাঁধা। মনসুরকে সেই ট্রলারে উঠানো হলো। তারপর উঠে পড়লো হানিফ আর খলিলও। লম্বা একটা লগি দিয়ে ঠেলে ট্রলারটিকে নিয়ে যাওয়া হলো তীর থেকে দূরে। হতভম্ব মনসুর বললো, 'আপনারা আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন?'

New Pdf download: www.PoragEducation.com + webtalkbd.com

হানিফ হাসিমুখে বললো, 'আপনেরে বাড়িতে দিয়া আসি। এইহানে আর কতদিন এমনে পইড়া থাকবেন কন?'

হানিফের কথা বিশ্বাস হচ্ছিলো না মনসুরের। তারপরও যতটা সম্ভব নিজেকে সামলে নিয়ে বললো, 'জোহরা আসেনি? সে পাঠিয়েছে আপনাদের?'

হানিফ বললো, 'সে ছাড়া আর কে পাঠাইবো?'

মনসুর খপ করে হানিফের একটা হাত ধরলো। তারপর আকুতির মতো বললো, 'সত্যি বলছেন হানিফ ভাই?'

হনিফ বললো, 'মিথ্যা বলবো কেন? আপনেরে মিথ্যা বইলাতো আমার কোনো লাভ নাই। জোহরা না কইলে এই ঝড়-বৃষ্টির রাইতে আমি আরামের ঘুম থুইয়া এই ঝামেলা করতে আসি? আপনেই কন?'

মনসুর বললো, 'তাহলে জোহরা একবারতো কিছু বললো না আমাকে!'

'আপনের ওপরে রাগ করছে সে। সে আপনেরে এত ভালো পায়, আর আপনে তারে পাত্তাই দেন না। এই দুঃখে সে আসে নাই।'

মনসুর বুঝতে পারছে না, হানিফ তাকে সত্যি বলছে না, মিথ্যে বলছে। তবে জোহরার পক্ষে সবই সম্ভব। সে সামান্য চুপ করে থেকে বললো, 'হানিফ ভাই, আপনার কাছে আমার একটা অনুরোধ।'

হানিফ বললো, 'কী অনুরোধ?'

'আপনি একবার একটু আমার সাথে জোহরার দেখা করিয়ে দিবেন? আমি আপনার কাছে চির কৃতজ্ঞ থাকবো!'

হানিফ বললো, 'সেইটা কী ঠিক হইবো ডাক্তার সাব? সে বলছে দেইখা চরের সবাইর লগে এত বড় বেইমানিটা আমি করলাম। নাইলে এই কাজ জীবনে কেউ আমারে দিয়া করাইতে পারতো? পারতো না। এহন আবার জোহরার লগে দেহা করতে গেলে যদি কোনো বিপদ হয়। এই এত রাইতে যদি কেউ দেহে, তহন কী হইবো একবার ভাবছেন?'

এই কথায় মনসুর চুপ করে রইলো। জোহরাকে এই জীবনে আর কখানোই সে দেখতে পাবে না? কী অদ্ভুত! কথাটা ভাবতেই বুকের ভেতর কেমন একটা ব্যাখ্যাহীন শূন্যতা অনুভব করতে লাগলো সে। কিন্তু পরক্ষণেই যেন জ্বলোচ্ছ্বাসের মতো ছলকে উঠলো কণার মুখ। সে হানিফকে বললো, 'হানিফ ভাই, আপনাকে একটা কথা বলি?'

'জে ডাক্তার সাব, বলেন।'

'আমি আপনাকে বোঝাতে পারবো না আপনি আমার কতবড় উপকার করছেন। আমি আমার সারা জীবন এই উপকারের কথা ভুলতে পারবো না। এখন থেকে আপনারা যেকোনো সময়ে নবীগঞ্জে আমাদের বাড়িতে...।'

মনসুরকে কথার মাঝখানে থামিয়ে দিয়ে হানিফ বললো, 'বোঝানো লাগবো না। আমি বুঝতে পারছি ডাক্তার সাহেব।'

সে পেছন ফিরে খলিলকে ডাকলো, 'ওই খলিল, এই দিকে আয়।'

খলিল লগি ঠেলা বাদ দিয়ে ট্রলারের মাঝখানে এলো। তারপর আচমকা তার হাতের দড়িটা ছুড়ে মারলো মনসুরের বুক বরাবার। চোখের পলকে দুবার পাক খেয়ে এসে সে মনসুরকে বেঁধে ফেললো। স্তম্ভিত মনসুর অন্ধকারেই তাকিয়ে রইলো তার সামনে দাঁড়ানো হানিফের চোখের দিকে। চমকানো বিদ্যুতের আলোতে সে যেন হঠাৎই আবিষ্কার করলো তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে সাক্ষাৎ এক মৃত্যু। মনসুর কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলো। তার আগেই হানিফ সপাটে চড় বসালো মনসুরের গালে। তারপর বললো, 'অনেক জ্বালাইছেন ডাক্তার সাব। এত জ্বালাইছেন যে সহ্য করতে কষ্ট হইছে। খালি ওই এক জোহরার লাইগ্যা সব সহ্য করছি। কিন্তু আর কতো! সবকিছুরইতো একখান শেষ আছে। আছে না?'

মনসুরের ভয় পাওয়ার কথা ছিলো। কিন্তু হঠাৎ করেই তার যেন ভয় লাগলো না। সে বললো, 'আমাকে খুন করবেন হানিফ ভাই?'

'আপনেরে খুন করনের আমি কেডা? সবই আল্লাহ পাকের হাতে। হাত পাও বাইন্ধা আপনেরে এই বিলের এইহানে ফালাই যাইতে পারি বড়জোর। তারপর মরণ বাঁচন সব আল্লাহর হাতে। কী কস খলিল?'

খলিল হাসলো, 'এক্কেলে খাঁটি কথা হানিফ ভাই। কাইল দিনে সবাই ভাববো আপনে ঝড়-বৃষ্টির রাইতে পলাই যাইতে গিয়া বিলে ডুইব্যা মরছেন। হা হা হা। আমরাও সেইফ, আপনের মরণও সেইফ। হা হা হা।'

খলিলের হাসিতে যোগ দিলো হানিফও। তারা মনসুরকে ধাক্কাতে ধাক্কাতে নিয়ে এলো ট্রলারের কিনারে। হানিফ বললো, 'আপনে লোক খারাপ না ডাক্তার সাব। আপনে লোক ভালো। সমস্যা হইলো গিয়া, দুনিয়াতে খারাপ মানুষ ভালো থাহে, ভালো মানুষ থাহে খারাপ। আপনেরে আপনের দোষে মরতে হইতেছে না, হইতেছে জোহরার দোষে।'

মনসুর কিছু বলতে যাচ্ছিলো! তার আগেই তাকে ধমক দিয়ে চুপ করিয়ে দিলো খলিল। বললো, 'আপনেরে বহুত আগেই হানিফ ভাই খুন করতো। খালি করে নাই, আপনেরে খুন করলে এইডা লইয়া চরে গ্যাঞ্জাম লাগতো। দাদাজানেও খেপতো। আর সবাইও খেপতো। এইজন্য বুদ্ধি বাইর করন লাগছে।'

হানিফ হাসলো, 'আমার মাথায়তো বুদ্ধি সুদ্ধি কম। সবাই কয়। কিন্তু এহন এই বুদ্ধি কেমন হইলো ডাক্তার সাব। কনতো? কাইল দিনের বেলা সবাই গিয়া আমারে ঘুমেরতন ডাইকা তুলবো। কইবো, ডাক্তাররে পাওন যাইতেছে না। তহন

New Pdf download: www.PoragEducation.com + webtalkbd.com

আমি লোকজন লইয়া আপনের লাশ খুঁইজা বাইর করবো নদীরতন। সবাই দেখবো রাইতের আন্ধারে পলাইতে গিয়া ট্রলারেরতন পইড়া মৃত্যু। হা হা হা। বুদ্ধি কেমন ডাক্তার সাব?'

হানিফ হাসছে। তার সাথে হাসছে খলিলও। মনসুর চুপ। সে জানে, তার মৃত্যু আর কয়েক মুহূর্তের ব্যাপার মাত্র। কিন্তু কোনো এক অদ্ভুত কারণে তার কোনো অনুভূতি কাজ করছে না। বরং মনে হচ্ছে, এই যন্ত্রণাদায়ক বেঁচে থাকার চেয়ে মরে যাওয়াই ভালো। কিন্তু তারপরও বুকের ভেতর কোথায় যেন একটা সূক্ষ্ম বেঁচে থাকার আশা। সেই আশার ভেতর কণা। কণার সাথে এই জীবনে আর কখনোই তার দেখা হবে না, এটা বিশ্বাস করতে পারছেন না মনসুর। হানিফ বললো, 'আল্লাহ বিল্লাহর নাম নিলে নিয়া নেন ডাক্তার। সময় কিন্তু শেষ।'

মনসুর হঠাৎ কথা বললো, 'কিন্তু একটা সমস্যা যে হানিফ ভাই?'

'কী সমস্যা?'

'কাল যখন এসে সবাইকে আমার লাশ তুলে দেখাবেন। তখন সবাই দেখবে আমার হাত পা বাঁধা ছিলো।'

মনসুর কথাটা বললো খুবই শান্ত ভঙ্গিতে। কিন্তু তার সেই শান্ত ভঙ্গির কথাতেই হানিফ থমকে গেলো। সে খলিলের দিকে তাকিয়ে বললো, 'ওই খলিল, কথাতো হাচাই? তহন? আর জোহরা আর দাদাজানতো আমারে এমনেই সন্দেহ করে। তহনতো আরো বিপদ।'

খলিল বললো, 'ধুর হানিফ ভাই, আপনে হুদাই চিন্তা করেন। আগে আইসা লাশ তুইলা দড়ি খুইলা ফেলবো। তারপর লোকজনরে দেখাইলেই হইবো!'

মনসুর ত্বড়িৎ জবাব দিলো, 'লাশতো এক জায়গায় থাকবে না। ভেসে কোথায় না কোথায় চলে যাবে। তখন? এমন না যে আপনারাই আমাকে আগেভাগে খুঁজে পাবেন। অন্য কেউওতো তুলতে পারে!'

হানিফের হঠাৎ খুব দুশ্চিন্তা হতে লাগলো। জোহরার কথা ভাবতেই একটা অস্বস্তিকর অনুভূতি ঘিরে ধরলো তাকে। এমন কিছু হলে জোহরা কোনদিনই তাকে বিয়ে করবে না। কেন যেন হানিফের মনের ভেতর কু ডাক ডাকছে। সে অকস্মাৎ খলিলের দিকে তাকিয়ে বললো, 'ওই খলিল, এর বান্ধন খুইল্যা এরে পানিতে ফালা।'

'কী কন হানিফ ভাই? সে সাঁতার জানে না?'

'জানলেও কী আর এহন স্বীকার পাইবো? সমস্যা নাই। এই রাইতের আন্ধারে সে সাঁতরাইয়া যাইবো কই? আর ট্রলারতো আমরা অনেক দূর লইয়া গিয়া ছাইড়া দিবো। সাঁতার জানলেও লাভ নাই।'

খলিল দড়ি খুলে মনসুরকে এনে ট্রলারের গলুইতে দাঁড় করালো। মনসুর কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলো হানিফকে। তার আগেই হানিফের তীব্র লাথির আঘাত টের পেলো মনসুর। রাতের গাঢ় অন্ধকারে সে ছিটকে পড়লো গভীর জলের ভেতর। শেষ মুহূর্তে সহজাত প্রতিক্রিয়ায়ই কিছু একটা আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করলো মনসুর। ট্রলারের গলুইটা যেন একবার তার হাতে বাঁধলোও। সামান্য ধরতে পারলেও হাতে আটকে রাখতে পারলো না। ঝুপ শব্দে সে তলিয়ে গেলো জলে। রাতের আকাশে তখন অবিশ্রান্ত বর্ষণ। সেই বর্ষণ ঝরঝর ঝরে পড়ছে জলের মধ্যে। শব্দগুলো মনসুরের কানের ভেতর খই ফোঁটার শব্দের মতোন বেজে চলেছে। ডুবে যেতে যেতে মনসুরের হঠাৎ মনে হলো, সে কখনো সাঁতার শেখেনি। তার জলে ভয় বলে বাবা অনেক চেষ্টা করেও তাকে সাঁতার শেখাতে পারেননি। হানিফ তাকে দড়িতে বেঁধে জলে ফেললেও কোন সমস্যা ছিলো না। জলের তলায় ডুবে যেতে যেতে মনসুরের প্রচণ্ড কষ্ট হতে লাগলো। তার তখনো বিশ্বাস হচ্ছেনা, এই জীবনে আর কখনোই সে কণাকে দেখতে পাবে না!

New Pdf download: www.PoragEducation.com + webtalkbd.com

কণার সামনে একখানা চিঠি। চিঠিখানা তাকে লিখেছেন তার বাবা দেলোয়ার হোসেন। তার বাবা যে অনেক দূরে কোথাও গিয়েছেন, বিষয়টা এমন না। তিনি মাগরিবের নামাজ পড়তে মসজিদে যাওয়ার আগে তার সামনে চিঠিখানা রেখে গেছেন। বলেছেন পড়তে। কণা চিঠি খুলে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছে। বাবা তাকে চিঠি লিখেছে কেন?

দেলোয়ার হেসেন লিখেছেন, *'মারে, আমি জানি তুই আমাকে খুব খারাপ ভাবছিস। মনে মনে ভাবছিস, তোর সেই আগের বাবাটা আর নেই। আমিও জানি রে মা। কিন্তু কী করবো বল? আমার সামনে যে আর কোনো উপায় খোলা নেই! তোর সামনে বারবার মঞ্জুর প্রসঙ্গ তুলতে আমার যে কী লজ্জা হয়, কী ঘৃণা হয় নিজেকে নিজের, বোঝাতে পারবো না। আল্লাহ কোনোদিন যেন এই কষ্ট কাউকে না দেন। এর চেয়ে বরং বাবা-মা হিসেবে মরে যাওয়া ভালো। আমি সব বুঝি, সব জানি, তারপরও তোর কাছে এই জীবনে এই একটাই চাওয়া আমার। আর কোনোদিন কিছু চাইবো নারে মা। কতই কিছুইতো চাইলাম জীবনে, তোর পরীক্ষা, ভালো ফলাফল, পড়াশোনা। তার কিছুইতো হলো না। তুই মঞ্জুর বিষয়টাতে না বলিস না মা। এ ছাড়া আমার সামনে, আমাদের সামনে আর কোনো পথ খোলা নেই রে মা। বেয়াই সাহেব মঞ্জুর সাথে কথা বলেছেন। এখন তোর সিদ্ধান্তই সব।'*

কণা চিঠি হাতে মূর্তির মতো বসে রইলো। গতরাতে বাবার সাথে তার তুলকালাম হয়ে গেছে। সে বলেছে এই বাড়ি ছেড়ে সে চলে যাবে। বাবাকে দেখলে

তার ঘেন্না হচ্ছে। তারপর থেকে দেলোয়ার হোসেন আবার অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। এতদিন সরাসরি কিছু না বললেও কণা বুঝতে পারছিলো ঘটনা। কিন্তু গতকালই প্রথম সরাসরি মঞ্জুর সাথে তার বিয়ের কথাটা তুলেছিলেন বাবা। আর তারপরই বাড়িতে প্রায় কুরুক্ষেত্র ঘটিয়ে ফেলছিলো সে।

চিঠিটা সামনে নিয়ে দীর্ঘসময় বসে রইলো কণা। বিছানায় শুয়ে আছে মন। মনের চেহারা হয়েছে অবিকল মনসুরের মতো। সে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। কণা উঠে গিয়ে মনের পাশে বসলো। তারপর ট্রাংক থেকে মনসুরের চিঠিটা বের করে আবার বার কয়েক পড়লো। আচ্ছা, মনসুর কী আগে থেকেই জানতো, ওই দেখাই তাদের শেষ দেখা? আর কোনদিন তাদের দেখা হবে না? না হলে সে কী করে লিখলো,

'ঝরা পালকের মতো, ঝরে যদি যাই?
হলুদ পাতার মতো, মরে যদি যাই?
যদি শূন্য এ রাতের মতো হয়ে যাই চুপ?
যদি তোমাকে না ডাকি আর?
তুমি কি তখন এই আমার মতো,
খুঁজে পাবে কাউকে আবার?'

কণার হঠাৎ বুকের ভেতরটা ওলটপালট হয়ে যেতে লাগলো। মনে হতে লাগলো, মনসুর যেন জানতো, সে না থাকলে কণা আবার কাউকে বিয়ে করবে। আর সেজন্যই যেন সে লিখে রেখে গিয়েছিলো, *'যদি তোমারে না ডাকি আর, তুমি কি তখন আমার মতো, খুঁজে পাবে কাউকে আবার?'*

একটা সূক্ষ্ম, ধারালো কিছু একটা যেন বুকের ভেতর গভীর করে ক্ষত করে দিতে থাকলো কণার। ব্যথায় কুঁকড়ে যাওয়া বুক আর তীব্র যন্ত্রণায় প্রায় অসাড় শরীরখানা নিয়ে আর যেন বেঁচে থাকতে ইচ্ছে হচ্ছে না তার। কান্না পাচ্ছে, খুব কান্না পাচ্ছে। কিন্তু সে কাঁদতে চাইছে না। এইটুকু জীবনে আর কত কাঁদবে সে। কণা অবশ্য পারলো না। ঘুমন্ত ছেলেটার বুকের ওপর টপটপ করে ঝরে পড়লো দু ফোঁটা চোখের জল। ওই চোখের জল দু ফোঁটা কণাকে কেমন যেন দিশেহারা করে তুললো। সে হঠাৎ বাবার লেখা চিঠিটার উল্টো পিঠে খসখস করে কী যেন লিখলো। তারপর মনকে কোলে তুলে নিলো। সাথে নিলো তাকে দেয়া আজাহার খন্দকারের একটা ব্যাগ। ব্যাগের ভেতর কিছু নগদ টাকা আছে। আর আছে কিছু গহনা। সে এক কাপড়ে সেই ভর সন্ধ্যাবেলা ঘর থেকে বের হয়ে গেলো। এই বাড়িতে সে আর থাকবে না। শুধু যে এই বাড়িতেই থাকবে না, তা-ই না। সে তার পরিচিত কোনো মানুষের কাছেই আর থাকবে না। সে তার সন্তানকে নিয়ে চলে যাবে দূরে কোথাও। যেখানে কেউ তাদের চিনবে না। তাকে বিয়ে দেয়ার জন্য সকলে উদগ্রিব হয়ে উঠবে না। মনসুরের এই স্মৃতিচিহ্নটুকু নিয়ে সেখানে সে বেঁচে

New Pdf download: www.PoragEducation.com + webtalkbd.com

থাকবে। যেমন করেই হোক বাকিটা জীবন সে বেঁচে থাকবে একদম নিজের মতো করে। কিন্তু কই যাবে কণা?

কণা একবার ভাবলো জসিমদের বাড়িতে গিয়ে জসিমকে ডেকে বলবে তাকে যেন একটু গোবিন্দপুর বাজারে পৌঁছে দিয়ে আসে। কিন্তু তারপর? তারপর কই যাবে সে?

আর জসিম নিশ্চিত করেই তাকে দিয়ে আসবে না। বরং আটকে রাখার চেষ্টা করবে। কণা অবশ্য শেষ অবধি জসিমদের বাড়িতে গেলো না। সে সন্ধ্যা ঘনিয়ে নেমে আসা রাতের অন্ধকারে মন-কে কোলে করে হেঁটে যেতে থাকলো একা। ঠিক এই পথ ধরেই, সে একদিন হেঁটে এসেছিলো মনসুরের সাথে। সারাটা পথ চুপ করে ছিলো সে। ছিলো মনসুরও। তার কী যে ইচ্ছে করছিলো মনসুরের সাথে একটু কথা বলার! ইচ্ছে করছিলো, মনসুর যদি তার হাতটা একটু ধরতে চাইতো! একটুখানি স্পর্শ, একটুখানি শব্দ, একটুখানি অনুভব! কী তীব্র তেষ্টা নিজের ভেতর পুষে রেখে পাশাপাশি হেঁটে গিয়েছিলো দুজন মানুষ। অথচ তারপর তারা হয়ে উঠেছিলো এই পৃথিবীর সবচেয়ে কাছের দুজন মানুষ! কিন্তু আজ? আজ তাদের চেয়ে দূরের বোধ করি আর কেউ নেই।

অদ্ভুত ব্যাপার, কণার মনে হচ্ছে এই অন্ধকারে তার পাশাপাশি হেঁটে যাচ্ছে মনসুর। মনসুর শুধু যে হেঁটেই যাচ্ছে, তাও না। বহু বহুকাল পরে যেন সে তার কাছে এসেছে। কণা যেন মনসুরের গায়ের গন্ধও টের পাচ্ছে। কিন্তু কথা বলতে ভয় হচ্ছে কণার। যদি কথা বলার সাথে সাথেই মনসুর চলে যায়। যদি আর ফিরে না আসে! কণার আচমকা মনে হলো, মনসুর কী তাহলে তার সাথে এতদিন অভিমান করেছিলো? আজ সে যখন সবকিছু ছেড়েছুড়ে তার জন্য ঘর ছেড়ে চলে এলো, আর ঠিক তখনই সে আবার ফিরে এলো! আকাশে ঘনঘন বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। থেকে থেকে মেঘের গর্জনও শোনা যাচ্ছে। যেকোনো সময় বৃষ্টি নামবে। কণার হঠাৎ খুব ভয় করতে লাগলো। সে ফিসফিস করে মনসুরকে ডাকলো, 'আমার তোমার জন্য কষ্ট হয় মনসুর।'

মনসুর কথা বললো না। কণা বললো, 'তুমি একটু আমার সাথে কথা বলবে? একবার? একবার মাত্র কথা বলবে মনসুর?'

মনসুর তাও কথা বললো না। কণা বললো, 'মনসুর! তুমি আমাকে এত কষ্ট কেন দিলে মনসুর? আমাকে এত কষ্ট দিয়ে তুমি কেন চলে গেলে! তুমি কী জানো, এই কষ্টের চেয়ে মরে যাওয়া অনেক ভালো। তুমি জানো মনসুর? তুমি জানো?'

মনসুর তাও চুপ। কণার যে কী কান্না পাচ্ছে! মনসুর তার সাথে কেন কথা বলছে না? সে সেই নিঃসঙ্গ একা অন্ধকারের পথে ঘুমন্ত সন্তানকে কোলে নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে কাঁদতে লাগলো। আর সেই কান্না জড়ানো গলায় ডাকতে লাগলো, 'মনসুর? ও মনসুর। মনসুর। একবার একটু আমার কথা শোনো। একবার। মনসুর,

আমার আর বাঁচতে ইচ্ছে করে না মনসুর। আমার মরে যেতে ইচ্ছে করে। আমার মনে হয়, মরে গেলে অন্তত তোমার কবরটার পাশে গিয়ে আমি শুয়ে থাকতে পারতাম। আচ্ছা, তখন কী তোমার সাথে আমার কথা হতো না মনসুর? দেখা হতো না? জীবিত মানুষ না হয় মৃত মানুষের ভাষা বোঝে না। কিন্তু মৃত মানুষও কী মৃত মানুষের ভাষা বুঝতে পারে না? নিশ্চয়ই পারে। মনসুর, ও মনসুর। আমার সাথে একটু কথা বলো। একটু। একটুখানি।'

মনসুর চুপ। কণার পাগলের মতো লাগতে থাকে। এই গভীর অন্ধকারে তার নিজেকে অশরীরী এক মানুষ মনে হয়। মনে হয় সে হেঁটে যাচ্ছে ছায়ার মতো। তার কোনো ওজন নেই, শক্তি নেই, উদ্দেশ্য নেই, গন্তব্য নেই। সে কেবল হেঁটে যাচ্ছে আর হেঁটে যাচ্ছে। এই পথের কোনো শেষ নেই। সে চায়ওনা, এই পথের শেষ হোক। সে চায় এই পথ হোক অনন্ত। সেই অনন্ত পথেও কোথাও না কোথাও মনসুরের সাথে তার নিশ্চয়ই দেখা হয়ে যাবে। সে আবারো মনসুরকে ডাকলো, 'আমি তোমার কাছে চলে আসতাম জানো? আমি মরেই যেতাম। তোমাকে ছাড়া আমি থাকতে পারি না। একটা মুহূর্তও না। আমার দম বন্ধ হয়ে আসে। কিন্তু আমি কেন পারি না জানো? মন-এর জন্য পারি না। ওকে আমি কার কাছে রেখে আসবো। মনসুর। আমি তোমাকে আর কখনো আসতে বলবো না। এই শেষবার। এই একটিমাত্র বার তুমি একটু আমার সাথে কথা বলবে? মনসুর। মনসুর।'

প্রবল কান্নায় কণার গলা জড়িয়ে আসে। আর ঠিক সেই মুহূর্তে সে যেন মনসুরের গলার শব্দ শুনতে পায়, 'তুমি কাঁদছো কেন? এইতো আমি কণা।'

'মনসুর!'

'হ্যাঁ বলো?'

'এতক্ষণ তুমি আমার সাথে কেন কথা বলোনি?' কণা ফিসফিস করে বলে। পাছে মনসুর যদি চলে যায়!

মনসুর বললো, 'কেন বলিনি শুনবে?'

'হ্যাঁ বলো?'

'এই যে তুমি আমাকে এতক্ষণ তুমি তুমি করে বলছিলে, আমার শুনতে খুব ভালো লাগছিলো। আমি বেঁচে থাকতেতো কখনো বলোনি!'

কণা চমকে উঠলো, সে কী তাহলে এতক্ষণ মনসুরকে তুমি করে বলছিলো! অনেক চেষ্টা করেও অবশ্য মনে করতে পারলো না কণা। এখন মনসুরের সাথে কথা বলতে তার অস্বস্তি হচ্ছে। এমনতো না যে মনসুর ইচ্ছে করেই এমনটা করছে। সে আসলে কণাকে বোকা বানাতে চাইছে! মনসুর বললো, 'কী হলো, কথা বলছো না কেন?'

কণা ভেবে পেলো না সে কী বলবে! পেছন থেকে একটা তীব্র আলো ছুটে আসছে কণার দিকে। কণা মুহূর্তের জন্য একবার পেছন ফিরে তাকালো।

New Pdf download: www.PoragEducation.com + webtalkbd.com

অন্ধকারের বুক চিরে ছুটে আসছে একটা চোখ ঝলসানো আলো। সাইকেলটা কণার কাছে এসে আচমকা ব্রেক কষতে গিয়ে তাল সামলাতে পারলো না। ছিটকে পড়লো সরু রাস্তার বাইরে ধান ক্ষেতের মধ্যে। সাইকেলে থাকা মানুষটার চিৎকারের শব্দ শুনে কণা চমকে উঠলো, বাবা! পেছনে অবশ্য ততক্ষণে আরো একটা সাইকেল ছুটে এসেছে। সেই সাইকেলে জসিম। মাগরিবের নামাজ থেকে ইচ্ছে করেই দেরি করে বাড়ি ফিরবেন ভেবেছিলেন দেলোয়ার হোসেন। কিন্তু তার আগেই তাকে জরুরি খবর পাঠালেন শাহিনা বেগম। খবর পেয়ে আর এক মুহূর্ত দেরি করেননি তিনি। বাড়ি ছুটে গিয়েছিলেন। শাহিনা বেগমের হাতে তখন কণার চিঠি। সে বাড়ির কোথাও নেই। নেই মন-ও। দেলোয়ার হোসেন আর এক মুহূর্তও দেরি করেননি। তিনি পাগলের মতো ছুটে গিয়েছিলেন জসিমদের বাড়ি। কিন্তু জসিমদের বাড়িতে কণাকে না পেয়ে ছুটেছেন গোবিন্দপুরের উদ্দেশ্যে। তার পেছন পেছন এসেছে জাসিমও। জসিম কাদা জলের ভেতর থেকে দেলোয়ার হোসেন কে ওঠালো। ততক্ষণে বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে। কণাকে দেখে দেলোয়ার হোসেন হাউমাউ করে কেঁদে ফেললেন। তার শরীরের বিভিন্ন জায়গায় জামা কাপড় ছিঁড়ে গিয়ে ক্ষত দেখা যাচ্ছে। তার শরীর কাঁপছে থরথর করে। জাসিমের টর্চের আলোয় কণা বাবাকে দেখে আচমকা ভয় পেয়ে গেলো। এমন বাবাকে সে আগে কখনো দেখেনি। দেলোয়ার হোসেনের চোখে মুখে তীব্র এক আতঙ্ক। তিনি সেই কাদা জল মাখা, ছিন্নভিন্ন জামা কাপড়সহই কণাকে জড়িয়ে ধরলেন। তারপর ভাঙা গলায় বললেন, 'আমি আর কোনদিন তোকে বিয়ের কথা বলবো নারে মা। আর কোনোদিন না। তুই আর কোনোদিন আমাকে ছেড়ে এভাবে কোথাও যাবি না গো মা। নাগো, ও মা, মারে, তুই আর কোনোদিন আমাকে এভাবে রেখে কোথাও যাবি না। আমি মরে যাবো গো মা। তুই আর একবার এমন করলে আমি মরে যাবো। আমার শরীর নিতে পারেনাগো মা। এই যে দেখ, আমার বুকে হাত দিয়ে দেখ। আমার কলিজাটা ছিঁড়ে বের হয়ে আসবেগো মা। এখনই বের হয়ে আসবে। ও মা। মাগো।'

কণাও কাঁদলো। এই জীবনে আর কখনো সে বাবাকে জড়িয়ে ধরে এমন করে কেঁদেছে কীনা কণা জানে না। তবে আজ কাঁদলো। তার সেই কান্নায় যেন শান্ত হলো পিতা আর কন্যার অশান্ত বুক। তারা বাড়ি ফিরলেন গভীর রাতে। গোবিন্দপুরে তখন শুরু হয়েছে তুমুল ঝড়-বৃষ্টি। সাথে মুহুর্মুহু বজ্রপাত। ঝোড়ো হাওয়ায় উল্টে পড়ছে গাছপালা, ঘর বাড়ি। যেন মহাপ্রলয় নেমে এসেছে পৃথিবীতে। শেষ রাতের দিকে অসুস্থ হয়ে পড়লেন দেলোয়ার হোসেন। কণা অপেক্ষা করছিলো ভোরের। যতই ঝড়-বৃষ্টি হোক, পরদিন সকালে সে বাবাকে নিয়ে ডাক্তারের কাছে যাবেই। কিন্তু দেলোয়ার হোসেন সেই সময় কণাকে দিলেন না।

তিনি মারা গেলেন ঠিক ফজরের আজানের সময়।

হানিফ ভেবেছিলো মনসুরের নিখোঁজ হওয়ার খবর শুনে কাতর হয়ে পড়বে জোহরা। কিন্তু ঘটনা দেখা গেলো উল্টো। ভোরবেলা তোরাব আলী লস্করকে গিয়ে খবরটা দিলো খলিল। সে গিয়ে বললো, 'দাদাজান, ডাক্তার সাবরে তো কোনহানে দেহি না।'

তোরাব আলী লস্কর বিষয়টিকে তখনো গুরুত্ব দেননি। তিনি নিস্পৃহ গলায় বললেন, 'আশেপাশেই কোনহানে আছে। খুঁইজা দ্যাখ।'

'না দাদাজান। আমি খুঁজছি, নাই। আর আমাগো একখান ছোট ট্রলারও নাই। তেলের ড্রামসহ।'

তোরাব আলী লস্কর হঠাৎ গর্জে উঠলেন, 'কী!'

'জে দাদাজান!'

তারপরের ঘটনা ছড়ালো খুব দ্রুত। জোহরাকে যখন খবরটা দিলেন তোরাব আলী লস্কর, জোহরা তখন কোনো প্রতিক্রিয়া দেখালো না। সে ঠাণ্ডা গলায় বললো, 'হানিফ ভাই আর খলিলরে ডাকো তো দাদাজান।'

তোরাব আলী লস্কর জোহরার গলা শুনে একটু চমকালেন, 'কিছু হইছেনি জোহরা?'

জোহরা সেই কথার জবাব দিলো না। সে চুপচাপ ঘরে ঢুকে গেলো। ফিরে এলো মিনিট দশেক পর। তার হাতে অর্ধচন্দ্রের মতো উদ্ভট দর্শন তীক্ষ্ণ ধাড়লো এক ছুরি। সে ছুরিখানা তার পেছনে কাপড়ের ভেতর গুঁজতে গুঁজতে তোরাব আলী লস্করকে বললো, 'আমার ধারণা ডাক্তাররে হানিফ খুন করছে।'

New Pdf download: www.PoragEducation.com + webtalkbd.com

তোরাব আলী লস্কর বললেন, 'না জাইন্যা আন্দাজে কথা বলন ঠিক না!'

'আমি আন্দাজে কথা কওনের মানুষ না দাদাজান। তোমারে খলিল কহন আইসা এই খবর দিছে যে ডাক্তারে নাই?'

'বেয়ান বেলা।'

'অত বেয়ানে সে ডাক্তারের খোঁজে গেছিলো ক্যান?'

'সেতো ডাক্তারের খোঁজে যায় নাই, সে গেছিলো টলারের খোঁজে।'

'চরে কী একখান দুইখান টলার যে সে চাইয়া দেইখ্যাই বুইঝ্যা গেলো যে একখান টলার নাই? আর অত বেয়ানে তার টলারের খোঁজ কী দরকার? টলার না দেইখাই সে বুইঝা ফেলাইলো যে ডাক্তার পলাইছে? না ডাক্তাররে ঘরে না দেইখাই বুইঝা ফালাইছে যে টলার লইয়া ডাক্তারে পলাইছে? ডাক্তারেতো ওই সময় বাইরে কোনহানে হাঁটতেও যাইতে পারতো। পারতো না!'

তোরাব আলী লস্কর জবাব দিলেন না। তবে তিনি শঙ্কিত বোধ করছেন। ডাক্তার বেঁচে থাকুক আর মরে যাক, আজ যে লস্করের চরে ভয়ংকর কিছু ঘটতে যাচ্ছে, তা তিনি দিব্য চোখে দেখতে পাচ্ছেন। জোহরা খলিলকে ডাকলো, 'তোরা কী ডাক্তাররে খুন করছোস?'

জোহরার কথা শুনে খলিল হতভম্ব হয়ে গেলো, 'ডাক্তাররে কই পামু আমরা?'

জোহরা আচমকা কষে চড় বসালো খলিলের গালে। হতভম্ব খলিল কিছু বোঝার আগেই চোখের পলকে শাড়ির আড়াল থেকে উদ্ভট দর্শন ছুরি খানা বের করলো জোহরা। তারপর খলিলের গলা বরাবর আড়াআড়ি ধরে ঠাণ্ডা গলায় বললো, 'খলিল, তোর কল্লা আলাদা করতে আমার দুইবার ভাবন লাগবো না!'

খলিল রীতিমতো কেঁদে ফেললো। তোরাব আলী লস্কর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘটনা দেখলেন। ততক্ষণে হানিফ চলে এসেছে। যেন কিছুই হয়নি এমন ভঙ্গিতে জোহরা বললো, 'রাইতে ঘুম কেমন হইছে হানিফ ভাই?'

হানিফ জবাব দিলো না। জোহরা বললো, 'এইরম ঝড় বৃষ্টির রাইতে ঘুমের মইধ্যে আমারে স্বপ্ন দেহেন নাই? মজার স্বপ্ন।'

হানিফ বললো, 'এইগুলান কী কথা জোহরা?'

চারদিকে ততক্ষণে খবর ছড়িয়ে পড়েছে। দলে দলে লোক এসে দাঁড়াচ্ছে তোরাব আলী লস্করের বৈঠকখানার মতো ঘরখানাতে। জোহরা বললো, 'আইজ রাইতে না দেখলেও এর পর হইতে প্রত্যেক রাইতে আপনে আমারে স্বপ্নে দেখবেন। খালি রাইতে না, দিনেও দেখবেন। জাগনা অবস্থায়। সেই ব্যবস্থা আমি করবো।'

হানিফ কিছু বলতে যাচ্ছিলো। তার আগেই তাকে থামিয়ে দিয়ে জোহরা উপস্থিত লোকজনকে উদ্দেশ্য করে বললো, 'কাইল রাইতে হানিফ আর খলিল মিল্যা ডাক্তার সাবরে খুন করছে। আমার কথা বিশ্বাস না হইলে খলিলরে জিগান।

খলিল সব স্বীকার গেছে। সে সাক্ষী। তারা ডাক্তার সাবরে টলারে কইরা বিলের মইধ্যে ধইরা নিয়া গেছে। তারপর পানির মইধ্যে ফালাই দিছে। যাতে আমরা সবাই বুঝি যে সে পলাইতে গিয়া পানিতে পইড়া মারা গেছে।'

উপস্থিত জনতার মাঝে আচমকা গুঞ্জন শুরু হলো। তারা বিশ্বাসই করতে পারছেনা, এই চরের কেউ ডাক্তারের মতো একজন মানুষকে খুন করতে পারে! গত কয়েক বছরে মনসুর তাদের কাছে হয়ে উঠেছিলেন আশীর্বাদের মতন। এই চরের মানুষের মঙ্গল কামনা করে, এমন কারো পক্ষে এই কাজ করার কথা না। ততক্ষণে মায়ার ঘুম ভেঙে গেছে। সে কাঁদতে কাঁদতে এসে জোহরার গা ঘেঁষে দাঁড়ালো। জোহরা মায়াকে দেখিয়ে বললো, 'এই মাইয়াডারে লইয়া আমরা একবার কালীগঞ্জ গেছিলাম, মনে আছে আপনেগো?'

সকলেই সমস্বরে বললো, 'হ।'

জোহরা বললো, 'আমি জোহরা নিজে, আর এইহানে বাহাদুর ভাই আছেন না? ওইযে বাহাদুর ভাই, সে, হানিফ ভাই আর মফিদুল খালি জানি, কোন দোজখ পার কইরা আমরা সেইদিন আইছিলাম। এহন এই ডাক্তার আহনের পর, আপনারাই কন, গত কয়েক বছরে, অবস্থা কী দাঁড়াইছে? আপনেগো কার পোলাপান নাই যারে ডাক্তারে আদর করে না? ভালো-মন্দ দেহে না? কন? কার আছে?'

উপস্থিত জনগণ ক্রমশই যেন ফুঁসে উঠছে। পরিস্থিতি তোরাব আলী লস্কর যা ভেবেছিলেন, তার চেয়েও খারাপ দিকে যাচ্ছে। এই মুহূর্তে এগিয়ে এলেন আয়নাল হক। তিনি বললেন, 'হানিফ যদি ডাক্তাররে খুন কইরাও থাহে, তাইলে তার জইন্য তোর দোষও কম না জোহরা।'

জোহরা হঠাৎ সবাইকে চমকে দিয়ে হা হা হা করে হেসে উঠলো। তারপর বললো, 'ক্যান? ডাক্তারের লগে আমার পিরিতের সম্পর্ক, এইজন্য?'

আয়নাল হক গম্ভীর গলায় বললেন, 'এইটা হাসনের কথা না। চরের মান-ইজ্জতের কথা। তোর লগে হানিফের বিয়া ঠিক, এই কথা সবাই ই জানে!'

জোহরা এবার গম্ভীর হলো। তারপর বললো, 'তো সেইটা কার দোষ? আমার না ডাক্তারের?'

আয়নাল হক কিছু বলতে যাচ্ছিলেন। জোহরা তাকে থামিয়ে দিয়ে বললো, 'ডাক্তারের লগে আমার কিছু নাই। সে বিয়াইত্যা মানুষ। তার বউ-বাচ্চার চিন্তায়ই সে কাতর। সেতো আর আমাগো মতন অমানুষ না! সে মানুষ। এহন দোষ যদি কিছু হইয়াও থাহে, সেইটা আমার। আমার দোষের শাস্তি পামু আমি। আমার দোষে ডাক্তাররে কেন খুন করবো? যে মানুষটা এই চরের শত শত মাইনষের জীবন বাঁচাইছে! হুম?'

New Pdf download: www.PoragEducation.com + webtalkbd.com

জোহরার এই প্রশ্নের উত্তর আয়নাল হকের কাছে ছিলো না। তারপরও সে বললো, 'সবাইতো আর তোর মতন না যে চরের মানুষেরতন বাইরের মানুষের লাইগ্যা মায়া মহব্বত বেশি। সবাই জানে, আমাগো হানিফের তোর লাইগ্যা টান কিরম? কী আপনেরা জানেন না?'

সমবেত জনতার একটা অংশ আয়নাল হকের কথায় সাড়া দিলো। কিন্তু তাদের সংখ্যা কম। তোরাব আলী লস্কর প্রমাদ গুনলেন। যেকোনো সময় বড়সড় রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ ঘটে যেতে পারে। তিনি জোহরা আর আয়নাল হকের মাঝখানে এসে দাঁড়ালেন। তারপর খুব কর্তৃত্বপূর্ণ গলায় বললেন, 'ঝগড়া অনেক হইছে। এইটা নিয়া এত বাড়াবাড়ি করনের কিছু নাই। আগে দেহি, ডাক্তারের অবস্থা কী!'

কিন্তু উপস্থিত মানুষগুলো তোরাব আলী লস্করের কথাকে তেমন পাত্তা দিলো না। বরং দুয়েকজনের মধ্যে কথাকাটাকাটির আভাস পাওয়া যাচ্ছে। একজন আচমকা তার পাশের জনকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়ে অশ্রাব্য ভাষায় গাল দিয়ে বললো, 'তুই বেশি বুঝস হুমুন্দির পুত? জোহরার হুঁশজ্ঞান নাই? হানিফ যা করনের ঠিকই করছে। নিজের বিয়া করা বউ যদি অন্যের লগে ফষ্টিনষ্টি করে তাইলে কারো মাথা ঠিক থাকে!'

মাটিতে পড়ে যাওয়া লোকটাকে এসে একজন টেনে তুললো। তারপর চার-পাঁচজন মিলে তেড়ে এলো আগের লোকটার দিকে। তারা চিৎকার করে তাকে গালাগালি করতে লাগলো। পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠছে। রাতে বৃষ্টিতে জমে থাকা পানি ছাড়িয়ে দিতে কেউ একজন মাটি কাটছিলো। সেই সেই মাটি কাটা কোদাল নিয়ে ছুটে এলো। পরিস্থিতি অবশ্য সামাল দিলেন তোরাব আলী লস্করই। তিনি হঠাৎ বাজখাই গলায় ধমকে উঠলেন, 'আমি কী মইরা গেছিনি ওই শুয়ারের বাচ্চারা! আমি বাইচ্চা থাকতেই আমার চৌক্ষের সামনে বইস্যা তোরা একজন আরেকজনের লগে...।'

যেন লজ্জায়, অপমানে তিনি তার কথা শেষ করতে পারছেন না। তিনি বললেন, 'এহনই যদি এই অবস্থা হয়, তাইলে আমার মরণের পর কী অবস্থা হইবো তোগো? এর চাইতে আমার মইর‍্যা যাওন ভালো। সমস্যা একটা হইছে, সেইটারতো একটা সমাধান বাইর করতে হইবো, নাকি?'

তোরাব আলীর কথায় সকলেই একটু শান্ত হলেও উত্তেজনাটা তাতে কমলো না। তিনি বললেন, 'আগে এক কাম করি। আগে দেহি ঘটনা কী? ডাক্তারের লাশতো আগে খুঁইজা আনি নাকি! তারপর যার যা বিচার হওনের হইবো। এইহানে মুরুব্বীরা আছেন, আমি আছি, একটা না একটা কিছুতো হইবোই। নাকি নিজেরা নিজেরা মারামারি কইরা মরবো, হ্যাঁ?'

উত্তেজনা কিছুটা কমলেও পুরোপুরি থেমে গেলো না। তবে জোহরা হানিফের দিকে তাকিয়ে বললো, 'আপনে আমার লগে আহেন। যা বলবো, সেই মতো কাম

করবেন। উল্টাপাল্টা কিছু করলে, আমি আপনের কিছু করবো না। তয়, নিজেরে নিজে শ্যাষ কইরা দিবো। এই কথা মনে রাইখেন।'

হানিফ গেলো জোহরার সাথে। তারা ট্রলার নিয়ে খুঁজতে বের হলো মনসুরের লাশ। তাদের সাথে সাথে বের হলো আরো কখানা ট্রলার। অবিশ্বাস্য ঘটনা হলো গতরাতে মনসুরকে পাওয়া গেলো জীবিত। জলের মধ্যে একটা বড় হিজল গাছের মাথা ভেসে আছে। সেই হিজল গাছের ডালে জড়সড় ভঙ্গিতে বসে আছে মনসুর। সে এক হাতে আঁকড়ে ধরে আছে হিজল গাছের ডাল। আরেক হাতে আঁকড়ে ধরে আছে লম্বা চওড়া একখানা ভাসমান তক্তা। তক্তাখানা মূলত ট্রলার থেকে নামার সিঁড়ি। মনসুর যখন হানিফের লাথি খেয়ে ট্রলার থেকে জলে পড়ে গেলো, তখন অন্ধকারে কিছু একটা আঁকড়ে ধরতে চাইছিলো সে। ধরতে না পারলেও তার হাতের কিংবা হানিফের পায়ের ধাক্কায় কাঁত করে রাখা সিঁড়িখানাও পড়ে গিয়েছিলো জলে। যখন জলের তলায় ডুবে যাচ্ছিলো সে, তখন প্রাণান্ত চেষ্টা করছিলো ভেসে ওঠার। আর ঠিক সেই মুহূর্তেই তার শরীর বরাবর ধেয়ে আসলো কাঠের সিঁড়িখানা। জোর ধাক্কায় পানিতে ছিটকে পড়েছিলো ভারী সিঁড়িখানাও। তারপর খাড়াখাড়ি অনেকটা দূর অবধি জলের তলায় চলে গিয়েছিলো। তারপর আবার ভেসে উঠতে থাকে জলের ওপরে। ঠিক ওই মুহূর্তে সিঁড়িখানা ধরে ফেলেছিলো মনসুর। ভেসে ওঠা কাঠের সিঁড়িটার সাথে সাথে সেও ভেসে উঠতে থাকে জলের ওপর। হানিফ আর খলিল ততক্ষণে ট্রলার নিয়ে খানিকটা সামনে এগিয়ে গিয়েছিলো। ভয়ে প্রায় মরার মতো পড়ে রইলো মনসুর। তারপর দীর্ঘসময় কেটে গেলে মাথা তুলে তাকালো সে। কিন্তু কোথাও কোনো আলোর সাড়া নেই তখন। হানিফরা ট্রলারখানা কোথায় কতদূর রেখে গেছে তাও জানে না সে। সেই অন্ধকার রাতে আর কিছুই করার রইলো না মনসুরের। কেবল মরার মতো সিঁড়িটাকে জড়িয়ে ধরে ভেসে রইলো সে।

মনসুরকে দেখে কিছু বললো না জোহরা। হানিফও না। তারা প্রায় ডুবন্ত হিজল গাছটার ওপর থেকে মনসুরকে তুলে নিলো। মনসুরের হাত-পা ফ্যাকাশে হয়ে আছে। তার চোখ রক্তবর্ণ। ঠোঁটজোড়া ধবধবে সাদা, রক্তশূন্য। প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় সে কাঁপছে। ট্রলারে তোলামাত্র গভীর ঘুমে তলিয়ে গেলো মনসুর। কিংবা জ্ঞান হারালো। জোহরা উঠে গিয়ে মনসুরের মাথাটা তার কোলে তুলে নিলো। হানিফ একবার তাকালো মাত্র। তারপর চোখ সরিয়ে নিলো জোহরার ওপর থেকে। জোহরা একহাতে আলতো করে ছুঁয়ে আছে মনসুরের গাল। সেই হাতজুড়ে গভীর মমতা, কান্না, কষ্ট কিংবা ভালোবাসা। তার আরেক হাত শক্ত করে ধরে আছে ভয়ালদর্শন একখানা ছুরি। সেই হাতখানা থরথর করে কাঁপছে। যেন প্রবল আক্রোশে কম্পমান সেই হাতখানা খুনের নেশায় উন্মাদ।

জীবিত মনসুরকে ফিরিয়ে আনায় চরের পরিস্থিতি বদলে গেলো। খানিক আগের উত্তপ্ত মানুষগুলো প্রবল কৌতূহল নিয়ে ছুটে গেলো। জোহরা অবশ্য

New Pdf download: www.PoragEducation.com + webtalkbd.com

কাউকে তেমন ভিড় করতে দিলো না। সে সারাদিন ঘুমন্ত মনসুরের পাশে বসে রইলো। মফিদুলের সহায়তায় মনসুরের কাপড় পাল্টে দিলো সে। যতটুকু সম্ভব ধুয়ে মুছে শরীর পরিষ্কার করে দিলো। মনসুর চোখ তুলে তাকালো বিকেলের দিকে। জোহরা তাকে হাতে তুলে ভাত খাইয়ে দিলো। তারপর হঠাৎ মনসুরকে জড়িয়ে ধরে ডুকরে কেঁদে উঠল সে। হতচকিত মনসুর কী করবে ভেবে পেলো না। সব হারিয়ে নিঃস্ব কিংবা সব পেয়ে পরিপূর্ণ হয়ে যাওয়া মানুষের মতো কাঁদলো জোহরা। মনসুর জানে না তার কী করা উচিত। গতকালের ঘটনা থেকে এখনো পুরোপুরি বের হতে পারেনি সে। কিন্তু জোহরা তাকে হতবিহ্বল করে দিয়ে পাগলের মতো চুমু খেতে লাগলো। তার চোখে, মুখে, ঠোঁটে। তারপর আবার জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগলো। মনসুর অগত্যা ডাকলো, 'জোহরা?'

জোহরা জবাব দিলো না। মনসুর আবার ডাকলো, 'জোহরা?'

জোহরা এবার কান্নাজড়িত গলায় জবাব দিলো, 'হুম।'

'এবার তুমি ঘরে যাও।'

জোহরা হঠাৎ সাপের মতো ফোঁস করে উঠলো, 'আপনে ডরান? কারে ডরান? হানিফরে?' সে অকথ্য ভাষায় গাল বকে বললো, 'ওই হানফিরে আমি খুন করবো। ওর শইল থাকবো এক জায়গায়, মাথা থাকবো আরেক জায়গায়। ওরে আমি খুন করবোই। আমারে কেউ ফিরাইতে পারবো না।'

জোহরা কাঁদছে। কিন্তু তার চোখে যেন জল নেই। যা জলের মতো ঝরে পড়ছে, যা জলের মতো দেখায়, যাতে তার চক্ষু ছলছল, তা আসলে এক সমুদ্র তরল আগুন। পরদিন বিচার বসলো হানিফ আর খলিলের। কিন্তু সেই বিচারে কোনো সমাধান হলো না। হানিফের কাজে অনেকেই ক্ষুব্ধ হলেও মনসুর বেঁচে ফিরে আসায় হানিফের অপরাধ যেন গৌণ হয়ে গেলো তাদের কাছে। যেন হাঁফ ছেড়েও বাঁচলো অনেকে। বরং হানিফের এই ভয়াবহ অপরাধটি করার পেছনে কারণ হিসেবে দায়টা চলে এলো জোহরার কাঁধে। জোহরা চুপচাপ সব শুনলো। তারপর বললো, 'আপনেগো কার কার ধারণা, আমি আপনেগো চাইতে কম বুঝি? তাগো মুখগুলান একটু দেখতে চাই আমি।'

জোহরার এই প্রশ্নে যেন নড়েচড়ে বসলো উপস্থিত সবাই। কারণ সকলেই জানে, এই কথা বলা মানে জোহরার মুখোমুখি দাঁড়ানো। কিন্তু জনসম্মুখে তার মুখোমুখি হয়ে অপমানিত হতে চাইলো না কেউই। জোহরা হঠাৎই যেন উন্মাদের মতো হয়ে গেলো। সে চিৎকার করে বললো, 'হানিফ মিয়া যে আমারে বিয়া করবো, বিয়া করলে মরদ মাইনষের বউ সামলাইতে জানতে হয়। ও কী আমারে সামলাইতে পারবো? ওর সেই ক্ষমতা আছে? কন আপনেরা, আছে?'

উপস্থিত জনতার মধ্যে হঠাৎই একটা হাস্যরসের সৃষ্টি হলো। যেন জোহরার এই অগ্নিমূর্তির সামনে হানিফের নুয়ে পড়া সঙ্কুচিত চেহারা দেখে তারা বিমলানন্দ উপভোগ করছে। কিন্তু পুত্রের এমন অপমান সহ্য হলো না আয়নাল হকের। সে

দাঁড়িয়ে বললো, 'এই চরের লাইগ্যা আমার হানিফ এই বয়সে যা করছে, আর কোনো পুরুষ পোলা আছে, সেই কাম করছে? এই চরে জোহরার উপযুক্ত যদি কেউ থাইক্যা থাকে, তাইলে সেইটা আমার হানিফই।'

জোহরা সবার প্রতিক্রিয়া বোঝার চেষ্টা করলো। তাদের মুখভঙ্গি বলে দিচ্ছে আয়নাল হকের কথায় তারা বেশির ভাগই সন্তুষ্ট। জোহরা বুঝলো, সময় থাকতে থাকতেই খেলাটা খেলে ফেলতে হবে। বেশি দেরি করলে বিপদ। সে বুঝে গেছে, হানিফকে এখানে কোন শাস্তি দেয়া যাবে না। তাকে যা শায়েস্তা করার, তা করতে হবে জোহরার নিজেরই। সে ঠাণ্ডা গলায় বললো, 'হানিফ ভাই কোন কামডা করছে, যেইটা আমি ছাড়া সে ঠিকঠাক করতে পারছে? দেহি, একটা নাম কনতো? শোনেন, আমি একটা মাইয়া মানুষ না? পুরুষ মানুষ যদি মাইয়া মাইনষের আঁচলের তলায় থাহে, তাইলে সেই পুরুষ মানুষ দিয়া কোনদিন কিছু হয় নাই। এইটার সবচাইতে বড় প্রমাণ হইতেছে এই হানিফ ভাই।'

জোহরার কথা শুনে উপস্থিত সকলেই এক ধরনের আনন্দ যেমন পাচ্ছে, তেমনি এই কথার সত্যতাও উপলব্ধি করতে পারছে। জোহরা বললো, 'এইজন্যইতো জব্বার ভাই ধরা পড়লো, তারে ছাড়ানোর কোনো ব্যবস্থা হইলো না। কেন হইলো না? জোহরা নাই। এইটা কোনো কথা? এত দামড়া দামড়া বীর পুরুষ থাকতে সবাই খালি জোহরার শাড়ির আঁচল খোঁজে কেন? বাপের ব্যাটা হইলে যা না, গিয়া জব্বার মিয়ারে ছাড়াই লইয়ায়। আইজ কয় বছর হইলো হ্যাঁ? কে কত বড় জুয়ান মর্দ হইছো, প্রমাণ দাও। জোহরাতো কয় নাই, বিয়া করবো না। আগেতো জোহরার স্বামী হওনের যোগ্যতার প্রমাণ দাও। নাকি?'

এক ধরনের বুনো চাপা উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ছে সবার মধ্যে। পরিস্থিতি যে হানিফের প্রতিকূলে চলে যাচ্ছে তা বুঝতে পারছিলো আয়নাল হক। পরিস্থিতি সামাল দিতে সে কিছু বলতে চাইছিলো, কিন্তু তার আগেই হানিফ তাকে থামিয়ে দিলো। তারপর উঁচু গলায় বললো, 'হানিফ বিলাই না, বাঘ। সে মিউমিউ করে অন্য কারণে। সেইটা যদি কেউ না বোঝে, তাইলে হানিফ যে বাঘ, সেইটাই এহন থেইক্যা সবাই দেখতে পাইবো।'

একটু থেমে সদম্ভে নিজের বুকের ওপর বার কয়েক থাবা মেরে হানিফ যেন বাঘের মতোই গর্জন তুলে বললো, 'আমি নিজে জব্বার মিয়ারে ছাড়াই আনতে যাবো। আমি নিজে। জব্বার মিয়ারে না লইয়া আমি আর লস্কর চরে ফিরবো না।'

উপস্থিত সকলে তুমুল হর্ষধ্বনি আর করতালিতে চারপাশ কাঁপিয়ে তুললেও হানিফের বাবা আয়নাল হকের চিন্তিত কপালের গভীর ভাঁজ কেউ খেয়াল করলো না। খেয়াল করলো না জোহরার ঠোঁটের কোণে লেগে থাকা সেই রহস্যময়, বিভ্রান্তিকর মৃদু হাসিটুকুও।

দূরে চুপচাপ বসে আছেন তোরাব আলী লস্কর। এখন যা ঘটবে তা চুপচাপ দেখে যাওয়া ছাড়া আর কিছুই করার নেই তার, এটি তিনি স্পষ্ট বুঝতে পারছেন।

New Pdf download: www.PoragEducation.com + webtalkbd.com

কণা আর মঞ্জুর বিয়ের তারিখ ঠিক হয়েছে। বিয়েতে যে আহামরি কোনো আয়োজন হবে, তা নয়। খুব সাদামাটা ঘরোয়া বিয়ে। এই বিয়ে নিয়ে নানাদিকে নানান ফিসফাস, আলাপ-আলোচনা। আজাহার খন্দকার অবশ্য এসব নিয়ে ভাবছেন না। তিনি ভাবছেন কণা আর মঞ্জুকে নিয়ে। কণা শেষ অবধি বিয়েতে রাজি হয়েছে। দেলোয়ার হোসেনের মৃত্যু যেন কণাকে পুরোপুরি শূন্য করে দিয়েছে। তার ধারণা, বাবার এই মৃত্যুর জন্য পুরোপুরি দায়ী সে নিজে। একটা সুতীব্র অপরাধবোধ তার ভেতরটা কুড়ে কুড়ে খাচ্ছে। প্রতিটি মুহূর্ত ঘুণপোকার মতো তার মগজে কিটকিট করে কামড়ে যাচ্ছে পোকাটা। কণার ধারণা সে একদিন পাগল হয়ে যাবে। অথবা শক্ত দেয়ালে মাথা ঠুকে মাথাটা ফাটিয়ে দেবে। তাতে যদি পোকাটার হাত থেকে সে নিস্তার পায়।

দেলোয়ার হোসেনের মৃত্যুর পর দিন যত গড়িয়েছে, কণা তত তৈরি হয়েছে ভাবনাশূন্য, নিষ্প্রাণ এক মানুষে। মরা বাড়িতে বড় চাচারা এলেন। খালা, ফুপুরা এলেন। আশেপাশের বাড়িগুলোর মুরুব্বীস্থানীয় লোকজন এলেন। তাদের সবরাই একটা মাত্র চিন্তা, কণা! কী হবে কণার এখন? শাহিনা বেগম তখনো পুরোপুরি সংজ্ঞাহীন একজন মানুষ। তাকে নিয়ে দুশ্চিন্তার অন্ত নেই। সেই সময়ে আজাহার খন্দকার কণা আর মঞ্জুর বিষয়টা খুলে বললেন কণার চাচা, খালা, ফুপুদের কাছে। সকলেই একবাক্যে রাজি হয়ে গেলেন। বরং এর চেয়ে শ্রেয়তর আর কোনো উপায় অনেক চিন্তা-ভাবনা করেও তারা খুঁজে পেলেন না।

কণাও অবশ্য আর বাধা দিলো না। ঠিক বাধা দিলো না, তাও নয়। সে কিছু বললোই না। না কাঁদলো, না কথা বললো, না অন্য কিছু করলো। সে হয়ে রইলো

নিষ্প্রাণ পাথরের এক মূর্তি। মাসখানেক পরে বড় চাচি এসে কথা বললেন কণার সাথে। বাবা মারা যাওয়ার পরে সম্ভবত সেদিনই প্রথম কাঁদলো কণা। তার হঠাৎ মনে হলো অন্তত বাবার জন্য হলেও বিয়েটা করবে সে। আচ্ছা, বাবা কী দেখতে পাবেন যে কণা এখন ভালো আছে? তার ভবিষ্যৎ নিয়ে আর তাকে উদ্বিগ্ন হতে হবে না? সে মঞ্জুকে বিয়ে করতে রাজি হয়ে গেছে, অবশেষে একটা গতি হয়েছে তার, এসব দেখতে পাবেন বাবা? মৃত্যুর ওপার থেকে কি মানুষ দেখতে পায়? তাহলে মনসুর? মনসুর কি দেখতে পাবে? এই কথাটা আর ভাবতে পারে না কণা। তার পুরো পৃথিবী ওলটপালট হয়ে যায়। সে তখন তলিয়ে যায় গভীর এক ঘুমে। এক ভাবনাহীন, চিন্তাহীন গভীর ঘুম। কেউ কেউ বলে সে অচেতন হয়ে যায়। কিন্তু এইসব কিছুর বিনিময়েওতো নিশ্চিন্ত নির্ভরতার একটা জীবন হয়ে গেলো মন- এর। এখন আর তার অন্য কোথাও গিয়ে থাকতে হবে না। কণার আর কারো ভ্রুকুটি সহ্য করতে হবে না। আড়ালে-আবডালে আর কারো গা ঘিনঘিনে কথা শুনতে হবে না। আজাহার খন্দকারেরও আর নাতির জন্য হাপিত্যেশ করে মরতে হবে না। নিজ বাড়ির উঠোনে রোজ সকাল, দুপুর, সন্ধ্যাবেলা তিনি একটা ছোট্ট শিশুর মতন খেলাধুলোয় মেতে উঠতে পারবেন নাতির সঙ্গে। এওতো কম কিছু নয়! কণার একটা সিদ্ধান্তের জন্য যদি এতগুলো মানুষের জীবন স্বাভাবিক হয়ে যায়, তাহলে কণা না হয় তার জীবনটা উৎসর্গই করে দিলো।

তবে এর মধ্যে একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটলো। নবীগঞ্জ থানার ওসি মইনুল হোসেন বসেছিলেন পুরনো ফাইলপত্র নিয়ে। সেখান থেকে টুকরো কাগজের একটা প্যাকেট বের হলো। তিনি সেই কাগজের প্যাকেটটা একবার খুলে দেখলেন। ভেতরের কাগজগুলোতে নানান জিনিসপত্রের তালিকা। এসআই একরামুল হককে ডেকে তিনি বললেন, 'এগুলো আমার ফাইলের তাকে কেন? এই বাজারের লিস্ট দিয়ে আমি কী করবো?'

এসআই একরামুল হক কাগজপত্রগুলো দেখে বললো, 'জব্বার যেদিন ধরা পড়েছিলো সেইদিন তার কাছ থেইকা স্যার এইগুলান পাওয়া গেছিলো।'

মইনুল হোসেন বিরক্ত গলায় বললেন, 'এমন ভাবে রাখছেন যেন দেখে মনে হচ্ছে অতি গোপন কোনো ডকুমেন্টস। একটা স্টুপিডের দল আমরা বুঝলেন? পিওর লুজারস। না হলে এইভাবে বছরের পর বছর কীভাবে কেটে যায়?' নিজের হতাশা লুকাতে পারছেন না মইনুল হোসেন।

একরামুল হক বললো, 'এইগুলান কি ফালাই দিবো নাকি স্যার?'

মইনুল হোসেন পুরনো ফাইলে নজর বুলাতে বুলাতে বললেন, 'না ফালাবেন কেন? মালা বানিয়ে গলায় পরে রাখেন। যত্তসব!'

New Pdf download: www.PoragEducation.com + webtalkbd.com

একরামুল হক আর কথা বললেন না। তিনি কাগজের প্যাকেটটা নিয়ে বাইরে চলে গেলেন। তবে তিনি ফিরে এলেন খানিক উত্তেজিত হয়েই। বললেন, 'স্যার, একটা ঘটনা।'

মইনুল হোসেন নিরুত্তাপ এবং বিরক্ত গলায় বললেন, 'কী ঘটনা?'

'এইটা দেখেন।' একরামুল হক তার সামনে একটা কাগজ বাড়িয়ে দিলেন।

মইনুল হোসেন ভ্রু কুঁচকে বললেন, 'এইটা কী দেখবো?'

'দেখেনই না স্যার?'

মইনুল হোসেন রাজ্যের অনাগ্রহ নিয়ে কাগজখানা হাতে নিলেন। বেশ কয়েকবার উল্টেপাল্টে কাগজখানা দেখে তিনি বললেন, 'কী এইটা?'

'দেখতেছেন না স্যার?'

'আরে ভাই, কী দেখবো, একটু স্পষ্ট করে বলা যায় না? এত মেয়ে মানুষের মতো করেন কেন? কী আছে এই কাগজে? ইংরেজিতে কতগুলো ওষুধের নাম লেখা। কিন্তু আপনার ভাব দেখে মনে হচ্ছে এটার মধ্যে কোটি টাকার গুপ্তধন আছে!'

একরামুল হক কিছু মনে করলেন না। বরং তিনি চকচকে চোখে তাকিয়ে বললেন, 'থাকতেওতো পারে স্যার! এই কাগজ ছিলো জব্বারের কাছে। লঙ্করের চরেরতন যে কেনাকাটা করনের লিস্ট সে নিয়া আইছিলো, সেই কাগজের মধ্যে এইখানও ছিলো।'

'তাতে কী!' বলতে গিয়েই থমকে গেলেন মইনুল হোসেন, 'লঙ্করের চরে এই প্রেসক্রিপশন সে কোথায় পাবে? সেখানে কী ডাক্তার আছে নাকি?'

একরামুল হক বিজয়ীর ভঙ্গিতে বললেন, 'সেইটাইতো স্যার। ঘটনা কেমন আজব না!'

মইনুল হোসেন অনেকক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর হঠাৎ বললেন, 'এমনওতো হতে পারে অন্য কোনো জায়গায় রোগী দেখতে গিয়ে প্রেসক্রিপশন নিয়েছিলো ডাক্তারের কাছ থেকে। তখন হয়তো ওষুধ নিতে পারে নি। এইজন্য সময় সুযোগমতো এখান থেকে নিতে চেয়েছিলো।'

একরামুল হক বললো, 'কিন্তু স্যার, সেইটা হইলে এইটা সিল মারা কোনো ডাক্তারের প্যাডে থাকতো। কিন্তু এইটাতো একখান খাতার কাগজ। তার ওপর দেখছেন, পাশে কী লেখা? অমুক ট্যাবলেট দুই কার্টন, তমুক ক্যাপসুল এক কার্টন। এত ওষুধতো আর কেউ প্রেসক্রিপশনে দেয় না। দেয়?'

'হুম।' মইনুল হোসেন গম্ভীর হয়ে গেলেন। একরামুল হকের কথায় যুক্তি আছে। কিন্তু এতে কী প্রমাণ হয়? কিছুই কী প্রমাণ হয় আদতে? এই তথ্য তাদের কী কাজে লাগবে? অনেক ভেবেও কোনো ক্লু খুঁজে পেলেন না মইনুল হোসেন। ঘটনা জানতে হলে জব্বারের সাথে কথা বলে দেখা যেতে পারে। কিন্তু মাস ছয়েক

হয়েছে জব্বারকে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে জেলা কারাগারে। মইনুল হোসেন বিষয়টা নিয়ে দিন তিনেক ভাবলেন। কিন্তু বিষয়টা তাকে কোনো সমাধান দিতে পারলো না। না তিনি এটি নিয়ে কোন গুরুতর সিদ্ধান্তে পৌছাতে পারলেন, না পারলেন পুরোপুরি অগ্রাহ্য করতে। বরং ক্রমশই একটা ধোঁয়াশা, একটা অস্পষ্টতা তৈরি হতে লাগলো।

ঘটনা তিনি জানলেন পরের সপ্তাহের শেষ দিন। অর্থাৎ বৃহস্পতিবার। নুরুন্নবীকে নিয়ে তিনি গেলেন জব্বারের সাথে দেখা করতে। প্রথম থেকেই উল্টাপাল্টা কথা বলতে লাগলো জব্বার। তার কথা শুনে এক অবিশ্বাস্য ঘটনার সম্ভাবনা জেগে উঠতে লাগলো মইনুল হোসেনের মনে। কিন্তু জব্বার পুরোপুরি খুলে না বললে কোনকিছুই নিশ্চিত হওয়া যাচ্ছে না। নুরুন্নবীর দিনভর চেষ্টায় অবশেষে ঘটনা খুলে বললো জব্বার।

নবীগঞ্জ থানার ওসি মইনুল হোসেন খবর শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন! তার মনে হচ্ছে ঘটনা সত্যি না, জব্বার তাদের বিভ্রান্ত করার জন্য ঘটনা বানিয়ে বলছে। এটি তার আরো একটা টোপ। এই টোপ ফেলে সে হয়তো তাদের প্রলুব্ধ করছে লঙ্করের চরে যেতে। না হলে মৃত্যুর প্রায় চার বছর পরে এসে এই কথা বিশ্বাস করার কোনো কারণ নেই যে মনসুর বেঁচে আছে!

কিন্তু ঘটনা পুরোপুরি উপেক্ষা করাও সম্ভব হচ্ছে না। জব্বার ঘটনা যেভাবে বলেছে, খুব বড় মিথ্যেবাদী নাহলে তা অসম্ভব। কিন্তু এখন কী করবেন মইনুল হোসেন? তিনি কী এই ঘটনা আজাহার খন্দকারকে জানাবেন? যদি ঘটনা সত্যি না হয়, তখন? এতবড় আঘাত কী আর তিনি নিতে পারবেন?

পরদিন শুক্রবারটা ভাবার সময় নিলেন মইনুল হোসেন। তিনি আজাহার খন্দকারের বাড়িতে গেলেন শনিবার বিকেলে। কিন্তু সেই বাড়ি থেকে তিনি ফিরে এলেন কিছু না বলেই। মইনুল হোসেনের মনে হলো, এই বাড়িতে জীবিত মনসুরের চেয়ে মৃত মনসুরই বরং এখন অনেক বেশি মঙ্গলময়।

কারণ গতকাল শুক্রবার বাদ জুমা মঞ্জু আর কণার বিয়ে হয়ে গেছে!

New Pdf download: www.PoragEducation.com + webtalkbd.com

হানিফ বসে আছে বাহাদুরের সামনে। বাহাদুর বললো, 'তুই আরেকবার ভাইবা দেখ হানিফ?'

হনিফ ঘোঁত করে শব্দ করলো, 'যা ভাবনের ভাবছি। আর কিছু ভাবনের নাই।'

'তুই জোহরারে চিনস না?'

'চিনি দেইখ্যাইতো! পেছনে অনেক মিনমিন করছি, এইবার নিজের শক্তি দেখাইয়াই আমি তারে ঘরে আনবো। প্রয়োজনে জোর কইরা আনবো। দেখবো তার কত সাহস, কত জেদ।'

'হানিফ, তুই কিন্তু বুঝতেছস না, সে তোর ওপরে একটা ঝাল মিটানির লাইগ্যা সেই দিন ওইগুলান কইছে। ডাক্তারের ঘটনায় সে তোর ওপরে ক্ষ্যাপা। বুঝোস নাই তুই?'

হানিফ বললো, 'আপনের কী ধারণা? তারে ছাড়া এর আগে আমি আর কোনোদিন কোনো কামে যাই নাই? তার কত বড় সাহস, সে কয়, আমি নাকি তার আঁচলের তলায় থাইক্যা থাইক্যা সব করছি! আপনে একবার চিন্তা করছেন বাহাদুর ভাই?'

'আরে গাঁধা, চিন্তা করছি দেইখ্যাইতো কইতেছি, সে চাইছে তোরে খেপাইতে, আর তুইও খেপলি! তুই কী বলদনি?'

হানিফ হঠাৎ ষাঁড়ের মতো ক্ষেপে গেলো। সে তার সামনে দাঁড়ানো বাহাদুরকে আচমকা ধাক্কা মেরে ফেলে দিলো। তারপর লাফ দিয়ে উঠে বসলো

তার বুকের ওপর। তারপর দুহাতে তার গলা চেপে ধরে বললো, 'সাবধান। আর কোনোদিন যদি আমারে আপনে বলদ কইছেন, এক্কেলে জায়গার মইধ্যে খুন কইরা ফালামু। জায়গার মইধ্যে।'

হানিফ এক মুহূর্তও আর সেখানে থাকলো না। ক্ষ্যাপা ষাঁড়ের মতো ফুসতে ফুসতে সে চলে গেলো। জল-কাদায় মাখামাখি বাহাদুর চোখে মুখে অবিশ্বাস নিয়ে তাকিয়ে রইলো হানিফের দিকে। বিকেলে জোহরার সাথে তার দেখা হলো। ঘটনা শুনে জোহরা বললো, 'একখান কথা কই বাহাদুর ভাই, কথাখান শোনবেন?'

'কী কথা?'

'আপনে তার লগে এইবার যাইবেন না। তার নাকি এতই হেডম, তো দেহি, সে এইবার কী করে! বুঝলেন কী কইছি? আর নিজের মাইয়াডার কথা মনে রাইখেন। আপনের কিছু হইলে, এই মাইয়ার কী হইবো?'

বাহাদুর ম্লান হেসে বললো, 'মাইয়ার আর চিন্তা কী? তুইতো আছোসই। তুইইতো এহন মাইয়ার মা-বাপ।'

মায়া কোথা থেকে দৌড়ে ছুটে এলো। বাহাদুর তাকে ধরতে হাত বাড়ালো। কিন্তু সে এসে ঝাঁপিয়ে পড়লো জোহরার কোলের মধ্যে। তারপর ফিসফিস করে বললো, 'মা, মা, মা।'

জোহরা বললো, 'কী মা?'

'ফুল।'

'ফুল?'

'হুম।' মায়া তার হাতের মুঠো খুলে জোহরাকে দেখালো। মায়ার হাতে সুন্দর ফুল এঁকে দিয়েছে কেউ। পাশাপাশি দুটো ফুল। একটি বড়, একটি ছোট। নিচে লেখা, 'মায়ের মেয়ে, মায়ের মায়া।'

জোহরা বললো, 'কেডা আঁকছে?'

'ডাক্তার।'

'ডাক্তার কই?'

মায়া হাতের ইশারায় দক্ষিণ দিকে দেখালো। মায়াকে বাহাদুরের কাছে রেখে গুটিগুটি পায়ে সেদিকে এগুলো জোহরা। কিন্তু মনসুরকে সহসাই খুঁজে পেলো না সে। বর্ষার পানিতে বিল থৈ থৈ। সেই পানিতে তরতর করে বেড়ে উঠেছে জংলি ঘাস, বুনো লতাপাতা। তেমনি এক কোমর সমান উঁচু জংলি ঘাসের ভেতর বসে আছে মনসুর। জোহরা পা টিপেটিপে গিয়ে তার পেছনে দাঁড়ালো। মনসুরের হাতে খাতা আর কলম। খাতার পাতায় হিজিবিজি কিছু একটা আঁকছে মনসুর। জোহরা দীর্ঘসময় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলো। সে ভেবেছিলো খাতার পাতায় কোনো ছবি ভেসে উঠবে। কিন্তু ওই হিজিবিজি দাগ ছাড়া আর কিছুই দেখা গেলো না। তবে সেই হিজিবিজি দাগগুলোর পাশে মনসুর লিখলো,

New Pdf download: www.PoragEducation.com + webtalkbd.com

'এখানে ছায়া থাকে, ওখানে মায়া থাকে, আর থাকে 'মন কেমনে'র লুকোচুরি, কখনো কি কেউ, চলে যেতে পারে পুরোপুরি?'

জোহরা লেখাটা পড়লো, কিন্তু তেমন কিছুই বুঝলো না। সে আচমকা মনসুরের পাশে বসে পড়লো। তারপর ছোঁ মেরে মনসুরের হাত থেকে খাতাটা টেনে নিয়ে গিয়ে বললো, 'শিক্ষিত মানুষের ভাবসাবই আলাদা, না ডাক্তার সাব?'

মনসুর চমকে ফিরে তাকালো। জোহরা বললো, 'এত ডর কেন আপনের? আপনে কী মাইয়া মানুষনি যে জঙ্গলের মইধ্যে ধইরা কিছু কইরা দিবো আপনেরে?'

মনসুর কথা বললো না। তবে অসহায় চোখে তাকিয়ে রইলো জোহরার দিকে। জোহরা হঠাৎ ধাক্কা দিয়ে মনসুরকে ফেলে দিলো ঘাসের মধ্যে। তারপর আধশোয়া হয়ে তাকে চেপে ধরে বললো, 'কী? কিছু হইয়া যাইবোনি ডাক্তার? টেস করি আপনেরে?' সে চোখ টিপে অশ্লীল ইঙ্গিত করলো। মনসুর যেমন পড়েছিলো, তেমন পড়েই রইলো। কোন প্রতিরোধের চেষ্টা করলো না।

জোহরা বললো, 'আসলেই কী কিছু আছে? নাকি নাই? আমি এই জীবনেতো এমন মরদ পোলা আর দেহিনাইগো ডাক্তার সাব! মাঝে মাঝে কী মনে হয় জানেন? মনে হয়, ধুর ছাতার জীবন, অভক্তি উইঠ্যা যায় নিজের ওপরেই। মনে হয়, এইনি কোনো মাইয়া মাইনষের জীবন? এই জীবনেরতো কোনো দামই রইলো না। একটা জুয়ান মরদ, পুরুষ পোলার পিছে এমনে চরকির মতো ঘুইরাও কোনো পাত্তা পাইলাম না। এই জীবন, এই শইলের আর দাম কী কন?'

মনসুর নিষ্পলক তাকিয়ে আছে জোহরার চোখের দিকে। তার ঠিক মুখের ওপরই জোহরার মুখ। জোহরার চুল এসে ছড়িয়ে পড়েছে মনসুরের চোখে মুখে। তার শরীরের স্পর্শে সাড়া দিতে শুরু করেছে মনসুরের শরীর। মৃদু হাওয়ায় কাঁপতে থাকা জোহরার চুলে কেমন একটা মাতাল বুনো ঘ্রাণ। মনসুরের শ্বাস কী ঘন হচ্ছে? সে স্থির তাকিয়ে আছে জোহরার চোখে। জোহরার মাথার ওপরে বিস্তৃত নীল আকাশ। আকাশে ভেসে বেড়াচ্ছে সাদা মেঘ। কিন্তু মনসুরের চোখের দৃষ্টি ক্রমশই যেন ঘোলাটে হয়ে আসতে শুরু করলো। জোহরার চোখজুড়ে উন্মাতাল আগ্রাসী আহ্বান। সেই আহ্বান অগ্রাহ্য করার ক্ষমতা কী মনসুরের আছে?

মনসুর অবশ্য অগ্রাহ্য করলো না। সে যেমন ছিলো, তেমনই তাকিয়ে রইলো। স্থির, অনড়, প্রতিরোধহীন। শেষ অবধি অবশ্য অগ্রাহ্য করলো জোহরাই। সে তার মুখখানা নামিয়ে এনেছিলো মনসুরের মুখের আরো কাছে। আর ঠিক তখনই মনসুরের চোখের কোল গড়িয়ে টলমল করে নেমে গেলো প্রথম ফোটা অশ্রুবিন্দু। তারপর টুপ করে ঝরে পড়লো ঘাসের ভেতর। জোহরা থমকালো। মনসুরের দুটো চোখই জল ছলছল। অশ্রু টলমল। আরো এক ফোটা জল গড়িয়ে পড়লো ডান দিকে। মনসুর অবশ্য তেমনই নিশ্চল শুয়ে রইলো ঘাসের ভেতর। সে তাকিয়ে আছে জোহরার দিকে। কিংবা তার পেছনে বিস্তৃত আকাশের দিকে। কিংবা অন্য

কোথাও। যেখানে মনসুর ছাড়া এই পৃথিবীর আর কেউই হয়তো কিছু দেখতে পায় না। কিছুই না। জোহরা হঠাৎ সপাটে চড় বসালো মনসুরের গালে। একবার, দুবার, তিনবার। তারপর হাতের খাতাটা ছুড়ে ফেলে দিয়ে ঝোড়ো হাওয়ার মতো চলে গেলো সে।

রাতে অবশ্য আবার এলো জোহরা। তার হাতে রাতের খাবার। মনসুর চুপচাপ বসে আছে হারিকেনের আলোতে। তার দীর্ঘ ছায়া পড়েছে দেয়ালে। মৃদু হাওয়ায় তিরতির করে কাঁপছে হারিকেনের আলো। সেই সাথে কাঁপছে মনসুরের দীর্ঘ ছায়াও। জোহরা সেই ছায়া ভেঙে এসে দাঁড়ালো। তারপর বললো, 'গরমের দিন, তাড়াতাড়ি খাইয়েন।' জোহরা চলে যাচ্ছিলো। মনসুর হঠাৎ ডাকলো, 'জোহরা?'

জোহরা দাঁড়ালো, তবে কথা বললো না। মনসুর বললো, 'আমার মেয়েটা এখন কত বড় হয়েছে, তুমি বলতে পারো?'

জোহরা কথা বললো না। মনসুর বললো, 'আচ্ছা, আমি যদি কখনো নবীগঞ্জ ফিরে যেতে পারি, তখন আমার মেয়েটা কী আমাকে চিনতে পারবে?'

জোহরা এবারও কথা বললো না। মনসুর অবশ্য নিজের কথা শুনে নিজেই হাসলো। তারপর বললো, 'আমি কী পাগল, তাই না? চিনবে কী করে? ওতো কখনো আমাকে দেখেইনি। আচ্ছা, তোমার কী মনে হয়, কণা কী অন্য কাউকে বিয়ে করবে?'

জোহরা অকস্মাৎ খুবই রূঢ় হয়ে উঠলো। সে বিশ্রি ভঙ্গিতে বললো, 'মাইয়া মানুষ হইলো নাঙ ভাতারি। ভাতার থাকতেও তাগো নাঙ লাগে। আর ভাতার না থাকলেতো এক নাঙেও হয় না। আমারে দেইখ্যা বোঝেন না?'

জোহরার কথা শুনে লজ্জায় মনসুরের মাথা নিচু হয়ে এলো। জোহরা অবশ্য থামলো না। সে যেন ফণা তোলা সাপ। তেমন ভঙ্গিতেই ছোবল উদ্যত করে বললো, 'দুই দিন ভাতার না থাকলে তাগো পোলাপানের আসল বাপ কেডা, সেই খবর খুঁইজ্যা পাওন যায় না, আর তার বউ না জানি কত মা মোমেনা! এহনো তার লাইগ্যা হারিকেন জ্বালাইয়া দুয়ার ধারে বইস্যা রইছে। আরে মরার মাইগ্যা মরদ, লাশতো গাঙ্গে ভাসছে। সেই লাশ কার না কার, কইনা কই ভাইস্যা গেছে, কেডা জানে! আর যদি জাইন্যাও থাহে, এতদিনে যেই মাইয়া জামাইর ফেরনের লাইগ্যা বাতি জ্বালাইয়া বইয়া থাকবো, তার পাও ধুইয়া এক বালতি পানি খামু আমি।'

জোহরা দেয়াল থেকে জ্বলন্ত হারিকেনখানা হ্যাচকা টানে ছাড়িয়ে নিয়ে ছুড়ে মারলো দূরে। তারপর অন্ধকারেই মনসুরের সামনে থাকা পানির জগ আর গ্লাস ছুড়ে ফেলে দিলো বিছানায়। মনসুর অবশ্য কিছু বললো না। এই জোহরাকে সে চেনে। জোহরাকে সে অন্যদের সাথে এমন ভঙ্গিতে কথা বলতে দেখেছে। কিন্তু তার সাথে আজই এই প্রথম। দরজার বাইরে হারিকেনের কেরোসিন ছড়িয়ে পড়েছে মাটিতে। ছড়িয়ে পড়ছে আগুনও। ভেজা ঘাসগুলো পটপট শব্দে পুড়ছে।

New Pdf download: www.PoragEducation.com + webtalkbd.com

অতদূরে থেকেও একটা লাল আলোর আভা এসে পড়েছে ঘরের ভেতর। সেই লাল আলোর আবছা আভায় জোহরাকে দেখতে লাগছে ভয়ংকর। যেন প্রতিশোধের নেশায় মাতাল খুনি উন্মাদিনী সে। তার ঘনঘন শ্বাস বইছে। মনসুরের হঠাৎ কী যে হলো, সে বললো, 'তুমি আমাকে মিথ্যা বলেছিলে তাইনা জোহরা? আমি আর কোনোদিন এখান থেকে যেতে পারবো না!'

মনসুরের কথার উত্তর দিলো না জোহরা। তবে মনসুরই আবার বললো, 'প্রথম প্রথম কি ভাবতাম জানো? ভাবতাম, তুমি সত্যি সত্যিই একদিন না একদিন আমাকে এখান থেকে দিয়ে আসবে কিন্তু তারপর দিন যত গেলো, ততই মনে হতে লাগলো, আমি কত বোকা!'

জোহরা হঠাৎ হাসলো, সেই উন্মাতাল হাসি। তারপর বললো, 'বলদে যে বলদ, সেইটা বুঝতেতো বলদের দেরি হইবোই। এই চরের বাইরে যে আর কোনো দিন এক পাও-ও যাওনের সুযোগ হইবো না আপনের, এইটা এতদিনেও বোঝন যায় নাই? হা হা হা। শিক্ষিত মানুষই যদি এমন বলদ হয়, তাইলে অশিক্ষিত থাকনই ভালো।'

মনসুর আর কিছু বললো না। তবে সারারাত আর একফোঁটা ঘুমও হলো না তার। বহুদিন পর আবার সেই পুরোপুরি দমবন্ধ অনুভূতিটা ফিরে এলো। এতদিন সে সত্যি সত্যিই ভেবেছিলো হয়তো কখনো না কখনো জোহরা তাকে এই নির্বাসন থেকে মুক্তির একটা উপায় খুঁজে দেবে। জোহরাকে সে যতটুকু দেখেছে, যতটুকু বুঝেছে, তাতে এই ধারণাটুকু তার বদ্ধমূল হয়েই ছিলো। কিন্তু দিন যত গড়িয়েছে, ততই সেই ধারণাটা যেন ফিঁকে হতে শুরু করেছে। জোহরা ক্রমশই বিষয়টি এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছে। এমনকি দীর্ঘদিন এই বিষয়ে আর কোনো কথাও বলেনি সে। মনসুর বলতে চাইলেও নানা অজুহাতে তাকে থামিয়ে দিয়েছে।

তারপরও যুক্তিহীনভাবেই কোথায় যেন এক চিলতে আলোর আভাসের মতন ছিলো। কিন্তু আজ ওই অভাবিত, অশিষ্ট, উন্মাদ জোহরাকে দেখে মনসুরের সকল সংশয়, দ্বিধা যেন মুহূর্তেই উধাও হয়ে গেলো। সে যেন শুধু শুধুই তাকে দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ ভাবতে গিয়েছিলো। এখানে মানুষ নৃশংস, স্বার্থপর, নির্দয়। এরা নিজের স্বার্থ বিহীন কিছুই বোঝে না, কিছুই করে না। হয়তো মনসুরের প্রতি তার ব্যক্তিগত ভালোলাগা কিংবা কামনাটুকু চরিতার্থ করতে গিয়েই সে খানিক আলাদা অনুভূতি তাকে দেখিয়েছে। আর মনসুর এটিকেই ভেবেছিলো তার মুক্তির চাবিকাঠি। কিন্তু ঘটনাতো উল্টো। বরং এটিই হতে পারে মনসুরের জন্য সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধকতার জায়গা। আজ এই মুহূর্তে এসে মনসুর যেন হঠাৎ করেই সেই কঠিন সত্যটি আবিষ্কার করে ফেললো। এই চর থেকে ফিরে যাওয়ার যদি সামান্যতম কোনো সম্ভাবনাও তার থেকে থাকতো, তবে জোহরা যেদিন থেকে তাকে পছন্দ করতে শুরু করেছে, ভালোবাসতে শুরু করেছে, সেদিন থেকেই বরং সেই

সম্ভাবনাটুকুও পুরোপুরি রুদ্ধ হয়ে গেছে তার। ওই সর্বগ্রাসী, স্বেচ্ছাচারী, খামখেয়ালি জোহরা যখন তাকে চেয়েছে, তখন তার থেকে মনসুরকে ছিনিয়ে নেয়ার সাধ্য আর কারো নেই!

দিন কয়েক জোহরার সাথে আর দেখা হলো না মনসুরের। তবে মায়ার ঠাণ্ডা জ্বর হওয়াতে চতুর্থদিন সকালে তোরাব আলী লস্করের ঘরে ডাক পড়লো তার। সমস্যা তেমন গুরুতর কিছু না। ঘরে কোথাও জোহরাকে দেখলো না সে। তবে রোগী দেখে ঘর থেকে বের হওয়ার সময় মনসুরের হঠাৎ মনে হলো কেউ যেন পর্দার আড়াল থেকে সরে গেলো। সে অবশ্য এই নিয়ে মাথা ঘামালো না আর। সকাল থেকে দুপুর অবধি বসে রইলো বিলের ধারে। ঝকঝকে পরিষ্কার আকাশ। তবে হাওয়া নেই কোথাও। বিলের জল স্থির। কিন্তু রোজ রোজ এই একই দৃশ্য দেখতে দেখতে বিরক্তি ধরে গেছে তার। কী মনে করে মনসুর হঠাৎ উঠে দাঁড়ালো। তারপর জলের ধারে গিয়ে নিজের চেহারাটা দেখার চেষ্টা করলো। কতদিন পর মনসুর জানে না! তবে একটা বড়সড় ধাক্কা মতো খেলো সে। জলে ভেসে ওঠা ওই মানুষটা তাহলে সে-ই? দীর্ঘসময় তাকিয়ে থেকেও বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছিলো তার। কণ্ঠার হাড় উঁচু হয়ে গেছে। কোটরের ভেতর ঢুকে গেছে চোখ। লম্বা দাড়ি প্রায় বুক অবধি পৌঁছে গেছে। প্রথম কাঁচি দিয়ে ছেটে রাখতো সে। তারপর আর আগ্রহ পায়নি। মনসুর মুখে খানিক জল দিয়ে ঘরে ঢুকতে যাবে এই মুহূর্তে বাতাসের গতিতে ছুটে এলো মফিদুল, 'ডাক্তার সাব, জোহরা ব'র হাত কাইট্টা দুই টুকরা!'

'মানে?'

'মানে আমি জানি না। দাদাজানে এহনই আপনেরে যাইতে কইছে।'

মনসুর গেলো। তোরাব আলী লস্কর জানালেন, তরকারি কুটতে গিয়ে ভয়ানকভাবে হাত কেটে গেছে জোহরার। মনসুরের অবশ্য হাত দেখে তা মনে হলো না। জোহরার বাঁ হাতের তালুর এপার থেকে ওপার অবধি গভীর ক্ষত। সূক্ষ্ম, ধারালো কিছুতে কেটে গেছে। মনসুর গরম পানিতে ক্ষতস্থান পরিষ্কার করে ব্যান্ডেজ করে দিলো। তোরাব আলী লস্করের মুখ থমথমে। তিনি বললেন, 'সমস্যা নাইতো ডাক্তার? একবারতো এই সামান্য দাওয়ের আঘাতেরতন একজনের পুরা হাতই পইচ্যা গেলো।'

মনসুর বললো, 'নাহ, ভয়ের কিছু নেই।'

তোরাব আলী লস্কর আরো কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, তার আগেই জোহরা বললো, 'তুমি একটু যাওতো দাদাজান। বিরক্ত কইরো না।'

তোরাব আলী লস্কর কী বুঝলেন কে জানে! তিনি চুপচাপ ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন। মনসুরও উঠে যাচ্ছিলো, জোহরা হঠাৎ ডান হাতে তার হাত চেপে ধরলো। তারপর মনসুরের চোখের দিকে তাকিয়ে রইলো। মনসুর অবশ্য চোখ

New Pdf download: www.PoragEducation.com + webtalkbd.com

ফিরিয়ে নিলো। জোহরা গাঢ়, ভেজা, গভীর কণ্ঠে বললো, 'আমার চোউখ দুইখান একটু মুছাই দিবেন ডাক্তার সাব?'

মনসুর জোহরার কথা কিছু বুঝলো না। তবে তার চোখে চোখ রেখে তাকালো। জোহরা কাঁদছে। সে চেষ্টা করছে কান্নাটা চেপে ধরে রাখতে, কিন্তু পারছে না। কান্নার দমকে তার ঠোঁটজোড়া ফুলে ফুলে উঠছে। জোহরা কান্না ভেজা গলায় বললো, 'আমার চোউখটা একটু মুছাই দিবেন না ডাক্তার সাব?'

মনসুর তাও জড়সড় ভঙ্গিতে বসে রইলো। জোহরা বললো, 'এই জীবনে চৌক্ষের পানি মুছাই দেওনের একজন মানুষ অন্তত লাগে। চাইরপাশে এত মানুষ, কিন্তু সেই মানুষটাই খালি নাই। কী ভাইগ্য মানুষের দেহেন!'

মনসুর কথা বললো, 'হাত কী করে কাটলো?'

'ছুরি দিয়া কাটছি।'

'কেন?'

'আপনেরে খুব ছুঁইয়া দেখতে ইচ্ছা করতেছিলো। আপনের মুখখান খুব কাছেরতন দেখতে ইচ্ছা করতেছিলো, এইজন্য।

'এইজন্য হাত কাটা লাগে? আমার ওখানে গেলেইতো হতো!'

'হইতো। কিন্তু শরম করতেছিলো। গত কয়েকদিনে কতবার যে যাইতে চাইছি, পারি নাই। শরমে যাইতে পারি নাই।'

'কিসের শরম?'

'আপনের লগে কী দুর্ব্যবহারটাই না করছি!'

মনসুর কথা বললো না। জোহরা তার হাতের মুঠোয় মনসুরের হাতখানা আরো শক্ত করে চেপে ধরলো। তারপর বললো, 'ডাক্তার সাব, আপনের জইন্য আমার এমন লাগে কেন! বুকের ভেতরটা এমনে কইরা তড়পায় কেন? একটু কইবেন আমারে? আমার খুব কষ্ট হয় ডাক্তার সাব।'

মনসুর চুপ করে রইলো। জোহরা বললো, 'আমার সামনে বইস্যা আপনে যহন অন্য কোন মাইয়া মানুষের কথা কন, অন্য কোনো মাইয়া মানুষের লাইগ্যা কান্দেন, আমি তহন আর সহ্য করতে পারিনা ডাক্তার সাব। আমার মাথাডা কেমন জানি পাগল পাগল লাগে। আমি তহন হাচা হাচাই পাগল হইয়া যাই।'

জোহরা একটু থামলো। তার দুই চোখের পাশ দিয়ে গড়িয়ে পড়ছে অশ্রু। সে নিজেকে খানিক সামলে নিয়ে বললো, 'এইটা আমার কী অসুখ হইলো ডাক্তার সাব? আপনে না ডাক্তার? এই অসুখ আমার কেমনে হইলো, আপনে কইতে পারেন না? এই অসুখের ওষুধ কী, আপনে জানেন না? আমার এত কষ্ট কেন হয়? কেন আমার সারাটা দিন মনে হয়, আমি একটু আপনের পাশে গিয়া যদি বইসা থাকতে পারতাম, যদি একটু আপনের গায়ের ঘ্রাণ নিতে পারতাম, যদি একটু আপনের মুখের কথা শুনতে পারতাম! না হইলে বুকের মধ্যে সারাটাক্ষণ ব্যথা হইতে

থাকে। শ্বাস নিতে পারি না। কেন এমন হয়। ও ডাক্তারসাব। কেন এমন হয়?'

মনসুর এই কথার কী উত্তর দিবে! সে বসে রইলো নিশ্চুপ, নিঃশব্দ। জোহরা হঠাৎ তার হাতখানা টেনে নিয়ে গালের সাথে চেপে ধরলো। চোখের জলে ভেজা গালখানা উষ্ণ, পেলব। কিন্তু সেই উষ্ণ পেলব গাল ছুঁয়েও যেন নিথর হয়ে রইলো মনসুরের হাত।

জোহরা বললো, 'হোউক কষ্ট। এই কষ্ট না হইলে আপনেরে আর পামু কেমনে? আপনে না হয় আমার এই কষ্ট হইয়াই থাহেন ডাক্তার সাব, এই অসুখ হইয়াই থাহেন। আপনের মনতো আর পামু না, কষ্টতেই না হয় পাইলাম, অসুখের লাহান পাইলাম।'

জোহরার কাছ থেকে এসে সেই সারাটা সন্ধ্যা বারান্দায় বসে রইলো মনসুর। জোহরার বুকে যে ব্যথা, ওই ব্যথাটা সে চেনে। ওই ব্যথাটা তারও আছে। সম্ভবত আছে এই জগতের আর সকল মানুষেরই। তাদের সবার বুকেই কখনো না কখনো ওই ব্যথাটা চিনচিন জেগে ওঠে। কিন্তু ওই ব্যথা মুক্তির উপায় কেউ জানে না। কিংবা সেই উপায় তার কাছে থাকে না। মনসুরেরও নেই। নেউ জোহরারও। এমনকি নেই কণারও। কিন্তু মনসুর কি তা জানে? এই ব্যথার কথা কেউ কারোটা জানে না, বোঝে না। এই ব্যথা একান্ত আপন, একান্ত গোপন। অসুখের মতোন। মনসুর হঠাৎ বিড়বিড় করে বললো,

'সে এসে বসুক পাশে, যেভাবে অসুখ আসে,
তারপর হয়ে যাক, যন্ত্রণা অনায়াসে।
তবুও আসুক সে,
প্রিয়তম অসুখ সে!'

New Pdf download: www.PoragEducation.com + webtalkbd.com

কণা আর মঞ্জুর বিয়ের মাসখানেক হয়ে গেছে। তবে এ বাড়িতে নতুন বিয়ের কোন ছাপ নেই। ঘরে কাজি ডেকে বিয়ে পড়ানো হয়েছে। বিয়েতে বাইরের কেউ ছিলো না। বিয়ের রাতে তাদের বাসর ঘর সাজানো হয়নি। কিন্তু আজাহার খন্দকারের কড়া চোখের কারণে সেদিন থেকেই তাদের থাকতে হচ্ছে একই ঘরে। ঘরে ঢুকে অবশ্য মঞ্জু আর কণা কেউ কারো সাথে কথা বলেনি। কণা জড়সড় হয়ে বসেছিলো বিছানার এক কোণায়। মঞ্জু ঢুকলো একখানা পাঁটি আর বালিশ নিয়ে। তারপর মেঝেতে বিছানা পেতে শুয়ে পড়লো। কণা বসে রইলো খাটে। ঘরের মাঝখানে টিমটিম করে জ্বলছিলো একটা হারিকেন। সেই হারিকেনের আলোয় মন-এর ঘুমন্ত মুখখানা দেখা যাচ্ছিলো। কণা তার মুখের দিকে তাকিয়েছিলো দীর্ঘসময়। তারপর শূন্য চোখে দেখতে লাগলো অতীত। সে যে দেখতে চেয়েছে এমন নয়, কিন্তু একের পর এক তার চোখের সামনে ভেসে উঠতে লাগলো কত কত ছবি, কত কত দৃশ্য!

জেগে ছিলো মঞ্জুও। সারাটা রাত। কিন্তু একটা শব্দ অবধি করেনি সে। নড়েওনি সামান্য। ভুলেও যেন কণার চোখে হঠাৎ চোখ পড়ে না যায়, সেজন্য কণার পুরো বিপরীতদিকে মুখ করে মেঝেতে শুয়েছিলো সে। মঞ্জু জানে না, কণার চোখের দিকে চোখ তুলে তাকাবে কী করে সে! একটা গোটা রাত দুটি মানুষ কাটিয়ে দিলো নির্ঘুম অথচ নিঃশব্দ। যেন সামান্য শব্দ হলেই তাদের মাঝখানের অদৃশ্য কিন্তু অলঙ্ঘনীয় দেয়ালটা হঠাৎ ধ্বসে পড়বে। কিংবা কেঁপে উঠবে। কিংবা আড়ালটা উন্মোচিত হয়ে যাবে। অথচ তারা দু'জন ওই দেয়ালের আড়ালে লুকিয়ে থাকতে চায়। তারা জানে জগতের আর সকল মানুষ তাদের দেখছে, জানছে। কিন্তু তারা আড়ালে থাকতে চায় তাদের পরস্পরের কাছ থেকে। ফলে ওই দেয়ালটা খুব দরকার তাদের। ওই দেয়ালটুকুই যেন তাদের আবরণ। তাদের দূরত্ব, সম্ভ্রম, শুদ্ধি।

ফজরের আজান হতেই টুপ করে উঠে গেলো মঞ্জু। তারপর সেই যে বাড়ির বের হলো, আর ঢুকলো না সারাদিনেও। ফিরলো গভীর রাতে। কণার ঘরে না ঢুকে চুপিচুপি নিজের ঘরে ঢুকে যেতে চাইছিলো সে। কিন্তু অন্ধকারে আজাহার খন্দকার দাঁড়িয়ে ছিলেন বারান্দায়। তিনি মঞ্জুকে ডেকে বললেন, 'একখান কথা মঞ্জু।'

'জি আব্বা।'

'বিয়াতো হইছে, নাকি?'

'জি আব্বা।'

'এহন এইটাই হইলো সত্য যে তোমরা স্বামী-স্ত্রী। বাকি জীবন সুখে-দুঃখে তোমাগোই একসাথে থাকতে হইবো। ভবিষ্যৎ গড়তে হইবো। আমি আর কয়দিন?'

'জি আব্বা।'

'এইজন্য যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বিষয়টা মাইনা নিতে হইবো। এহনতো আর পিছে যাওনের সুযোগ নাই। নাকি আছে?'

মঞ্জু আর জবাব দিলো না। আজাহার খন্দকার হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেন। তারপর অন্ধকারে মঞ্জুকে জড়িয়ে ধরলেন। মঞ্জুর শরীর কাঁপছে। তার খুব কান্না পাচ্ছিলো। কিন্তু সে কাঁদলো না। তবে সেদিনের পর থেকে আর নিজের ঘরে যাওয়ার চেষ্টা করলো না মঞ্জু। কারণ রোজ গভীর রাতে বাড়ি ফিরে সে দেখে, বাবা দাঁড়িয়ে আছেন বারান্দায়।

অদ্ভুত ব্যাপার হচ্ছে বিয়ের এক মাস কেটে গেলেও কণা আর মঞ্জু কেউ কারো সাথে একটা কথা অবধি বললো না। যেন ওই ঘরখানা একটা অন্ধকার কবর। সেই কবরে রাখা হয়েছে দুটি মৃতদেহ। যেন এরা কেউ কাউকে চেনে না, জানে না, অনুভব করে না। এমনকি তাদের নিজেদের কোনো অনুভূতি নেই, স্পর্শময়তা নেই, প্রাণ নেই। নিঃশ্বাস অবধি নেয় না তারা। অথচ এই মানুষ দুজন জীবন্ত। তারা সারারাত জেগে থাকে। একটা ছুটে যাওয়া ইঁদুর, একটা ঝরে পড়া পাতা কিংবা কোন এক নিশাচর পাখির ডানার শব্দেও তারা কেঁপে ওঠে। কিন্তু কিসের ভয়ে এমন তটস্থ হয়ে থাকে তারা? এই প্রশ্নের উত্তরও হয়তো তাদের জানা নেই। কিংবা তারা জেনেও হয়তো মানতে চায় না, যে জীবন যাপনের তা এড়িয়ে যাওয়ার সুযোগ তাদের নেই। নেই কারোই। তারপরও যেন নিজের ছায়ার আড়ালেই নিজেকে লুকিয়ে রাখার এক প্রাণান্তকর চেষ্টায় মেতে আছে তারা।

New Pdf download: www.PoragEducation.com + webtalkbd.com

খুব ভোরে মঞ্জু যখন ঘর থেকে বের হয়ে যায়, কণা তারপর ঘুমায়। আর মঞ্জু ঘুমায় আড়তে গিয়ে। এই নিয়েও আড়ালে আবডালে কতজনের ফিসফাস, কত অশোভন ইঙ্গিত। মঞ্জু যেমন সেসব নীরবে শুনে যায়, শুনে যায় কণাও। তারা এখন জানে, মানুষ আসলে এমনই। ঠিক পাশের মানুষটার বুকে জমে থাকা কান্নাও মানুষ দেখতে পায় না, কিন্তু ঠিকই দেখতে পায় তার মুখে জমে থাকা হাসিটুকু। কণার সাথে মঞ্জুর প্রথম কথা হলো তাদের বিয়ের একত্রিশ দিনের মাথায়। মঞ্জুর খানিক তন্দ্রা লেগে এসছিলো। আর ঠিক তখনই তাকে ডাকলো কণা। কিছুটা উত্তেজিত হলেও ঠিক আগের মতো সহজ স্বাভাবিক ভঙ্গিতেই ডাকলো সে, 'মঞ্জু, মঞ্জু।'

মঞ্জু লাফ দিয়ে উঠে বসলো। সে এখনো মেঝেতেই ঘুমায়। কণা বললো, 'বাবুর যেন কী হয়েছে। সে তখন থেকে বমি করছে।'

মঞ্জু উঠে গিয়ে মন-এর কপালে হাত ছোঁয়ালো। তার গায়ে জ্বর। কণা বললো, 'এখন? এতরাতে কী করবো?'

মঞ্জু কিছু বলতে গিয়েও হঠাৎ যেন থমকে গেলো। কী বলবে সে কণাকে? আপনি না তুমি? গভীর রাতের সেই সন্ত্রস্ত, শঙ্কিত মুহূর্তটুকুতেও এই অদ্ভুত প্রশ্নের এক বিস্তৃত দেয়াল তাকে থমকে দিলো। কণা বললো, 'মাথায় পানি ঢালবো?'

মঞ্জু বললো, 'এতটুকু বাচ্চা একটা ছেলে, এখন পানি ঢাললে যদি ঠাণ্ডা লেগে যায়?'

তাওতো কথা। কণা যতদিন গোবিন্দপুর ছিলো, মন-এর দেখাশোনা করতো মূলত তার মা-ই। ছেলের অসুস্থতায় কখন কী করতে হবে, তা নিয়ে তাই কখনোই খুব একটা ভাবতে হয়নি কণাকে। আজ অবশ্য পরিস্থিতি সামাল দিলো মঞ্জুই। ততক্ষণে ভোরের আলো ফুটেছে। ওই সাত সকালেই কোথা থেকে একটা তিন চাকার ভ্যান গাড়ি জোগাড় করে নিয়ে এলো সে। তারপর কণা আর মন-কে নিয়ে ছুটলো নবীগঞ্জ বাজারে। পথে কণার সাথে খুব একটা কথা না হলেও এই ঘটনাটা যেন খানিক সহজ করে দিলো সম্পর্কটা।

মঞ্জু এখনো মেঝেতেই ঘুমায়। কণা এখনো রাতভর জেগেই থাকে। এখনো ওই বন্ধ ঘরের রাতটুকুতে কেউ কারো সাথে কথা বলে না। শুধু নিঃশব্দ রাতের বুক চিরে অবিরাম বয়ে যেতে থাকে চাপা দীর্ঘশ্বাসের স্রোত। সেই স্রোতে ভেসে ভেসে জেগে উঠতে থাকে কত কত কান্না, ক্রোধ, কষ্ট, ক্লেদ। মঞ্জু ঘুমিয়ে গেলেও কণা কেন যেন ঘুমাতে পারে না। সে জেগে থাকে সারারাত। ভয়টা কিসের, তা জানে না সে। তবে দিনের আলোয় মঞ্জুর সাথে টুকটাক কথা হয় তার। সেদিন মঞ্জু হঠাৎ বললো, 'আজ রাতে আমি ফিরবো না।'

কণা বললো, 'কেন?'

'আড়তের কাজে আলীপুর যাইতে হবে।'

কণা বললো, 'আচ্ছা।'

মঞ্জু চলে গেলো। সেই রাতটা বহুদিন পর যেন শান্তিমতো কাটালো কণা। বন্ধ দরজা বন্দিত্বের প্রতীক হলেও সেই রাতে দরজাটা বন্ধ করতেই নিজেকে যেন মুক্ত স্বাধীন এক পাখি মনে হলো কণার। রোজকার মতো আজ আর জড়সড় হয়ে বসে থাকতে হলো না তাকে। হাত-পা ছড়িয়ে আরাম করে বসলো সে। কতকাল পরে আজ রাতে ঘুমাবে। কিন্তু দীর্ঘদিনের অনভ্যস্ততায় সেই রাতেও একটুও ঘুমাতে পারলো না কণা। রাতে ঘুমাতে না পারার কারণটা সেদিনই প্রথম ধরতে পারলো সে। খানিক তন্দ্রার মতো যে তার আসে না, তা নয়। বরং প্রায়ই গভীর ঘুমে চোখ বুজে আসে তার। খানিক আচ্ছন্নও হয়। কিন্তু তারপরই আচমকা ঘুম ভেঙে যায়। চোখ খুলে প্রথমেই মঞ্জুকে দেখে সে। মঞ্জু তার জায়গায় ঠিকঠাক আছেতো? নাকি উঠে এসেছে? গায়ের কাপড় ঠিকঠাক আছেতো নিজের? সেটাও ভালো করে দেখে নেয় কণা!

মঞ্জুবিহীন একলার স্বাধীন রাতটাতে কণা সেই প্রথম বুঝতে পারলো, এই বন্ধ ঘরটাতে আসলে মঞ্জুকে ভয় পায় সে। মঞ্জু আইনত যতই তার বৈধ স্বামীই হোক না কেন, তার মনের কাছে এখনো সে সেই আগের মঞ্জুই রয়ে গেছে। আবার অবচেতনে তার শরীর সদা সন্ত্রস্ত হয়ে থাকে, কারণ তার শরীরের কাছে মঞ্জু এক জ্বলজ্যান্ত অচেনা পুরুষ। ফলে কণার মন আড়ষ্ট হয়ে থাকে আগের সেই মঞ্জুকে স্বামী হিসেবে মেনে নিতে না পারার কারণে। আর তার শরীর সন্ত্রস্ত হয়ে থাকে রাতের বন্ধ দরজার ভেতরে অন্ধকারে একই ঘরে অন্য এক পুরুষ শরীরের অস্তিত্বের কারণে। শরীরতো কোনোভাবেই মন থেকে আলাদা কিছু নয়। ফলে ক্রমশই এটি হয়ে উঠতে থাকে এক ভয়াবহ মানসিক যুদ্ধ। সেই যুদ্ধ নিয়ত আড়ষ্ট করে রাখে কণাকে।

মঞ্জুর আসতে দুদিন দেরি হলো। এই নিয়ে আজাহর খন্দকারের সাথে প্রথমবারের মতো সামান্য কথা-কাটাকাটি হলো কণার। আজাহার খন্দকার বললেন, 'মঞ্জুতো আইলো না বউমা?'

কণা বললো, 'হুম।'

আজাহার খন্দকার বললেন, 'কী বইলা গেছিলো? গতকাইল রাতেইতো আসনের কথা?'

'হুম।'

'তাইলে এহনও যে আইলো না, এইটাতো চিন্তার কথা!'

কণা জবাব দিলো না। তবে সেই রাতেও যখন ফিরলো না মঞ্জু, তখন ভীষণ চিন্তিত হয়ে পড়লেন আজাহার খন্দকার। তিনি মাঝরাতে কণাকে ডেকে বললেন, 'মঞ্জুটা এহনো ফিরলোনাতো বউ!'

কণা বললো, 'জি।'

New Pdf download: www.PoragEducation.com + webtalkbd.com

আজাহার খন্দকার বললেন, 'এতরাইত হইয়া গেলো, চিন্তাইতো লাগতেছে!'

কণা কোনো কথা বললো না। এবার সামান্য খেপে গেলেন আজাহার খন্দকার, 'বউমা, তুমি এহন তার স্ত্রী, তোমারতো একটু খোঁজখবর রাহনের কাম আছিলো, আছিলো না?'

কণা এবারও জবাব দিলো না। আজাহার খন্দকার বললেন, 'তোমার মধ্যেতো তারে নিয়া কোনো চিন্তাও দেখি না! এইটা কেমন কথা বউ?'

কণা এবারও জবাব দিলো না। সে মাথা নিচু করে শুনছে। আজাহার খন্দকার বললেন, 'এইটা আমি তোমার কাছের তন আশা করি নাই মা।'

কণা যেন আচমকা খেপে গেলো। সে বললো, 'আমার থেকে আর কী কী আশা করেন আপনি? বলেন, আর কী কী আশা করেন আপনি আমার থেকে? দাঁড়ান, আমি একটা কাগজ কলম নিয়ে আসি, আপনি বলবেন আর আমি একটা একটা করে লিস্ট করবো। তারপর সেই লিস্ট ধরে ধরে আমি আপনার আশা পূরণ করতে থাকবো। লিস্টের শেষে রাখবেন, গায়ে কেরোসিন ঢেলে আগুন দিয়ে আমার জীবন্ত মৃত্যু। আপনার সেই আশাও আমি পূরণ করবো বুঝলেন?'

কণা সত্যি সত্যি ঘর থেকে কাগজ-কলম নিয়ে এলো। আজাহার খন্দকার অনেক্ষণ কণার দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর নরম গলায় বললেন, 'তুমি কিছু মনে কইরো না মা। আমারতো এহন এই একটাই ছেলে। সারাক্ষণ বুকটা ভয়ে কাঁপে। মনে হয়, কী জানি কী হইয়া যায়। পরানডা পুঁটি মাছের পরানের লাহান হইয়া গেছে। কী করবো কও?'

কণা হঠাৎ কেঁদে ফেললো, 'আমি আর পারি না বাবা। আমি সত্যিই আর পারি না। আমি অনেক চেষ্টা করি, কিন্তু কিছুতেই কিছু করতে পারি না আর। আমার মরে যেতে ইচ্ছে করছে বাবা। আমার সত্যি সত্যি মরে যেতে ইচ্ছে করছে।'

আজাহার খন্দকার আর কথা বললেন না। কণাও না। তবে সেদিন রাতে কণা আবার তার কল্পনার মনসুরের সাথে কথা বলার চেষ্টা করলো। কিন্তু সারারাত জেগে থেকেও সে মনসুরের সাথে কথা বলতে পারলো না। ভোররাতে সে ঘরের দরজা খুলে চুপিচপি মনসুরের কবরের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। তারপর মনে মনে কত ডাকলো মনসুরকে। কিন্তু মনসুর আর তার কাছে ফিরে এলো না। তবে ভোরের আলো ফুটতে দেখা গেলো মঞ্জু ফিরে এসেছে। তার কোনো অসুবিধা হয়নি। সে জরুরি কাজে আটকে গিয়েছিলো আলীপুরে।

কণার অবশ্য একটু দুশ্চিন্তাও হচ্ছিলো। কিন্তু সেটি সে ইচ্ছে করেই কাউকে বুঝতে দেয়নি। এই দুশ্চিন্তাটুকু মঞ্জুর জন্য তার সবসময়ই হতো। কিন্তু অদ্ভুত এক কানামাছি খেলার চক্রে তারা আটকে পড়েছে। এই খেলায় নিজেকে সবসময় লুকিয়ে রাখতে হয়। এখানে সবাই চোর। কোনো পুলিশ নেই। অথচ এক চোরকে আরেক চোরের কাছ থেকে নিজেকে আড়াল করে রাখতে হয়।

সেদিন রাতে মঞ্জুর সাথে কথা হলো কণার, 'তোমার কাজ কেমন হলো?'

'একটু ঝামেলা হইছিলো।'

'কী ঝামেলা?'

'আলীপুরের যে বড় মহাজন, সে আগের পাওনা টাকা দিতে চাইছিলো না।'

'পরে দিছে?'

'হুম।'

এরপর আর কোনো কথা খুঁজে পেলো না কেউ। দুজনেই বসে রইলো চুপচাপ। তবে মঞ্জু হঠাৎ উঠে গিয়ে তার চটের ব্যাগটা থেকে কতগুলো টাকার বান্ডিল বের করলো। তারপর হারিকেনের মৃদু আলোয় সময় নিয়ে টাকাগুলো গুনলো। তারপর উঠে কণার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে বললো, 'এই টাকাগুলান সিন্দুকে রাখতে হইবো। চাবিতো আমার কাছে নাই।'

কণা চাবি বের করে মঞ্জুর কাছে দিতে চাইলো। কিন্তু মঞ্জু বললো, 'না থাক। টাকাগুলান সিন্দুকে রাখলেই হইবো। আমি চাবি দিয়ে কী করবো?'

কণা খেয়াল করেছে, মঞ্জু তার সাথে ভাব বাচ্যে কথা বলে। আপনি তুমি কিছুই বলে না। সেও বিষয়টা আর বাড়ালো না। তবে শেষ রাতের দিকে তুমুল বৃষ্টি শুরু হলো। সেই বৃষ্টিতে নেমে এলো কনকনে ঠাণ্ডা। কণা জেগে আছে। ঘুম ভেঙে গেছে মঞ্জুরও। মেঝের ঠাণ্ডা মাটিতে শুয়ে সে শীতে কাঁপছে। কিন্তু তারপরও কোনো শব্দ করছে না। নড়ছে না। গুটিশুটি মেরে ছোট্ট বাচ্চাদের মতো হাত-পা এক করে শুয়ে আছে। কণার দেখে হঠাৎ খুব মায়া লাগলো। সে মঞ্জুকে ডেকে বললো, 'মঞ্জু, মঞ্জু?'

মঞ্জু ঘুম জড়ানো গলায় জবাব দিলো, 'হুম?'

'তুমি ওপরে উঠে শোও। ওই যে বাবুর ওইপাশের ফাঁকা জায়গাটাতে এসে শুয়ে পড়ো।'

মঞ্জু বললো, 'নাহ, আমি এইখানেই ঠিক আছি। কোনো সমস্যা নাই।'

কণা বললো, 'সমস্যা আছে। অনেক ঠাণ্ডা পড়েছে। জ্বর ঠাণ্ডা লেগে যাবে। আসো।'

মঞ্জু আর কথা বললো না। সে চুপচাপ উঠে এসে মন-এর ওপাশে জড়সড় ভঙ্গিতে শুয়ে পড়লো। কণা একবার তাকিয়ে দেখলো। ছেলেটার ঘুমানোর মধ্যে কেমন একটা ভীত সন্ত্রস্ত, আড়ষ্ট ভাব। দেখে খুব মায়া লাগলো কণার। একটা কাঁথা টেনে নিয়ে মঞ্জুকে ঢেকে দিলো সে।

New Pdf download: www.PoragEducation.com + webtalkbd.com

জব্বারকে ছাড়িয়ে আনার জন্য হানিফ মোটামুটি প্রস্তুত। সে প্রায় তেরো-চৌদ্দজনের একটা দল ঠিক করেছে। এর মধ্যে চারজন যাবে দুটা ছোট দ্রুত গতির ট্রলার নিয়ে আলাদা। আর তারা বাকি দশজন চলে যাবে গোবিন্দপুর। সেখান থেকে তাবলিগ জামাতের একটা দলের সাথে তারা ভিড়ে যাবে। মাঝখানে আরো একবার গোবিন্দপুর গিয়েছিলো সে। ভালো মতো খোঁজখবর নিয়ে জেনে এসেছে কবে, কখন, কোন কোন দল নবীগঞ্জের দিকে যাবে। তার উদ্দেশ্য বড় একটা দলের সাথে ভিড়ে যাওয়া। না হলে প্রয়োজনে নবীগঞ্জের আশেপাশের কোনো একটা দল পেলে সেটাতেও কয়েকজনকে ঢুকিয়ে দিবে সে। যাতে প্রয়োজন পড়লে তাদের সাহায্যও নেয়া যায়। পুরো পরিকল্পনা করার পর হানিফ খুব আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠেছে। তার ধারণা, এবার অন্তত সে একটা হৈচৈ ফেলে দিতে পারবে। তা চরের ভেতরে যেমন, তেমনি চরের বাইরে পুলিশের মধ্যেও। যে নিশ্ছিদ্র পরিকল্পনা সে করেছে, তাতে তার ব্যর্থ হওয়ার সুযোগ নেই বললেই চলে।

এরমধ্যে সে আর জোহরার সাথে কোনো কথা বলেনি। তবে তার যাত্রা শুরুর দিন দুই আগে জোহরা নিজ থেকেই হানিফের সাথে দেখা করতে এলো। হানিফ তখন ছোট ট্রলার খানার ইঞ্জিন পরীক্ষা করে দেখছিলো। জোহরা ট্রলারের গলুইয়ের কাছে এসে দাঁড়ালো। তারপর বললো, 'কী অবস্থা হানিফ ভাই?'

হানিফ একবার জোহরার দিকে মুখ তুলে তাকালো। তারপর আবার কাজে মনোযোগ দিতে দিতে বললো, 'অবস্থাতো ভালো, তোর কী খবর?'

হানিফের কথা বলার ভঙ্গিতে স্পষ্ট আত্মবিশ্বাস। জোহরা বললো, 'কবে যাইবেন নবীগঞ্জ?'

'কাইল পরশু।'

'সব ঠিকতো?'

'হ, ঠিক।'

'বুইঝেন কিন্তু।'

'হ।'

'কিন্তু এত মানুষ কেন নিতেছেন? এইরম কামে মানুষ যত কম নিবেন তত ভালো। যেই কাজ সামনাসামনি, জানাইয়া করবেন, সেই কাজে শক্তি লাগে বেশি, বুদ্ধি লাগে কম। আর যেই কাম জানাইয়া সামনাসামনি করবেন না। করবেন লুকাইয়া, শত্রুর চোউক্ষে ধুলা দিয়া, সেই কামে বুদ্ধি লাগে বেশি, লোক লাগে কম। বুঝছেন কী কইছি?'

হানিফ বললো, 'যার যার বুঝ, তার তার কাছে। তোর একলার মতো চিন্তা করলেতো আর দুনিয়া চলবো না। দুনিয়াতে আর মানুষের বুদ্ধিরও দাম আছে। সেই বুদ্ধিতেও অনেক কাম হয়।'

জোহরা হাসলো, 'আমার ওপরে রাগ কইরা চরের ক্ষতি কইরেন না। এই কামে যত বেশি মানুষ নিবেন, তত বেশি বিপদ। তত বেশি আগে ভাগেই চৌক্ষে পইড়া যাওনের সম্ভাবনা আছে। বুঝলেন? সবচেয়ে ভালো হয় তাবলিগ জামাতের লগে চাইর পাঁচজন ঢুইকা যান। আর টলারে আগেভাগে পাঠাই দেন দুইজন। জব্বাররে কোনোমতে বাইর করতে পারলেই সোজা টলারে। বুঝলেন?'

হানিফ ঘোঁত করে শব্দ করলো একটা। ইঞ্জিনে কোনো একটা ঝামেলা হচ্ছে। সে চিৎকার দিয়ে খলিল আর নুরুকে ডাকলো। যেন জোহরার কথা সে শুনছেই না। জোহরা বললো, 'আর বাহাদুর ভাই নাকি শুনলাম যাইবো না?'

এবার কথা বললো হানিফ, 'খালি শইলের সাইজে বড় হইলেই হয় না, কইলজার সাইজও বড় হওন লাগে।'

জোহরা হাসলো, 'আপনের কী ধারণা, আপনের কইলজার সাইজ বড়?'

হানিফ বললো, 'বড়ই। তারতন অন্তত বড়।'

'কত বড়? হাত দিয়া মাইপা দেহান তো?'

হানিফ যেন এতক্ষণে বুঝলো, জোহরা তার সাথে ঠাট্টা করছে। সে গলা খাকড়ি দিয়ে একদলা থুতু ফেললো পানির ভেতর। তারপর বললো, 'কইলজা হাত দিয়া মাপন যায় না, হাত দিয়া মাপন যায় শইল। আর ওই শইল দিয়া কিছু হয় না। এই জন্যই মাইনষে কয়, মোডা হইলেই দারোগা হওন যায় না।'

জোহরা বললো, 'আর বুদ্ধি? বুদ্ধি কতটুক লাগে? কইলজার মাপে, না শইলের মাপে?'

কথাটা খুব গায়ে লাগলো হানিফের। সে জোহরার দিকে তাকিয়ে বললো, 'অহংকার বেশি ভালো না জোহরা। দাদাজানে কয় না, অহংকার বেশি হইলেই পতনের শুরু হয়। কথা কিন্তু মিছা না।'

New Pdf download: www.PoragEducation.com + webtalkbd.com

'আপনের কী অহংকার বেশি? না কম? কম হইলে কতটুক, আর বেশি হইলে কতটুক? হাত দিয়া মাইপা দেহান?'

হানিফ এবার আর জবাব দিলো না। সে বুঝতে পারছে জোহরা ইচ্ছে করেই তাকে রাগিয়ে তোলার চেষ্টা করছে। কিন্তু তার বাবা গত কয়েকদিন থেকেই তাকে বুঝিয়েছে, সে যেন এবার নবীগঞ্জ গিয়ে হুটহাট রেগে না যায়। যেকোনো পরিস্থিতিতেই যেন মাথা ঠাণ্ডা রাখে। আর খুন-খারাবি একদম না। সে সেই কথা এখানেও খাটানোর চেষ্টা করলো। কিন্তু জোহরা যেন হানিফকে রাগানোর পণ করেই এসেছে, সে হাসতে হাসতে বললো, 'এক কাম করেন হানিফ ভাই, হাতের মাপে না দেখান গেলে কইলজা আর শইলের মাপে কন, আপনের অহংকার কতটুক?'

হানিফ হঠাৎ ট্রলার থেকে নেমে এলো। তারপর জোহরার একদম মুখোমুখি দাঁড়ালো। তারপর ক্রুদ্ধ গলায় বললো, 'তোর এই বিষ যদি আমি না নামাইছি তাইলে আমার নাম হানিফ আলী লস্কর না।'

হানিফ জোহরাকে হাল্কা ধাক্কা মেরে দূরে সরিয়ে দিয়ে বাড়ির দিকে হাঁটা দিলো। জোহরা পেছন থেকে গলা উঁচিয়ে বললো, 'ও হানিফ ভাই, কইয়া গেলেন না? আপনের অহংকারের সাইজ কতো? আপনের কইলজা না বাহাদুর ভাইর শইলের সমান? নাকি আপনের বুদ্ধির সমান?'

জোহরার ঠোঁটের কোণায় হাসি। সেই হাসির অর্থ জোহরা ছাড়া আর কেউ জানে না।

জোহরার হাত এখনো পুরোপুরি শুকায়নি। ক্ষতটা গভীর ছিলো অনেক। তবে আজ ব্যান্ডেজ খুলতে হবে। ব্যান্ডেজ খোলার জন্য এসেছে মনসুর। জোহরা বললো, 'একখান কথা ডাক্তার সাব।'

'কী কথা?'

'হাতের মইধ্যে আঘাত পাইলে এই যে এমনে ব্যান্ডেজ করন যায়। রক্ত বন্ধ করন যায়। বুকের মইধ্যে আঘাত পাইলে ব্যান্ডেজ করন যায় না?'

মনসুর কথা বললো না। জোহরা বললো, 'আপনে ডাক্তার মানুষ, কিন্তু একখান কথা কী আপনে জানেন?'

মনসুর চোখ তুলে তাকালো। জোহরা বললো, 'হাত পাও কাটলে যেমন রক্ত বাইর হয়, বুকের ভেতর কাটলেও এমন রক্ত বাইর হয়। কিন্তু হাত পাওয়ের রক্ত বন্ধ করনের ব্যবস্থা আছে। বুকের ভেতরের রক্ত বন্ধ করনের ব্যবস্থা নাই। হা হা হা।'

জোহরা হাসছে। তার হাসির দমকে ব্যান্ডেজ করা হাতটাও কাঁপছে। মনসুরের কাজ করতে অসুবিধা হচ্ছে। সে বললো, 'এটা এমন কোনো হাসির কথা না।'

জোহরার হাসি অবশ্য তাতে থামলো না। সে হাসতে হাসতেই বললো, 'মন যদি ভালো থাহে, তহন কান্দনের ঘটনায়ও হাসি আসে বুঝলেন ডাক্তার সাব?'

'মন ভালো থাকার কারণ কী?'

জোহরা আবারো হাসলো। তারপর হাসি থামিয়ে বললো, 'এক ঢিলে দুই পাখি মারতেছি। এই আনন্দে মন ভালো।'

'দুই পাখি কী কী?'

'এক নম্বর পাখি হইলো হানিফ ভাই। আর দুই নম্বর পাখি হইলেন আপনে। হা হা হা।'

'মানে কী?' মনসুর সামান্য কৌতূহলী হয়ে উঠলো।

জোহরা বললো, 'হানিফ আলী লস্কর খুব বীর বাহাদুর সাইজা, তোড়জোড় কইরা যাইতেছে নবীগঞ্জ থানায়, জব্বার মিয়ারে ছাড়াই আনতে। কিন্তু ঘটনা কী হইবো জানেন? ঘটনা হইবো, জব্বার মিয়ার লগে, তারও জেল খাটন লাগবো। সে হইলো বলদ। বলদ মানুষ নিজেরে চালাক ভাবলে যা হয় আর কী!'

মনসুরের কানে জোহরার কথা কিছু ঢুকছে না। তার কান আটকে আছে নবীগঞ্জে। হানিফ নবীগঞ্জ যাবে, এই কথা যেন সে বিশ্বাসই করতে পারছে না। সে আচমকা দুই হাতে জোহরার হাত জড়িয়ে ধরলো। তারপর ব্যাকুল গলায় বললো, 'জোহরা, আমি তোমার কাছে দুই হাত জোড় করে বলছি, তুমি আমকে হানিফের সাথে যাওয়ার ব্যবস্থা করে দাও। আমি এই জীবনে আর কোনদিন কারো কাছে কিছু চাইবো না জোহরা। জোহরা আমি সারাজীবন তোমার কাছে ঋণী হয়ে থাকবো। জোহরা...।'

মনসুর আরো কিছু বলতে চাইছিলো। কিন্তু তার আগেই জোহরা আবারো হা হা হা করে হেসে উঠলো। সে বললো, 'এক ঢিলে দুই পাখি মারণের কথা কইছি। আপনে দেখি এক পাখিতেই তটস্থ হইয়া গেছেন। তাইলে আরেক পাখির কথা শুনলে কী করবেন?'

মনসুর বুঝতে পারছে, জোহরাকে এসব বলে কোনো লাভ নেই। কিন্তু নবীগঞ্জ নামটা শোনার সাথে সাথে বুকের ভেতরটা হঠাৎ করেই আবার যেন শূন্য হয়ে গেলো। একটা তীব্র যন্ত্রণা। একটা প্রচণ্ড ঢেউ। সে দুই হাত জড়ো করে করুণ চোখে জোহরার দিকে তাকিয়ে রইলো। জোহরা হাত বাড়িয়ে তার দুখানা হাত ধরলো। তারপর বললো, 'কইছি না, আরেক পাখি আপনে? হানিফ চইলা গেলে ময়দান ফাঁকা। আর ফাঁকা ময়দানে কী হয়? হা হা হা।'

মনসুর আর কোনো কথাই শুনতে চাইলো না জোহরার। বরং যতভাবে সম্ভব আকুতি মিনতি করতে লাগলো। কিন্তু লাভ হলো না। জোহরা নির্বিকার গলায় বললো, 'আপনের যাইবেন হানিফের লগে?'

New Pdf download: www.PoragEducation.com + webtalkbd.com

উত্তেজনায় মনসুরের যেন দম বন্ধ হয়ে আসছে উত্তরটা দিতে। সে রুদ্ধশ্বাস গলায় বললো, 'হ্যাঁ জোহরা। হ্যাঁ, আমি যাবো। আমি যাবো জোহরা।'

জোহরা আশ্চর্য শীতল গলায় বললো, 'আপনে আমার চৌক্ষের আড়াল হওয়া মাত্র সে আপনেরে খুন করবে। এক মুহূর্ত দেরি করবো না। এইটা বোঝেন না ডাক্তার সাব?'

মনসুর আসলেই বোঝে না। সে আসলে কিছুই বুঝতে চায় না। সে কেবল নবীগঞ্জ যেতে চায়। যেকোনো মূল্যে যেতে চায়। যেকোনোভাবে যেতে চায়। কিন্তু সে জানে জোহরা তাকে আর কোথাও যেতে দেবে না। কখনোই না। তার ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে গেছে এই লস্করের চরে। এখানেই তার মৃত্যু। জোহরার সামনে বসে যেন সেই কথাটিই নিজেকে ফিসফিস করে শোনালো মনসুর।

হানিফ চলে গেলো ভোরবেলা। সে যাওয়ার সময় দেখা গেলো জোহরার কথা মতো ছোট দল নিয়েই গিয়েছে সে। বিষয়টি নিয়ে বাহাদুর হাসিঠাট্টা করলেও জোহরা হঠাৎই যেন গম্ভীর হয়ে রইলো। বিষয়টা ভালো ঠেকলো না তোরাব আলী লস্করের কাছেও। তিনি জোহরাকে ডেকে বললেন, 'কী হইছে, তোর মুখ গম্ভীর কেন?'

জোহরা বললো, 'মুখ গম্ভীর না, ঠোঁটে জ্বর ঠোসা উঠছে, এইজন্য হাসতে পারতেছি না।'

তোরাব আলী লক্ষ করে দেখলেন সত্যি সত্যিই তার ঠোঁটের দুইপাশে ক্ষতের আভাস। তিনি বললেন, 'তাইলে ডাক্তারের কাছে যা। ভালোয় ভালোয় তারে দেখাই নিয়ায়। অসুখ লাইল্যা পাইল্যা বড় করন ভালো না।'

জোহরা বললো, 'আমার সময় মতো আমি যামু দাদাজান। এখন একখান কাম করো।'

'কী কাম?'

'একবার চরের সব অস্ত্রশস্ত্র বাইর করতে কইছিলা না? সব ভালো বড় ট্রলারগুলা রেডি করতে কইছিলা না?'

'হুম।'

'সেই কামের কামতো কিছুই হয় নাই। এইবার এক কাম করো। আবারো সেইগুলান ঠিকঠাক করতে কও সবাইরে। সব জিনিসপত্র এক জায়গায় জড় করতে কও। আর যেইগুলান অনেকদিন ব্যবহার করা হয় নাই, সেইগুলানও সাড়াই করতে কইয়া দেও।'

'কেন? কী হইছে?'

জোহরা নিস্পৃহ গলায় বললো, 'কিছু হয় নাই দাদাজান।'

'তাইলে?'

'তাইলে কিছু না। দেখছো কী গরম পড়তেছে?'

'হু, আইজ খুবই গরম।'

জোহরা হাই তুলতে তুলতে বললো, 'আইজ মনে হয় বৃষ্টি হইবো খুব। ঝড়, বইন্যা হইবো। আমার খুব ঘুম পাইতেছে। আমারে একটু ঘুমাই দাদাজান। আমারে বিরক্ত কইরো না। আমি না জাগা পর্যন্ত আমি জাগাইও না।'

তোরাব আলী লস্কর তাকিয়ে দেখলেন মাথার ওপর ঝকঝকে আকাশ। যতদূর চোখ যায় বিস্তৃত বিল। সেই বিলে আয়নার মতো চকচকে আদিগন্ত জলরাশি। জলে মৃদু ঢেউ। সেই ঢেউয়ের মাথায় সূর্যের আলো পড়া চকমকি রোদ।

তিনি জোহরার দিকে তাকালেন, 'তুই ঝড়, বইন্যা বৃষ্টি পাইলি কই? এই ভ্যাপসা গরম পড়ছে দেইখ্যাই বৃষ্টি নামবো?'

জোহরা ঘুম জড়ানো গলায় বললো, 'এক ফোঁটা বাতাসও নাই কোনোদিকে দেখছো। তুমিইতো কইতা, এইরম হইলে ঝড়, বইন্যা, বৃষ্টি-বাদলা হয়?'

তোরাব আলী বললেন, 'হ, তাতো হয়ই। আইজও তেমন হইবো কিনা কে জানে! তয় সবকিছু কেমন জানি থম মাইরা আছে। ও জোহরা?'

তিনি জোহরাকে ডাকলেন কিন্তু জোহরা ততক্ষণে তলিয়ে গেছে গভীর ঘুমে। কী শান্ত, স্নিগ্ধ, সরল একখানা মুখ। সেই মুখের দিকে তাকিয়ে তোরাব আলীর বুকের ভেতরটা কেমন করে উঠলো। কতদিন হয়, মেয়েটাকে একটু আদর করেন না। একটু যত্ন করেন না। মেয়েরা আসলে ছোট থাকলেই ভালো, কাছে রাখা যায়, আদর করে দেয়া যায়। তারা যত বড় হতে থাকে, তত দূরে সরে যেতে থাকে। তোরাব আলী লস্করের বুক চিরে একটা দীর্ঘশ্বাস বের হয়ে এলো। তিনি ঘুমন্ত জোহরার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন। জোহরাকে দেখে মনে হচ্ছে না সে এই পৃথিবীর কোথাও আছে। সে যেন ডুবে আছে কোনো এক গহীন, গভীর, অতল স্বপ্নের দেশে। জোহরার ভাবনার সেই গহীন গভীর অতল জগৎটা দেখার খুব ইচ্ছা তোরাব আলীর। এইটুকু এক মেয়ে। নিজের হাতের ওপর বড় হয়েছে। অথচ সেই মেয়েটাই কিনা তার কাছে হয়ে উঠলো সবচেয়ে বেশি রহস্যময়, সবচেয়ে বেশি অচেনা! এমন অদ্ভুত কেন সে? তোরাব আলী লস্করের হঠাৎ মনে হলো, জোহরার ঠোঁটের কোণায় এখনো সেই হাসিটুকু লেগে আছে। ওই হাসিটুকুর অর্থ তিনি জানেন না। জানে না কেউই।

বিকেলের দিকে সত্যি সত্যি আকাশ অন্ধকার করে বৃষ্টি নামলো। সাথে ঝোড়ো হাওয়া। গত কদিনের ভ্যাপসা গরম তাতে কেটে যেতে থাকলেও প্রকৃতি হয়ে উঠতে লাগলো ভয়ংকর। রাত যত বাড়তে থাকলো, ঝড়-বৃষ্টির গতিও বাড়তে থাকলো ততই। একা ছোট্ট ওই ঘরটাতে মনসুরের কেন যেন খুব ভয় করতে লাগলো। কাছেই কোথাও তীব্র শব্দে বাজ পড়লো। একটা গাছ ভেঙে পড়লো সাথে সাথেই। রাত কত হবে মনসুর জানে না। তবে সে বিছানার ওপর জড়সড় হয়ে বসে রইলো। তার মনে হচ্ছে যেকোনো সময় এই উন্মাতাল ঝোড়ো হাওয়া তার

New Pdf download: www.PoragEducation.com + webtalkbd.com

ঘরের চালা উড়িয়ে নিয়ে যাবে। মুহুর্মুহু বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে রাতের অন্ধকারে। আর ঠিক সেই মুহূর্তে মনসুরের ঘরের দরজায় এসে কেউ একজন দাঁড়ালো। তারপর বার দুয়েক দরজায় ধাক্কা মেরে মনসুরকে ডাকলো, 'ডাক্তার সাব, ডাক্তার সাব?'

মনসুর ঘোরের মতো অন্ধকারেই বিছানা ছেড়ে নামলো। তারপর দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। ওপার থেকে জোহরার কণ্ঠস্বর ভেসে এলো, 'আমি ভিজে শীতে মারা যাইতেছি ডাক্তার। দরজাটা খোলেন।'

মনসুর দরজাটা খুললো। সেই মুহুর্মহু বিদ্যুতের আলোয় জোহরাকে দেখা যাচ্ছে। তার পরনের হালকা সবুজ রঙের শাড়িটা ভিজে শরীরের সাথে লেপ্টে আছে। সে মনসুরের বুকের কাছে এসে দাঁড়ালো। তারপর ফিসফিস করে বললো, 'আমারে একটু জড়াই ধরবেন ডাক্তার? আমার খুব শীত করতেছে। খুব শীত। খুব।'

মনসুর জোহরাকে জড়িয়ে ধরলো। জোহরা বললো, 'আমার ঠোঁটে অসুখ হইছে। দাদাজান বললো আপনের কাছে ওষুধ আছে। আছে আপনের কাছে ঠোঁটের ঔষধ?'

মনসুর জবাব দিলো না। জোহরা বললো, 'আমারতো মনেও অসুখ হইছে, আপনার কাছে মনের ওষুধ নাই?'

মনসুর এবারো জবাব দিলো না। জোহরা অবশ্য আর কোনো জবাব চাইলোও না। সেই তুমুল ঝড়-বৃষ্টির রাতে জোহরারও হঠাৎ ঝড়-বৃষ্টি হয়ে যেতে ইচ্ছে করলো। হলোও যে। তুমুল ঝড়। উম্মাতাল বান। যেন ভাসিয়ে নিলো সব কিছু। যদিও ভোরের আগেই থেমে গেলো সেই প্রলয়ঙ্করী ঝড়, তুমুল বৃষ্টি। পরদিন সকাল যেন নিয়ে এলো নতুন একটি ঝকঝকে দিন। সেই ঝকঝকে দিনের রোদ ঝলমলে আলোয় গতকাল রাতের প্রলয়ঙ্করী ঝড়-বৃষ্টিকে মনে হচ্ছিলো বিভ্রম।

নবীগঞ্জ বড় বাজারের থানাসংলগ্ন মসজিদে দাওয়াতের জন্য নতুন দল এসেছে। সেই দলের সাথে ভিড়ে গেছে হানিফরা। তারা মূল দলের সাথে দোকানে দোকানে গিয়ে দাওয়াত দিচ্ছিলো। আজানের শব্দ শুনে মসজিদের দিকে রওয়ানা করেছে সবাই। দলে সবচেয়ে ছোট মুসুল্লির নাম হচ্ছে হামিদুল। হামিদুলের মাথা থেকে পা পর্যন্ত সাদা জোব্বা। লাল-সাদা বড় রুমালে মাথা ঢাকা। রুমালের ওপর টুপি। তার সামনে হানিফ, খলিল আর মোকাররম। হানিফ ফিসফিস করে হামিদুলকে বললো, 'আমরা সবাই মসজিদে ঢুকতেছি, নামাজে। এই ফাঁকে তুই থানার দিকে একটা টুঁ মাইরা আয়।'

হামিদুল বললো, 'আমার যাওন কী ঠিক হইবো হানিফ ভাই? এর আগে জোহরা বু'র লগে আমি একবার গেছিলাম। পুলিশতো আমারে চিন্যা ফালাইতে পারে।'

হানিফ হাসলো, 'তোরে এই অবস্থায় দেখলে তোর আব্বায়ও চিনবো না। যা।'

হামিদুল থানার কাছে গেলো। থানার সামনে দুজন পুলিশ কনস্টেবল দাঁড়ানো। হামিদুল তাদের পাশ দিয়েই খুব স্বাভাবিক ভঙ্গিতে হেঁটে থানার দিকে এগুলো। থানার মূল গেটের কাছে আসতেই একজন পুলিশ কনস্টেবল হমিদুলকে থামালো। পুলিশ কনস্টেবলের নাম আফসার। ওসি মইনুল হোসেন এই আফসারকে বিশেষ পছন্দ করেন। তারমতো অনুসন্ধিৎসু পুলিশ কনেস্টবল সচরাচর দেখা যায় না। আফসার হামিদুলকে দেখে সালাম দিয়ে বললো 'কই যান হুজুর?'

New Pdf download: www.PoragEducation.com + webtalkbd.com

হামিদুল হাসলো, 'মসজিদের টাংকিতে পানি নাই। ওজু করন যাইবো?'

আফসার খানিক ইতস্তত করে অবশেষে বললো, 'যাইবো।'

সে নিজেই তাকে থানার ভেতরের বাথরুমে নিয়ে গেলো। হামিদুল বললো, 'জীবনে প্রথম থানায় ঢুকলাম। ডর লাগতেছিলো।'

আফসার বললো, 'ডরের কী আছে হুজুর? আপনে এত ছোট বয়সে আল্লাহর পথে নামছেন, এইটাইতো বিরাট ব্যাপার। দেইখ্যাই পরানডা জুড়াই গেলো।'

হামিদুল কথা বললো না। আফসার বললো, 'অল্প বয়সে বিয়া করছিলাম, বাপও হইছি অল্প বয়সে। আমার পোলার বয়স ছয়। সে এহনই মাশাল্লাহ মক্তবে যায়। আমপাড়া শুরু করছে।'

হামিদুল গম্ভীর ভঙ্গিতে বললো, 'হুম। যত কম বয়সে যাইবো, ততই ভালো।'

'দোয়া কইরেন হুজুর। ইচ্ছা আছে, ভবিষ্যতে আপনের মতোই আল্লাহর পথে দিবো।'

'দোয়াতো করবোই। আর আমরাতো মসজিদেই আছি। নামাজ পড়তে আইসেন। তহন অনেক কথা-বার্তাই জানতে পারবেন।' হামিদুলের উদ্দেশ্য হচ্ছে আফসারের সাথে খাতির জমানো। সে মসজিদে এলে গল্পচ্ছলে তার কাছ থেকে অনেক তথ্যই হয়তো বের করা যাবে।

আফসার বললো, 'জে, আসবো। মসজিদতো কাছেই। চইল্যা আসবো হুজুর।'

হামিদুল মনে মনে প্রমাদ গুনলো। তারপর আচমকাই কথাটা জিজ্ঞেস করলো, 'আচ্ছা, আপনেগো এইহানে আসামি নাই? হুনছিলাম বিরাট বড় এক ডাকাইত ধরছিলো একবার এইহানে?'

আফসার বললো, 'আর বইলেন না। কী যে এক যন্ত্রণা! ধরছিলো একজনরে। কিন্তু সেতো এহন আর এইহানে নাই। তারে নিয়া গেছে ডিস্ট্রিক্ট জেলখানায়। কতদিন আর এইহানে রাখবো। লম্বর ডাকাইতগো লোক এইহানে রাহন রিস্ক।'

'সে এইহানে নাই?'

'নাহ।'

কথা শুনে হামিদুল হতভম্ব হয়ে গেলো। জব্বার এখানে না থাকলেতো বিপদ! সে আর এক মুহূর্ত দেরি করলো না। কোনোমতে নাকে মুখে পানি ছিটিয়ে ওজুর ভান করে ছুটে গেলো হানিফদের কাছে। ঘটনা শুনে হানিফ বোকা বনে গেলো! এখন কী করবে সে? পুরো চরের কাছে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে এসেছে সে, জব্বারকে না নিয়ে আর চরে ফিরে যাবে না। তাহলে? এখন কোন মুখে জোহরার সামনে গিয়ে দাঁড়াবে হানিফ? শেষদিনে জোহরার বলা কথাগুলো মনে পড়তেই হানিফের শিড়দাঁড়া টানটান হয়ে গেলো। যেভাবেই হোক, জব্বারকে নিয়েই ফিরবে সে। কোনো একটা বুদ্ধি খুঁজে বের করতেই হবে। হানিফ নিশ্চিত, এই পরিস্থিতিতেও জোহরা কোনো না কোনো একটা উপায় খুঁজে বের করতোই।

সেদিন রাতেই নিজেদের মধ্যে গোপন আলোচনায় বসলো তারা। কিন্তু কেউই কোনো জুতসই উপায় খুঁজে বের করতে পারলো না। শেষে সিদ্ধান্ত হলো এখান থেকে হানিফসহ তিনজন চলে যাবে জেলা শহরে। বাকিরা নবীগঞ্জেই থাকবে। লস্করের চর থেকে ট্রলার নিয়ে এসেছে চুন্নু আর ছানাউল। তারা ট্রলারভর্তি চালকুমড়ো নিয়ে এসেছে, যাতে লোকজন তাদের সন্দেহ করতে না পারে। হনিফ তাদের সাথেও কথা বললো। জেলা শহর থেকে আগে পরিস্থিতি বুঝে, খোঁজখবর নিয়ে আসবে হানিফরা। তারপর প্রয়োজন বুঝে ছানাউল আর চুন্নকে দিয়ে খবর পাঠানো হবে লস্করের চরে, যাতে আরো বড় দল নিয়ে আসতে পারে তারা।

তবে জেলা শহরে যাওয়ার আগে আরো কিছু খোঁজ খবর নিয়ে যেতে পারলে ভালো হতো। কিন্তু এখানে কে তাদের খোঁজখবর দেবে! বহুদিন হারাধনের সাথেও কোনো যোগাযোগ নেই। জব্বার ধরা পড়ার পর মাঝখানে কয়েক বছর কেটে গেলেও হারাধনের সাথে আর যোগাযোগ করা হয়নি। এতদিনে পুলিশও নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছে যে তার সাথে আর লস্করদের কোনো যোগাযোগ নেই। সুযোগটা নিলো হানিফ। এই গোটা নবীগঞ্জে হারাধনের মতো বিশ্বস্ত আর কেউ নেই তাদের। অনেক ভেবে-চিন্তে খুব সতর্কতার সাথেই হারাধনের কাছে খবর পাঠালো হানিফ। খবর নিয়ে গেলো চাল কুমড়ার ট্রলারে থাকা চুন্নু।

ফজরের আজান হয়েছে। আজান শুনে ঘুম ভেঙে গেছে পুলিশ কনস্টেবল আফসারের। গতকাল হামিদুলের সাথে কথা বলে তার ভালো লেগেছে। ওইটুকু এক ছেলে কী সুন্দর করে কথা বললো! ছেলেটার সাথে নিশ্চয়ই আজও কথা বলার সুযোগ হবে। আফসার একটু আগেভাগেই বিছানা ছেড়ে উঠে গেলো। ফজরের নামাজটা আজ পড়বে সে। কিন্তু মসজিদের বাঁ দিকের কোনায় এসে একটু থমকে গেলো আফসার। ভোরের আলো তখনো ঠিকঠাক ফোটেনি। সেই আলোতেই সে দেখলো করাতকলের মালিক হারাধন মসজিদের কোনায় দাঁড়ানো। সে ভেতরে থাকা কারো সাথে কথা বলছে। ভেতরে যারা আছে, তাদের দেখা যাচ্ছে না। তবে তার কথা বলার ভঙ্গিতে স্পষ্ট সতর্কতা। এই সাতসকালে মসজিদের কাছে কী হারাধনের? সে হিন্দু মানুষ, সে থাকবে মন্দিরের কাছে! বিষয়টা একটা স্পষ্ট অস্বস্তিই তৈরি করলো আফসারের মনে। সে আরো খানিক্ষণ অপেক্ষা করলো। মসজিদে এখনো কোন মুসুল্লিদের দেখা যাচ্ছে না। তবে তাদের আসার সময় হয়ে গেছে। হারাধন অবশ্য বেশিক্ষণ থাকলো না। খানিকবাদেই চলে গেলো সে। অদ্ভুত ব্যাপার হচ্ছে নামাজ পড়তে গিয়ে হামিদুলকেও দেখতে পেলো না আফসার।

বিষয়টা নিয়ে ভেতরে ভেতরে বেশ একটা অস্থিরতা কাজ করতে লাগলো আফসারের। ওসি মইনুল হোসেন অফিসে আসেন তাড়াতাড়িই। ঘটনাটা তাকে খুলে বললো আফসার। মইনুল হোসেন কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, 'গতকাল সন্ধ্যায় যে ছেলেটি থানার ভেতর ঢুকেছিলো, তার বয়স কতো হবে?'

New Pdf download: www.PoragEducation.com + webtalkbd.com

'তাতো বলতে পারবো না স্যার। এই বারো তেরো হইতে পারে, আবার বেশিও হইতে পারে।'

'সে কী আসামী নিয়ে কিছু জিজ্ঞেস করেছিলো?'

'জে স্যার।'

'লস্কর ডাকাতদের কথা?'

'সে ওইভাবে জিগায় নাই। কইছে বড় আসামি আছেনি, আমিই তহন কইছি। তারপরই তাড়াহুড়া কইরা চইলা গেলো।'

'হুম। তুমি ঠিক দেখছো ভোরবেলা মসজিদে ওটা হারাধন ছিলো?'

'জি স্যার।'

মইনুল হোসেন আফসারকে বিদায় দিয়ে এসআই একরামুল হককে খবর পাঠালেন। একরামুল হক ঘটনা শুনে বললো, 'স্যার, ঘটনা সিরিয়াস মনে হইতেছে।'

'হুম। কিন্তু খুব সাবধান। হুট করে কিছু করা যাবে না। অনেক সময় যেমন দড়ি দেখে সাপ মনে হয়, আবার অনেক সময় সাপ দেখেও দড়ি মনে হয়। এটা মাথায় রাখতে হবে।'

'জি স্যার।'

'আরেকটা কথা। যারা আছে, তারা সবাইই ওই দলের নাও হতে পারে। ভালো লোকজনই বেশি থাকতে পারে। ওরা হয়তো তাদের ব্যবহার করে সুযোগ নিচ্ছে। সুতরাং অন্যদের যেন কোনো অসম্মান না হয়, এটাও খেয়াল রাখতে হবে।'

'কিন্তু স্যার, বুঝবো কেমনে যে কে ভালো আর কে মন্দ?'

'সেটা বোঝা খুব সহজ। হারাধন আছে, ওরে ধরলেই হবে। তবে খুব সাবধান। ওরা যখন এইভাবে এসেছে, বড় কোন উদ্দেশ্য আছে। তার মানে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে প্রস্তুত হয়েই এসেছে। সুতরাং সাবধান।'

হনিফরা ধরা পড়লো এশার নামাজের সময়। তবে অতি সতর্ক থাকার পরও সবাইকে ধরা গেলো না। ট্রলারের দুজন পালিয়ে গেলো। তাদের সাথে ছিলো হামিদুল। হামিদুলকেও ধরা গেলো না। ওসি মইনুল হোসেন তারপরও খুশি। লস্কর ডাকাতদের এতজন লোক একসাথে শেষ কবে ধরা পড়েছিলো, তা কেউ মনে করতে পারছে না। বহুকাল পরে ওসি মইনুল হোসেন খোশ-মেজাজে বসে আছেন তার চেয়ারে। সামনে একরামুল হক। তিনি একরামুল হককে বললেন, 'কী বুঝলেন একরামুল সাব?'

একরামুল হক বিগলিত হাসিতে বললেন, 'ধৈর্য স্যার। সবই ধৈর্যের ফল।'

'সেটা ঠিক আছে। কিন্তু ধৈর্যের সাথে আরো একটা ব্যাপার আছে।'

'কী ব্যাপার?'

'বুদ্ধি। মাথায় বুদ্ধি না থাকলে ধৈর্য ধরে বসে থাকবেন, এদিকে চোর চুরি করে চলে যাবে, লাভ হবে না। ধৈর্যের সাথে বুদ্ধিও লাগে। সেই জিনিস আপনার নাই, আছে আফসারের।'

একরামুল হক একটু অপমানিত বোধ করলেও কিছু বললেন না। তবে মইনুল হোসেন বললেন, 'বুদ্ধি নিয়ে চিন্তা করে লাভ নেই। ওটা আল্লাহর দান। বুদ্ধি আমারও কম। এমনকি আপনার চেয়েও কম। না হলে এতদিনে কিছু একটা হয়ে যেতো। আমার চেয়ে যে আপনার বুদ্ধি বেশি, সেটার প্রমাণ ওই ওষুধের লিস্ট। ওটা আপনি না বললেতো আমি বুঝতামই না। কিন্তু তাতেওতো লাভ কিছু হলো না। এখন এক কাজ করেন। হানিফ মিয়ারে নিয়া নুরুন্নবীর কাছে দেন। সে একটু ঝাল মিটাক। আমার একটা তথ্য দরকার।'

'কী তথ্য স্যার?'

'ওইটাই। মনসুরের ঘটনা সত্য কিনা? আমি একটু কনফিউজড। এইজন্যই এই ঘটনা কাউকে জানাতে বারণ করেছি। কিন্তু এখনতো যাচাই করার সুযোগ আছে। দুইজনতো আর একই মিথ্যা একইভাবে বলবে না!'

হানিফকে সামনে পাওয়ামাত্রই যেন এতদিনকার পুষে রাখা রাগ, ক্রোধ, জিঘাংসা একসাথে জেগে উঠলো নুরুন্নবীর। কালিগঞ্জের সেই ভয়ংকর রাতে জোহরার সাথে হানিফও ছিলো, এই কথা শোনার পর নুরুন্নবী রীতিমতো উন্মাদ হয়ে গেলো। তবে তাতেও যে খুব একটা সুবিধা করতে পারলো সে, তেমন নয়। কারণ প্রচণ্ড আত্মম্ভর হানিফ তার এই পরিস্থিতিকে কোনোভাবেই মেনে নিতে পারছিলো না। ফলে নমনীয় আচরণের পরিবর্তে সে বরং হয়ে উঠলো আরো বেশি দুর্বিনীত, উদ্ধত, একগুঁয়ে। কিন্তু এর ফলাফল হলো ভয়াবহ।

দিন শেষে মইনুল হোসেন যখন হানিফকে দেখলেন, তখন আঁতকে উঠলেন তিনি। হানিফের চোখ মুখ ফুলে ঢোল হয়ে আছে। ঠোঁটের অর্ধেকটা নেমে গেছে নিচে। সারা শরীর ক্ষতবিক্ষত। রক্ত জমাট বেঁধে কালো হয়ে আছে ক্ষতস্থানগুলোতে। কিন্তু কোনো প্রশ্নের উত্তরেই মুখ খোলেনি হানিফ। এভাবে আর কিছুক্ষণ চললে নুরুন্নবী তাকে নির্ঘাত খুন করে ফেলবে। হানিফকে শুশ্রূষার জন্য পাঠিয়ে মইনুল হোসেন বরং খলিলকে নিয়ে বসলেন নুরুন্নবীর সাথে। এতে অবশ্য কাজ হলো। গড়গড় করে সব বলে দিতে থাকলো খলিল। এবং সেই মুহূর্তে মইনুল হোসেন পুরোপুরি নিশ্চিত হয়ে গেলেন যে মনসুর এখনো বেঁচে আছে। সে আটকা পড়ে আছে লস্করের চরে। কিন্তু তার এই বেঁচে থাকাটাকে অর্থহীন এক বেঁচে থাকা মনে হতে লাগলো মইনুল হোসেনে কাছে।

সেই পুরোটা রাত নির্ঘুম কাটালেন মইনুল হোসেন। তিনি কিছুতেই তার করণীয় নির্ধারণ করতে পারছেন না। এই মুহূর্তে তার যদি কিছু করণীয় থেকে

New Pdf download: www.PoragEducation.com + webtalkbd.com

থাকে, তবে তা হলো সন্তান হারানো এক পিতার কাছে গিয়ে তাকে পৃথিবীর সবচেয়ে আনন্দময় সংবাদটি দেয়া। জগতে কোনো পিতার কাছে এর চেয়ে আনন্দময় আর কোনো সংবাদ হতে পারে না। তিনি জানবেন তার মৃত সন্তানটি আসলে মরেনি, সে বেঁচে আছে। সুস্থ আছে। সে ফেরার জন্য আকুল হয়ে অপেক্ষা করছে। খবরটি দেয়ার পরে মইনুল হোসেন আজাহার খন্দকারের মুখের দিকে নিষ্পলক তাকিয়ে থাকতে চান। কারণ তিনি জানেন, এরপরের মুহূর্তটিই হতে পারে তার দেখা জগতের সবচেয়ে সুন্দরতম মুহূর্ত। পৃথিবীতে এর চেয়ে সুন্দর কিছু কী আর আছে? মইনুল হোসেন নিশ্চিত জানেন, নেই। কিন্তু তারপরও এই খবরটি তিনি দ্বিধাহীনভাবে দিতে যেতে পারছেন না। কারণ তিনি এও জানেন, কিছু কিছু মৃত্যু অন্তত বেঁচে থাকার চেয়ে ভালো। কিছু কিছু বেঁচে থাকা নিশ্চিত করেই মৃত্যুর চেয়েও ভয়ংকর। কী করবেন মইনুল হোসেন?

সারারাত নির্ঘুম মইনুল হোসেন শেষ রাতে এসে সিদ্ধান্ত নিলেন তিনি খবরটি আজাহার খন্দকারের কাছে দেবেন। ঘটনা যা-ই ঘটুক, এই খবর চেপে রাখা কোনো সুস্থ মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। পরদিন তিনি আজাহার খন্দকারকে ডেকে আনলেন। এতদিন পর থানা থেকে ডাক পেয়ে আজাহার খন্দকার একটু অবাকই হলেন। তিনি চিন্তিত গলায় বললেন, 'কোনো সমস্যা ওসি সাব?'

মইনুল হোসেন স্বাভাবিক ভঙ্গিতে বললেন, 'না, কোনো সমস্যা না। আপনি কেমন আছেন খন্দকার সাহেব?'

'জি আছি, আল্লাহর রহমতে ভালোই আছি।'

'আপনার ছোট ছেলেকেতো বিয়ে করিয়েছেন, তা কেমন আছে তারা?'

'জি, তারাও ভালোই আছে।'

'ছেলের বউ? শুনেছিলাম সে অনেকদিন খুব আপসেট হয়েছিলো?'

'আসলে কী ওসি সাব, সে মাইয়া ভালো। এমন মাইয়া আমি আমার এই জীবনে আর দেহি নাই। কিন্তু কী করবো বলেন, কপালের ফের। মানুষরেতো আর আল্লাহয় তার কপাল বদলানোর ক্ষমতা দেয় নাই!'

আজাহার খন্দকার দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন। তার সেই দীর্ঘশ্বাস সত্যিকার অর্থেই ছুঁয়ে গেলো মইনুল হোসেনকেও। দীর্ঘসময় তিনিও কোনো কথা বললেন না। আজাহার খন্দকার বললেন, 'যাই হোক, আল্লাহর ইচ্ছা-অনিচ্ছার ওপরে আর কোনো কথা নাই। আল্লায় যা করে, ভালোর লাইগ্যাই করে। এহন সে ভালোই আছে। কত মানুষতো এর চাইতেও খারাপ থাহে। থাহে না?'

'হুম, তা থাহে।'

'এইটা কইয়াই এহন নিজেরে সান্ত্বনা দেই। কী করবো কন!'

মইনুল হোসেন খানিক চুপ করে থেকে হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেন। তারপর নিজের ঘরের দরজাটা বন্ধ করলেন। তারপর নিজ হাতেই জানালাগুলোও ভেজিয়ে দিলেন। আজাহার খন্দকার খানিক ভয় পেয়ে গেলেন। তিনি বললেন, 'কোনো সমস্যা ওসি সাব?'

এবার আর হাসলেন না মইনুল হোসেন। তিনি গম্ভীর হয়ে রইলেন দীর্ঘসময়। তারপর টেবিলের ওপর রাখা আজাহার খন্দকারের হাতটা একহাতে চেপে ধরলেন। তারপর বললেন, 'খন্দকার সাব, মনসুর বেঁচে আছে!'

আজাহার খন্দকার প্রথমে কথাটা বুঝতে পারলেন না। তিনি বললেন, 'কী!'

মইনুল হোসেন খুব শান্ত, খুব স্থির ভঙ্গিতে বললেন, 'আপনার বড় ছেলে মনসুর বেঁচে আছে। সে মারা যায়নি। আপনারা যার লাশ কবর দিয়েছেন, সেটি তার লাশ নয়। সে আছে লস্করের চরে। তাকে সেই রাতে তোরাব আলী লস্কর ধরে নিয়ে গিয়েছিলো।'

আজাহার খন্দকারের মনে হলো তার ফুসফুস থেকে সব বাতাস বের হয়ে গেছে। তার কানের কাছে বিকট শব্দে কোনো বাজ পড়েছে। তিনি সেই কানে আর কিছু শুনতে পাচ্ছেন না। তার চোখের সামনে থাকা মইনুল হোসেনকেও তিনি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন না। সবকিছুই ক্রমশ ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে। চারপাশের জগতটা ঘুরছে। তিনি বার দুই কথা বলতে গিয়ে আবিষ্কার করলেন তার গলা দিয়ে কোনো শব্দ বের হচ্ছে না। মইনুল হোসেন তার হাতটা শক্ত করে চেপে ধরলেন। আজাহার খন্দকারের সারা শরীর কাঁপছে। তার টুপির ফাঁক দিয়ে নেমে আসছে ঘামের স্রোত।

New Pdf download: www.PoragEducation.com + webtalkbd.com

কণা বললো, 'আপনার কী হয়েছে বাবা, শরীর খারাপ?'

আজাহার খন্দকার বসে আছেন দখিন দিকের মাচার মতো জায়গাটাতে। তার সামনে বিস্তৃত বিল। বিলের ওপারে আকাশ। আকাশে মেঘ। মেঘগুলো কেমন আদল পাল্টাচ্ছে। খানিক মানুষের মুখের মতো, তারপর বৃক্ষ, পশু, মসজিদের মিনার কিংবা গম্বুজের মতো। কোনো দিকে তার কোনো খেয়াল নেই। কণা আবারো বললো, 'বাবা?'

আজাহার খন্দকার যেন চমকে উঠলেন, 'হুম?'

'মন তখন থেকে কাঁদছে, আপনার কাছে আসবে।'

আজাহার খন্দকার সামান্য ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালেন। কণার কোলে মন। সে তার কাছে আসার জন্য কাঁদছে। কণা খুবই অবাক হলো, আজাহার খন্দকার নাতিকে কোলে নেয়ার জন্য হাত বাড়ালেন না। তিনি আবার আগের মতো শূন্য চোখে তাকিয়ে রইলেন। কণা সামনে এসে দাঁড়ালো। তারপর আজাহার খন্দকারের কপালে আলতো করে হাত রাখলো, 'জ্বর আসেনিতো বাবা?'

আজাহার খন্দকার এবার কণার দিকে মুখ তুলে তাকালেন। কণা বললো, 'কী হয়েছে বাবা?'

তিনি কথা বললেন না। তবে কণা দেখলো তার চোখের কোল ভেজা। সে মনকে কোল থেকে নামিয়ে আজাহার খন্দকারের পাশে বসে পড়লো। তারপর বললো, 'বাবা? কী হয়েছে?'

আজাহার খন্দকার এবারও কথা বললেন না। বরং কণাকে অবাক করে দিয়ে তিনি ধীর পায়ে উঠে চলে গেলেন। কণা অনেকটা সময় মনকে কোলে নিয়ে সেখানে দাঁড়িয়ে রইলো। আজাহার খন্দকারের আচরণে এতটা অবাক সে এর আগে কখনো হয়নি। রাতে মঞ্জুকে কথাটা বললো সে, 'বাবার কী হয়েছে?'

'কী হইবো?'

'তুমি কথা বলো নাই?'

'নাতো। সময় পাইলাম কই?'

'একটু দেখবে? বিকেল বেলা দেখলাম একা একা বিলের ধারটাতে বসে আছে। সম্ভবত কাঁদছিলো!'

'কাঁদছিলো! কেন?' মঞ্জু ভারি অবাক হলো।

'হুম। আমি জিজ্ঞেস করলাম, কিন্তু কিছুই বললেন না। উঠে চলে গেলেন।'

মঞ্জু সাথে সাথেই ঘর থেকে বেরিয়ে আজাহার খন্দকারের ঘরের সামনে এসে দাঁড়ালো। ঘরের দরজাটা ভেজানো। সে বার কয়েক ডাকলো। কিন্তু ভেতর থেকে কেউ সাড়া দিলো না। দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকলো মঞ্জু। ঘর অন্ধকার। কিছু একটাতে সামান্য হোঁচট খেলো সে, তবে ঘরে কেউ নেই। মঞ্জু চিন্তিত ভঙ্গিতে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো। কণা দাঁড়িয়ে আছে বারান্দায়। মঞ্জু কণাকে দেখে বললো, 'আব্বাতো ঘরে নাই।'

'নাই!'

'উহু।'

'এতরাতে বাবা কোথায় গেলেন তাহলে?'

মঞ্জু কণার কথার জবাব দিলো না। সে ঘরে ঢুকে আলনা থেকে শার্টটা গায়ে চড়াতে চড়াতে বললো, 'আমার টর্চটা কই? একটু লাগবে।'

'তুমি এখন কোথায় যাবে তাকে খুঁজতে?'

'দেখি কোথায় যাওন যায়।'

কণা টর্চটা এনে মঞ্জুকে দিলো। মঞ্জু হঠাৎ বললো, 'এক মিনিট।'

'কী হয়েছে?'

'বাবার ঘরের সিন্দুকটা সম্ভবত খোলা। অন্ধকারে খোলা পাল্লাটাতে মনে হয় পায়ে ধাক্কা লাগছিলো। একটু দেইখা আসি।'

মঞ্জুর ধারণা সত্য। আজাহার খন্দকারের ঘরের বড় সিন্দুকের দরজাটা হাট করে খোলা!

আজাহার খন্দকার বসে আছেন ওসি মইনুল হোসেনের সামনে। এই গরমেও তার গায়ে একটা চাদর। তিনি বসে আছেন অসহায়ের মতন। এতরাতে আজাহার খন্দকারকে দেখে মইনুল হোসেন সামান্য অবাক হয়েছেন। রাতের খাবার খেয়ে

New Pdf download: www.PoragEducation.com + webtalkbd.com

তিনি কেবল ঘুমাতে যাচ্ছিলেন। এই সময়ে তার ঘরের দরজায় শব্দ, 'ওসি সাব, ঘুমাই গেছেন? আমি আজাহার খোনকার।'

আজাহার খন্দকারের গলায় স্বর নেই। ভাঙা গলা থেকে ফ্যাঁসফ্যাঁস শব্দ বের হচ্ছে। মইনুল হোসেন বললেন, 'কী খবর খোনকার সাব?'

'আমি আমার ছেলেরে আনতে যাবো।'

মইনুল হোসেন আজাহার খন্দকারকে একটু ধাতস্ত হওয়ার সময় দিলেন। তারপর বললেন, 'অবশ্যই যাবেন। কিন্তু সে কী অবস্থায় আছে, কেমন আছে, কোথায় আছে, তাতো আমরা এখনো ঠিকঠাক জানি না।'

'অতোকিছু আমি জানি না। আপনে আমার ছেলেরে আননের ব্যবস্থা করেন। যেমনেই হোউক, যেইভাবেই হোউক তারে আননের ব্যবস্থা আপনের করতেই হবে।'

মইনুল হোসেন কিছু বলতে যাচ্ছিলেন। তার আগেই আজাহার খন্দকার তার চাদরের ভেতর থেকে একটা চামড়ার ব্যাগ বের করলেন। ব্যাগের ভেতরে নানান রকমের কাগজপত্র। তিনি সেগুলো বের করে টেবিলে রাখলেন। তারপর বললেন, 'এইগুলান হইলো আমার সব স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির দলিল।'

মইনুল হোসেন অবাক গলায় বললেন, 'এগুলো দিয়ে আমি কী করবো?'

আজাহার খন্দকার তার কথার উত্তর দিলেন না। তিনি পাঞ্জাবির দুই পকেট থেকে কয়েক তোড়া টাকাও বের করলেন। তারপর বললেন, 'আমার কাছে আর কিছু নাই ওসি সাব। এইগুলান সব আপনের। আপনে যেমনেই পারেন, আমার ছেলেরে ফিরাই আননের ব্যবস্থা করেন।'

মইনুল হোসেন চুপচাপ আজাহার খন্দকারের দিকে তাকিয়ে রইলেন। আজাহার খন্দকার কাঁদছেন। নিঃশব্দ কান্না। একজন সত্তরোর্ধ্ব বয়সের বৃদ্ধ মানুষ শূন্য চোখে তাকিয়ে আছেন। তার কোঁচকানো চামড়ার গাল বেয়ে ঝরে পড়ছে অশ্রু। লাল টকটকে চোখে তিনি মইনুল হোসেনের দিকে তাকিয়ে আছেন। মইনুল হোসেন উঠে এসে আজাহার খন্দকারের পাশে বসলেন। তারপর দু হাতে আজাহার খন্দকারকে জড়িয়ে ধরলেন। মইনুল হোসেনের বুকের মধ্যে এক সন্তানহারা বৃদ্ধ পিতার ন্যুব্জ শরীরখানা তখন থরথর করে কাঁপছে।

মইনুল হোসেন ডাকলেন, 'খোনকার সাব?'

আজাহার খন্দকার নিজেকে সামলে নিলেন। চাদরের খুটে নিজের চোখ মুছে স্খলিত গলায় বললেন, 'আমি শরমিন্দা ওসি সাব। বাপতো! সামলাইতে পারি নাই নিজেরে।'

দলিলপত্র এবং টাকার বান্ডিলগুলো আজাহার খন্দকারের দিকে ঠেলে দিতে দিতে মইনুল হোসেন বললেন, 'সব বুঝেও একটা কথা বলি, মনসুরকে ফিরিয়ে আনা সহজ কোনো ব্যাপার না। আপনিতো সবই বোঝেন। ওই পরিমাণ লোকবল আমাদের নেই। তা ছাড়া এটা একটা বিরাট ঝুঁকিরও ব্যাপার...।'

আজাহার খন্দকার তাকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে বললেন, 'আপনে লোকজনের কথা চিন্তা কইরেন না। লোকজনের ব্যবস্থা আমি করবো। খোনকাররা এহনও নবীগঞ্জের সবচাইতে বড় বংশ। আমার এক ডাকে শতেক লোক হাজির হইবো।'

'কিন্তু তাদের নিয়ে কী ডাকাতের সাথে যুদ্ধ চলে?'

'চলবো না ক্যান? চলবো। ডাকাইতরা কী বিলাতের তন বিটিশগো থেইকা ট্রেনিং নিয়াসছেনি? তারাও আমাগো মতনই মানুষ। আমরাও জীবনভর কম কাইজ্জা করি নাই। আপনের বয়স কম, এইজন্য দেহেন নাই। আগেরদিনে চর দখলের লাইগ্যা রোজ খুনাখুনি হইতো। খোনকাররাতো আর এমনে এমনেই এত বড় বংশ হয় নাই। এই দুই চাইর দশটা খুনাখুনি তারাও করছে। তহনকার দিনে পুলিশও আসনের সাহস পাইতো না। আর বংশের পোলার লাইগ্যা খোনকাররা জীবন দিতে রাজি। আমি সব ব্যবস্থা করবো। আপনে খালি আমারে সাহায্য করবেন।'

আজাহার খন্দকারের উদ্ধত, বেপরোয়া এবং একইসাথে অসহায় ভঙ্গি দেখে মইনুল হোসেন খানিক থমকে গেলেন। তারপর আচমকাই প্রশ্নটা করলেন, 'কিন্তু আপনার ছেলের বউ?'

এই প্রশ্নের উত্তর আজাহার খন্দকার দিতে পারলেন না। মইনুল হোসেনও জানেন, এই প্রশ্নের উত্তর আজাহার খন্দকারের কাছে নেই। তবে খানিক বাদে আজাহার খন্দকার মিনমিন করে বললেন, 'দরকারে আমি মাওলানা সাবের লগে কথা বলবো। এই বিষয়েও ধর্মে বিধান আছে। ঘটনাতো আর জাইন্যা ঘটে নাই! অজান্তে ঘটা ঘটনার বিধান ধর্মে আছে। আগে আপনে আমার ছেলেরে আননের ব্যবস্থা করেন।'

মইনুল হোসেন নতুন করে ভাবতে বসলেন। তার হাতে এবার কিছু সুযোগ রয়েছে। প্রথমত, হানিফসহ বেশ কয়েকজন বড়সড় ডাকাত তাদের কাছে আটক। দ্বিতীয়ত, বড়সড় একটা পুলিশ ফোর্সের সাথে কয়েক শ মানুষ যুক্ত হলে চেষ্টা করে দেখা যেতেই পারে। আজাহার খন্দকারের কথা মিথ্যে না। গ্রামের এইসব মানুষই একসময় ভয়াবহ গ্রাম্য বিবাদ, বংশানুক্রমিক সহিংস কোন্দল, চর দখলের মতো রক্তক্ষয়ী অসংখ্য সংঘর্ষে অহরহ লাশ ফেলে দিতো।

তা ছাড়া হানিফের মতো গুরুত্বপূর্ণ একজন ডাকাত তাদের কাছে আটক আছে। মইনুল হোসেন জানেন, লস্করের চরের ভবিষ্যৎ সর্দার হচ্ছে হানিফ। সুতরাং মূল পণবন্দি হিসেবে হানিফকে আটকে রাখতে পারলে দর-কষাকষির একটা ভালো সুযোগ তাদের সামনে থাকবে, তাতে লস্করের চরে গিয়ে যত খারাপ পরিস্থিতিতেই তারা পড়েন না কেন! তা ছাড়া মইনুল হোসেনের নিজের জন্যও

New Pdf download: www.PoragEducation.com + webtalkbd.com

এটি বিশাল একটি সুযোগ। এই এতদিনের পরাজয়ের হাতাশা আর দুঃসময়ের গ্লানি শেষে একটা সুযোগ যেন সময় তাকে দিয়েছে। এই সুযোগ তিনি হেলায় হারাতে চান না।

মইনুল হোসেন অবশেষে বললেন, 'আমাকে বিষয়টা নিয়ে আরেকটু ভাবতে দেন খন্দকার সাহেব। তবে একটা কথা।'

'কী কথা?'

'এই ঘটনা আপনি আর আমি ছাড়া এখন যেন কাক-পক্ষীও না জানে। আমি না বলা পর্যন্ত ঘরের দেয়ালের কাছেও এই বিষয়ে কোনো কথা বলবেন না। এমনকি মনসুরের বিষয়েও না। আপনার ছেলে বউয়ের কাছেও না। কারণ কাল কী হবে আমরা আজ জানি না। জানি?'

আজাহার খন্দকার কান্নার মতোন করুণ ভঙ্গিতে ম্লান হাসলেন, 'আপনেতো জানেনই, সেইটা আমার চাইতে ভালো আর কে জানে!'

তিনি বাড়ি ফিরলেন ফজরের নামাজ পড়ে। বাড়ির উঠানে তখনো দাঁড়িয়ে আছে মঞ্জু। বাবাকে দেখে সে তড়িঘড়ি করে ছুটে এলো, 'আব্বা!'

আজাহার খন্দকার থমথমে গলায় বললেন, 'চিন্তার কিছু হয় নাই। যা ঘুমাইতে যা।'

'আপনে কই গেছিলেন আব্বা? সারারাইত কই আছিলেন?'

আজাহার খন্দকার আবারো একই ভঙ্গিতে বললেন, 'কাম আছিলো। এহন আর কথা বাড়াইস না। একটু ঘুমাইতে দে।'

মঞ্জু আর কথা বাড়ানোর সাহস পেলো না। কণা বসেছিলো ঘরের দরজার কাছে। মঞ্জু কণার দিকে তাকিয়ে বললো, 'আমিও তাইলে একটু ঘুমাই। নয়টার দিকে ডাইকা দিও।'

কণা বললো, 'আচ্ছা।

আজাহার খন্দকার ঘরে ঢুকতে গিয়েও মুহূর্তের জন্য থমকে দাঁড়ালেন। কণাকে বলা মঞ্জুর শেষ শব্দটা কেন যেন খট করে কানে লেগেছে তার।

পুরো লস্করের চরজুড়ে গোরস্তানের নীরবতা। কারো মুখে কোনো কথা নেই। সকলেই যেন স্বজন হারানোর শোকে মূহ্যমান। বহুবছর এমন বিষাদ ছুঁয়ে যায়নি লস্কর চরের মানুষদের। এমন ভয়ংকর ঘটনাও ঘটেনি বহুকাল। হানিফের বাবা আয়নাল হক রীতিমতো পাগল হয়ে গেছেন। তবে পুত্রের জন্য যতটা কষ্ট তার রয়েছে, ঠিক ততটাই রয়েছে জোহরার জন্য ঘৃণা। যেন জোহরা নিজ হাতে এই ভয়াবহ সর্বনাশ ঘটিয়েছে। এই বিষয়ে আয়নাল হকের সাথে অনেকটাই একমত হলেও তোরাব আলী লস্কর প্রকাশ্যে জোহরাকে কিছু বলতে পারছেন না। তবে সম্ভবত জীবনে এই প্রথম তিনি জোহরার সাথে সত্যিকার অর্থেই দুর্ব্যবহার করেছেন। শুধু যে দুর্ব্যবহারই করেছেন তাও নয়, তিনি জোহরার সাথে কথা বলাও বন্ধ করে দিয়েছেন। এতদিনে এসে তার মনে হয়েছে, জোহরার কারণে ভয়াবহ এক বিপর্যয়ের মুখোমুখি হতে যাচ্ছে লস্কর চরের মানুষ। এবং এর জন্য পরোক্ষভাবে হলেও তিনি নিজেও কম দায়ী নন। কিন্তু এই মুহূর্তে কী করণীয় তা নিয়ে কেউই সঠিক কোনো সিদ্ধান্তে পৌছাতে পারছে না। চরের মানুষের মধ্যেই নানান মতবিরোধ তৈরি হয়েছে। তবে এই ঘটনায় একটি জিনিস স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, সেটি হলো চরের মানুষ হানিফকে অসম্ভব পছন্দ করে। বিষয়টি অনেকটা জীবিত মানুষের চেয়ে মৃত মানুষের শক্তিশালী হয়ে ওঠার মতো ব্যাপার। যতদিন হানিফ এই চরে ছিলো, ততদিন যেন তার উপস্থিতি কেউ তেমন করে টের পায়নি। কিন্তু যেই মুহূর্তে খবর এলো যে হানিফ দলবলসহ ধরা পড়েছে, ঠিক সেই মুহূর্ত থেকেই যেন সবাই উপলব্ধি করতে পেরেছে এই চরের জন্য কতটা নিবেদিত প্রাণ

New Pdf download: www.PoragEducation.com + webtalkbd.com

মানুষ ছিলো হানিফ। যে কারো বিপদে-আপদে সবার আগে ঝাঁপিয়ে পড়তো সে। নিজের ব্যক্তিগত লাভ-ক্ষতির কথা চিন্তা করতো না।

অথচ সেই হানিফের এমন বিপদের মুহূর্তে কী করণীয়, তাই যেন ঠিক করতে পারছে না কেউই। তোরাব আলী লস্কর বলছেন আরো কিছুদিন অপেক্ষা করতে। অন্যদিকে আয়নাল হক অস্থির হয়ে গেছে তার ছেলের জন্য। এই পরিস্থিতিতে সকলেই মনে মনে অপেক্ষা করছে জোহরার জন্য। কিন্তু জোহরা নীরব, নির্বিকার। আয়নাল হক ও তোরাব আলী লস্কর স্পষ্ট করেই বলে দিয়েছেন, জোহরাকে আর কোনো কিছুতে তারা দেখতে চান না। জোহরা অবশ্য আসেওনি। কিন্তু সময় গড়িয়ে যাচ্ছে। ঘটনার চতুর্থ দিন সকালে তোরাব আলী লস্করের বাড়ির উঠানে জরুরি সভা বসলো। তাতে আয়নাল হক বললো, 'যা করনের এহনই করতে হইবো। দেরি হইলে বিপদ।'

তোরাব আলী লস্কর বললেন, 'কিন্তু এহন কী করবি? উপায়টা কী?'

এই উপায় খুঁজতে গিয়ে সকলেই প্রায় দিশেহারা হয়ে গেলো। কিন্তু কেউই জুতসই কোনো সমাধান দিতে পারলো না। শেষ পর্যন্ত কথাটা তুললো বাহাদুরই, 'দাদাজান আর আয়নাল কাকু, আমি একখান কথা কইতে চাই।'

'কী কথা?' আয়নাল হক বললো।

'ভালো হোউক, মন্দ হোউক, এইটাতো আমরা সবাইই মানি যে জোহরা ছাড়া এই পরিস্থিতিতে সিদ্ধান্ত নেওন সম্ভব না।'

আয়নাল হক যেন খেঁকিয়ে উঠলেন, 'কয়দিনের জোহরা, অ্যাঁ? সে যহন আছিলো না, তহন কী লস্কর চরের মানুষ জেলে পইচ্যা মরছেনি?'

আয়নাল হকের কথাটা ধরলেন বৃদ্ধ জালালুদ্দি। তিনি বললেন, 'হ, মরছেইতো। কেউর কেউর মরণের কথা আমরা জানি, কেউর কেউরডা জানি না। তয় মরছে যে এই কথা সত্য।'

জালালুদ্দির কথার পিঠে কথা বলতে যাচ্ছিলো আয়নাল হক। কিন্তু উপস্থিত সকলেই যেন খানিক অস্থির হয়ে উঠেছে। তোরাব আলী লস্কর তাদের দিকে তাকিয়ে কী ভাবলেন। তারপর বাহাদুরকে বললেন, 'যা, জোহরারে নিয়া আয়।'

জোহরা এলো। তার মুখ থমথমে। বাহাদুর বললো, 'এহন কী করন যায়, জোহরা? একটা বুদ্ধিতো বাইর করন লাগে। এইরম হাত-পা গুটাইয়াতো বইসা থাহন আর যায় না।'

'কিসের বুদ্ধি?' যেন কিছুই জানে না, এমন ভঙ্গিতে বললো জোহরা।

বাহাদুর বললো, 'ক্যান? হানিফগো ঘটনায়? তারে ছাড়ানোর একটা ব্যবস্থা করন যায় না?'

জোহরা খানিক উদাসী গলায় বললো, 'তাগো ছাড়াই আননের ব্যবস্থা করনের কাম আছিলো আরো আগেই। এহনতো দেরী হইয়া গেছে।'

জোহরার কথায় সকলেই নড়েচড়ে বসলো। তোরাব আলী লস্কর কথা বললেন, 'আইজ চাইরদিন হইলো মাত্র।'

'হুম। চাইরদিন অনেক সময়। যাইতেই লাগবো দুই দিন প্রায়।'

'এত গরম গরম কী ঠিক হইবো? পরিস্থিতি একটু ঠাণ্ডা হইতে দিলে ভালো হইতো না?' তোরাব আলীর কণ্ঠে যেন একটু সন্ধির আভাস।

জোহরা বললো, 'সবকিছুই গরম গরম ভালো। সবকিছুই গরম অবস্থায় নরম থাকে, ঠাণ্ডা হইলেই শক্ত।'

তোরাব আলী লস্কর বললেন, 'এইটা কেমন কথা? এহনতো পুলিশ থাকবো সতর্ক, সাবধান।'

জোহরা বললো, 'এইটাই কথা। শক্ত চাউল গরম হইলে নরম ভাত হয়, শক্ত লোহা গরম হইলে ব্যাকাত্যাড়া করন যায়। ঠাণ্ডা থাকতে করন যায় না।'

জোহরার কথা বলার ধরনে কিছু একটা ছিলো। তোরাব আলী লস্কর আর কথা বললেন না। বাহাদুর বললো, 'এহন কী করবো, সেইটা ক।'

জোহরা বললো, 'যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সবাইরে রেডি করতে হইবো। একবার যদি হানিফ ভাইগোও জেলা শহরের জেলখানায় লইয়া যায়, তাইলে কিন্তু সব শেষ।'

জোহরার এই আশঙ্কার সাথে কারোই কোনো দ্বিমত রইলো না। বরং সকলেই যেন অবশেষে একটা আশার আলো দেখতে পেলো। জোহরা বললো, 'পুলিশ সাবধান থাকবো এইটা সত্য। হানিফ ভাইগো দিয়া আমাগো ধরনের ফাঁদও পাততে পারে। কিন্তু সেই ফাঁদে পাও দেওন যাইবো না।'

'তাইলে উপায় কি? আমরাতো আর জানি না, পুলিশের চিন্তা কী?'

'এই জন্য আমাগো লুকাছাপা করন যাইবো না। যাইতে হইবো একদম সামনাসামনি।'

'কী কস তুই?'

'হুম। পুলিশ ভাববো আমরা আগের মতোই কানামাছি খেলতে যাবো তাদের লগে। তারা সেই অনুযায়ী ফাঁদ পাতবো। কিন্তু আমরা যাবো সরাসরি। এতে তারা হকচকাইয়া যাইবো। ওইটাই আমাগো সুযোগ।'

'তাইলেতো আগেই ধরা পইড়া যাবো।'

'উহু। আমরা যাবো পঞ্চাশ-ষাইট জনের দল নিয়া। ফজরের আজানের আগে আগে সরাসরি থানায় ঢুইকা যাইতে হইবো। এতবড় দল সামলানোর প্রস্তুতি তাগো থাকার কথা না।'

জোহরার পরিকল্পনা খুবই সহজ এবং সাধারণ। কিন্তু সে বলার আগে এই সহজ সাধারণ বুদ্ধিটিই যেন কারো মাথায় ঢোকেনি। জোহরা বলার পর এখন

New Pdf download: www.PoragEducation.com + webtalkbd.com

সকলেরই মনে হচ্ছে, তারা শুধু শুধুই এতদিন ভয় পেয়েছে। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করা গেলে হানিফদের ছাড়িয়ে আনা খুব কঠিন কোনো ব্যাপার হবে না।

জোহরা বললো, 'তিনখান বড় আর দুইখান ছোট টলার নিবেন বাহাদুর ভাই।'

জোহরা কথা শেষ করে আর দাঁড়ালো না। চলে গেলো ঘরের ভেতর। তবে সে চলে যাওয়ার পরেও তোরাব আলী লস্কর বা আয়নাল হক চুপ করেই রইলেন। কথা বললো উপস্থিত জনতা। তাদের সকলের হতাশা কেটে গিয়ে মুহূর্তেই যেন একটা উৎসব উৎসব ভাব ফিরে এসেছে। শেষ কবে এত বড় দল নিয়ে লস্করের চরের কেউ কোথাও অভিযানে গিয়েছে, তা যেন কেউ মনেই করতে পারলো না। এই নিয়ে পুরো চরজুড়েই একটা চাপা উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়লো। সেই উত্তেজনায় আছে আনন্দও।

যাত্রা শুরু করার আগের রাতে জোহরার সাথে আবারো বসলো বাহাদুর। সে বললো, 'দাদাজানও কী যাইবো?'

জোহরা বললো, 'না।'

'কেন?'

'আমরা জানি না ওইখানের অবস্থা কী! সরাসরি থানা আক্রমণ সহজ বিষয় না। পুলিশের কাছে রাইফেল বন্দুক থাকবো, যেকোনো সময় যেকোন কিছু ঘটতে পারে। আমি চাই না দাদাজানের কোনো ক্ষতি হোউক।'

বাহাদুর বললো, 'কিন্তু তারে এই কথা কইবো কেডা?'

'আমি কমু। আরেকখান কথা বাহাদুর ভাই।'

'ক।'

'সাবধানের মাইর নাই। ডাক্তাররেও নিয়া নিয়েন। কওনতো যায় না, কখন কার কী হইয়া বসে। পুলিশের হাতে থাকবো অস্ত্র। গুলি টুলি কইরা বসলে বিপদ। ডাক্তার লগে থাকলে একটা ভরসা থাহে।'

বাহাদুর বললো, 'এইটা ভালো কথা কইছোস।'

জোহরা বললো, 'কিন্তু সাবধান, তারে কিন্তু আবার ভুলেও কইয়েন না যে আমরা নবীগঞ্জে যাইতেছি। তাইলেই কিন্তু শেষ! সে জানি ঘুণাক্ষরেও এই কথা জানতে না পারে।'

'ক্যান?'

'ক্যান আবার! তাইলে তার আর অন্য মানুষের চিকিৎসা করন লাগবো না। আমাগোই তার চিকিৎসা করন লাগবো। খুব সাবধান। তারে এমন কী টলারের

বাইরেও আনন যাইবো না। ওপরে ভালো ছই আছে এমন কোন ছোট টলারে নিবেন তারে।'

'আইচ্ছা।'

রাতে তোরাব আলী লস্করের ঘরে গেলো জোহরা। তিনি জোহরাকে দেখে চোখ নামিয়ে নিলেন। জোহরা অবশ্য কোনো ভনিতা না করে সরাসরিই বললো, 'তুমি কাইল যাইতেছো না দাদাজান।'

'কই যাইতেছি না?'

'নবীগঞ্জ।'

'কে কইলো?'

'আমি।'

তোরাব আলী লস্করের হঠাৎ মাথা গরম হয়ে গেলো। তিনি চিৎকার করে বললেন, 'আমি যামু কী যামু না সেইটা বলনের তুই কেডা? তুই ঠিক কইরা দিবি, আমি কই যামু না যামু?'

জোহরা বললো, 'রাইতে ভাত খাইছো?'

জোহরার কথা তার কানে গেলো না। তিনি উত্তেজিত ভঙ্গিতে বলতে লাগলেন, 'তোর অনেক বাড় বাড়ছে। তোরে আমি কিছু না কইতে কইতে তুই এহন আমার মাথার ওপরেও উইঠ্যা বইতেছোস। নিজেরে কী মনে করোস তুই, অ্যাঁ? কী মনে করোস নিজেরে?'

জোহরা মৃদু হাসলো, 'দুনিয়াতেতো আমার ওই একটাই পরিচয়, আমি তোরাব আলী লস্করের নাতনি। আর কী মনে করবো? আমার না আছে মা, না আছে বাপ, না আছে স্বামী। আমার খালি ওই তোরাব আলী লস্করই আছে। আরতো কেউ নাই আমার। মনে কইরা লাভ কী?'

'আমার লগে ভাবের কথা কইবি না তুই। তুই অনেক বড় হইয়া গেছোস। অনেক বড়।'

'কত বড় হইছি? তোমার চাইতেও বড়?'

'হ, তুইতো এহন আমার চাইতেও বড়। লস্করের চরের মানুষ এহন আমার কথা শোনে না। আমারে পাঁট পাতার দাম দেয় না। সবাই তোর কথা শোনে। তুই বড় হইছোস না? এহন আইছস আমারে ধমকাইতে। আমি কই যামু না না যামু সেইটা ঠিক করতে? অ্যাঁ? তুইতো আমার চাইতেও বড়।'

জোহরা অবশ্য তোরাব আলী লস্করের কথা শোনার জন্য অপেক্ষা করলো না। সে ঘর থেকে বের হয়ে গেলো। তোরাব আলী লস্কর অধিক উত্তেজনায় খেয়াল করলেন না। অবশ্য কথা শেষ করে তাকিয়ে দেখেন জোহরা দরজা দিয়ে আবার ঘরে ঢুকছে। তার হাতে ভাতের প্লেট। সে এসে শান্ত ভঙ্গিতে তোরাব আলী

New Pdf download: www.PoragEducation.com + webtalkbd.com

লস্করের পাশে বসলো। তোরাব আলী তখনো উচ্চস্বরে জোহরাকে গাল-মন্দ করে যাচ্ছেন। রাগে তার শরীর কাঁপছে। তবে বেশিক্ষণ কথা চালিয়ে যেতে পারলেন না তিনি। জোহরা তার হাতের নলা মাখা ভাতের প্রথম গ্রাস তোরাব আলী লস্করের কথা বলতে থাকা মুখের ভেতর আচমকা ঢুকিয়ে দিলো। হতভম্ব তোরাব আলী কথার মাঝখানে বিদঘুটে শব্দ করে থেমে গেলেন। তিনি চোখ কটমট করে জোহরার দিকে তাকালেন। এবার জোহরাও তার চোখে স্থির চোখ রেখে একই ভঙ্গিতে তাকিয়ে রইলো। তোরাব আলী লস্কর আর ঝামেলা করলেন না। তিনি চুপচাপ শান্তশিষ্ট শিশুটির মতো অভিমানে গাল ফুলিয়ে অন্যদিকে তাকিয়ে ভাত খেতে লাগলেন।

ভাত খাওয়ানো শেষ হলে জোহরা তার দাদাজানকে পানি খাইয়ে শাড়ির আঁচলে মুখ মুছিয়ে দিলো। তারপর বললো, 'আমি যেইদিন ফিরা আসবো, সেইদিন আইসা যেন দেহি এই ঘরে তুমি এমনে বইসা আছো। বাইরে ঝড় বৃষ্টির দিন, বেশি বাইর হওনের দরকার নাই। কী বলছি শুনছো?'

তোরাব আলী লস্কর কথা বললেন না। তিনি বিছানার ওপর উঠতে উঠতে একবার চোরা চোখে জোহরার দিকে তাকালেন। তারপর আবার মুখ ফিরিয়ে নিলেন। জোহরা সেদিকে তাকিয়ে মৃদু হাসলো।

গভীর রাতে মনসুরের ঘরের বারান্দায় এসে দাঁড়ালো জোহরা। তারপর মনসুরকে ডাকলো সে, 'ডাক্তার সাব, ঘুমাই পড়ছেন নি?'

মনসুর ঘুমায়নি। বহুকাল রাতে তার ঘুম হয় না। সেদিন সেই প্রবল ঝড়-বৃষ্টির রাতের পর তার ঘুম পুরোপুরি নেই হয়ে গেছে। সারাক্ষণ ঘর বন্ধ করে বসে থাকে সে। আজও এই ভরা পূর্ণিমার রাতে, ঘরের সামনে এই বিস্তৃত জলের বুকে ছড়িয়ে পড়া ধবল জোছনার হাতছানি রেখেও সে বসে আছে ঘুটঘুটে কালো অন্ধকার এক ঘরে। মনসুরের ধারণা ধীরে ধীরে পাগল হয়ে যাচ্ছে সে। জোহরা আবারও তাকে ডাকলো, 'ডাক্তার সাব, একটু বাইরে আসবেন?'

মনসুর বের হলো। জোহরা বললো, 'সেই ঝড়-বৃষ্টির রাইতের পরতো আর আমার লগে দেহা দেন না। এত শরম ক্যান আপনের? পুরুষ পোলারে এত শরম পাইতে আমি আর দেহিনাই কোনদিন!'

মনসুর জবুথবু ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে। জোহরা তার হাত ধরলো। এবং সে অবাক হয়ে আবিষ্কার করলো মনসুরের হাতটা কাঁপছে। সে বললো, 'আরেহ খোদা! এত দেখি পুরাই মাইয়া মাইনষের কাণ্ড! ঘটনা কী কনতো?'

মনসুর কথা বললো না। জোহরা বললো, 'আসেন, ওই ঘাসের মইধ্যে গিয়া একটু বসি। দেখছেন আসমান জোড়া চান উঠছে? আমি কিন্তু গান জানি, জীবনে কোনোদিনতো শুনতেও চাইলেন না। তা শুনবেন কেন? আমিতো আপনের বিয়া

করা বউ না, আপনেতো আবার বিয়া করা বউ ছাড়া ঘুমানও না, গানও শোনেন না। হা হা হা।'

জোহরা হাসতে হাসতে ভেঙে পড়ছে। মনসুর তার পাশে জড়সড় ভঙ্গিতে বসে আছে। জোহরা গুনগুন করে গান ধরলো,

'আসমানে উইঠাছে চাঁন, সেই চাঁন তোমারও লাহান,
চাঁনের ওই মুখ চৌক্ষে দেইখা, মন হইলো আনচান,
বাগানে ফুইটাছে ফুল, সেই ফুলে তোমারই ভুল,
আমার গাঙ্গে ঢেউ উঠাইয়া, ভাঙ্গিলো দুই কুল,
আকুল হইয়া সেই ঢেউয়েতে ঘর ভাইঙ্গাছি,
ও বন্ধু, তোমার লগে আমি আমার মন বাইন্ধাছি।
শুধু আমি জাইনাছি,
তোমার লাইগ্যা বন্ধু আমার মন বাইন্ধাছি।

জোহরা হঠাৎ গান থামিয়ে মনসুরের দিকে তাকালো। মনসুর তাকিয়ে আছে দূরে। তুমুল জোছনায় ভেসে যাছে চারপাশ। কিন্তু তার কিছুই সে দেখছে বলে মনে হচ্ছে না। জোহরা মনসুরের কাঁধে আলতো করে মাথা রাখলো। তারপর নরম গলায় বললো, 'আপনে আমারে কেন পছন্দ করেন না?'

মনসুর কথা বললো না। জোহরা বললো, 'এক্কেলে আসমানের দিকে চাইয়া কনতো, সত্য সত্যই আপনে আমারে একটুও পছন্দ করেন না! কোনোদিনও না? চৌক্ষের এক পলকের জন্যও না?'

মনসুর চুপ করেই রইলো। জোহরা হঠাৎ খিলখিল করে হাসলো। তারপর হাসতে হাসতে যেন লুটোপুটি খেলো সে। মনসুর অবাক চোখে তাকিয়ে বললো, 'কী হয়েছে জোহরা?'

জোহরা হাসি থামিয়ে বললো, 'কিছু হয় নাই।'

'কিছু না হলে এভাবে হাসছো কেন?'

'ক্যান? আমার হাসিও আপনের কাছে ভাল্লাগে না?'

'তাতো বলিনি।'

'তাইলে কী বলছেন? আমার হাসি আপনের কাছে ভাল্লাগে? আসেন, তাইলে একখান চুমা দেন। দেন?' জোহরা তার মুখ এগিয়ে নিয়ে এলো মনসুরের মুখের কাছে।

মনসুর অবশ্য কোনো প্রতিক্রিয়া দেখালো না। সে চুপ করে রইলো আবার। জোহরা বললো, 'আপনের বউডারে আমার খুব দেহনের শখ জানেন? কী কপাল লইয়া সে এই দুনিয়ায় আইছে, এইডা খুব দেহনের শখ আমার। একবার যদি খালি

New Pdf download: www.PoragEducation.com + webtalkbd.com

দেখতে পারতাম, তাইলে তার কপালের লগে জাইত্তা ধইরা আমার কপালডা ঘইস্যা দিতাম। হা হা হা।'

জোহরা আবারো হাসছে। মনসুর বললো, 'আজ তোমার কী হয়েছে?'

'কেন? আমারে পাগল মনে হইতেছে?'

'উহু।'

'তাহলে?'

'মনে হচ্ছে কোনো কারণে তোমার মন অসম্ভব খারাপ।'

এই ছোট্ট একটু কথায় জোহরা আচমকা চুপ করে গেলো। খানিক আগের ঝলমলে, উদ্ভ্রান্ত, উন্মাতাল মানুষটা মুহূর্তেই যেন জলে ভেজা তুলোর মতো হয়ে গেলো। বেশ খানিকটা সময়। তারপর হঠাৎ মাথা তুলে বললো, 'আমার কী মনে হইতো জানেন?'

'কী?'

'আমার মনে হইতো এই দুনিয়ায় আমারে একটু বোঝনের মতো কোনো মানুষ নাই। কিন্তু আইজ মনে হইতেছে, না, ভুল কথা। আমারে বোঝনের মতন মানুষও আছে। যদিও সেই মানুষটা আমার না। হা হা হা।' জোহরা আবারও হাসলো। নিষ্প্রাণ হাসি। সে হাসি থামিয়ে আবার বললো, 'একখান কথা কইবেন?'

'কী কথা?'

'আপনে আপনের বউরে এত ভালোবাসেন কেন?'

'সে আমাকে ভালোবাসে বলে হয়তো।'

জোহরা চট করে বললো, 'কিন্তু কই? আমিওতো আপনেরে ভালোবাসি, আপনের বউয়ের চাইতেও বেশি। কিন্তু আপনেতো আমারে ভালোবাসেন না?'

মনসুর কী জবাব দেবে এই কথার? সে আবারো চুপ করেই রইলো। জোহরা অবশ্য এবার আর ছাড়লো না তাকে। সে বললো, 'আপনের এইটা কইতেই হইবো। আপনে কেন আমারে ভালোবাসেন না?'

মনসুর এবারও জবাব দিলো না। জোহরা এবার খানিক ঘুরিয়ে বললো, 'আচ্ছা, এইটা কন, আপনে কেন আপনের বউরে এত ভালোবাসেন?'

মনসুর এবার জবাব দিলো। সে বললো, 'জানিনাতো!'

'জানেন না?'

'উহু।'

'না জাইনাও ভালোবাসন যায়?'

'হুম, ভালোবাসা কারণ না জেনেই হয়। কারণ জানলে বোধহয় আর ভালোবাসা যায় না। এই যে তুমি আমায় এত ভালোবাসো, তুমি কি জানো, তুমি কেন আমায় এত ভালোবাসো?'

মনসুরের এই প্রশ্নে চুপ করে গেলো জোহরা। আসলেইতো, সেওতো জানো না, সে কেন মনসুরকে এত ভালোবাসে! জোহরা চুপ করে রইলো। এই নিশ্চুপ সময়টুকুতে সে যে কত কত কিছু ভাবলো, কিন্তু অনেক ভেবেও খুঁজে বের করতে পারলো না, ঠিক কী কারণে সে মনসুরকে ভালোবাসে! কিন্তু মনসুরকে যে সে ভালোবাসে, এই সত্যের চেয়ে বড় আর কোনো সত্য তার কাছে নেই।

জোহরা আচমকা মাথা তুলে মনসুরের চোখে চোখ রেখে বললো, 'আমিও জানি না, ডাক্তার সাব।'

তখন মেঘের আড়ালে ঢাকা পড়ে গেছে চাঁদ।

New Pdf download: www.PoragEducation.com + webtalkbd.com

আজাহার খন্দকারকে নিয়ে মঞ্জু চিন্তিত। চিন্তিত কণাও। কিন্তু তারা দুজনের কেউই বিষয়টি নিয়ে আজাহার খন্দকারের সাথে কথা বলতে পারছে না। দিনের বেশির ভাগ সময়ই তিনি থাকেন বাড়ির বাইরে। ফেরেন গভীর রাতে। কারো সাথে কোনো কথা বলেন না। এমনকি মনের সাথেও না। মন বার কয়েক দাদার আশেপাশে ঘুরঘুর করে আগের মতো সখ্যতা গড়ে তোলার চেষ্টা করেছে। কিন্তু লাভ হয়নি। আজাহার খন্দকার ফিরেও তাকাননি। বিষয়টি ভেতরে ভেতরে বিচলিত করে তুললেও কণা আজাহার খন্দকারকে কিছু জিজ্ঞেস করতে গেলো না। সে বরং অপেক্ষায় আছে আজাহার খন্দকারের মন ভালো হওয়ার। মন ভালো হলে নিশ্চয়ই তিনি নিজ থেকেই এসে কথা বলবেন। তবে নানান প্রয়োজনীয় বিষয় নিয়ে কথা বলতে গিয়েও কোনো সাড়া মেলেনি তার কাছ থেকে। এটি নিয়ে এক ধরনের অস্বস্তি কাজ করছে কণার মধ্যে। তবে এই অস্বস্তিটা আরো বড় হয়ে গেলো একটা ঘটনায়।

সেদিন ফজরের নামাজ পড়ে কণা খানিক হাঁটতে বেরিয়েছিলো। খালি পায়ে ভোরের ভেজা ঘাস মাড়িয়ে অনেকটা পথ গিয়ে আবার ফিরে আসতে গিয়ে হঠাৎ বিষয়টা লক্ষ করলো সে। বেশ কিছুদিন মনসুরের কবরের কাছে আর আসা হয়ে ওঠেনি তার। কিন্তু আজ কবরের পাশ দিয়ে হেঁটে আসতে গিয়ে হঠাৎই সে লক্ষ্য করলো, কবরের গায়ে বাঁশের বেড়ার সাথে মনসুরের নাম লেখা নেমপ্লেটটা নেই!

ঘটনাটি খুবই স্বাভাবিক। বেড়াগুলো পুরনো হয়ে খসে পড়ে যেতে পারে। বাচ্চা কাচ্চা বা কেউ কারণে অকারণে খুলে নিয়ে যেতে পারে। কিন্তু বাড়ি ফেরার

পর থেকে বিষয়টা কেন যেন আর স্বস্তি দিচ্ছিলো না কণাকে। একবার ভেবেছিলো বিষয়টি নিয়ে মঞ্জুর সাথে কথা বলবে সে। এমনকি কথা বলতে গিয়েওছিলো, কিন্তু শেষ মুহূর্তে নিজেকে সামলে নিলো।

মঞ্জু রাতে ঘরে ফিরলে কণা বলেছিলো, 'আচ্ছা, তুমি কী একটা জিনিস খেয়াল করেছো?'

'কী?'

'না মানে মসজিদের পুকুরের সিঁড়িটা দেখেছো, কেমন পিচ্ছিল হয়ে আছে?'

'না দেখিনিতো। কতদিন যাওয়া হয় না।'

'কেন? বাড়ির সামনে মসজিদ, একটু নামাজ পড়তেওতো যাওয়া যায়, তাই না?'

'তা যায়। কিন্তু কেন বলোতো?'

'নাহ মানে মসজিদের চারপাশটা কেমন অপরিষ্কার হয়ে আছে।'

'বাবাইতো দেখাশোনা করে। বাবাকে বললেইতো হয়।'

'তাহ হয়। কিন্তু...।'

'কিন্তু কী?'

কণা আর কথা বাড়ায়নি। তবে সেই রাত, পরের সারাটা দিন তার মনটা ভার হয়ে রইলো। সে বার কয়েক রাস্তার ওপাশটায় গিয়ে আড়চোখে নেমপ্লেটটা খুঁজলো। কিন্তু কোথাও পেলো না। সবচেয়ে খারাপ লাগলো, কবরটার চারধারে বড় বড় ঘাস, লতাগুল্ম বেড়ে উঠতে দেখে। ধীরে ধীরে যে কবরটার কাছে যাওয়া মানুষের সংখ্যা কমে যাচ্ছে তা যেন ওই ঘাস আর লতাগুল্মগুলো সাড়ম্বরে ঘোষণা করছে।

পরদিন মঞ্জুর সাথে একটা বাজে ঘটনা ঘটে গেলো কণার। বাজারের দোকানিরা প্রতি মাসে টাকা জমা রাখার একটা সমিতি খুলেছে। সেই সমিতিতে মঞ্জুও আছে। তার নামেও একটা হিসেব খোলা হয়েছে। তবে সে হিসেব নিজের নামে না খুলে খুলেছে মন-এর নামে। রাতে খুশি মনেই সে হিসেবের কার্ডটা কণার হাতে দিলো। তারপর উচ্ছ্বসিত গলায় বললো, 'মন-এর নামে খুললাম। ভালো হয়েছে না?'

কণা খুব স্বাভাবিকভাবেই কার্ডটা উল্টেপাল্টে দেখলো। তারপর হঠাৎই যেন গায়ে আগুন লেগে গেছে এমন ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়ালো সে। তারপর মঞ্জুকে হতভম্ব করে দিয়ে কার্ডটা কুচিকুচি করে ছিঁড়ে ফেললো। মঞ্জু স্তম্ভিত গলায় বললো, 'কী হয়েছে?'

কণা বললো, 'মন-এর বাবার নাম মনসুর খন্দকার, মনজুর খন্দকার না। এরকম আর কখনো যেন আমি না দেখি।'

New Pdf download: www.PoragEducation.com + webtalkbd.com

আজাহার খন্দকার থানায় এসেছেন। পুরো থানা যেন গমগম করছে। নবীগঞ্জ বড়বাজার থানাকে এরকম আগে কেউ দেখনি। মইনুল হোসেন বললেন, 'আমি আমার সাধ্যমতো করেছি খন্দকার সাহেব। যতটুকু আশা করেছিলাম, তার চেয়ে বেশি ফোর্সই আমি পেয়ে গেছি। দিন কয়েক একটু কষ্ট করে তাদের এখানে থাকতে হবে। এর মধ্যে আপনি আপনার ব্যবস্থা করে ফেলুন। খুব বেশি সময় আর নেয়া যাবে না।'

আজাহার খন্দকার বললেন, 'আপনি চিন্তা করবেন না ওসি সাব। আমি দিন তিনেকের মধ্যে সব ব্যবস্থা করে ফেলবো।'

মইনুল হোসেন বললেন, 'আচ্ছা।'

আজাহার খন্দকার দরজা পর্যন্ত গিয়ে আবার ফিরে এলেন। তারপর মইনুল হোসেনের ডান হাতখানা দীর্ঘসময় তার দুই হাতে চেপে ধরে রাখলেন।

মঞ্জু রাতের বেলা চুপচাপ এসে শুয়ে পড়লো। কণা বললো, 'খাবে না?'

'নাহ।'

'কেন?'

'খেতে ইচ্ছে করছে না।'

'খেতে ইচ্ছে না করলেও রাতে খেতে হয়।'

মঞ্জু জবাব দিলো না। কণা উঠতে উঠতে বললো, 'আমি টেবিলে খাবার দিচ্ছি।'

মঞ্জু উঠে এসে রাতের খাবার খেলো। গত দুদিন আগের রাতের ঘটনার পর আর তার সাথে কণার কথা হয়নি। বিষয়টি নিয়ে মঞ্জুর খুবই মন খারাপ হয়েছে। সে অতোকিছু ভেবে কাজটি করেনি। মন-কে সে নিজের ছেলের চেয়ে কম কিছু ভাবে না। কিন্তু কণা ওভাবে প্রতিক্রিয়া দেখাবে সে ভাবে নি। কণা বললো, 'বাবা না বলেছিলো এখন থেকেই মন কে প্রতিদিন ভোরবেলা বাজারের মক্তবটাতে নিয়ে যেতে?'

মঞ্জু জবাব দিলো না।

কণা বললো, 'ক'দিন নিয়ে গিয়ে আজ দু'দিন আবার নিয়ে গেলে না যে!'

মঞ্জু এবারও জবাব দিলো না।

কণা বললো, 'কাল থেকে আবার নিয়ে যেও।'

মঞ্জু বললো, 'আচ্ছা।'

কণা সামান্য হাসলো।

মনসুর ঘুমিয়ে আছে ট্রলারের ভেতর। ট্রলারের একটানা শব্দে তার কানে তন্দ্রা লেগে গেছে। ট্রলার কখন থামবে সে জানে না। অবশ্য জানা নিয়ে তার আগ্রহও নেই। খুব ভোরে তাকে ডেকে তুলেছিলো বাহাদুর। তারপর বলেছিলো, রেডি হন ডাক্তার সাব। আপনেরে নিয়া এক জায়গায় যাবো।'

মনসুরের রেডি হওয়ার মতো কিছু ছিলো না। সে এক কাপড়েই বের হয়ে এসেছে। কিন্তু বিলের পারে এসে দেখে এলাহি কাণ্ড! একটা যুদ্ধ যুদ্ধ সাজ। কাউকে কিছু জিজ্ঞেস করার সুযোগ অবশ্য সে পায়নি। বাহাদুর একপ্রকার গা ধাক্কা দিয়েই তাকে ছোট একটা ট্রলারে ঢুকিয়ে দিয়েছে। এই ট্রলারে চারজন মাত্র মানুষ। সে ছাড়া বাহাদুর, হামিদুল আর জোহরা। বাকী ট্রলারগুলোতে লোক গিজগিজ করছে। তারা কোথায় যাচ্ছে, কেন যাচ্ছে মনসুর জানে না। জানার ইচ্ছেও তার নেই। আর একটানা ঘণ্টার পর ঘণ্টা সেই একঘেয়ে শব্দ শুনতে শুনতে এখন আর মাথা কাজ করছে না তার। একটু বাইরের আলো হাওয়াতে যেতে পারলেও ভালো লাগতো। কিন্তু তাও তাকে যেতে দেয়া হচ্ছে না। তবে শব্দ শুনে মনসুর বুঝতে পারছে তাদের আশেপাশেই রয়েছে বাকী ট্রলারগুলোও।

অদ্ভুত ব্যাপার হচ্ছে, এই দীর্ঘ ক্লান্তিকর সময়ে জোহরা একবারও মনসুরের সাথে কথা বলার চেষ্টা করেনি। বরং একদম চুপচাপ পুরোটা সময় বসে থেকেছে সে। এক মুহূর্তের জন্যও তাকে ঘুমাতে দেখেনি মনসুর। তবে যতবারই জোহরার দিকে চোখে পড়েছে, ততবারই মনসুর দেখেছে জোহরা তার দিকে তাকিয়ে আছে। নিষ্পলক দৃষ্টি। এবং নির্বিকারও। সেই চোখে যেন কোনো অনুভূতি নেই, কোনো সাড়া নেই, কম্পন নেই। মৃত মাছের চোখের মতন।

New Pdf download: www.PoragEducation.com + webtalkbd.com

মনসুরের অবস্থা অবশ্য বেশ খারাপ। এখন তার মাথা আর কাজ করছে না। মনে হচ্ছে মাথার ভেতর একটা কুয়াশার মতো ব্যাপার। খুব অস্পষ্ট। শরীরও অবশ হয়ে আছে। একটা ঘোর যেন। শেষ দিকে এসে আর কথা না বলে থাকতে পারলো না মনসুর। সে বললো, 'আমরা কোথায় যাচ্ছি জোহরা?'

জোহরা যেন শুনতে পায়নি। সে যেমন তাকিয়েছিলো, তেমন তাকিয়েই রইলো। জবাব দিলো না।

মনসুর আবার বললো, 'আমরা কোথায় যাচ্ছি জোহরা?'

জোহরা চমকে ওঠা গলায় বললো, 'কোনোহানে না।'

'কোথাও না কোথাওতো যাচ্ছিই?'

জোহরা বললো, 'জাইনা কী হইবো?'

'কিছু হবে না, এমনিই।'

'তাইলে জানার দরকার নাই।'

'আচ্ছা।'

মনসুর চুপ করে গেলো। তারপর কিছুক্ষণ পর আবার বললো, 'আমরা আবার কবে ফিরবো?'

'কেন? লস্কর চরের প্রেমে পইড়া গেছেন?'

'তা না।'

'তাইলে?'

'আমার ধারণা ফেরার সময়েই আমি মারা যাবো।'

'কেন?'

'এইভাবে যদি এই এতটা পথ আবার ফিরতে হয়, আমি আর নিতে পারবো না। আমি ট্রলারেই মারা যাবো।'

জোহরা কিছু বলতে যাচ্ছিলো। তার আগেই মনসুর হড়বড় করে বমি করে ফেললো। মনসুর খুবই লজ্জা পেলো। সে ভেবেছিলো জোহরা ছুটে আসবে। কিন্তু জোহরা এলো না। সে হাসি হাসি চোখে তাকিয়ে রইলো। মনসুর আবারো বমি করলো। জোহরা তার হাত থেকে একটা চুড়ি খুলে মনসুরের দিকে ছুড়ে মারলো। তারপর বললো, 'নেন, এই চুড়িটা নেন।'

মনসুর বমি মাখা মুখেই জিজ্ঞেস করলো, 'চুড়ি ক্যানো?'

'হাতে পরেন। আপনের ভাবভঙ্গি ষোল আনাই মাইয়া মাইনষের লাহান। এহন খালি হাতে চুড়ি পরনটাই বাকি আছে। লাগলে ছায়া ব্লাউজও চাইয়েন। খুইলা দিয়া দিবো।'

মনসুর আবারো বমি করলো। তাকে পানি এগিয়ে দিলো বাহাদুর। সে সেই পানিতে নিজেকে পরিষ্কার করলো। জোহরা বললো, 'আপনেতো আমারে কোনোদিন কিছু দিলেন না। নেন, এই আরেকখান চুড়িও নেন। দুই হাতে দুই

চুড়ি পরবেন। মানাইবো ভালো। তারপর চুড়ি বাজাইতে বাজাইতে গান গাইবেন, *আমার চুড়িরও শব্দ, তোমার কানে বাজেনি, আমায় নিবাগো নিবাগো মাঝি তোমার কাজে নি? নিলে মাঝি জাইন্যা রাইখ্যো ভাত রান্ধিয়া দিবো, তার বিনিময় তোমায় মাঝি আমার কইর‍্যা নিবো।'*

জোহরা গতরাতের মতো আবার হাসলো। তারপর বললো, 'ভাত রানতেওতো জানেন না। আপনেরে দিয়া হইবোটা কী?'

মনসুর কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলো। কিন্তু বলতে পারলো না। তার আগেই সে জ্ঞান হারালো।

মনসুরের ঘুম ভাঙলো কিংবা জ্ঞান ফিরলো ঘুটঘুটে অন্ধকারে। তার মুখের ওপর কেউ ঝুঁকে আছে। সে তার চোখে-মুখে পানির ঝাঁপটা দিচ্ছে। মনসুর একটু ধাতস্ত হওয়ার সময় নিচ্ছে। তবে চারপাশের বিকট শব্দটা যেন একটু কমে এসেছে। সে ধীরে সুস্থে উঠে বসলো। তারপর মৃদু কণ্ঠে বললো, 'পানি।'

তাকে পানি এগিয়ে দিলো জোহরা। মনসুর ঢকঢক করে পানিটুকু খেয়ে ফেললো। জোহরা বললো, 'আমরা চইল্যা আসছি। আর একটুখানি সময় বুঝলেন? ডরাইয়েন না কিন্তু।'

মনসুর বললো, 'কই চলে আসছি?'

'ঘাটে।'

'কোন ঘাটে।'

'টলার ঘাটে।'

মনসুর প্রশ্ন করতে যাচ্ছিলো, কোন ট্রলার ঘাটে? কিন্তু শেষ পর্যন্ত নিজেকে সামলে নিলো সে। জোহরা যে তার প্রশ্নের উত্তর দিবে না এবং দিলেও এমন হেয়ালি করেই দিবে, তা সে বুঝে গেছে। জোহরা অবশ্য আর কিছু বললো না। মনসুরও না।

ট্রলার ঘাটে ভিড়েছে। কিন্তু মনসুর অবাক হয়ে আবিষ্কার করলো চারপাশে আর কোন ট্রলারের শব্দ সে শুনতে পাচ্ছে না। জোহরা বললো, 'ডাক্তার সাব?'

'হুম।'

'ওঠেন।'

'কেন?'

'নামবেন না?'

'কই নামবো?'

New Pdf download: www.PoragEducation.com + webtalkbd.com

'ঘাটে?'

'ঘাটে আমাকেও নামতে হবে?'

'খালি আপনারই নামতে হবে।'

'মানে?'

'মানে এই ঘাটে খালি আপনে একা নামবেন।'

'তোমরা?'

'আমরা চলে যাবো।'

'তোমরা নামবে না? আমি একা তাহলে এখানে কী করবো?'

'আপনে একা একা হাইট্টা বাড়ি যাইবেন।'

'বাড়ি!'

'হুম।'

'কোন বাড়ি?'

'নবীগঞ্জের আজাহার খোনকারের বাড়ি।'

'কোন বাড়ি?'

জোহরা আর জবাব দিলো না। সে মনসুরকে ধরে দাঁড় করালো। তারপর নিয়ে গেলো ট্রলারের গলুইয়ের কাছে। বাইরে অন্ধকারেও আবছা দোকান-পাট, গাছ-পালার সারি দেখা যাচ্ছে। জায়গাটা চেনা লাগছে না মনসুরের। তবে কেমন একটা ঘ্রাণ যেন রয়েছে জায়গাটার। তার কেন যেন মনে হচ্ছে এই ঘ্রাণটা সে চেনে। কিন্তু কোথাকার ঘ্রাণ তা সে মনে করতে পারছে না। মনসুর বুক ভরে নিঃশ্বাস নিলো। জোহরা বললো, 'নামেন।'

মনসুর বললো, 'এইটা কোন জায়াগা?'

জোহরা বললো, 'আগে নামেন, তারপর বলি।'

মনসুর নামলো। তারপর ঘুরে তাকালো জোহরার দিকে। সকাল হয়ে আসছে। পাখিদের কলকাকলি শোনা যাচ্ছে। জোহরা বললো, 'এইটা হইলো নবীগঞ্জ ছোট বাজার। ওই যে সামনে যেইটা দেখতেছেন, ওইটা হইলো আপনেগো নতুন আড়ত। এইহান থেইকা সোজা হাঁইটা গেলেই আপনের বাড়ি। বাড়িতে আপনের বউ, বাচ্চা।'

মনসুর একবার ভাবলো পেছন ফিরে তাকায়। তাকিয়ে দেখে। কিন্তু তারপর আবার ভাবলো, না থাক। তাকালেই যদি সব কিছু উধাও হয়ে যায়, অন্ধকারে মিলিয়ে যায়। তারপর যদি ঘুম ভেঙে যায় তার! তার চেয়ে না তাকানোই ভালো। একটা আশা অন্তত থাকুক। সে জোহরার দিকে তাকিয়ে ফিসফিস করে বললো, 'এসব কী সত্যি জোহরা?'

জোহরা হাসলো, 'নাহ, মিথ্যা। আপনে স্বপ্ন দেখতেছেন, স্বপ্ন এহনই ভাইঙ্গা যাইবো।'

মনসুর হঠাৎ পেছন ফিরে তাকালো। ভোরের আলো ফুটতে শুরু করেছে। সেই আলোতে ক্রমশই দৃশ্যমান হতে শুরু করেছে তার পরিচিত এক দৃশ্যপট। সেই দৃশ্যপট কোথাও না কোথাও একটু আধটু বদলেছে হয়তো, কিন্তু এর সকলই তার চেনা। এই যে পায়ের তলায় কাদা-মাটি, এই যে জল, ওই যে ভোরের আকাশ, এই যে হাওয়া, ওই যে পাখির ডাক, ওই যে আবছায়া বৃক্ষের আদল, ঘাসের ঘ্রাণ, মাটির স্পর্শ, এই যে...।

মনসুর আর ভাবতে পারে না। এর সকলই তার। জগতে আর কোথাও যেন এমন আকাশ নেই, এমন মাটি নেই, এমন হাওয়া, জল, নদী, বৃক্ষ, ঘ্রাণ নেই। এখানে যা আছে তা কেবলই তার। তা কেবলই আলাদা, অনন্য। এর তুল্য আর কিছু কেথাও নেই। কোথাও না। সে এক পা সামনে এগুলো, তারপর আরো এক পা। তারপর আরও এক পা। ওইযে রঘু পোদ্দারের মিষ্টির দোকানের সাইনবোর্ড, ওই যে বিপুল শীল-এর সেলুন, ওই যে এছাহাক মিয়ার চায়ের দোকান। আর খানিক্ষণ বাদেই রোদ উঠবে। ঝলমল করে উঠবে আলোয়। তারপর লোকে লোকারণ্য হবে দোকানগুলো!

মনসুরের দম বন্ধ হয়ে আসছে। আর সেই মুহূর্তে তাকে ডাকলো জোহরা, 'মনসুর?'

মনসুর মুহূর্তেই থমকে দাঁড়ালো। জোহরাতো তাকে কখনো এই নামে ডাকে না! সে স্বপ্ন দেখছে নাতো? মনসুর ঘুরে তাকালো। জোহরা ট্রলার থেকে নেমে নিচে দাঁড়িয়েছে। সে মনসুরকে বললো, 'একটু এইদিকে আসবেন ডাক্তার সাব?'

মনসুর বিভ্রান্তের মতো জোহরার কাছে গেলো। তার ভয় করছে, জোহরা যদি তাকে আবার ট্রলারে তুলে নেয়! কিন্তু তারপরও জোহরার অমন আহ্বানকে সে এড়াতে পারলো না। সে ঘোরগ্রস্ত মানুষের মতো জোহরার কাছে এগিয়ে গেলো। জোহরা হাত বাড়িয়ে মনসুরের ডান হাতখানা ধরলো। তারপর বললো, 'আমার জন্য আপনের একটুও কষ্ট হইবো না ডাক্তার?'

মনসুর জবাব দিলো না। জোহরা বললো, 'আমার জন্য আপনের একটুও খারাপ লাগবো না?'

মনসুর এবারও জবাব দিলো না। জোহরা মৃদু হাসলো। তারপর বললো, 'আমারে আপনে সত্যি সত্যিই একটুও ভালোবাসেন নাই? কোনোদিনও না?'

মনসুর চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো। জোহরা এবার বললো, 'আমি কিন্তু আপনেরে থুইয়া যাইতেছি না।'

'মানে?'

New Pdf download: www.PoragEducation.com + webtalkbd.com

মনসুর ভয়ার্ত মুখে চোখ তুলে তাকালো। জোহরা বললো, 'আপনেরে থুইয়া একলা একলা থাকতে আমার খুব কষ্ট হইবো ডাক্তার। এই জন্য আপনেরে আমি লইয়াই যাইতেছি।'

মনসুর জোহরার কথার কিছুই বুঝতে পারছে না। সে ফ্যালফ্যাল চোখে জোহরার দিকে তাকিয়ে রইলো। জোহরা মনসুরের হাতটা তার আরো কাছে টেনে নিলো। তারপর তার পেটের ওপর থেকে শাড়িটা সরিয়ে পুরো পেট উদোম করে ফেললো। মনসুর লজ্জায় তার নগ্ন পেটের দিকে তাকাতে পারছে না। জোহরা মনসুরের হাতখানা তার নগ্ন পেটের ওপর চেপে ধরলো। তারপর ফিসফিস করে বললো, 'এইখানে কইরা আমি আপনেরে রাইখ্যা দিছি ডাক্তার। এইখানে। আপনেরে ছাড়া থাকতে যে আমার কষ্ট হইতো। অনেক কষ্ট। এইজন্য আপনেরে এইহানে রাইখ্যা দিলাম।'

জোহরা কাঁদছে। তার গাল বেয়ে দরদর করে ঝরে পড়ছে অশ্রু। মনসুরের চোখের সামনে ভেসে উঠছে সেই ঝড়-বৃষ্টির রাতটা। তার দৃষ্টি ঘোলাটে হয়ে উঠছে। জোহরা ট্রলারে উঠে গেলো। হামিদুল ট্রলার ছেড়ে দিয়েছে। তারা দল ছেড়ে আলাদা হয়ে গিয়েছিলো। দ্রুতই তাদের দলের সাথে যুক্ত হয়ে পৌঁছে যেতে হবে নবীগঞ্জ থানার উদ্দেশ্যে।

ভোরের আলো ফুটছে। সেই আলোয় স্পষ্ট হয়ে উঠছে চারদিক। অথচ মনসুর তাকিয়ে দেখলো, সেই একই আলোয় তার চোখের সামনে থেকে ক্রমশই অস্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে জোহরা। সে বিড়বিড় করে ডাকলো, 'জোহরা।'

কিন্তু জোহরা সাড়া দিলো না। মনসুরের বুকের বাঁ দিকটা হঠাৎ ভারী হয়ে যেতে লাগলো। তার মনে হলো বুকের বাঁ দিকে কোথায় যেন একটা অনাবিষ্কৃত কিন্ত প্রবল অস্তিত্বশীল এক অনুভূতি ক্রমশই জেগে উঠছে। ক্রমশই গ্রাস করছে তাকে। সেই অনুভূতি থেকে এই জীবনে আর কখনোই মুক্তি নেই তার।

New Pdf download: www.PoragEducation.com + webtalkbd.com

https://www.facebook.com/anyadhara অন্যধারা